ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির

আলী আহমাদ মাবরুর

বই সম্পর্কে

হামাস। বিশ্বব্যাপী পরিচিত এক মুক্তি-আন্দোলনের নাম। হামাসের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা আল-কুদস মুক্তির স্বপ্ন দেখে। জাতির বেইমান বড়ো একটা অংশ যখন জায়োনবাদীদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা ও আপসকামিতায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুরন্ত সাহসে গর্জে উঠে আমৃত্যু লড়াকু হামাস যোদ্ধারা। মজলুম জননেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের হাত ধরে জন্ম নেওয়া হামাস এখন রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিনের মুক্তির লড়াইয়ে আশা-ভরসার একমাত্র প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আজকের এই অবস্থানে পৌঁছতে অসংখ্য শাহাদাত এবং ত্যাগের নজরানা পেশ করতে হয়েছে। ইজরাইলের মতো ঘৃণ্য অপশক্তির মোকাবিলায় হামাস যে দুঃসাহসিতার পরিচয় দিচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ হামাস নিয়ে বেশ অনুসন্ধিৎসু। বাস্তবে বাংলা ভাষায় এই বৈপ্লবিক মুক্তি-আন্দোলন নিয়ে সেই অর্থে কোনো একাডেমিক কাজ হয়নি। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত এই মুক্তি-আন্দোলনকে বাংলাভাষীদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন তরুণ লেখক ও অনুবাদক জনাব আলী আহমাদ মাবরুর। অনেক পরিশ্রম করে তুলে এনেছেন হামাস সম্পর্কিত অনেক আজানা তথ্য ও ঘটনা। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান অনেক ঘটনা পড়ে পাঠকবৃন্দ কখনো অশ্রুসিক্ত হবেন, কখনো রিক্ত হবেন, কখনো-বা শিহরন জাগবে রক্তকণিকায়।

হামাস

(ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির)

আলী আহমাদ মাবরুর

হামাস

(ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির)

আলী আহমাদ মাবরুর

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২০ জানুয়ারি, ২০২০

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : আলি মিসবাহ
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৪৮০
পেপারব্যাক মূল্য : ৪৫০

ISBN- 978-984-8254-46-2

Hamas by Ali Ahmad Mabrur, Published by Guardian Publications,
Price TK. 480 (HC)/TK. 450 (PB) Only

প্রকাশকের কথা

হামাস।
বিশ্বব্যাপী পরিচিত এক মুক্তি আন্দোলনের নাম। হামাসের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা আল কুদস মুক্তির স্বপ্ন দেখে। জাতির বেইমানদের বড়ো একটা অংশ যখন জায়োনবাদীদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা ও আপসকামিতায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুরন্ত সাহসে গর্জে উঠে আমৃত্যু লড়াকু হামাস যোদ্ধারা। মজলুম জননেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের হাত ধরে জন্ম নেওয়া হামাস এখন রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিনের মুক্তির লড়াইয়ে আশা-ভরসার একমাত্র প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আজকের এই অবস্থানে পৌঁছতে অসংখ্য শাহাদাত এবং ত্যাগের নজরানা পেশ করতে হয়েছে তাদের। ইজরাইলের মতো ঘৃণ্য অপশক্তির মোকাবিলায় হামাস যে দুঃসাহসিতার পরিচয় দিচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর তাওয়াক্কুল করে জায়োনবাদীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিপ্লবী হামাস।

হামাসের উত্থান এবং পথচলাটা খুব সুখকর ছিল না। তাকে একই সঙ্গে অনেকগুলো পক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছে। একদিকে জায়োনবাদী ও তার সমর্থকগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পিচাশসুলভ ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নিজ দেশের ফাতাহ, মাতৃসংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন, এমনকী নিজেদের ঘরের সংকটকেও সামাল দিতে হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী-ই হামাস সম্পর্কে জানতে ব্যাপক কৌতূহল। প্রথম ইন্তিফাদার গর্ভে জন্ম নেওয়া হামাস কীভাবে জায়োনবাদীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার পরিচালনা করছে, তা জানার আগ্রহ অনেক জ্ঞানপিপাসু লোকের। কীভাবে লড়াই আর সমাজসেবা একাকার করে নিয়েছে হামাস, তা জানতে ব্যাকুল অনেকেই। হামাসের বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো অনেকেরই অজানা। এমন একটা মুক্তিকামী আন্দোলনের পর্দার অন্য পাশটাও জানা দরকার।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দও হামাস নিয়ে অনুসন্ধিৎসু। বাস্তবে বাংলা ভাষায় এই বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলন নিয়ে সেই অর্থে কোনো কাজ হয়নি;

নেই কোনো একাডেমিক বয়ান। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত এই মুক্তি আন্দোলনকে বাংলাভাষীদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন তরুণ লেখক ও অনুবাদক আলী আহমদ মাবরুর। অনেক পরিশ্রম করে তুলে এনেছেন হামাস সম্পর্কিত অনেক আজানা তথ্য ও ঘটনা। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান অনেক ঘটনা পড়ে পাঠকবৃন্দ কখনো অশ্রুসিক্ত হবেন, কখনো রিক্ত হবেন, আবার কখনো-বা শিহরণ জাগবে রক্তকণিকায়।

আর কথা নয়, বাকিটা জানতে থাকব গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে। তো শুরু হোক ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন হামাস সম্পর্কে জানার সফর...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২০ জানুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

ফিলিস্তিন আমাদের প্রাণস্পন্দন, আত্মার আকুতি এবং হৃদয়ের মিনতি। মুসলমানদের প্রথম কিবলা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' এই ফিলিস্তিনের বুকেই অবস্থিত। আমি লক্ষ করেছি— আমরা যে যে-ই অবস্থানেই থাকি না কেন, ফিলিস্তিন ইস্যু সামনে এলেই যেন কিছু সময়ের জন্য থমকে যাই। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ আমাদের প্রিয় বায়তুল মুকাদ্দাস, অসংখ্য নবি ও সাহাবিদের স্মৃতিবিজড়িত জেরুজালেমসহ গোটা ফিলিস্তিন আজ ইহুদি জায়োনবাদীদের দখলে। গভীরভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, আমরা খুব সহজেই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব না। তারপরও ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমাদের ভালোবাসা ও আবেগ বিন্দুমাত্রও কমেনি; কমবেও না ইনশাআল্লাহ!

ফিলিস্তিন ইস্যুতে কাজ করার আগ্রহ অনেক দিন থেকেই। বিগত ৪-৫ বছরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং সর্বশেষ বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে যখন মার্কিন প্রশাসন জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন একজন মুসলিম হিসেবে ফিলিস্তিন নিয়ে কাজ করাটাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। তা ছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনের ইস্যু নিয়ে কাজ করাটা জরুরিও। কারণ, দল-মত নির্বিশেষে সবাই ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আবেগতাড়িত, সহানুভূতিশীল। এমনকী আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে একই ধরনের ভালোবাসা কাজ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ইজরাইল আমাদের স্বীকৃতি দিতে চাইলেও আমরা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই ধারা এখনও চলছে। আমাদের দেশে যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারাও সর্বদাই ফিলিস্তিনের ওপর ইজরাইলের জুলুম-নিপীড়ন নিয়ে সোচ্চার থেকেছেন। আমাদের সংসদে ইজরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ জানানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। এমনকী আজকের এই লজ্জাজনক বাস্তবতায় যেখানে অনেক মুসলিম দেশই ইজরাইলের ব্যাপারে তাদের অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে, সেখানে বাংলাদেশ ইজরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেদিন (১৪ মে, ২০১৮) জেরুজালেমে তাদের দূতাবাস চালু করে, সেদিনও বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ইতিহাসের সেই কালো দিনে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল— 'জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।' ইজরাইলি বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

জানি না, আমাদের সরকারের পক্ষে এই অবস্থান কতদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে। তবে বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক দল ছাড়াও এ দেশের সাধারণ মানুষও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে বরাবর সোচ্চার থেকেছে। আমি শৈশব থেকেই বায়তুল মোকাররমে ফিলিস্তিনের মানুষের পক্ষে এবং ইজরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে অসংখ্যবার বিক্ষোভ মিছিল হতে দেখেছি। একটি দল হয়তো কর্মসূচি ঘোষণা করে ঠিক, কিন্তু তাতে যোগ দেয় দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা। ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে আবেগ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমি দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে একই অবস্থানে পেয়েছি। এমনকী রাস্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও মিছিল চলাকালে ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য চোখের পানি ফেলতে দেখেছি। কূটনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ফিলিস্তিনকে সম্মান দিয়ে এসেছে সব সময়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে ততটা শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে না পারলেও এটাই বাস্তবতা, অন্য অনেক শক্তিশালী দেশের ভিড়েও বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতকেই দীর্ঘদিন ডিপ্লোম্যাট কোরের ডিন হিসেবে কাজ করার সুযোগও দিয়েছে।

এত আবেগ যেই ফিলিস্তিনের জন্য, সেই ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির আন্দোলন নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি বই নেই। সেই অভাব থেকেই এই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। মূলত ১৯৪৮ সালে ইজরাইল যখন জোরপূর্বক ফিলিস্তিনের অসংখ্য ভূখণ্ড দখল করে এবং অগণিত ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, তখন থেকেই ফিলিস্তিনের অধিকার আন্দোলনের সূচনা। তবে সেই আন্দোলনের গতি ও কৌশল কখনোই এক রকম ছিল না; এটা পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। ফাতাহ একভাবে করেছে তো সেক্যুলার বাথ পার্টি করেছে অন্যভাবে। আবার ইসলামপন্থিরা অন্যভাবে করেছে। প্রায় অনেক বছর শুধু পাথর ছুড়েই অনেক ফিলিস্তিনি যুবক ইজরাইলি দখলদারিত্বের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। এই প্রসঙ্গে মরহুম ইয়াসির আরাফাতসহ অনেক নাম না জানা শহিদ ও গাজির কথা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

ফিলিস্তিন অধিকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দীর্ঘদিন এককভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মরহুম ইয়াসির আরাফাত। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে 'দ্য গান অ্যান্ড দ্য অলিভ ব্র্যাঞ্চ' নামে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ দিয়ে তিনি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ৯০'র দশকে যখন মরহুম পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইজরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা শুরু করেন, তখনই ফিলিস্তিন ইস্যুটি ব্যাপক অর্থে আন্তর্জাতিক একটি উপসর্গে পরিণত হয়। ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আন্দোলন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।

১৯৮৭ সালে প্রথমবারের মতো দেশটিতে ইন্তিফাদা বা জনবিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর থেকেই ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পালটাতে থাকে। ইতিহাসের পাতায় নতুন নতুন অনেক অধ্যায়ের সংযোজন হতে থাকে। আমি মূলত সেই সময়টা নিয়েই কাজ করতে চেয়েছিলাম।

ঠিক তখনই আমি একটা অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখীন হই, আর সেটা হলো হামাস। ইন্তিফাদার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল হামাসের। আবার এভাবেও বলা যায়, এই ইন্তিফাদা থেকেই হামাসের জন্ম। যেভাবেই বলি না কেন, হামাস হঠাৎ করেই ১৯৮৭ সালের পর থেকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিরাট বড়ো নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ইন্তিফাদার পরপরই প্রকৃতার্থে ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের গতিপথ পালটাতে শুরু করে। আর সেই অবস্থা আজও চলছে। এই পরিবর্তিত আন্দোলন এবং আন্দোলনের নানা আলোচিত কর্মসূচি বিশেষ করে– প্রথম ইন্তিফাদা, দ্বিতীয় ইন্তিফাদা, ফিলিস্তিনের প্রথম আইনসভা নির্বাচন, পৌর নির্বাচন কিংবা অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া 'গ্রেট মার্চ অব রিটার্ন' কর্মসূচি নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে– ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলন আর হামাস একটা অপরটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হামাসকে বাদ দিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি–আন্দোলনকে মূল্যায়ন করা কখনোই সম্ভব নয়।

এই অনস্বীকার্য বাস্তবতার কারণেই হয়তো নিজের অজান্তেই আমার মনোযোগ ফিলিস্তিন থেকে সরে গিয়ে কীভাবে যেন হামাসের ওপর নিবদ্ধ হলো। আমরা যারা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরাখবর দেখি, তারা ইয়াসির আরাফাত বা মাহমুদ আব্বাসের অনেক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানলেও হামাস সম্পর্কে তেমন একটা জানি না। বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য জানলেও বিস্তারিত ধারণার খুবই অভাব। তাই এবার হামাসের ওপর বইপত্র খুঁজতে শুরু করলাম। বিস্ময়কর শোনালেও বলতে হয়– হামাস নিয়ে বাংলা ভাষায় আজ অবধি তেমন কোনো কাজ হয়নি!

হামাসের ব্যাপারে আমার বাড়তি আগ্রহ ছিল ২০০৬ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই। তখন আমি কিশোর থেকে তরুণ হওয়ার পথে। হামাসের ব্যাপারে চারপাশ থেকে যে তথ্যগুলো পেতাম, বিশেষ করে সিএনএন বা বিবিসিতে যে খবরগুলো শুনতাম, তার অধিকাংশই নেতিবাচক। হামাস নাকি সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু ২০০৬ সালের নির্বাচনে সেই হামাস নামক তথাকথিত সন্ত্রাসী সংগঠনটিই ফিলিস্তিনের মেইনস্ট্রিম দল ফাতাহকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে। আমি তখন প্রচণ্ড অবাক হয়েছিলাম– একটি দল যদি সন্ত্রাসীই হয়, তাহলে এত ভোট কেন পেল? মানুষ কেন তাদের চাইল?

তবে হামাসের নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিও খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের কল্যাণে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে খালিদ মিশালকে চিনতাম, অথচ প্রধানমন্ত্রী তিনি হলেন না; হলেন ইসমাইল হানিয়া। এটা নিয়েও প্রশ্ন ছিল, কিন্তু উত্তর পাইনি।

মনের ভেতর অবচেতনভাবে সেই প্রশ্নগুলো বোধ হয় থেকেই গিয়েছিল। তাই এত বছর পরে যখন বাস্তবতার প্রয়োজনে আবার লেখালেখি শুরু করলাম, তখন হামাস নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে তরুণ বয়সে মনে জাগা সেই উত্তরগুলো অনুসন্ধান করার ব্যাপক ইচ্ছা হলো। কিন্তু একটু আগে যেমনটা বললাম, বাংলায় হামাসের ওপর তেমন কোনো বই নেই, তাই ইংরেজিতে খোঁজা শুরু করলাম। ততদিনে আমার প্রথম অনূদিত বই *ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড* প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। তাই মনে মনে একটা নিয়ত করে ফেললাম, যদি হামাসের ওপর ইংরেজিতে ভালো বই পাই, তাহলে সেটা আমি অনুবাদ করব এবং বাংলা ভাষায় হামাস নিয়ে চর্চার যে ঘাটতি, তা কিছুটা হলেও দূর করব।

এখানে ব্যক্তিগত কিছু কথা বলে রাখি, আমি নিজেকে খুব একটা যোগ্য মনে করি না। মূল ধারার গণমাধ্যম, পত্রিকা, জার্নাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করছি অনেক দিন থেকেই। তবে যখন থেকে লেখালেখির জগতে পা ফেললাম, তখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, যোগ্যতায় নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে না পারলে আমি মৌলিক রচনায় হাত দেবো না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুবাদ করে যাব, অন্তত আরও কয়েক বছর। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হামাসের ওপর ভালো ইংরেজি বই অনুসন্ধান শুরু করলাম।

আবারও যেন বিস্ময়ের ঘোরে পড়ে গেলাম। হামাসের ওপর ইংরেজিতে ভালো বই পাওয়াও কঠিন দেখা যাচ্ছে। যেই বইটাই পাই, সেটাই দেখি পশ্চিমা রংঢং আর মানসিকতায় লেখা; যেখানে হামাসকে ভীষণ নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ বই যথেষ্ট পরিমাণে খুঁজে না পাওয়ায় হঠাৎ একদিন সাহস করে নিজেই হামাসের ওপর বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পড়তে শুরু করলাম। সংগ্রহ করার মতো কিছু পেলেই লিখে রাখি। যখনই কোনো জায়গায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাই না, নেটে সার্চ দিই, ব্রিটিশ পত্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের পত্রিকা পড়ি, ফিলিস্তিন নিয়ে পশ্চিমা ভাবধারার লেখা পড়ি। আবার তার কাউন্টার আর্টিক্যালও পড়ি, বাংলা পত্রিকা পড়ি, ব্লগের লেখাগুলোতে ঘাঁটাঘাঁটি করি। এভাবে গত ১০ মাস ধরে নিরন্তর পড়েই চলেছি এবং কাজ করেছি; যার ফল এই বইটি।

আলহামদুলিল্লাহ! এটি আমার প্রথম মৌলিক বই। ফিলিস্তিনের ওপর আমি প্রথম মৌলিক বই রচনা করতে পেরেছি, এই মানসিক তৃপ্তিটা সারা জীবন থেকে যাবে। বইটি লেখার প্রয়োজনে আমি তথ্য নিয়েছি অনেক জায়গা থেকেই, তবে লিখেছি, সাজিয়েছি নিজের মতো করে; নিজস্ব ভাব-ভঙ্গিমায়। এই বইটিতে সংগঠন হিসেবে হামাসকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে (১৯৮৭-২০০৭) ২০ বছরের ফিলিস্তিনের মুক্তির আন্দোলনকেও তুলে ধরা হয়েছে। আগেই বলেছি, হামাসের প্রতিষ্ঠা ও উত্থান এবং ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলন একই সূত্রে গ্রথিত। তাই বিশেষ করে সে সময়ের ঘটনাবলিকে এই বইটিতে ন্যায়নিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা ঘটনা ইতিহাস হতেও সময় লাগে। এই বইতে আমি ততটুকুই আলোচনা করেছি, যার মূল্যায়ন ইতিহাসের আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানের ঘটনাবলি খুব একটা বিশ্লেষণ করিনি। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে, তা আমি বিভিন্ন দৈনিকে এবং সামাজিক মিডিয়ায় প্রায়শই লিখছি। হয়তো আরও কিছু সময় পর এগুলো নিয়েও আরও কাজ করা সম্ভব হবে। ঠিক একই কথা হামাসকে নিয়েও। হামাস একটি চলমান আন্দোলন। প্রতি মুহূর্তেই তারা কাজ করছেন, কর্মসূচি দিচ্ছেন। সেগুলো আমি হয়তো পরবর্তী সময়ে অন্য কোথাও তুলে ধরব। কিন্তু এই বইতে মূলত হামাসের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার পেছনের ইতিহাস, কীভাবে তারা বিকশিত হলো, বিভিন্ন দেশে কীভাবে শাখা চালু করল, হামাস কী কী বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছে এবং সর্বশেষ ২০০৬ সালে তারা কীভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করছে– এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি।

বইটি লিখতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করছি, তিনি আমার পরিশ্রমকে কবুল করবেন। আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই ধরনের একটি কাজ করতে গেলে স্ত্রী-সন্তানদের বঞ্চিত না করে পারা যায় না। আশা রাখছি, তারাও এই বইটি দেখে সেই বঞ্চনার দায় থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। আমার স্ত্রী আমাকে সব সময় এই ধরনের কাজ করতে উৎসাহ দেন। রাত-দিন যখনই কাজ করি, তিনি আপত্তি করেন না। এটা না পেলে আমি হয়তো এতটা সময় ব্যয় করে বইটি লিখতে পারতাম না। আমার মা, আমার অভিভাবক। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁর সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দুআ চাই। কৃতজ্ঞতা আমার সেই কাছের মানুষগুলোর প্রতিও, যারা সব সময় আমার পাশে ছিলেন, আমাকে ভালো কাজে উৎসাহ এবং লড়াই করার সাহস জুগিয়েছেন।

আমার দুঃসময়ে, অনেক চড়াই-উতরাই মোকাবিলা করেও আমার পাশে যেই প্রতিষ্ঠানটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*। কর্ণধার নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং এই প্রকাশনীর গোটা টিমের জন্য আমার আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা। আমার জীবনের গল্পে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কখনোই ভোলার নয়। এখানে একটা সত্য স্বীকার করতেই হবে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমার কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন কীভাবে হতো জানি না। তবে ফিলিস্তিন, বিশেষত হামাস ইস্যুতে যে বই হতে পারে– এই চিন্তাটা মাথায় প্রথম ঢুকিয়েছেন গার্ডিয়ানের প্রিয় নূর ভাই। তাই এই বইটির সূত্রধর হিসেবে ক্রেডিটটা তাকে আমি নির্দ্বিধায় দিতেই পারি।

পরিশেষে নিজের মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে যেন আরও বাড়াতে পারি, মুসলিম উম্মাহর জন্য যেন আরও কল্যাণকর কিছু করে যেতে পারি, সেই কামনায় আপনাদের সকলের কাছে দুআ চাই।

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা।
amabrur@yahoo.com

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

হামাসের উত্থান এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যেকোনো বড়ো কিছুর আবির্ভাবের জন্য চাই বড়ো প্রেক্ষাপট। প্রতিনিয়ত তো কত কিছুই ঘটে চলছে। সময়ের পালাবদলে অধিকাংশ ঘটনাই আমাদের কাছে গা সওয়া মনে হয়। কিন্তু ঘটনার অনন্যতা বা গুরত্ব বোঝা যায় বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর; বিশেষ করে ঘটনার প্রভাব যখন আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে কিংবা নতুন কোনো উপাখ্যানের সূচনা করে।

এ রকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়, যার সূত্রপাত ১৯৮৭ সালের ৯ ডিসেম্বর। একটি সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। হাজারো ফিলিস্তিনি নাগরিক এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে এবং ইজরাইলের প্রতি তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফিলিস্তিনিরা ইজরাইলি সেনাদের দিকে বোতল ছুড়ে মারে। সেই সময় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস *এপির* একজন সাংবাদিক ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট করছিলেন। তিনি বিশ্বকে জানাচ্ছিলেন– ফিলিস্তিনিরা কোনো সহিংসতা ছাড়াই ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইজরাইলি বাহিনী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

তবে *এপির* সেই সাংবাদিক তার রিপোর্টে এই সংঘাত শুরুর ঘটনাটিকে সাধারণ একটি সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে প্রচার করলেও ফিলিস্তিনিদের কাছে এটি মোটেও কোনো সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা ছিল না। তারা মনে করেছিল– এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

মূলত এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে আগের দিন সন্ধ্যায়। ইজরাইলে দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গাজার কিছু শ্রমিক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটি ইজরাইলি

সেনাবাহিনীর ট্রাক পেছন থেকে তাদের থেতলে দিয়ে যায়। তিনজন ফিলিস্তিনি শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং আরও বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এটা নিছক কোনো অঘটন ছিল না; বরং এর মাধ্যমে নতুন সংকট সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আবার এটাই যে শেষ ছিল– এমন নয়; বরং এটা দীর্ঘ এক নীলনকশা বাস্তবায়নের শুরু মাত্র। এরপর পরবর্তী বছরগুলোতে ফিলিস্তিনে এ রকম আরও অনেক ঘটনাই ঘটে, যা গোটা অঞ্চলে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

৯ ডিসেম্বর ঘটনাবহুল দিনটি পার করে সেই রাতেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ৭ শীর্ষ নেতা গাজায় জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। এই ৭ শীর্ষ নেতা হলেন– শেখ আহমাদ ইয়াসিন, ড. আব্দুল আজিজ রান্তিসি, সালাহ শিহাদাহ, আব্দুল ফাত্তাহ দুখান, মুহাম্মাদ শামআহ, ইবরাহিম আল ইয়াজুরি ও ইসা নাসর।[১] এর আগের দিন সকালে তারা গাজা উপত্যকায় ইখওয়ান নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের' ছাত্রদের ধর্মঘটের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে ছাত্র-জনতা আশ-শিফা হাসপাতালের চারপাশে জমায়েত হয়, যা বিশাল এক জনসমাবেশের রূপ ধারণ করে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেই হাসপাতালের বাইরে দাঁড়ানো ছিল। কারণ, শুধু বিক্ষোভ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ইজরাইলি সেনাদের হামলায় যারা আহত হয়েছিল, তাদের রক্ত দিয়েও সাহায্য করেছিল।

যাহোক, ৯ ডিসেম্বর রাতে সেই বৈঠকে ইখওয়ানের ৭ নেতা ফিলিস্তিনের ইখওয়ান শাখাকে 'প্রতিরোধ আন্দোলনে' পরিণত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা নতুন এই প্রতিরোধ আন্দোলনটির নাম দেন 'হারাকাতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়াহ'। আর ইংরেজিতে 'দ্য ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট' তথা হামাস নামে। ড. আব্দুল আজিজ আল রানতিসি খুব দ্রুত এই সংগঠনের প্রথম কর্মসূচি প্রস্তাবনা তৈরি করেন, যা দলটি প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় দিনের মাথায় গণমাধ্যমের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটিকেই হামাসের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' বলা হয়। জানা যায়– এর আগে প্রায় ১০ বছর ধরে শেখ আহমাদ ইয়াসিন এবং তার সহকর্মীরা মিলে এই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য তৈরি হয়েছেন। ভেতরে ভেতরে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন; যদিও তা কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি।

---

১. এই ৭ শীর্ষ নেতার প্রথম ৩ জন শাহাদাতবরণ করেছেন অনেক আগেই। ২০০২ সালের ২৩ জুলাই ইজরাইলি বিমান বাহিনীর হামলায় সালাহ শিহাদাহ তাঁর স্ত্রীসহ শহিদ হন। শেখ ইয়াসিন শহিদ হন ২০০৪ সালের ২২ মার্চ। আর আব্দুল আজিজ রান্তিসি ২০০৪ সালের ১৭ এপ্রিল শাহাদাতবরণ করেন। শীর্ষ এই ৭ নেতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল– তারা সকলেই হয় নাকাবার (দুর্যোগময় দিনের) আগে, নাহয় নাকাবার পরপরই জন্মগ্রহণ করেন। ফলে তারা ইজরাইলিদের হাতে গাজাসহ ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ড দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হামাস প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেন– 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, সক্রিয় প্রচেষ্টা, প্রিয় ভাই ও সহকর্মীদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে অব্যাহত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতরে আমরা বহুবার মিলিত হয়েছি, সবকিছু পর্যবেক্ষণ এবং অপেক্ষা করেছি, কেবল পরিবর্তনের সূচনাকারী সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটির জন্য।'[২]

ফিলিস্তিনে ইহুদি উপনিবেশের ইতিহাস

ইহুদিদের ফিলিস্তিন আগ্রাসনের শুরুটা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে। মূলত এই সময়টাতেই ইউরোপে অ্যান্টি-সেমিটিজম তথা ইহুদিবিদ্বেষ দানা বাঁধতে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিরা নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে।

প্রায় সহস্র বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদিরা বিতাড়িত ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতিত হলেও অ্যান্টি-সেমিটিজমের উত্থানের যুগে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের কোনো অধিকার ছিল না। ১৮৭৮ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়– তদানীন্তন সময়ের ফিলিস্তিন মোটামুটি সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবে বিরাজ করছিল। সেখানে মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং অল্পসংখ্যক ইহুদিও ছিল। ১৮৭৮ সালে ফিলিস্তিনে আদমশুমারি কিছুটা এমন–

> মোট জনসংখ্যা : ৪৬২৪৬৫। আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৯৬.৮%, ইহুদি : ৩.২%

কিন্তু নেপোলিয়ানের ভ্রষ্ট ও আগ্রাসী নীতির অনুসারী ব্রিটিশদের সহায়তায় ইহুদিরা দ্রুতই ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে। জাহাজে করে হাজারো ইহুদিকে ফিলিস্তিনে আনা হয়, ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থও দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকে আরবদের থেকে জমি কেনে, অনেকে খুন ও গুমের পথ বেছে নিয়ে জোরপূর্বক মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের ঘরবাড়ি দখল করে নেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহায়তার মূল কারণ ছিল– পতনোন্মুখ উসমানি খিলাফতের অধীনে থাকা ভূখণ্ডের ভাগ-বাটোয়ারা সম্পন্ন করার সময় মিশরকে নিরস্ত্র রাখা।

---

২. শেখ ইয়াসিনের একটি সাক্ষাৎকার ১৯৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু করে ৫ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে আল জাজিরার আরবি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। যেখান থেকে এই উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আল জাজিরার আহমাদ মানসুর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী সময়ে আহমাদ মানসুর তাঁর সম্পাদিত বইতেও সন্নিবেশিত করেন। সেই বইটি বিস্তারিত ১ নং রেফারেন্সে পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল– মিশরকে নিষ্ক্রিয় রাখতে না পারলে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ-বাটোয়ারাতে জাতীয়তাবাদী মিশরীয়রাও হস্তক্ষেপ করবে। উপনিবেশের স্রোতে ভেসে আসা ইহুদিদের পরবর্তী পরিসংখ্যান লক্ষ করা যাক। ১৯২২ সালের পরিসংখ্যান কিছুটা এমন–

> মোট জনসংখ্যা : ৭৫৭১৮২ জন।
> আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৮৭.৬%।
> ইহুদি : ১১%।

১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইহুদিরা পরিকল্পিতভাবে উপনিবেশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যান–

> মোট জনসংখ্যা : ১০৩৫১৫৪ জন।
> আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৮১.৬%।
> ইহুদি : ১৬.৯%।

বলা বাহুল্য, হিটলারের অমানবিক অ্যান্টি-সেমিটিজম ইহুদিদের ইউরোপ ত্যাগে বাধ্য করে। হিসাব খুব সোজা– হয় ইউরোপ ত্যাগ, নয়তো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাশবিক মৃত্যুবরণ! এ সুযোগে জায়োনবাদীরা ফিলিস্তিনে ইহুদি সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে ফিলিস্তিনে আসা ইহুদি অভিবাসী তথা উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পরিসংখ্যান কিছুটা এমন–

> ১৮৮২-১৯১৪ সালের মধ্যে : ৬৫,০০০
> ১৯২০-১৯৩১ : ১০৮,৮২৫
> ১৯৩২-১৯৩৬ : ১৭৪,০০০
> ১৯৩৭-১৯৪৫ : ১১৯৮০০

অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইহুদি স্থাপনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুরো বিশ্বের সহানুভূতি ছিল ইহুদিদের প্রতি। কিন্তু আজ বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীরা বলতে বাধ্য হয়েছেন– 'হলোকাস্ট করেছে হিটলার, এতে ফিলিস্তিনিদের তো কোনো দোষ ছিল না। তাহলে ক্ষতিপূরণটা ফিলিস্তিনিদের দিতে হলো কেন?'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের পরিবর্তে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। আমেরিকার ইহুদিরা এবার বিশ্ব মানচিত্র নকশায় নিজেদের অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের অপরাধী ভাবতে শুরু করেছিল।

কারণ, তাদের সতীর্থ ইহুদিরা ইউরোপজুড়ে গণহত্যার শিকার, আর তারা আমেরিকায় বসে অঢেল বিত্ত-বৈভবের বিলাসে ডুবে ছিল। এই অপরাধবোধ থেকে তারা হোটেল বাল্টিমোরকে ঘিরে তুমুল লবিং শুরু করে।

ফ্রাংকলিন রুজভেল্টই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইহুদি লবির সাহায্য নিয়েছিলেন। তার উত্তরসূরি ট্রুম্যান সে পথ ধরেই ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ শুরু করেন। মূলত এই সময়ই আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী লবি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘকে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে ঐতিহাসিক 'দুই জাতি' সমাধান প্রস্তাব করে। তারা প্রাচীন ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে দুটি দেশ তৈরির কথা বলে– ইজরাইল ও ফিলিস্তিন।

এমনকী গণপ্রস্তাবপত্রে দেখা যায়– সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো ইহুদিদের দেওয়া হয়েছিল। ইজরাইল যদি এই দুই জাতি সমাধানও নিত, তাহলেও হয়তো মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা সমাধান হতো। কিন্তু ইজরাইল এটাও মানতে পারেনি। তারা দাবি করে– আমাদের পুরো ফিলিস্তিন দরকার এবং আমরা একে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই।

সময়ের দুর্বিপাকে শুরু হয় ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ। যুদ্ধটা যদিও আরবের সাথে ইজরাইলের, তবে সত্য হলো– আরবরা ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার অনেক পরে সাড়া দিয়েছে। ইহুদিরা ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি গ্রামে গণহত্যা চালিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো গণহত্যা ঘটেছিল দাইর ইয়াসিন গ্রামে। ইজরাইলি সৈন্যরা এই গ্রামের ৬০০ জনের মধ্যে ১২০ জনকেই হত্যা করেছিল। তাই দেরিতে হলেও পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর টনক নড়ে। ফিলিস্তিনের সীমান্তবর্তী দেশ মিশর, জর্ডান সিরিয়াও যুদ্ধে যোগ দেয়। অন্যান্য কয়েকটি আরব দেশও এগিয়ে আসে। কিন্তু এত কিছুর পরও পুরো যুদ্ধজুড়ে ইজরাইলিদের আধিপত্য ঠিকই বজায় থাকে। সৈন্যের পরিসংখ্যান–

> আরব : ৬৮০০০ জন।
>
> ইজরাইল : ৯০০০০ জন।

এই যুদ্ধে ইজরাইলের প্রত্যেক যুবকের যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক ছিল। তারা ফিলিস্তিনের ৫০০ টি গ্রামের মধ্যে ৪০০ টিই জনশূন্য করে ফেলেছিল। যুদ্ধ শেষে পুরো ফিলিস্তিন দখল করতে খুব একটা বাধা ছিল না। ফিলিস্তিনের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ শরণার্থী ও উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ফিলিস্তিনে এমন একটা পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা কমপক্ষে দুই-দুইবার নিজের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়নি।

১৯৪৮ সালেই ইজরাইল নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ ও অন্য কিছু দেশ বাদে প্রায় সবাই স্বীকৃতি দেয়। এই যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিন বলে পৃথিবীতে আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকল না। ফিলিস্তিনের যে অংশটুকু তারা দখল করতে পারেনি, তা মিশর এবং জর্ডান ভাগাভাগি করে নেয়। গাজা উপত্যকা মিশরের অধীনে আসে, জর্ডান পায় পশ্চীম তীর।

এরপরও ইজরাইলের শান্তি মেলে না। প্রকাশ্য দিবালোকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৫৭ সালের পর ৪০০০০০ ফিলিস্তিনি বাস্তুহারা হয়। বাস্তুহারাদের অনেকেই একটু ঠাই পাওয়ার জন্য ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়। উল্লেখ্য, তখন যুদ্ধপরবর্তী ইজরাইলের মধ্যেও অনেক ফিলিস্তিনি বাস করত। তাদের প্রায় সবাই বাস্তুহারা হওয়ার পর ইজরাইল গাজা এবং পশ্চিম তীরের দিকে নজর দেয়। মিশর ও জর্ডানের কাছ থেকে এ দুটো অংশ কেড়ে নিতে আবারও যুদ্ধ শুরু করে। এভাবেই ১৯৬৭ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৬৭ সালে পুরো ফিলিস্তিন ইজরাইলের অধিকারে চলে আসে। কিন্তু জায়োনবাদীরা জানত– শুধু দখল করলেই চলবে না, চ্যালেঞ্জ আরও আছে। এ জন্য দরকার, ফিলিস্তিনিরা যাতে কোনোভাবেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা। ইজরাইলিরা ঠিক এ কাজটাই করে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগে জেরুজালেম দুই ভাগ ছিল। পশ্চিম জেরুজালেম ছিল ইজরাইলের রাজধানী। আর পূর্ব জেরুজালেম জর্ডান অধিকৃত পশ্চিম তীরের রাজধানী। এ সময়ই ইয়াসির আরাফাতদের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন জোরালোভাবে শুরু হয় এবং তারা পূর্ব জেরুজালেমকেই নিজেদের রাজধানী হিসেবে দাবি করে। মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস পূর্ব জেরুজালেমেই অবস্থিত।

ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে যেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হয়, এ জন্য ইজরাইল গাজা এবং পশ্চিম তীরের অভ্যন্তরে অসংখ্য সামরিক চেকপোস্ট স্থাপন করে। ২০০৫ সালে গাজা থেকে ইজরাইলি সেনা ও ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করা হলেও গাজা উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে এখনও চেকপোস্ট আছে। এই চেকপোস্টের কারণে এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে যেতে পারে না! কেউ অন্য গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাও করতে পারে না। কী এক দুর্বিষহ অবস্থা!

এ তো গেল গাজার কথা। পশ্চিম তীরের অবস্থা আরও খারাপ। বলা যায় পুরো পশ্চিম তীরই ইজরাইলি বসতিতে ছেয়ে গেছে। অথচ বিশ্ব মিডিয়াতে ইজরাইলিদের হত্যাযজ্ঞকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ, আর ফিলিস্তিনিদের প্রতিরক্ষাকে সন্ত্রাস!

ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের ইতিহাস

মুসলিম ব্রাদারহুড নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের মূল্যায়ন আছে। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হলো– আরব অঞ্চলের লাখো মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে এই সংগঠনটি দীর্ঘ বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। আরব অঞ্চলের বাইরেও কোটি কোটি মুসলিম এই সংগঠনটিকে তাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন মনে করে। এমনকী এমন অনেক অমুসলিমও আছে, যারা এই সংগঠনটি নিয়ে গবেষণা কিংবা এই দলের নেতা-কর্মীদের সংস্পর্শে সময় কাটানোর পর ভক্ত হয়েছেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্ম মিশরে, কিন্তু কালক্রমে সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে শহিদ হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) মিশরের 'ইসমাইলিয়াহ' নামক শহরে মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল সংগঠনটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন শহিদ হাসানুল বান্না ছিলেন একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। এই স্কুলের কাছেই ছিল দখলদার ব্রিটিশদের কার্যালয়।

হাসানুল বান্নার সঙ্গে হাসাফিয়া মতধারার বেশ কিছু সুফি-সাধকের পরিচয় ছিল। তাদের কাছ থেকে তিনি বিশুদ্ধ তাওহিদি চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠার পরপরই ইখওয়ান মিশরের বাইরে ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। মিশরের অভ্যন্তরে মাত্র ৪টি শাখা দিয়ে ইখওয়ান যাত্রা শুরু করলেও ১৯৪৮ সালে ২০০০ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে শুধু মিশরেই ইখওয়ানের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লাখ। আর ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইখওয়ান ফিলিস্তিন, সুদান, ইরাক ও সিরিয়াতে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

হাসানুল বান্নার সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা ছিল– তিনি সমাজের অভিজাত ও শিক্ষিতশ্রেণির ভাবনাগুলো একেবারে আমজনতার কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে অভিজাত শ্রেণির সংস্কারমূলক দাবিগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৃণমূল থেকে একটি আন্দোলনও শুরু করেছিলেন। তিনি নিজের কাজকে শুধু মসজিদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র এবং ধনীদের আড্ডাবাজির জায়গাগুলোতেও কাজ করেছেন। মূলত খাবারের দোকান, ক্যাফে আর উন্মুক্ত স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে হাসানুল বান্নার মূল কাজ শুরু হয়েছিল। তিনি গণমানুষের সঙ্গে কথা বলতেন এবং ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালাতেন।

যেমন : ঔপনিবেশিকতার বিষয়ে হাসানুল বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জামালউদ্দিন আফগানির[৩] মতোই। সুদের বিষয়ে তিনি মতামত নিয়েছেন মোস্তফা কামিলের[৪]। একই সঙ্গে তিনি মোহাম্মাদ আবদুহু এবং মোহাম্মাদ রশিদ রেজার চিন্তাধারা থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। বিদেশিরা ব্যাবসার নামে কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, সেটা বুঝেছিলেন মোস্তফা কামিলের কাছ থেকে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট দেখা দিলে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়, সেই ভাবনাগুলো নিয়েছিলেন মোহাম্মাদ আবদহু এবং মোহাম্মাদ রশিদ রেজার কাছ থেকে।

পশ্চিমাদের কোনোভাবেই অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না– হাসানুল বান্না এই ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য তাঁর এই কঠোর মানসিকতা তৈরি হয়েছিল জামালউদ্দিন আফগানি এবং সাকিব আরসালানের[৫] মতো ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারার প্রভাবে। বিশেষ করে মানবরচিত মতবাদ যে কখনোই সমাজে শান্তি দিতে পারবে না; বরং এ ধরনের মতবাদের কারণে সমাজে অন্যায়-অপরাধ প্রতিনিয়ত বাড়বে– এই সত্যটা বুঝেছিলেন সাকিব আরসালানের চিন্তাদর্শন থেকে। শিক্ষাখাতের দশা বেহাল হলে জাতি, সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়– সেটা শিখেছিলেন মোহাম্মাদ আবুদুহুর কাছ থেকে। আর মুসলিমদের মধ্যে কখনো বেপরোয়া ভাব এবং গা ছেড়ে দেওয়া– এই সমস্যার কারণ কিংবা তা মোকাবিলা করার কৌশল শিখেছিলেন আরসালান ও মোস্তফা কামিলের কাছ থেকে।

হাসানুল বান্না মনে করতেন, পশ্চাদপদতা এবং ঔপনিবেশিকতার কারণে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে বিভক্ত হয়েছে, সেটাই মুসলিমদের সবচেয়ে বড়ো সংকটের কারণ। তাই সবার আগে তিনি মিশরীয়দের একতা ও সংহতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন– যতক্ষণ মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হবে, ততক্ষণ তারা কোনোভাবেই ঔপনিবেশিকতার মোকাবিলা করতে পারবে না। তাঁর এই বার্তা শুধু মিশরে নয়; বরং দাবানলের মতো গোটা আরবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, আরব ভূখণ্ডের বেশিরভাগ এলাকাই ছিল তখন উপনিবেশিক শক্তিগুলোর হাতে জিম্মি।

---

৩. সাইয়্যেদ জামাল উদ্দিন আফগানি (১৮৩৮/১৮৩৯-৯ মার্চ ১৮৯৭) ছিলেন উনিশ শতকের ইসলামি আধুনিকতাবাদ নামে যে মতবাদ চালু হয়েছিল, তার অন্যতম জনক ও প্যান ইসলামিক ঐক্যের একজন প্রবক্তা।

৪. মোস্তফা কামিল ছিলেন মিশরীয় একজন আইনজীবী। সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় একজন কর্মী।

৫. সাকিব আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬) ছিলেন লেবানিজ একজন যুবরাজ, কিন্তু অসাধারণ একজন বক্তা হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। রাজনীতিবিদ তো ছিলেনই, পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রভাবশালী একজন লেখক, কবি ও ইতিহাসবিদ। তিনি প্রায় ২০টির বই লিখেছেন। কলাম লিখেছেন ২০০০-এরও বেশি। তিনিও প্যান ইসলামিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একজন সমর্থক ছিলেন।

হাসানুল বান্না ইসলামিক সাম্রাজ্যগুলোর বিভক্তি এবং খিলাফত বিলুপ্তির জন্য ইউরোপিয়ানের নীতি-নির্ধারকদের দোষারোপ করতেন। সে কারণে তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি ভূখণ্ডগুলো ভিনদেশি দখলদার থেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল মুসলিম ভূখণ্ডে আবারও ইসলামি শাসন চালু। কিন্তু সেই সময়ে এই দুটি লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই হাসানুল বান্না উম্মতের সংস্কারের কাজে হাত দেন। শুরুতেই ব্যক্তি পরিসরে মুসলিমদের সংস্কার কাজ শুরু করেন, তারপর পরিবার এবং সমাজ। মূলত এভাবেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও কাজ দুটোই এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইখওয়ান তার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে থাকে। ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের কার্যক্রম শুরু হয় ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। ফিলিস্তিনের ইখওয়ান প্রাথমিকভাবে গাজায় বেশ কিছু শাখা চালু করে, আর পুরোপুরি সাংগঠনিক আদলে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ৬ মে। সেদিন জেরুজালেমে ফিলিস্তিনের ইখওয়ান শাখা তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর চালু করে। ১৯৪৮ সালে যখন ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ডের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাস্তবিক কারণেই ফিলিস্তিনে ইখওয়ান দুভাগ হয়ে যায়; এর মধ্যে একটি ছিল গাজা উপত্যকায়। উল্লেখ্য, গাজা উপত্যকা তখন মিশরীয় সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের দ্বিতীয় শাখাটি শুরু হয় পশ্চিম তীরে। পশ্চিম তীর আগে থেকেই ট্রান্সজর্ডানের অধীনে ছিল। সেই কারণে পশ্চিম তীর জর্ডানের হাশিমাইত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

১৯৭৭ সালের জুন মাসে ইজরাইলে ডানপন্থি লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর গাজাবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ওই বছরেরই নভেম্বরে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইজরাইলের পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন। এর আগে ফিলিস্তিনিদের ধারণা ছিল, মিশর তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু আনোয়ার সাদাতের ইজরাইল সফরের পর সেই আশার প্রদীপও নিভে যায়। আনোয়ার সাদাতের আগে মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জামাল আবদুল নাসের। তিনিও ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যায়– তিনি ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মিশরের সিনাই অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেননি।

১৯৬৭ সাল থেকে ইজরাইলিদের দখল প্রক্রিয়া শুরু হলেও গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটিভাবে টিকে ছিল। কারণ, তারা তখন ইজরাইলে

প্রবেশ করে বেশ ভালো উপার্জন করতে পারত। অন্যদিকে, ইজরাইলিরাও কেনাকাটার জন্য গাজায় আসত। গাজায় এসে ইজরাইলিরা বাড়তি সুবিধা পেত। কারণ, এখান থেকে কিছু কিনলে বাড়তি কর গুনতে হতো না। আর গাজার মার্কেটগুলোতে জিনিসপত্রের দামও তুলনামূলক কম থাকায় ইজরাইলিরা সেই সুবিধাটি ভালোভাবেই ভোগ করত।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পর ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ডটি ইজরাইলের দখলে চলে গেলেও তা কিছু ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের সুবিধাও দিয়েছিল। যেমন : গাজার বাসিন্দারা অন্তত মিশরের স্বৈরশাসক জামাল আব্দুল নাসেরের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তা ছাড়া এই যুদ্ধের পরই পশ্চিম তীর থেকে গাজায় যাতায়াত সহজ ও শিথিল করা হয়। গাজা এবং পশ্চিম তীর– দুটো এলাকাই আরব বংশোদ্ভূত ইজরাইলি নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকায় এই জায়গাগুলো এক ধরনের মিলনমেলায় পরিণত হয়।[৬]

কিন্তু কৌতূহলের বিষয় হলো– ইজরাইল ১৯৬৭ সালে গাজা দখলের পরও যেখানে উন্নয়ন বন্ধ হয়নি, সেখানে হঠাৎ করে এমন কী ঘটল যে গাজা থেকে শ্রমিকদের ইজরাইলে যাওয়া বন্ধ কিংবা যারা গেল তাদেরও অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হলো? প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। ফিলিস্তিনের যেসব শ্রমিক গ্রিন লাইন পার হয়ে ইজরাইলি সীমানায় যেত, তাদের নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে যেতে হতো। ইজরাইলেরও এসব শ্রমিকের দরকার হলেও বাস্তবতা হলো তারা কখনোই এই মানুষগুলোকে সম্মান করত না।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরাও চরম হতাশায় ডুবেছিল। যখন এই হতাশা বেড়ে যেত, তখন ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামি চেতনার পুনর্জাগরণের ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়ত। কারণ, ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী কিংবা প্যান ইসলামিক আন্দোলন– উভয়ের নেতারাই সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়– তারা যেন দখলদার, নিপীড়ক ইজরাইলিদের সঙ্গে সহাবস্থান না করে। প্রতিরোধ করতে না পারলেও অন্তত বয়কট যেন করে।

এ রকম নির্দেশনা দেওয়ার কারণও ছিল। ইসলামি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আশঙ্কা ছিল– ফিলিস্তিনি যেসব শ্রমিক ইজরাইলে কাজ করতে যাচ্ছে, তারা যেন ইজরাইলিদের সুযোগ-সুবিধা, বিত্ত-বৈভব, বিলাসিতা দেখে প্রভাবিত হয়ে তাদের প্রতি দুর্বল না হয়।

---

৬. ১৯৪৮ সালে ইজরাইল নামক বিষফোঁড়া রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ফিলিস্তিনি জনগণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। আর নব্য ইজরাইল রাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ ছিল ফিলিস্তিনি। আরবরা এই মানুষগুলোকে ১৯৪৮-এর ফিলিস্তিনি হিসেবে অভিহিত করে, আর ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ এদের বলে ইজরাইলি আরব। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর এই উচ্ছেদকৃত মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের পরিজনেরা আবার দেখা করার সুযোগ পায়।

এসব চিন্তা যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন ফাতাহ এবং পিইএলপি'র মতো সংগঠনগুলোর ইজরাইল প্রতিরোধ কর্মসূচি তীব্র আকার ধারণ করে। এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইলও ফিলিস্তিনিদের ওপর দমন-নিপীড়ন বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও গাজায় থাকা উদ্বাস্তু শিবিরগুলো থেকে ফিলিস্তিনি লোকজনদের তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানবিক নির্যাতন চালায়।

এমনই এক পরিস্থিতিতে তৎকালীন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৭ সালে ইজরাইল সফর করেন। এই সফরটি গোটা মানবতাকে হতাশা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সফরের কারণেই ক্যাম্প ডেভিড নামক বিতর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের পথ সুগম হয়। এই চুক্তিকে ইজরাইল আজ অবধি আরব বিশ্বের রাজনীতিতে তাদের অন্যতম সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে। ইজরাইলের ডানপন্থি লিকুদ পার্টি যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে, তখনই কূটনৈতিক সফলতা হিসেবে এই চুক্তিটি করতে সক্ষম হয়। কট্টরপন্থি লিকুদ পার্টির সমর্থকরা মনে করে– নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিশাল এলাকাটি তাদের, আর ঈশ্বরই তাদের জন্য এটা বরাদ্দ করেছেন। যেহেতু মিশরের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিটি তারা খুব উপভোগ করছিল, এই সুযোগে ফিলিস্তিনের স্বার্থে ইস্যুটা একেবারেই আড়ালে চলে গেল। আর এরই ফাঁকে ইজরাইল ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে একের পর এক আঘাত হানে। এই আঘাতে জর্জরিত হয়ে পিএলও'র বেশ কয়েকটি শাখা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়।

লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর গাজায় ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৭] এই সরকারের সময়েই গাজা উপত্যকায় প্রথম ইহুদি বসতি গড়ে ওঠে। আগে থেকেই গাজায় জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি।'[৮] তাই নতুনভাবে বসতি স্থাপন গাজায় প্রচণ্ড মানবিক সংকট সৃষ্টি করে।

আরব-ইজরাইলের লড়াইয়ে মিশর একসময় পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় থাকে। এতে শুধু যে ফিলিস্তিনিরা হতাশায় ভেঙে পড়ে এমন নয়; বরং এই তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য গাজার লোকদেরও বেশ বড়ো খেসারত দিতে হয়। কেননা, মিশরের সঙ্গে

---

৭. ১৯৭৭ সালের ১৭ মে, মেনাচেম বেগিনের নেতৃত্বে লিকুদ পার্টি ইজরাইলের ক্ষমতায় আসে। এর মাধ্যমে তিন দশক ধরে চলে আসা লেবার পার্টির একচেটিয়া শাসনেরও অবসান ঘটে। ১৯৯২ সালের জুনের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লিকুদ পার্টি টানা ১৫ বছর ইজরাইলের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

৮. আমরা বাংলাদেশকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলে জানি। তবে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাটিকে ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকা মনে করা হয়। গাজায় জনসংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি। আর এখানে প্রতি বর্গমাইলে ১৩ হাজার ৬৪ জন মানুষ বসবাস করে।

সমঝোতার পরপরই ইজরাইল সিনাই থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে গাজায় মোতায়েন করে। এই সমঝোতা চুক্তির পরও ইজরাইলি সেনাবাহিনী বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। তারা দখলকৃত এলাকা থেকেও জোর করে বহু মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করায়।

মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি হওয়ার আগে মিশরের সঙ্গে ইজরাইলের সীমান্তটি গাজা থেকে বেশ দূরে ছিল, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই সীমানা গাজাতেই স্থাপিত হয়। আর সেই সুযোগে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ইজরাইল গাজায় প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকরা ইজরাইলে যেভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছিল, কালক্রমে তা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে লিকুদ পার্টির নেতা এরিয়েল শ্যারন ইজরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর নতুন কৌশল হতে নেন। তিনি একটি ইজরাইলি প্যারাট্রুপস বাহিনী গঠন করেন। ফিলিস্তিনিরা এই বাহিনীকে লাল টুপির দল বলে অভিহিত করত। এই বাহিনীর ক্ষমতা ছিল– কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করার তথ্য পেলে তারা সেই ব্যক্তিকে দমন করত। এই বেআইনি ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ইজরাইলি সেনাবাহিনী দখলকৃত এলাকায় বেশ কিছু চেকপোস্ট বসায়। তারা চাইলেই যেকোনো পথিককে থামিয়ে তল্লাশির নামে হয়রানি করত। বিশেষ করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্ররা বেশি হয়রানির স্বীকার হতো। তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতো।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গোটা গাজা উপত্যকাটি যেন একটি বিশাল কারাগারে পরিণত হয়। গাজার নাগরিকদের জন্য আস্তে আস্তে মিশরে যাওয়াটাও কঠিন হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরই গাজাবাসীদের জন্য জর্ডান ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দেওয়ায় খুব কম মানুষই রুজি-রোজগারের সুযোগ পাচ্ছিল। তবে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প একটি কাজ করার সুযোগ ছিল। কাজটা হচ্ছে– তাদেরই বাপ-দাদার ভূখণ্ডে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি স্থাপন প্রকল্পে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করা; যদিও তাদের জন্য এটি করা অনেক কঠিন ছিল। এভাবে চারপাশের চাপে পিষ্ট হতে হতে একসময় গাজার মানুষের জীবনযাত্রা প্রচণ্ডভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

যেসব কারণে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্তিফাদার সূচনা হয়েছিল, হামাসের উত্থানের পেছনে সেই একই কারণ ছিল– এমনটা বলা যাবে না। তবে কারণগুলোর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য তো ছিলই। গাজায় ইখওয়ানের যেসব নেতারা ছিলেন, তারা মূলত

স্থানীয় জনগণের হতাশা এবং ইজরাইলবিরোধী ক্ষোভকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সংগঠনকে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একইভাবে খুব কম মানুষই জানত– এই সিদ্ধান্তটি এককভাবে নয়; বরং ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের সকল দায়িত্বশীলরা নিজেদের ঐক্যমতে গ্রহণ করেছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধটি একদিকে যেমন আরবদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল, একইভাবে ইজরাইলিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি বিরাট সুযোগও তৈরি হয়েছিল। কেননা, এই যুদ্ধের মাধ্যমেই ইজরাইল নতুন করে গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, সিনাই এবং গোলান হাইটসসহ বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদের চেতনা ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী দশকজুড়েই ইখওয়ান সেই ব্যর্থতার পরিণতিকে ভালোভাবেই কাজে লাগায়। ১৯৭০ সালে জামাল আব্দুল নাসেরের ইন্তেকালের পর মিশরের কারাগার থেকে ইখওয়ানের অধিকাংশ নেতাকর্মীরা মুক্তি পান। এ কারণে এই সময়টাতে ইখওয়ানে বেশ বড়োসংখ্যক জনশক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি ফিলিস্তিনে প্রচুর সাধারণ মানুষ– বিশেষ করে যুবকদের একটা বড়ো অংশ ইখওয়ানে নাম লেখায়।

গাজাতে ইখওয়ানের এই অভূতপূর্ব সফলতার পেছনে গুটিকয়েক মানুষের অবদানই মুখ্য। ইখওয়ানের নেতারা মনে করতেন, ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের ওপর মিশরের শাসকদের জুলুম-নিপীড়ন চালানোর সিদ্ধান্তটি ছিল মস্ত বড়ো ভুল। আর সেই ভুলেরই ফায়দা ইজরাইল ভালোভাবে হাসিল করেছে।

অন্যদিকে গাজার মানুষরা ইজরাইলের দমন অভিযানকে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারছিল না। এই বিষয়টাও ইখওয়ানের নেতাদের ভাবিয়ে তোলে। ইজরাইলিরা প্রতিনিয়ত গাজার মানুষকে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা দেখাচ্ছিল। সেই লোভের কাছে যেন বিক্রি না হয়– এ জন্য ব্যক্তিকে নৈতিক ও চেতনার দিক থেকে ভীষণ শক্তিশালী হতে হবে। অথচ নৈতিকভাবে জনগণকে শক্তিশালী করারও কোনো কর্মসূচিও তখন ছিল না। কেননা, তখন এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল– ইজরাইলের সাথে আপস করে না চললে কেউ ভালো চাকরি, ভালোভাবে জীবনযাপন; এমনকী জরুরি প্রয়োজনেও অন্য কোনো দেশে যেতে পারবে না।

ইজরাইলও অবশ্য ফিলিস্তিনিদের সহায়তা ছাড়া অধিকৃত এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। তাই ইজরাইলিদের পরিকল্পনা ছিল ফিলিস্তিনিদের গুপ্তচর বানানো। গুপ্তচর যদি না-ও হয়, অন্তত ইজরাইলের বিরোধিতা যেন না করে– এ রকম একটা পরিস্থিতি তারা তৈরি করতে চাচ্ছিল। ইজরাইলিরা সাধারণত টাকা,

মাদক, যৌনতা এবং ভয় দেখিয়ে ফিলিস্তিনিদের কাবু করতে চাইত। বিশেষ করে কিশোর ও যুবক– যারা দরিদ্রতার চাপে হতাশ হয়ে পড়েছিল, প্রাথমিকভাবে তাদেরই টার্গেট করত। ইসলামি আন্দোলনের নেতারা এই ধরনের প্রলোভন এবং নোংরা প্রচেষ্টা থেকে গাজার মানুষদের বাঁচাতে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি আন্দোলনের নেতা আহমাদ ইয়াসিন বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নেন।

শেখ আহমাদ ইয়াসিনের জন্ম ও শৈশব

আহমাদ ইয়াসিন। জন্ম ১৯৩৬ সালের জুন মাসে আসকালান শহরের আল জুরাহ গ্রামে। তার জন্মের মাত্র এক বছর আগে শায়খ ইজ্জুদিন কাসসাম[৯] ফিলিস্তিনে বিদেশি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। তা ছাড়া এই ১৯৩৬ সালেই ফিলিস্তিনিরা ব্রিটিশদের ইহুদিপন্থি নীতিমালার বিরুদ্ধে ৬ মাসব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন। ইয়াসিনের বয়স যখন ১২, তখন ১৯৪৮ সালে নাকাবার ভয়ংকর বিপর্যয়ের ঘটনাটি ঘটে। ফলে তার মাকে অন্যসব শিশু ভাই-বোনদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। নাকবা হলো ইহুদি আগ্রাসী সেনাদের একটি আক্রমণ। তারা ফিলিস্তিনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে ফিলিস্তিনি আরবদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করত। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।[১০]

যখন আহমাদ ইয়াসিনের বয়স তিন, তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তার গ্রাম আল জুরাহর অল্প দূরেই ইহুদিরা অবৈধ বসতি স্থাপন করে। তারা বলত– 'দুই হাজার বছর আগে আমাদের আদিপুরুষরা এখানেই বসবাস করত, তাই আমরা নিজ ভূমিতে ফিরে এসে বসতি স্থাপন করছি।' ইজরাইলিদের এই অন্যায় দাবির খেসারত আহমাদ ইয়াসিনকেও খুব নির্মমভাবেই দিতে হয়। অবশ্য পরে তিনি বুঝতে পারেন, বৈশ্বিক রাজনীতির হিসাব-নিকাশের কারণে ইহুদিরা দেশটাকে দখল করতে পেরেছে; এর সঙ্গে ধর্মের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

---

৯. ইজ্জুদিন কাসসাম ১৮৭১ সালে সিরিয়ার বন্দর নগরী লাটাকিয়াতে (আরবরা যাকে লাজিকিয়্যাহ বলেন) জন্মগ্রহণ করেন। তার যৌবনকালে তিনি মিশরে চলে যান এবং মোহাম্মাদ আবদুহুর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। সিরিয়াতে ফিরে আসার পর তিনি সুলতান ইবরাহিম মসজিদে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নেন। তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরওয়ানা জারি হলে ১৯২২ সালে তিনি হাইফায় পালিয়ে যান এবং ১৯৩৫ সাল অবধি তিনি সেখানে মুসলমান যুবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরির কাজ করেন। ১৯৩৫ সনে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ সেনাদের এক হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

১০. ড. সালমান আবু সিত্তার *The right of return is sacred, legal and possible* গ্রন্থ থেকে জানা যায়– ইজরাইল নামক পৃথক ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালেই ৫৩১টি ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরকে সম্পূর্ণরূপে জনমানবশূন্য এলাকায় পরিণত করে ফেলা হয়। এই বইটি রেফারেন্স ২-এ উল্লেখ আছে।

যতদিন তিনি আল জুরাহ গ্রামে ছিলেন, ততদিন নিকটস্থ সমুদ্র তীরে হেসে-খেলেই তার শৈশব কেটেছিল। সেখানে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর খেলতে গিয়ে ব্রিটিশ ও মিশরীয় সেনাদের সাগর দিয়ে চলাচলের দৃশ্য দেখতেন। আর এর পরপরই চোখের সামনে তার গ্রামবাসীর ওপর ইজরাইলি সেনাদের নৃশংসতম গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেন।[১১] অন্য অনেকের মতো তাঁর পরিবারও আরব সেনাদের ওপর ক্ষীপ্ত ছিল। কারণ, তারা ইহুদিদের প্রতিরোধ কিংবা ফিলিস্তিনিদের রক্ষার জন্য কোনো ভূমিকাই নেয়নি; উলটো সেই আরব সেনারা ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। আরব সেনাদের যুক্তি ছিল– ফিলিস্তিনিদের কাছে অস্ত্র রাখার কোনো দরকার নেই, যা করার আরব সেনারাই করবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেনি; বরং বিপর্যয়কে আরও দীর্ঘায়িত করেছে।[১২]

১৯৪৯ সালে যখন আহমাদ ইয়াসিন স্কুলে, তখন তাকে এক বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। কেননা, ১৯৪৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিবারের সাত সদস্যের খাবার জোগাড় করতে তাকে একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের চাকরি করতে হয়। এরপরই সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন খেলতে গিয়ে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পান। তার মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধিটা পুরোপুরি ভেঙে যায়। ক্রমশ অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে সারা জীবনের জন্য হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তবে সেই অক্ষমতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেন। পাশাপাশি জনসাধারণের সাথেও গভীর সখ্যতা গড়ে তোলেন; বিশেষ করে তরুণ সমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা গড়ে ওঠে।

---

[১১]. ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল ভোরবেলায় মেনাচেম বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইরগুন বাহিনী এবং ইতঝাক শামিরের (ইজরাইল জাতি হিসেবে কতটা বর্বর তা তাদের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায়। মেনাচেম বেগিন এবং ইতঝাক শামিরের মতো দুজন গণহত্যা সংঘটনকারী ব্যক্তিই পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।) নেতৃত্বাধীন স্টার্ন গ্যাং শেখ ইয়াসিনের দিয়ের ইয়েসিন গ্রামে গণহত্যা চালিয়েছিল। সে সময় শতাধিক পুরুষ, নারী ও অসংখ্য শিশু-কিশোরকে পরিকল্পিতভাবে বর্বরতার সাথে হত্যা করা হয়।

[১২]. ১৯৪৮ সালের ১৫মে, দীর্ঘ দখলদারিত্ব শেষে ব্রিটেনের সর্বশেষ সেনাটিও যখন ফিলিস্তিন ছেড়ে যায়, তখন ইজরাইলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান ফিলিস্তিনের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড নিয়ে স্বতন্ত্র ইহুদিরাষ্ট্র ইজরাইল প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন। এই অন্যায্য ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মিশর, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাক থেকে আরব সেনারা ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। বাহ্যিকভাবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল– ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করা এবং ফিলিস্তিনকে ইহুদিরাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে হেফাজত করা। কিন্তু কার্যত এই পাঁচ দেশের আরব সেনারা তাদের লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে সিরিয়াস ছিল না। এমনকী ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে যে সাহস ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ছিল, তাও তাদের ছিল না। ফলে কাজের কাজ তো হয়ইনি; উলটো ধীরে ধীরে ৭ লাখ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি নাগরিক তাদের আদিবাড়ি ও আদিভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়।

১৯৫৮ সালের জুন মাসে তার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। তিনি কায়রোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু সেখানে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তবুও তার মনে স্বপ্ন ছিল, শিক্ষকতার উপার্জিত টাকা দিয়েই একসময় মিশরে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবেন। একই সঙ্গে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করার পরিকল্পনাও ছিল তার। একবার অবশ্য তিনি তার এই স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। কেননা, ১৯৬৪ সালে কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান। এর পরপরই তিনি কায়রোতে গিয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি মূলত গাজা থেকে এক্সটার্নাল ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করছিলেন। ১৯৬৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবারও মিশরে যান, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পরপরই তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নটি ধূলিসাৎ হয়। ১৯৬৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা মিশরীয় সেনারা ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে তাকে আটক করে।

এর আগে প্রায় এক দশক তার বিরুদ্ধে জামাল আব্দুল নাসেরের প্রশাসন নানা ধরনের বাজে প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডা চালায়। এক মাস গাজার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার পর তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তার কায়রো ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। তিনি এর আগে কখনোই মিশরের ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে এই ঘটনাটি তাকে ইখওয়ানের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯৬৬ বা ৬৭ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদান করেন এবং দলের প্রয়োজনে নিবেদিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বোচ্চ পরিমাণ আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তী সময়ে একটি সাক্ষাৎকারে ইখওয়ানে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে আহমাদ ইয়াসিন বলেছিলেন– 'ওই একটি মাসের কারাবরণ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমার ভেতরের ঘৃণাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমাকে শেখায়, কোনো কর্তৃপক্ষের বৈধতা নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের ওপর। একই সঙ্গে তার অধীনে মানুষ কতটা সম্মান ও স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করতে পারে তার ওপর।'[১৩]

আহমাদ ইয়াসিনের দূরদর্শিতা

ইখওয়ানের সঙ্গে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সখ্যতাটি ছিল আগামী দিনের বিপ্লবের স্পষ্ট ইঙ্গিত। কেননা, ১৯৬০ সালের দিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পুরোটাই পালটে যায়। পূর্বের অবস্থার সঙ্গে নতুন অবস্থার কোনো মিলই ছিল না। ৫০-এর দশকের শুরুতে

---

[১৩]. পূর্বে উল্লেখিত *আল জাজিরা*-কে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

ইখওয়ানে যোগ দেওয়াটা অনেকটা সৌখিনতার পর্যায়ে পড়ত। কারণ, ১৯৪৮ সালের লড়াইয়ে ইখওয়ান যেভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সেটা গাজা ও পশ্চিম তীরের জনসাধারণের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর যখন জামাল নাসের ইখওয়ানের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়ন শুরু করে, তখন খুব কম লোকই ইখওয়ানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইত।

অন্যদিকে, ঠিক একই সময় জামাল নাসেরের প্রচারণার ওপর ভর করে আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আরব জাতীয়তাবাদীরা পুরোনো এবং অনেক সংকটের জন্য ইখওয়ানকেই দায়ী করত। ৬০-এর দশকের শেষ দিকে বাস্তবতা এতটাই পালটে যায়, ফিলিস্তিনে খুব কম লোকই নিজেকে ইখওয়ানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। যারা পরিচিত নেতা ছিল, তারাও তত দিনে নিরাপত্তার খাতিরে বা উন্নত জীবনের আশায় অন্য দেশে চলে গিয়েছিল। একই সময় ফিলিস্তিন ইখওয়ানের বেশ কিছু নেতা ফাতাহ আন্দোলনে যোগ দেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে ফাতাহ আন্দোলন যাত্রা শুরু করে। ফাতাহ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল– গোটা ইখওয়ানকে নিজেদের পেটের ভেতর নেওয়া। কেননা, ফাতাহর নেতারা মনে করত– ইখওয়ান দিয়ে কোনো কাজ হবে না; বরং তারা যদি ফাতাহর সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন আরও বেগবান হবে।

এটা সত্য– কেউ ভাবতেও পারেনি আহমাদ ইয়াসিনের মতো একজন পঙ্গু ও অসুস্থ লোক শুধু গাজা নয়; বরং গোটা ফিলিস্তিনের মানুষের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আহমাদ ইয়াসিনের বৈশিষ্ট্য ছিল– শুরু থেকেই তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন– কর্ম-উদ্দীপনা, শক্তিশালী সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং জিহাদের প্রেরণা ছাড়া দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তিনি এটাও মানতেন– ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নেওয়াও জরুরি।

ফাতাহর নেতারা ১৯৬৫ সালেই তার কাছে এসে ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে আরব দেশগুলোর সঙ্গে তাকে অংশ নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। আহমাদ ইয়াসিন সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি মনে করতেন– আরব দেশগুলো এ ধরনের কোনো যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত নয়; তাদের সেই আগ্রহও নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি বুঝেছিলেন– এমন কোনো যুদ্ধে যাওয়া মোটেই উচিত নয়, যেখানে পরাজয় নিশ্চিত। আর তিনি এটাও আন্দাজ করেছিলেন, এখন কোনো যুদ্ধে হেরে যাওয়ার অর্থ ইজরাইলের কাছে আরও কিছু জমি খুইয়ে ফেলা।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার চিন্তা-ভাবনা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে– গাজা উপত্যকার দেইর আল বালাহ্ নামক এলাকার একটি ইজরাইলি বাসে ফাতাহর কর্মীরা হামলা চালায়। সেই সময় গাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল মিশরীয় সেনাবাহিনী। তারা এই ঘটনার সন্দেহে ব্যাপক ধরপাকড় এবং সন্দেহভাজন হামলাকারীদের আটক করে।

মিশর মূলত যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চাইছিল। কারণ, তারা ভালো করেই জানত– যুদ্ধে তারা জিতবে না। সেই হামলার জন্যও মিশরীয় সরকার ইখওয়ানকেই অভিযুক্ত করে। তারা বলে, মিশরকে বিপাকে ফেলতেই ইখওয়ান এই কাজটি করেছে। প্রকৃত সত্য হলো– ইখওয়ান এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না। মূলত এই হামলাটি পরিচালনা করে ফাতাহ আন্দোলনের কর্মীরা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ অতীতে ইখওয়ানের কর্মী থাকতে পারে। কারণ, বাস্তবতা এটাই– ইয়াসির আরাফাত ছাড়া ফাতাহর অধিকাংশ নেতা-কর্মী ইখওয়ানেরই প্রোডাক্ট।[১৪]

আহমাদ ইয়াসিন যে সঠিক ছিলেন, তা আরও একটি ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়। ১৯৬৭ সালে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধে আরবরা ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও মিশরসহ অন্য কোনো দেশ খুব একটা আগ্রহ নিয়ে যুদ্ধটা করেনি। ফলে আরব দেশগুলো শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। আহমাদ ইয়াসিন যুদ্ধের এত আগে এই পরিণতি সম্পর্কে কীভাবে জানতেন, তা অনেককেই বিস্মিত করেছিল।

মিশর মোটেও এই যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি। অন্যদিকে জামাল নাসের সিনাই এলাকা থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে সরিয়ে ফেলার যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে জন্য তাকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে গাজাতে যে মিশরীয় সেনারা মোতায়েন ছিল, তারাও অপ্রস্তুত ছিল। তারা জানতও না তাদের কী করতে হবে। শেখ ইয়াসিন ধারণা করেছিলেন, মিশরীয় সেনাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইজরাইল মিশরের বিমান বাহিনীর ওপরও হামলা চালাতে পারে।

ঘটেছিলও তাই। মিশরীয় সেনারা যখন স্থল অভিযানে ইজরাইলের কাছে পরাজিত হচ্ছিল, তখন জামাল নাসের মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে– মিশরীয়রা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। পরিণতিতে যা হলো তা গোটা পৃথিবীই প্রত্যক্ষ করেছে। মাত্র ছয় দিনের মাথায়

---

[১৪] ইখওয়ান থেকে গিয়ে ফাতাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন– এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন খলিল আল ওয়াজির (যিনি আবু জিহাদ নামে বেশি পরিচিত), আব্দুল ফাত্তাহ আল হুমুদ, ইউসুফ উমায়রাহ এবং সুলায়মান হারমাদ। পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে ইখওয়ানের আরও যেসব ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন– তার মধ্যে আছেন মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজ্জার, কামাল আদওয়ান, সেলিম আল জানুন, ফাতিহ আল বালাভি, রাফিক আল নাতাশাহ এবং সালাহ খালাফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

ইজরাইলি সেনাবাহিনী শুধু গাজা নয়; বরং সুয়েজখালের দিকেও অগ্রসর হয়, সিরিয়ার গোলান হাইটসও দখল করে নেয়। যারা মিশরীয় নেতাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখার প্রত্যাশায় ছিলেন, তারা এই পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে। অনেকের আশা করেছিল, আরব জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক জামাল আব্দুল নাসের ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করে আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে আশ্রয় দেবেন! কিন্তু এই ঘটনার পরে তারা একবারেই ভেঙে পড়ে। এই হতাশ ব্যক্তিরা তখন একটি কথার সত্যতা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে, যা ১৯৬৫ সালে কায়রোতে ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের ভাষণে জামাল নাসের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'আপনারা যদি মনে করেন ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার জন্য আমার কোনো পরিকল্পনা আছে, তাহলে এটা মিথ্যা বলা হবে।'

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর আহমাদ ইয়াসিন বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ করেন, গাজার মানুষগুলো যেন জেগে উঠছে এবং বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এই অচলাবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায়ও নেই। অনেকেই প্রতিরোধের চেষ্টা না করে আপসে ব্যাবসাও শুরু করে। দখলদারদের সঙ্গে আপস করা ছাড়া রুজি-রোজগারের আর কোনো পথ তাদের চোখে পড়েনি। শেখ আহমাদ ইয়াসিন এই অবস্থা দেখে খুবই আফসোস করেন। তবে তিনি পরিস্থিতি ও বাস্তবতা দুটোই অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি বললেন–

> 'এই মানুষগুলোর খাবার নেই, দিনের পর দিন এই দুর্বিসহ বাস্তবতা দেখতে দেখতে তারা ক্লান্ত। তাই তারা পুরোনো চাকরিতে ফিরে যেতে চাচ্ছে। যদি সত্যিকারার্থেই আমাদের ভালো কোনো সংগঠন থাকত, তাহলে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম। কিন্তু আমাদের তেমন কোনো শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোও নেই; সংগঠন তো পরের কথা! তাই মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো নিশ্চয়তাও আমরা দিতে পারছি না। আর সাধারণ মানুষও জানে না, তাদের মূলত কী করতে হবে।' [১৫]

আহমাদ ইয়াসিন নিজেই সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজা শুরু করলেন। গাজায় ইজরাইলি দখলদারিত্ব শুরু হওয়ার আগে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ঘোষণা দেওয়া হলো– গাজায় স্কুলগুলো আবারও খুলবে এবং পুরোনো শিক্ষকদের আবারও রিপোর্ট করতে বলা হলো। তখন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন– 'আমি এখন কী করব? আমি কি শিক্ষকতাকে অব্যাহত রেখে দখলদারদের কাজকে সহজ করব,

---

[১৫]. *আল জাজিরা*'র সিনিয়র সাংবাদিক ফয়সাল বদিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার। ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ, *আল জাজিরা* অনলাইনে এটা প্রকাশিত হয়। রেফারেন্স ৩ ও ৪-এ এই সাক্ষাৎকারগুলোর লিংক দেওয়া আছে।

নাকি জনগণের সেবা করব?'[১৬] শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মন বলল, দখলদারকে সহযোগিতা না করে তার উচিত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। আর সে কারণেই তিনি ও তার সহকর্মীরা কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারও কারও কাছে বিষয়টা বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

আহমাদ ইয়াসিন যেহেতু পেশায় শিক্ষক ছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন শিক্ষকতার মাধ্যমে গাজার সমাজকে আমূল পালটে দেবেন; হলোও তাই। তার ছাত্ররাই হলো ইসলামি পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ। এই অল্প কয়েকজন মানুষ মিলেই ৭০ দশকের শুরুতে ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা করল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন ইতিহাসের এই মহান ব্যক্তি আহমাদ ইয়াসিন।

ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের পুনরুত্থানে শেখ আহমাদ ইয়াসিন

গাজা ও পশ্চিম তীরে ইজরাইলের অন্যায় দখলদারিত্ব আহমাদ ইয়াসিনের জন্য অনেকগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কারণ, এই দখলদারিত্বের পরই তিনি গোটা ফিলিস্তিন সফর করার সুযোগ পান। ফলে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী অনেকের কাছেই পৌঁছায়। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইজরাইলের রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে যে সকল ফিলিস্তিনিরা থাকার সুযোগ পেয়েছিল, তাদের কাছেও তার বার্তাগুলো পৌঁছায়। একই সময় পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনিদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজটি ছিল– তিনি বিরাটসংখ্যক মানুষের কাছে আবারও ইখওয়ানের অবস্থানকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন। মাঝের কয়েকটি বছর মিশরীয় মিডিয়াগুলোর মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে ইখওয়ানের ভাবমর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। ফলে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা ইখওয়ানের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মিথ্যা প্রচারণা ও দমন-পীড়নের কারণে অনেকেই ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাইছিল না। আহমাদ ইয়াসিনের হাত ধরেই সেই পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়া শুরু করল।

পশ্চিম তীরে বসবাসরত ইখওয়ানের জনশক্তি গাজার ইখওয়ানের তুলনায় কিছুটা স্বস্তিদায়ক অবস্থানে ছিল। ১৯৪৮ সালে ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম তীর জর্ডানের অংশ ছিল। আর জর্ডান শাসন করত হাশিমাইতরা। হাশিমাইতদের সঙ্গে ইখওয়ানের অনানুষ্ঠানিক সমঝোতাও ছিল। ইখওয়ানিরা সেখানে আইনগত বৈধতা পেয়েছিল। আর এই সুবিধাটুকুর বিনিময়ে তারা জর্ডানের শাসকদের

---

১৬. প্রাগুক্ত।

নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করত। বিশেষ করে সমাজে যেন শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ দানা না বাঁধে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র যেন প্রবেশ করতে না পারে কিংবা জামাল নাসেরের প্রবর্তিত আরব জাতীয়তাবাদের ঢেউয়ে যেন সমাজ অস্থিতিশীল না হয়– এই বিষয়গুলো গোপনে ইখওয়ানের নেতা-কর্মীরা লক্ষ রাখতেন।

অবশ্য, আরব জাতীয়তাবাদের ভিন্ন ধরনের একটা গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। অনেকেই এই দর্শনটিকে দেশবান্ধব বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনে করত। তাই হাশিমাইতদের অনেক ফিলিস্তিনিরাই আমেরিকার দালাল বা ইজরাইলের সহযোগী মনে করত। পশ্চিম তীরে যদিও ইখওয়ান অফিস খুলে অনুকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিল, তারপরও তারা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের সহানুভূতি পাচ্ছিল না। ১৯৫০-৬০ সাল, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম তীরের ইখওয়ান ক্রমশ একটি অগণতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। ৩০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানের ইমেজের সঙ্গে তাদের কোনো মিলই ছিল না। ইখওয়ান যেমন গরিব-দুঃখী ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল, বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল– পশ্চিম তীরের ইখওয়ান এর থেকে ছিল অনেকটাই দূরে।

ইখওয়ানের সেই ইমেজ সংকটের মধ্যেও গাজায় যে অল্প কয়েকজন ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ্যে জানান দিত, শেখ আহমাদ ইয়াসিন তার মধ্যে অন্যতম। তাই রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই তাকে এড়িয়ে চলত। এমনকী যদি তিনি নর্দান ক্যাম্পের কোনো মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যেতেন, তাহলে অনেক যুবকই অন্য মসজিদে নামাজ আদায় করত। তাদের ভয় ছিল, একই মসজিদে নামাজ পড়লে তাদের ইখওয়ান সমর্থক ভেবে নির্যাতন করা হবে। কিন্তু ইয়াসিনের তো কিছু লক্ষ্য ছিল, যা আগে বলা হয়েছে। মানুষজন তাঁর সংগঠনকে ভয় পেলে কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই রকম একটি অনুভূতি থেকেই ইয়াসিন সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন।

শেখ ইয়াসিন গাজা ও জেরুজালেম থেকে ইখওয়ানের ১০ জন ব্যক্তিকে ডাকেন। তাদের সঙ্গে ইখওয়ানের কার্যক্রম আবারও শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করেন। অবশ্য, তাদের মধ্যে কেউ-ই এই ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী ছিল না; বরং এই বৈঠকের কয়েকদিনের মধ্যে বেশিরভাগই আরব দেশগুলোতে চাকরি নিয়ে চলে যায়।

তারপরও শেখ ইয়াসিন এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। তিনি মসজিদে বসেই কাজগুলো করতেন। ইখওয়ানের কাজগুলো সমাজের তরুণ শ্রেণিকে বেশি আকর্ষণ করত। এই তরুণরা বেশিরভাগ বড়ো হয়েছে ৬৭'র যুদ্ধের পরাজয় দেখে। একটা সময় তারা জামাল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদের মোহে মোহবিষ্ট ছিল।

যতদিন জামাল আব্দুন নাসের জীবিত ছিল, এমনকী তার মৃত্যুর পরও আরব জাতীয়তাবাদের কিছু সমর্থক থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, প্রায় এক দশক ধরে শেখ ইয়াসিন তাঁর কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান। এই সময়ে তিনি যুবকদের মগজে ইসলামি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়গুলো ঢোকানোর চেষ্টা করেন।

’৬৭ সালের যুদ্ধের আগে গাজা উপত্যকা নাসেরের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সময়ে তারা ধর্মীয় কার্যক্রমকে নানাভাবে বাধা দিত। তবে এটা সত্য, ইজরাইলি প্রশাসন অন্তত ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। তারা মূলত জাতীয়তাবাদীদের বাধা এবং নির্যাতন করত! কেননা, জাতীয়তাবাদকে তারা মারাত্মক হুমকি মনে করেছিল।

আহমাদ ইয়াসিন মনে করতেন, প্রতিরোধ শুরু করার আগে আরও অনেক কাজ করতে হবে। তিনি স্কুলগুলোতে লেকচার দেওয়া অব্যাহত রাখেন এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যুবকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এই যুবকদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল হাইস্কুল বা কলেজ পড়ুয়া। প্রথমদিকে তারা জামাল আব্দুল নাসেরের জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে তার পতনের পর সেই পথ থেকে ফিরে আসে। তারা জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতার গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য ধর্মের মাঝে শান্তি খোঁজা শুরু করে। ইখওয়ান এই সুযোগকে কাজে লাগায়। প্রথম যে গ্রুপটি শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সান্নিধ্যে আসে এবং সক্রিয় হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহিম আল মাকদামাহ, ইসমাইল আবু শানাব, আব্দুল আজিজ আওদাহ, ফাতহি আশ-শিকাকি এবং মুসা আবু মারজুক।[১৭] পরবর্তী সময়ে এদের সবাই মিশরে পড়াশোনা করেছেন এবং সেখানকার প্যালেস্টাইন ইসলামিক স্টুডেন্ট কমিউনিটি নামক ছাত্রদের একটি ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আরও পরে এসে তারা ফিলিস্তিন এবং ইসলামি আন্দোলন ইস্যুতে বিভিন্ন জায়গায় বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জনমত তৈরিতেও প্রচুর ভূমিকা রেখেছেন।

ফিলিস্তিন-মিশর যোগসূত্র

১৯৬৭ সালে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইজরাইলি দখলদারিত্ব শুরু হওয়ার পর আরেকটি ট্রেন্ড চালু হয়। যেসব ফিলিস্তিনি ছাত্ররা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করত, তারা উচ্চশিক্ষার্থে দেশের বাইরে যাওয়া শুরু করে। ফিলিস্তিনে তখনও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তাই যারা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করত,

---

[১৭]. মুসা আবু মারজুক ছিলেন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রথম প্রধান। তার সম্বন্ধে জানতে উইকিপিডিয়াসহ অন্যান্য সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন। রেফারেন্স সূচিতে ৫,৬,৭-এ তার ব্যাপারে জানতে সহায়ক হবে– এমন কিছু লিংক দেওয়া আছে।

তারা মিশরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। সেখানে গিয়ে মেডিসিন, প্রকৌশলবিদ্যা অথবা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পড়াশোনা করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ফিলিস্তিনের ছাত্রদের জন্য পৃথক কোটা শুরু করে। সবচেয়ে বড়ো কোটাটি ছিল গাজার ছাত্রদের। দ্বিতীয় কোটাটি পশ্চিম তীরের এবং তৃতীয় কোটাটি ছিল সেসব ফিলিস্তিনি ছাত্র বাইরে বসবাস করছে তাদের। এসব জায়গা থেকে ছাত্ররা গিয়ে সেখানে নতুন একটি ফিলিস্তিনি ডায়াসপোরা কমিউনিটি তৈরি করে।

গাজা ও পশ্চিম তীর দখল হলে বেশ কয়েক বছর ফিলিস্তিনি ছাত্রদের বিদেশে পড়াশোনার বিষয়টি স্থগিত ছিল। কেননা, তারা পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। মিশরীয় কর্তৃপক্ষ এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকরা উদ্‌বিগ্ন ছিল– পড়াশোনা শেষ করে ছাত্ররা যখন নিজ দেশে ফিরতে চাইবে, তখন ইজরাইল হয়তো তাদের সেই সুযোগ দেবে না। ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে এসে আবারও মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনিদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। ইজরাইলিরা ছাত্রদের ঘরে ফিরতে দেবে– এই নিশ্চয়তা পেয়ে মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবারও ছাত্র ভর্তি শুরু করে। অন্যদিকে রেডক্রস জানায়– ফিলিস্তিনি ছাত্ররা গ্রীষ্মকালীন ছুটি এবং পড়াশোনা শেষ করে যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারে, সে ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করবে। ইজরাইলও এই প্রক্রিয়াটিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে।

মূলত পরিকল্পনাটি ছিল– জনগণের আসা-যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং জর্ডান নদী দিয়ে পশ্চিম তীর থেকে জর্ডানে ব্যাবসার প্রসার ঘটানো। প্রাথমিকভাবে গাজায় এই প্রক্রিয়াটি আগেই শুরু হয়। কেননা, গাজার ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করে কোথাও যাওয়ার সুযোগ পেত না। ফলে প্রতি বছরই এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যেত, যারা কোথাও ভর্তি হতে পারছে না, আবার কোনো কাজে ঢোকারও সুযোগ পাচ্ছে না। আর ইজরাইলও এই কাজকর্মহীন যুবকদের নিয়ে ভয়ে ছিল– যদি তারা প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়! তাই তারা বিদেশে ছাত্র পাঠানোর প্রক্রিয়াটাকে কখনোই অগ্রাহ্য করেনি।

মুসা আবু মারজুকের জন্ম ও শিক্ষাজীবন

শেখ ইয়াসিন তার কিছু ছাত্রকে মিশরীয় মিলিটারি একাডেমিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একটা সময়ে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ সেই অনুমোদন প্রদানও করে, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। এই সুযোগ শুধু সেসব ফিলিস্তিনি ছাত্ররা পাবে, যারা মিশরেই উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে শেখ ইয়াসিন তার ছাত্রদের মধ্যে

মুসা আবু মারজুককে বাছাই করেন। তাকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পড়ালেখা শেষ করার এক বছর আগে মিশরে ভর্তি হতে বলেন। উদ্দেশ্য মিলিটারি একাডেমিতে পড়ার সুযোগ পাওয়া। সবকিছুই পরিকল্পনামাফিকই চলছিল। কিন্তু তার উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ নতুন ঘোষণা দেয়। তারা জানায়– গাজার ছাত্ররা মিশরে আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ার সুযোগ পাবে এবং মিশরীয় সরকার বৃত্তিও প্রদান করবে। আবু মারজুকও এই সুবিধাটি পেতেন, কিন্তু এর জন্য তাকে পিএলও'র মাধ্যমে আবেদন করতে হতো। তিনি সেটা করতে রাজি হননি। ফলে সেই একাডেমিতে ভর্তি না হয়ে প্রকৌশলবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন।[১৮]

ইখওয়ানের অন্যান্য অনেক তরুণ কর্মীদের মতো মুসা আবু মারজুকও জন্ম ও বড়ো হন একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। তিনি ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকা রাফাহ উদ্বাস্তু শিবিরের একটি তাবুতে জন্ম নেন। তিনি ছিলেন তার মায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান। আর পরিবার নির্বাসনে যাওয়ার পর তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। এরপর আরও চার ভাই-বোন জন্ম নিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইজরাইলের সম্প্রসারণ নীতির কারণে ফিলিস্তিন যখন একীভূত হয়, তখন তিনি তার প্রথম গ্রাম জুবনাহ যাওয়ার সুযোগ পান।

উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে এই গ্রাম থেকেই তার পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই গ্রামটি ছিল জাফা ও গাজার মধ্যবর্তী। নিজ গ্রামে ভ্রমণের সময় বড়ো ভাই মাহমুদ তাকে পুরোনো ভিটামাটি দেখান– যেখানে তার প্রথম পাঁচ ভাই-বোন জন্ম নিয়েছিলেন। সেই বাড়ি একটি ইহুদি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। স্কুলটিতে তখন গৃহহীন ইহুদি নারীদের নানা ধরনের সামাজিক সেবা প্রদান করা হতো। ফিলিস্তিনিদের হটিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত জুবনাহ গ্রামটি ছিল জাফা অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো গ্রাম, যেখানে প্রায় ১৫ হাজার লোক বসবাস করত।

মিশরে প্রথমবার যাওয়ার পর আবু মারজুক ফিলিস্তিনিদের ছোটো একটি সার্কেলে যোগ দেন। এই সার্কেলটির সঙ্গে মিশরীয় ইখওয়ানের কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। ইখওয়ান তখন নাসেরের দমন-পীড়নে অনেকটাই আন্ডারগ্রাউন্ডে। তার সিনিয়র ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা পড়াশোনা শেষ করে ফিলিস্তিনে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এই সার্কেলটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরই মধ্যে মিশরীয় সরকারের অনুদানে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের প্রথম ব্যাচও মিশরে পৌঁছে। এই গ্রুপের নেতা ছিলেন আব্দুল আজিজ আওদাহ। এই আব্দুল আজিজ আওদাহ ছিলেন আহমাদ ইয়াসিনের ঘনিষ্ঠ এবং গাজা ইখওয়ানের প্রথম দিকের কয়েকজন সদস্যের একজন।

---

১৮. *হামাস- এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন*। রেফারেন্স নং ৮-এ এই বইটির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে।

প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ ছাত্র ফিলিস্তিন থেকে মিশরে পড়তে আসত। প্রথম দিকে ফিলিস্তিন থেকে আসা ছাত্রদের মাঝে ইখওয়ান সমর্থক ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু। এসব ছাত্রদের বেশিরভাগ ছিল পিএলও'র অথবা আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে। ইখওয়ানের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে তাদের একটি নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই তারা ছাত্রদের সমস্যা সমাধান ও গাজার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু মারজুক, আব্দুল আজিজ আওদাহ এবং আলি শাকশাক।

পিএলও-জর্ডান সম্পর্কে টানাপোড়েন

ফিলিস্তিনি ছাত্ররা যে সময়ে মিশরে আসছিল, ঠিক তখন জর্ডানে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। ফিলিস্তিনিরা এটাকে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' হিসেবে অভিহিত করে। এই ট্রাজেডির সূচনা হয় মূলত পিএলও ও জর্ডানের শাসকশ্রেণি হাশিমাইতের মধ্যে উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে। এর আগে তিন বছর পিএলও জর্ডানের সামরিক শক্তি ও ভূমি ব্যবহার করে ইজরাইলের ওপর হামলা চালিয়েছে। এর ফলে শুধু ইজরাইল বা আমেরিকা নয়; বরং শাসকমহলের ভেতর থেকেই জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়– তিনি যেন পিএলও'র বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেন। কেননা, পিএলও জর্ডানের ভেতরে আরেকটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদলে কাজ শুরু করেছিল। ফলে তারা ক্রমশই জর্ডানের শাসকশ্রেণির জন্য হুমকি হয়ে উঠছিল।

বিষয়টা মারাত্মক আকার ধারণ করে ১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, যেদিন পিএলও'র বামপন্থি সংগঠন 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' (পিইএলপি) চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে। তারা এই চারটি প্লেনের মধ্যে তিনটি জর্ডানের অবতরণ করায়। যে এলাকাটিতে অবতরণ করায়, সেটা ছিল পিএলও'র নিয়ন্ত্রণাধীন একটি এলাকা। এটি রাজধানী আম্মান বা মিশরের রাজধানী কায়রোর বেশ কাছাকাছি ছিল। ঘটনার শিকার যাত্রী ও কেবিন ক্রুরা যদিও নিরাপদে প্লেন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, কিন্তু একটা সময় গোটা বিমানটিকেই বিস্ফোরক দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সেপ্টেম্বর জুড়েই জর্ডানের সেনাবাহিনী পিএলও-কে জর্ডান থেকে বের করে দিতে অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানে অসংখ্য পিএলও স্বাধীনতাকামী, জর্ডানি সেনা এবং বেসামরিক লোক হতাহত হয়।

অভিযানের পর পিএলও উত্তর জর্ডানে আশ্রয় নেয়। মাত্র ১০ মাসের মাথায় তারা জর্ডান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা না পেয়ে

অবশেষে লেবাননে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে। এ ব্যাপারেও শেখ ইয়াসিনের দূরদৃষ্টি আরেকবার সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। তিনি সব সময় দুর্বল, অনাগ্রহী এবং অপ্রস্তুত আরব রাষ্ট্রদের দিয়ে ইজরাইলকে মোকাবিলা করার বিরোধিতা করেছেন। পিএলও'র কার্যক্রমের নেতিবাচক দিক ছিল– তারা জর্ডানের ভূমিকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় হাশিমাইত শাসকমহলকে বাধ্য হয়ে ইজরাইলের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়।

জর্ডানে পিএলও'র করুণ পরিণতি নিয়ে মিশরে পড়ুয়া ফিলিস্তিনি ছাত্ররা প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করত। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের ঘটনা ফিলিস্তিনিদের কার্যত দুটি ভাগে বিভক্ত করে। একটি হলো জাতীয়তাবাদী ধারা– যারা পিএলও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারা এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি জর্ডানকেই দায়ী করে। আর দ্বিতীয়টি হলো ইসলামপন্থি; যারা মূলত ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, তারা জর্ডান এবং পিএলও উভয়কেই দায়ী করে।[১৯] এই ঘটনাটি একই সঙ্গে ইসলামপন্থিদের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, ইসলামপন্থিরা বরাবর বলত– ইজরাইলকে মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের শক্তিশালী রাষ্ট্র-কাঠামো দরকার, তা নির্মাণ করতে হলে আগে আরবের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংস্কার করে একটি স্বাধীন ও মজবুত ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেনতেন বা জগাখিচুড়ি চেতনাসমৃদ্ধ রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থা দিয়ে ইজরাইলকে মোকাবিলা করে কখনোই সুফল পাওয়া যাবে না।

একই সময়ে মিশরও খুব সংকটে পড়েছিল। মিশরের স্বঘোষিত পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব জামাল নাসের ১৯৭০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, ইন্তেকাল করেন। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে জামাল নাসের ও তার কিছু সহকর্মী মিলে পূর্বের রাজাকে উৎখাতের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের সূচনা করে, যা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে। যদিও জামাল আব্দুল নাসের ১৯৬৭ সালে ইজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সার্বিকভাবে দুর্বল হয়েছিলেন। তারপরও তিনি মিশরের ছাত্র-ছাত্রীদের কম খরচে পড়াশোনা এবং শ্রমিকদের নানা সুবিধাদি দেওয়া অব্যাহত রাখেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই অর্থ প্রদানে তেমন একটা বিরোধিতা করেননি।

---

[১৯]. জর্ডানের ইখওয়ান শাখা সেই দেশ থেকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই গেরিলা অপারেশন চালিয়ে আসছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল, জর্ডান সরকার ও পিএলও'র মধ্যে সংঘাত ও দূরত্ব বাড়ছে, তখন তারা নিজেদের গেরিলা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এর মাত্র ৮ মাস পরই সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ইখওয়ানের যে নেতারা এই গেরিলা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– ড. আব্দুল্লাহ আজ্জাম এবং আহমাদ নাওফাল। পরবর্তী সময়ে তারা মিশর গমন করেন এবং সেখানেই নিজেদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।

জামাল নাসেরের পরবর্তী যুগে মিশরে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ইসলামপন্থিরা ভালো অবস্থানে পৌঁছায়। নাসেরের পরে মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। তার বিভিন্ন পলিসির কারণেই এ মতবাদগুলো কার্যকরভাবে প্রসারিত হয়। সাদাত তার পূর্বসূরি শাসকে মতোই ইসলামের বিকল্প হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাগুলো প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। তিনি সব সময় নিজের রাজনৈতিক বৈধতার বিষয়টি বড়ো করে প্রচার করতেন। ফিলিস্তিনি ছাত্রদের মিশরে আসার হার ক্রমশ বাড়তে থাকায় এর প্রভাবে মিশরের সমাজগুলোতে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথম যে প্রভাবটি পড়ে তা হলো– এসব ছাত্রদের দাবির মুখে আনোয়ার সাদাত ছাত্ররাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হন।

মিশর থেকেই ফিলিস্তিন ইখওয়ানের সংস্কার দাবি

মিশরে পড়তে আসা ফিলিস্তিনি ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মেধাবী। এসব ছাত্ররা হাইস্কুলে ভালো নম্বর পেয়েছিল অথবা বৃত্তি নিয়েই মিশরে এসেছিল। ফলে তারা মেডিসিন বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো ভালো ভালো বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায়। একটা সময়ে মিশরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভালো বিষয়গুলোতে পড়ুয়া ফিলিস্তিনি ছাত্রদের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। আব্দুল আজিজ আওদাহ এই ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সার্কেল প্রতিষ্ঠা করেন; যার বেশিরভাগ ছিল কায়রোতে।

১৯৭১ সালের এক শরতে নতুন একজন এসে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের এই সার্কেলে যোগ দেয়। তার নাম ছিল বাশির নাফি।[২০] তিনি মিশরে পশুচিকিৎসা নিয়ে পড়তে এসেছিলেন। বাশির নাফির জন্ম ও বড়ো হওয়ার সবটাই গাজার রাফাহ উদ্বাস্তু শিবিরে। তিনি জর্ডান থেকে মিশরে এসে পৌঁছান। শৈশব রাফায় কাটলেও ১৯৬৭ সালের পর থকে তিনি জর্ডানেই আবাস গড়েন। কেননা, সেই যুদ্ধের পরপরই তার পরিবার তাকে আম্মানে তার এক চাচার কাছে পাঠিয়ে দেয়। চাচার কাছে থেকেই নাফি তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। তারপরই ইখওয়ানে যোগদান করেন এবং খুব অল্প সময়ে ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

---

২০. বাশির নাফি বর্তমানে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মরত আছেন। ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ তোলে যে, নাফি ইসলামি জিহাদের যুক্তরাজ্য শাখাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাশির নাফি সেই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। তিনি জানান– ইসলামি জিহাদ নামক সংগঠনটি যেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তিনি সমর্থনই করেন না। অতএব, এই সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। রেফারেন্স ৯-এ তার বিষয়ে জানার জন্য সোর্স ও লিংক দেওয়া আছে।

জর্ডানে থাকা অবস্থায় তিনি ফাতাহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু মিশরে এসে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৯৭০-এর ব্লাক সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তিনি পিএলও'র বিকল্প হিসেবে ইখওয়ানকে চিন্তা করেন। আলি শাকশাক তাকে মিশরের প্রখ্যাত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা *মাইলস্টোন* নামক অমর গ্রন্থটি পড়তে দেয়। এটা পড়েই তিনি ইখওয়ানের সঙ্গে জড়িত হওয়ার অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। শাকশাক রাফা শিবিরে নাফির ঘরে বেড়াতে যান। এই সময় শাকশাক ও নাফি মিলে ইখওয়ান এবং ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনাও করেন। এই সময়ই শাকশাক নাফিকে সাইয়্যেদ কুতুবের[২১] অন্যান্য বইগুলো দেন; যা নাফির মানসিকতাকে আমূল পালটে দেয়।

একই সময়ে 'আল জামায়াতুল ইসলামিয়াহ' নামের আরেকটি মিশরীয় সংগঠনও মিশরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শুরু করে। এক দশক পরে এই সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা মিশরীয় ইখওয়ানের দ্বিতীয় প্রজন্মের শীর্ষ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। মিশরীয় ইখওয়ানের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার বহু আগে থেকেই তারা ফিলিস্তিনি ইখওয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। একই সময় জর্ডানের ইখওয়ানের বেশ কিছু ছাত্রও মিশরে আসে। তাদের সঙ্গেও ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। আবার একই সময়ে মিশরের কারাগারগুলো থেকে বেশ কিছু কারাবন্দি ইখওয়ান নেতা মুক্তি পান। এদের মধ্যে কিছু ফিলিস্তিনি নেতাও ছিলেন।

১৯৭৩ সালে ফিলিস্তিনের আন্দোলনের আরও বেশ কিছু নেতা মিশরে আগমন করেন। তাদেরই একজন ছিলেন ফাতহি আশ শিকাকি। তিনিও আওদাহর মতো আহমাদ ইয়াসিনের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এরপর মিশরে আরও যারা আসেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহিম আল মাকাদমাহ এবং সালাহ শিহাদাহ। প্রায় বছরখানেক পর কিছু অসততার কারণে আব্দুল আজিজ আওদাহ ইখওয়ান থেকে বহিষ্কৃত হন। এই ঘটনার পর আওদাহর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বাশির নাফিও ইখওয়ান থেকে বেরিয়ে যান। ইখওয়ান যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই নাফিকে বহিষ্কার করেনি; তাদের সে রকম কোনো ইচ্ছাও ছিল না।[২২]

---

২১. সাইয়্যেদ কুতুব মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একজন শীর্ষ নেতা। ১৯৫৪ সালে তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ১৯৪৯ সালে ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর তিনি ইখওয়ানে যোগ দেন এবং খুব স্বল্প সময়ে তিনি ইখওয়ানের প্রভাবশালী শীর্ষ নেতায় পরিণত হন। তাঁর মতাদর্শ ও সাহিত্যকর্ম আজও বিশ্বজুড়ে ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করে যাচ্ছে। এখনও উম্মাহ তাকে ইসলামি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণ করে।

২২. হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন

সেই সময়ের এই সার্কেলগুলোর আলোচনায় যে বিষয়টি বারবার উঠত– কীভাবে ইখওয়ানকে আরও গতিশীল করা যায়। তবে তারা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারেন– ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনকে দখল করার পর ফিলিস্তিনিরা তৎকালীন সময়গুলোতে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছিল, তার আলোকে সঠিক কর্মকৌশল গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় ইখওয়ান নেতাদের নেই। আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে– এরা কি স্বাধীন কোনো সংগঠন, নাকি গাজা সংগঠনেরই একটি বর্ধিত শাখা? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি ছাত্ররা ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করাটাও জরুরি মনে করে। কেননা, তাদের মনে হচ্ছিল– গাজার ইখওয়ানের নেতারা এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছেন না। এই প্রশ্নগুলোর সমাধান পাওয়ার জন্য ছাত্ররা বারবার বসেছে, মতবিনিময় এবং পরামর্শসভার আয়োজন করেছে। একসময় দেখা যায়, গাজার সংগঠনের সাথে অনেক চিন্তাই তারা মেলাতে পারছে না। ফলে তারা মূল সংগঠন থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল।

ফাতহি আশ– শিকাকি নামক এক ছাত্র গাজার সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন এই ধারাটির নেতৃত্ব দেয়। এভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার ধারণাটি তিনি পান তাওফিক তৈয়্যব নামক সিরিয়ার একজন ছাত্রের একটি লেখা থেকে। লেখাটির শিরোনাম ছিল– দুদফা বিপর্যয়ের পর ইসলামপন্থিদের করণীয়। লেখাটার[২৩] সূচনা বক্তব্যে লেখক ১৯৬৭ সালের ৫ জুনের ঘটনাকে ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। কেননা, এই দিনই ইজরাইল জর্ডানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর এবং একই সঙ্গে পূর্ব জেরুজালেমও দখল করে নেয়। ১৯৬৭ সালের এই ঘটনাটি আরব জাতীয়তাবাদের ওপর একটি চপেটাঘাত। ফলে বিভিন্ন স্থানে ইসলামি বিপ্লবের সূচনা হয়। তাওফিক তার লেখায় জেরুজালেম হারানোর বিষয়টিকে আরব জাতিগুলোর পরাজয়ের করুণ পরিণতি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন– জেরুজালেম হারানোর বিষয়টি কি ১০৯৯ সালে ক্রুসেডারদের কাছে জেরুজালেম হারানোর মতো, নাকি ১২৩৭ সালে কর্ডোভা হারানোর মতো ক্ষতি, নাকি ১২৮৫ সালে বর্বর মোঙ্গলদের কাছে বাগদাদের পরাজয়ের মতো?

এই মৌলিক প্রশ্নটি তুলে তাওফিক বলেন– 'ওপরোক্ত ঘটনাবলির কোনোটাই জেরুজালেম শহরটিকে হারানোর মতো ক্ষতিকারক নয়। কেননা, ১৯৬৭ সালে শুধু জেরুজালেমের পতন হয়নি; বরং সমগ্র মুসলিম ও পুরো ইসলামি সভ্যতার ওপরও বিরাট আঘাত এসেছে।' তাই এই ঘটনাটিকে তিনি অন্য যেকোনো ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

---

২৩. এই লেখাটা অনলাইনে পাওয়া যায় www.qudsway.com শীর্ষক ওয়েবসাইটে।

তাওফিকের মতে– '১৯৬৭ সালের ঘটনা মুসলিম উম্মাহ্ এবং তাদের ঈমানকে এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে– হয় এগুলো থাকবে, নাহয় বিলুপ্ত হবে। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব থাকবে, নয়তো অনন্ত-মহাকালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি থাকবে কিংবা বিলীন হবে। ইসলাম কি একটি শাশ্বত বিশ্বাস হিসেবে টিকে থাকবে, আরব জাতি কি তাদের পূর্বসূরিদের মতো বুক ফুলিয়ে পৃথিবীর বুকে ভাস্বর থাকবে, নাকি ইহুদিদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে নিজেদের ঈমান-আকিদা হারিয়ে দেউলিয়া হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে মূলত ফিলিস্তিনকে ঘিরেই।' সবশেষে তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনই হলো উম্মাহর জাগরণ এবং মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো ইস্যু। তাই ইসলামি আন্দোলনগুলোকে ফিলিস্তিনকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা, ফিলিস্তিনের পরিণতি আর ইসলাম, ইসলামি আন্দোলন ও মুসলমানদের পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা।'

অন্যদিকে, সে সময়ে ইসলামকেন্দ্রিক যে রাজনৈতিক ভাবনাগুলো মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো– ইখওয়ানও এই চিন্তাই লালন করত। তারা দাবি করত, শক্তিশালী একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই কেবল ফিলিস্তিনকে ইজরাইলি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা সম্ভব। তবে সেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আগে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে– যার ভিত্তি হবে ওহির আলোকস্নাত শরিয়ত এবং সুবিবেচনাবোধ। আর সেই সমাজের মুসলিমরা হবে পবিত্র, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং তাকওয়ার বলে বলীয়ান।

তারা জেরুজালেম হারানোর ঘটনাকে ইসলামি মূল্যবোধ হারানোর একটি ইঙ্গিত হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তারা মনে করতেন, মুসলিমরা সত্যিকারের ইসলামি আদর্শ ও চেতনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই এই অধঃপতন। তাই উম্মাহর সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে; বিকল্প কোনো পথ নেই। তবে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আর এই সংস্কারটি লাগবে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের জন্য। ব্যক্তির সংস্কারের পাশপাশি পরিবার এবং গোটা সম্প্রদায়ের সংস্কারেরও কোনো বিকল্প নেই।

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইখওয়ানের বক্তব্য এমনটা হলেও এটা তাদের প্রাথমিক বা মৌলিক অবস্থান নয়। ১৯৪৮ সালে যখন ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়, ইখওয়ান তখন শত শত স্বেচ্ছাসেবীকে ইজরাইলের মোকাবিলার জন্য ফিলিস্তিনে পাঠায়। কিন্তু তাদের এই জিহাদি চেতনা তৎকালীন আরব শাসকরা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

তারা নিজেদের নেতৃত্ব নিয়ে শঙ্কায় পড়ে। ফলে দেশে দেশে ইখওয়ানকে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আরব দেশগুলোর শাসকদের সামনেও প্রশ্নটি চলে আসে– তারা ফিলিস্তিনের বিষয়ে কী ভাবছেন?

১৯৫০-৬০ সাল, এই সময়টাতে ইসলামপন্থি ও জাতীয়তাবাদীরা ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে বির্তক করতেই ব্যস্ত থাকত। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দুই ধারার ছাত্ররা পড়তে আসত। তারা এই ইস্যুগুলো নিয়ে অনেক তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়ত। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল– আরবরা কীভাবে ইহুদি আগ্রাসনকে মোকাবিলা করবে? তবে উভয় দলই ইহুদি আগ্রাসনকে সবচেয়ে বড়ো হুমকি বিবেচনা করত। ইসলামপন্থিরা দাবি করত– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা তখনই সম্ভব, যখন ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তাই অনৈসলামিক কোনো শক্তি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবে– তা ভাবাই সমীচীন হবে না। তারা প্রশ্ন উত্থাপন করল, মিশরের নাসের বা সিরিয়ার বাথ পার্টির অধীনে জিহাদ হবে কি না। কেননা, এই শাসকরাও নানা সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইহুদিদের দোসর হিসেবেই ভূমিকা পালন করেছে।

এর আগে ’৬০-এর দশকের শেষ দিকে ইখওয়ানের কিছু সদস্য ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তারা ছিল জর্ডান উপত্যকায় নিজস্ব ঘাঁটি গড়ার পক্ষে, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক ও লজিস্টিক কারণে তাদের ফাতাহ বা পিএলও’র আওতায় কাজ করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না।

মিশরে পড়তে আসা ফিলিস্তিনি ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন, বিতর্ক আরও বেড়ে যায় ১৯৭০–এর মাঝামাঝি। ফাতাহ তখন তাদের কাছে ইসলামি শাখার (ইসলামিক ফাতাহ) আওতায় কাজ করার প্রস্তাব দেয়। ফাতাহ আন্দোলনের শীর্ষ নেতারা লেবাননের বৈরুত থেকে একজন সদস্যকে প্রতিনিধি হিসেবে মিশরে পাঠায়। তিনি ছাত্রদের ইখওয়ানের আদর্শ নিয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। ইখওয়ান সদস্যরা আগাগোড়াই জিহাদ ও শাহাদাতকে সবচেয়ে চরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয় মনে করত। যখন তাদের প্রশ্ন করা হলো– জিহাদ ও শাহাদাত যদি এতটাই আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহলে কেন সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিচ্ছেন না? ইখওয়ানের ছাত্ররা এর উত্তরে বলত– তারা জাতীয়তাবাদী ব্যানারের আওতায় জিহাদ করতে চায় না। ইখওয়ান মনে করতেন, ফাতাহ ইসলামিক শাখাটি খুলেছে ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নয়; বরং দলীয় স্বার্থের জন্য।

ফিলিস্তিন ইখওয়ান এবং কুয়েতের যোগসূত্র

একই সময়ে কুয়েতে ফিলিস্তিনের ইখওয়ান শাখাটি ভিন্ন কিছু সংকটে পড়ে। ফাতাহর উত্থান এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় পিএলও একমাত্র কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থিরা ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের শেষে কুয়েত অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে আশ্রয় দেয়। এসব ফিলিস্তিনিরা ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং উন্নত জীবনযাপনের লোভে কুয়েতে আসে। যদিও ফিলিস্তিনের নিকটতম প্রতিবেশী সৌদি আরব এবং তারাও বেশ বড়ো ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। তারপরও কুয়েতকে তারা বেশি পছন্দ করত। কেননা, তারা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারত।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর কুয়েতে ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বিশেষ করে শ্রমিক কিংবা নানা পেশায় চাকরি নিয়ে অসংখ্য ফিলিস্তিনি গাজা, পশ্চিম তীর এবং জর্ডান থেকে পরিবারসহ কুয়েতে আসে। এর আগে যেসব ফিলিস্তিনি পেশাজীবী কুয়েতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আবার বেশ কিছু তরুণ, যারা বিভিন্ন মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে, তারাও সে সময় চাকরির সন্ধানে কুয়েতে আসে। সব মিলিয়ে বড়ো সংখ্যক ফিলিস্তিনিই কুয়েতে এসে থিতু হয়।

১৯৭০ সালের শেষ দিকে কুয়েত ইখওয়ানের ছাত্রদের জন্য একটি আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। এই ছাত্ররাই '৮০'র দশকের শেষে হামাসের প্রতিষ্ঠার পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। '৭০-এর দশকটি ছিল ইসলামের উত্থানের সময়– যখন অসংখ্য যুবক-যুবতি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নাসেরের পতনের পর কুয়েতেও ইখওয়ানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইখওয়ানও এই সুযোগে জনগণের কাছে আরব জাতীয়তাবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ পায়। ফলে তরুণদের কাছে ধীরে ধীরে আরব জাতীয়তাবাদের গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে।

তা ছাড়া কুয়েতে ইখওয়ানের পালে আরও হাওয়া লাগে, যখন নাসেরের মৃত্যুর পর মিশরের কারাগার থেকে অনেক ইখওয়ান নেতা কুয়েতে আসে। সেইসঙ্গে মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়া উচ্চশিক্ষিত ফিলিস্তিনি যুবকরাও কুয়েতে আসা শুরু করে। এ রকমই একজন স্কলার ছিলেন হাসান আইউব। তিনি তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে অসংখ্য মানুষকে ইসলামের পথে নিয়ে আসেন। তিনি শুক্রবারে বিভিন্ন খুতবায় যে বক্তব্য দিতেন, তা শোনার জন্য বিপুলসংখ্যক লোকসমাগম হতো। তার বক্তব্য অডিও ক্যাসেট আকারে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ত। এমন কোনো সমসাময়িক ইস্যু ছিল না, যে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যেত না। তিনি ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, বিচার কার্যক্রম এবং দর্শনসহ নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। এর কিছুদিন পর তিনি ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় এবং শরিয়তের বিভিন্ন বিধিবিধানের ওপর বই লেখা শুরু করেন।

সেই সময়ে ইখওয়ান অনুভব করে– চারদিক থেকে যে ভিন্নমতের আদর্শগুলো তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে, তার মোকাবিলায় জনশক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সে সময়ের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল ব্যক্তি, পরিবার এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে পশ্চিমা ধ্যানধারণা, ভাবাদর্শ, তথাকথিত উদারপন্থা বা মার্কসবাদের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা। তারা অনুধাবন করে– মুসলমানরা তার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজসংক্রান্ত যেসব সমস্যায় ডুবে আছে, তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শরিয়ার দ্বারস্থ হওয়া। এমনকী ইহুদিদের কবল থেকে ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করতে চাইলেও শরিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই।[২৪]

মূলত দুটি কারণে ফিলিস্তিনের ইখওয়ান জাতীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। প্রথমত, ভয় ছিল– এই ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হলে তাদের ইসলামি সত্তাটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কেননা, এর আগে ফাতাহও এই ধরনের সংকটে পড়েছে। ফাতাহ আন্দোলনের ইয়াসির আরাফাত ছাড়া শীর্ষ সব নেতাই একসময় ইখওয়ানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অথচ দেখা গেল, দল চালাতে গিয়ে তারা একটা পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছে। এর জন্য নিজেদের ইসলামি চিন্তাধারাকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করল না।

দ্বিতীয়ত, কোন ইস্যুটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা নয়, তা নির্ণয় করতে ইখওয়ান নিজেদের প্রয়োজনীয় আস্থা ও সক্ষমতার সংকটটা ভালোভাবেই অনুভব করছিল। কারণ, দমন-পীড়ন এবং জুলুম-নির্যাতনে তারা গুটিয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই জাতীয় কিংবা জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে নির্ধারণ করতে পারছিল না। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল– প্যান ইসলামিক প্রকল্পের অংশ হিসেবে একটি ইসলামিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করা। কারণ, অধিকাংশ আরব দেশেই তত দিনে ইসলামি আন্দোলনটি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ইখওয়ান সদস্যরা মনে করত– ইসলামিক বিধান প্রতিষ্ঠা করা না গেলে কোনো লক্ষ্যই অর্জন সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী ব্যর্থতাগুলো সামনে রেখে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক যেকোনো প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করত।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে ইখওয়ান ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষার জন্য শত শত স্বেচ্ছাসেবীকে প্রেরণ করল, সেই ইখওয়ান '৭০-এর দশকে এসে ফিলিস্তিনে জিহাদে অংশ নিতে পারল না। ফিলিস্তিনে যা ঘটল, সেটাকে তারা ধর্মীয় অনুশাসন না মানার কারণে উম্মাহর ওপর নেমে আসা বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করল।

---

[২৪]. খালিদ মিশালের মতামত। তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন

ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দেওয়াটা তারা ইসলামের পথ থেকে সরে আসার মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করে। ইখওয়ানের মতে— এই সংকটের কারণেই ভিন্নধর্মীরা ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম ভূখণ্ডকে দখল করার সাহস পেয়েছে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র সমাধান— আবারও ইসলামের পথে ফিরে আসা এবং ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া। যখন উম্মাহ ইসলামের হারানো একাত্মতা ফিরিয়ে আনবে এবং তা অটুট রাখতে সচেষ্ট হবে, তখনই শত্রুদের মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

এমতাবস্থায় ইখওয়ান তাদের কর্মকৌশল পুনরায় বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। কেননা, এরই মধ্যে ইসলামিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের মনোপলি অবস্থান অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আরও অনেক ইসলামিক গ্রুপ দৃশ্যপটে হাজির হয় এবং তারাও ইসলামিক চেতনা লালন করে। সার্বিকভাবে গোটা সমাজেই ধর্মের আবহ ও প্রভাব বেড়ে যায় এবং ইসলামি মূল্যবোধগুলো সমাজে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই পালিত হওয়া শুরু করে। এই অবস্থায় ইখওয়ান বুঝতে পারে— তারা যদি ইজরাইলের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার ডাক দিতে বিলম্ব করে, তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা ভয়ংকরভাবে প্রশ্নের মুখে পড়বে এবং জনগণ তাদের ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

ইসলামি পুনরুত্থানের এই বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় ছাত্র ও তরুণসমাজ। এই সময়ে তরুণসমাজ থেকে ইসলামি আন্দোলনে অন্তর্ভুক্তির হারও অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি ছিল। ১৯৭০ সালে এসে অন্য সব ইসলামি দলের মতো ইখওয়ানও মাধ্যমিক স্কুলছাত্রদের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়। এই ছাত্রদের ইসলামি ছাত্র আন্দোলনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রে ইখওয়ানের সবচেয়ে বড়ো সফলতা আসে মসজিদগুলোতে। কেননা, মসজিদ কমিটিগুলোর মাধ্যমে তারা তরুণ সম্প্রদায়কে নানা ধরনের সামাজিক, বিনোদনমূলক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার সুযোগ পায়। কুয়েতস্থ ফিলিস্তিন ইখওয়ান ১৯৭০ সালের মাঝামাঝিতে সংগঠনের কাঠামোর আওতায় ছাত্র সংগঠন চালু করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। এটা ছিল সময়োপোযোগী সিদ্ধান্ত। এর পরপরই কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইখওয়ানের প্রথম ব্যাচ প্রবেশ করে। এই ব্যাচেরই একজন ছিলেন হামাসের সদ্য বিদায়ি রাজনৈতিক ব্যুরোপ্রধান খালিদ মিশাল।

খালিদ মিশালের জন্ম ১৯৫৬ সালে রামাল্লার সিলওয়াদ নামক গ্রামে। সেখানে তিনি ১১ বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। এরপর ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শুরু হলে জর্ডানে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পরই তরুণ খালিদ মিশাল জর্ডান ছেড়ে কুয়েতে পাড়ি জমান।

কেননা, কুয়েতে তার বাবা ১৯৬৭ সালের আগে থেকেই বসবাস করতেন। ১৯৭০ সালে নিজের প্রাথমিক লেভেলের পড়াশোনা শেষ করে খালিদ 'আব্দুল্লাহ আস সালিম সেকেন্ডারি' স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলটিতে সেই সময়ে অভিজাত শ্রেণির লোকেরাই পড়াশোনা করার সুযোগ পেত। তা ছাড়া '৭০-এর দশকে এই স্কুলটিই ছিল সব ধরনের রাজনৈতিক ও আদর্শিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষে পড়া অবস্থায় ১৯৭১ সালে তিনি ইখওয়ানে যোগ দেন। তিনি শুরু থেকেই ছিলেন ইখওয়ানের নিবেদিত একজন কর্মী। স্কুলের পড়াশোনার পর্ব শেষ হওয়ার পর কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৭৮ সালে সেখান থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর বেশ কয়েক বছর কুয়েতে থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতাও করেন।

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের একটি সমিতি ছিল– জেনারেল ইউনিয়ন অব প্যালেস্টিনিয়ান স্টুডেন্টস (জিইউপিএস)। এই সমিতিটি ছিল পুরোপুরি ফাতাহ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে। ইসলামপন্থি ছাত্ররা শুরুর দিকে এই সমিতিকে এড়িয়ে চলত, কিন্তু ১৯৭৭ সালে তারা এই সমিতিতে যোগ দেওয়া এবং এর নেতৃস্থানীয় পদগুলোতে যাওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত জেরুজালেম সফর করে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে সংঘাত অবসানের আহ্বান জানান। এই সফর ফিলিস্তিনি ছাত্রদের আরও উত্তেজিত করে। খালিদ মিশাল এবং তার সহকর্মীরা মিলে জিইউপিএস নির্বাচনের জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। 'আল হক' বা 'সত্য' শিরোনামের সেই তালিকায় তারা তাদের বক্তব্যগুলো প্রচার করেন। প্রচারণার মূল বক্তব্য ছিল দুটো। একটি হলো, লেবানন যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে এই যুদ্ধের প্রভাব। দ্বিতীয়টি হলো, জেরুজালেমে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট সাদাতের সফর, ইজরাইলের পার্লামেন্টে বক্তব্য এবং এর পরিণতি।

তবে সময়ের ব্যবধানে জিইউপিএস-এর অধীনে কাজ করাটা একসময় রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, ইসলামপন্থিরা এই সমিতিতে অবহেলিত হতে থাকে। একটা পর্যায়ে বুঝতে পারে, এখানে থেকে তাদের ভাবনাগুলো কখনোই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। খালিদ মিশালের গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার দুই বছর পর ১৯৮০ সালে তার জুনিয়র সহকর্মীরা জিইউপিএস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের ঘরানার ফিলিস্তিন সংঘ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পিএলও নিজেদের বলয়ে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের রাখার জন্য যে ধরনের সংস্থাগুলো করেছিল, তার বিকল্প হিসেবে ফিলিস্তিনি ইখওয়ান প্রথম একটি বিকল্প ছাত্রসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

'কুয়েত ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন অব প্যালেস্টিনিয়ান স্টুডেন্টস' ছিল সেই সংগঠনের নাম। একই সময়ে শুধু আরব অঞ্চল নয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বেশ কিছু ইউরোপিয়ান দেশেও ফিলিস্তিনি ছাত্রদের নিয়ে এই ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব ছাত্রদের বেশিরভাগ পিএলও'র ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। যারা মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের হতাশ করে দিয়ে পিএলও নেতারাও সেই স্বপ্নকে নির্দ্বিধায় বিক্রি করেছেন। পিএলও সকল উদ্বাস্তুকে তাদের বাড়িঘর ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই দিতে পারেনি; পারার কথাও নয়...

অধ্যায়-২

ইখওয়ান থেকে হামাস

ইসলামি আন্দোলনের পথটি কখনোই সহজ ছিল না। ছিল বন্ধুর, বিপদসংকুল ও প্রতিকূল। জনশক্তি ও সম্পদের একটি দায়িত্বানুভূতি এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন করে। অনেক সময় এই নেতারা কোনো দিকে অগ্রসর হতে চাইলেও নানাবিধ বিষয় ও খারাপ পরিণতির আশঙ্কা থাকায় তাদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়। আবার অনেক সময় একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও পরবর্তী সময়ে প্রস্তুতির কমতি বিবেচনায় সেখান থেকেও সরে আসতে হয়। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে গাজায় অবস্থানরত শেখ আহমাদ ইয়াসিন এবং ও সঙ্গীরাও একই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছিল। তখন তারা খুবই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য কাজ করছিলেন। কেননা, একদিকে তখন আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, অন্যদিকে বামপন্থি সংগঠনগুলো ইজরাইলের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকায় তাদের জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়ছিল। একটা পর্যায় ইজরাইল আরব জাতীয়তাবাদী নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার, জুলুম, নিযার্তন, হত্যা, আটকের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষের কাছে আবারও ইখওয়ানের শান্তিপূর্ণ দাওয়াতি কার্যক্রম জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে।

শুরু থেকেই আহমাদ ইয়াসিন আশঙ্কা করেছিলেন– ১৯৭৩ সালের ইজরাইল ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ইজরাইলের সাথে সন্ধি স্থাপনের পথটাই ত্বরান্বিত হবে। তার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। আরেকবার প্রমাণ হয়, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আরব দেশগুলোর ইচ্ছা ও প্রস্তুতি– দুটোতেই ব্যাপক ঘাটতি আছে। ফিলিস্তিনিরা নিজেরাও যে খুব প্রস্তুত ছিল তাও নয়। আরব দেশগুলোর তরফ থেকে ফিলিস্তিনিরা প্রয়োজনীয় আর্থিক ও লজিস্টিক সাপোর্টও পাচ্ছিল না।

অন্যদিকে ইজরাইলিরাও বিভিন্ন কৌশলে তাদের বেশ কিছু চরদের ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করায়।[২৫] ফলে প্রতিরোধ আন্দোলনটি চালিয়ে যাওয়া রীতিমতো অসম্ভব হয়েছিল। ইখওয়ানের চিন্তা ছিল– ফিলিস্তিনি সমাজে যে ঘুণে ধরা বাস্তবতা, তার সমাধান না করা পর্যন্ত এই প্রতিরোধ আন্দোলনটি সফল হবে না। এটাকে ইখওয়ান একটি সামাজিক ব্যাধি বলে মনে করত। তাদের ভাষায়– এর একমাত্র ওষুধ ইসলামে ফিরে আসা।

এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শেখ ইয়াসিন বলেন– 'এটা ঠিক যে আমার ব্যক্তিগত একটি স্বপ্ন ছিল, সেটা বাস্তবায়নে উৎসাহীও ছিলাম। আমি ১৯৬৭ সালের পরপরই যুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই যুদ্ধে যাওয়ার আগে যখন নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করলাম, শক্তি ও সম্পদগুলোকে মূল্যায়ন করলাম, তখন বুঝলাম– প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের প্রস্তুতি মোটেও যথেষ্ট নয়। তাই বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা স্থগিত করলাম। এরপর আবারও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হলো। তখনও গণসিদ্ধান্তকে স্থগিত করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিল না।'

ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম

প্রায় দশ বছর নিজেদের বাসাবাড়িতে এবং মসজিদে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে ইখওয়ান প্রথমবারের মতো অনুধাবন করে, তাদের জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য একটি কাঠামো সৃষ্টি করার উপযুক্ত সময় এসেছে। সেই মোতাবেক তারা যে কাঠামো নিয়ে আবির্ভূত হয়, তার নাম ছিল 'আল জামিয়াহ আল ইসলামিয়াহ' বা ইসলামিক সমাজ কাঠামো। এই ফোরামের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের জন্য নানা ধরনের শিক্ষা, বিনোদন এবং হালাল ক্রীড়া সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রাথমিক অবস্থায় ইজরাইল এই কার্যক্রমকে কোনো ধরনের হুমকি বলে মনে করেনি। ফলে তারা ফোরাম ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্সও প্রদান করে। আশ-শাতি নামক এলাকার একটি মসজিদের একটি রুম ভাড়া নিয়ে ফোরামের কাজ শুরু হয়। সেখান থেকেই নানান সময়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, বিনোদন, সফর, স্কাউটিং কার্যক্রম এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ইস্যুতে নানা ধরনের লেকচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

---

২৫. ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরপরই ইজরাইল ফিলিস্তিনের কিছু অসহায় লোককে নিজেদের সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেয়। তারা মূলত যেকোনো প্রতিরোধ আন্দোলন বা ইজরাইলের প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো ঘটনা বা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সম্পর্কে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষকে আগাম সংবাদ দিত। এ ধরনের বিক্ষোভকারীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্যও তারা নানা ধরনের তৎপরতা পরিচালনা করত।

অন্যদিকে, আল আব্বাস মসজিদ থেকে শেখ আহমাদ ইয়াসিন তার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই টাকায় মিশরের প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুব শহিদের *ফি জিলালিল কুরআন* পুনঃপ্রকাশ করেন। ফিলিস্তিনি জনগণ বিশেষ করে ছাত্র-যুবকরা যাতে এই কুরআন শরিফ হাতে পায়, সে জন্য ২ হাজার কপি কুরআন বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হলে গাজায় ইখওয়ানের ব্যাপারে মানুষের ধারণাও পালটাতে শুরু করে। সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব; যিনি জামাল আব্দুল নাসেরের দমন-নিপীড়নের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন, কিন্তু ইসলামের আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও সরেননি। ব্যাপক বিতরণের ফলে পাঠকরা যেমন বিপ্লবের প্রেরণা অনুভব করার সুযোগ পেল, ঠিক তেমনি সাইয়্যেদ কুতুব যে অনেক বড়ো জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ, সেটাও অনুধাবন করল।

শেখ ইয়াসিনের খুতবার বয়ান ছিল খুবই জ্ঞানগর্ভ আর দৈনন্দিন সমস্যাকে সহজে তুলে ধরার এক নৈপুণ্যে ভরা। জনগণ তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। সাধারণ মানুষ খুঁজে নিত– কোন মসজিদে শেখ ইয়াসিনের বয়ান হবে। তরুণদের আকৃষ্ট করত তার আধুনিক রূপক, আর তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

শুধু ক্লাসেই নয়; ছাত্ররা তার পিছু পিছু মসজিদেও যেতে থাকে। ক্লাসের বাইরে তাকে অনুসরণের ক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকের আপত্তি ছিল, কিন্তু তিনি সবাইকে তার অনুরাগী করে তুলতে শুরু করেন। অন্যের কষ্ট উপলব্ধি করার এক অলৌকিক ক্ষমতা তার ছিল। তিনি এতটাই জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাকে এক কথা দুবার বলতে হতো না। অনেক সময় তিনি মুখ দেখে বুঝে নিতেন। তার ছিল অপরিসীম জ্ঞান আর আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা।

এসব মসজিদভিত্তিক প্রকল্পের সফলতা দেখে ইখওয়ান নতুন আরেকটি প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নেয়– আল মাজমাউল ইসলামি বা ইসলামিক সেন্টার। এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে ১৯৭৬ সালে। মসজিদগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিকভাবে গাজা উপত্যকার দক্ষিণে স্থানীয় জনগণকে নানা ধরনের সামাজিক, চিকিৎসা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সেবা প্রদান শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ভবনটি নির্মিত হয় পশ্চিম তীরের বিত্তবান ফিলিস্তিনি নাগরিকদের অর্থায়নে। ভবনটির নির্মাণ শেষ হলে তারা এই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স চেয়ে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। প্রাথমিকভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পর গাজার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কমিটির বাক্-বিতণ্ডার জেরে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের কাছে লাইসেন্সটি বাতিল করার আহ্বান জানায়।

সেই ব্যক্তি কমিটিতে ভালো পদ চেয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামিক সেন্টার তাদের সেক্রেটারি হিসেবে আহমাদ ইয়াসিনকে বেছে নিলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। ইজরাইলি প্রশাসনও সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্স বাতিল করে।

তবে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লবিং করে আবারও লাইসেন্সটি ইস্যু করানোর উদ্যোগ নেন। একটা পর্যায়ে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়। ইসলামিক সেন্টার এখান থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আওতায় গাজা উপত্যকায় বেশ কিছু মসজিদ, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল এবং ক্লিনিক চালু করে। এই সামাজিক কার্যক্রমগুলো ইসলামিক সেন্টারকে এতটাই গতিশীল ও জনপ্রিয় করে তোলে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা খান ইউনুস নামক এলাকায় দ্বিতীয় শাখা খুলতে সক্ষম হয়।

আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমকে কীভাবে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর এবং নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে কীভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া যায়, বিশ্বে এর নজির ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থিরাই সবার আগে স্থাপন করে। এই ধরনের কাজগুলো আরবের অন্য দেশগুলোতে করা যায়নি। কেননা, সেখানে ধর্মীয় বা শিক্ষাখাতে বেসরকারিভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এমনকী অনুদান নিয়ে দাতব্য কাজ করার ক্ষেত্রেও বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল। আরব দেশগুলোতে উপনিবেশপরবর্তী সরকারগুলো নিজেদের গদি বাঁচানোর জন্য নাগরিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। কারণ, তারা জানত– এই প্রতিষ্ঠানগুলো আটকাতে পারলেই জনগণের ওপর নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে পারবে। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, এই স্বৈরাচারী শাসকরা নামে মুসলিম হলেও ইহুদিদের প্রতিরোধ করার নামে জনগণের ওপর দমন-নিপীড়নগুলো চালাত। যার কারণে গাজা যখন মিশরের কিংবা পশ্চিম তীর যখন জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, ফিলিস্তিনিরাও এ ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছে।

নিয়তির পরিহাস, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ এবং ইজরাইলি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইজরাইল নিজেদের প্রশাসনিক কাজে বাড়তি সুবিধার জন্য গাজা ও পশ্চিম তীরের আরব জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে উসমানি খিলাফতের বেশ কিছু আইন প্রবর্তন করে। আর এই আইনি সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য তাদের অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও অনুমোদন দিতে হয়; যার মধ্যে আছে দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। দখলদারিত্বের সময়ের মধ্যে এটা ছিল ফিলিস্তিনিদের জন্য এক মোক্ষম সুযোগ। তবে এটা সাময়িক হলেও

তা ছিল তাদের জন্য সৌভাগ্যের হাতিয়ার। দখলদারিত্বের প্রথম ১০ বছরে অর্থাৎ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ইজরাইলের নীতি ছিল– সামাজিক কার্যক্রমে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ না করা।

ইজরাইলের তৎকালীন লেবার পার্টি সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান নিজে এই নীতিমালাটির বাস্তবায়ন তদারকি করতেন। এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল– ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের ভেতর ইজরাইলের ব্যাপারে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি ও ফিলিস্তিনি জনগণকে স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া। সর্বোপরি যদি কোনো অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইন মেনে চলে এবং ইজরাইলি শাসনের সাথে সংঘর্ষে না জড়ায়, তাহলে তাকে অবাধে কাজ করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া। যদিও এই ধরনের আইন বলবৎ থাকার কারণে সকল সামাজিক ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধা পাচ্ছিল, তারপরও ধর্মভিত্তিক সংস্থাগুলো একটু বেশিই সুবিধা পায়।

অভিজ্ঞতা বলে– যদি কোনো মুসলিম সমাজে এই ধরনের স্বাধীন পরিবেশ পাওয়া যায়, তাহলে কোনো রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা আদর্শিক প্রতিষ্ঠানই ধর্মীয় সংস্থাগুলোর কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনসেবা এবং অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণে বরাবর এগিয়ে থাকে। কেননা, ইসলামে দুস্থ মানুষকে আর্থিক সাহায্য কিংবা এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ আছে; যাকে আমরা জাকাত বলি।

তাই ইসলামিক সোসাইটি এবং ইসলামিক সেন্টারের ওপর ভর করে ইখওয়ানও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে। অল্প সময়েই মসজিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। প্রায় প্রতিটি মসজিদেই কিন্ডারগার্টেন এবং কুরআনিক স্কুল চালু হয়। আবার কিছু কিছু মসজিদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল ক্লিনিকেরও ব্যবস্থা ছিল।

অন্যদিকে, গ্রামগুলোতে প্রায়ই অস্থায়ী মেডিকেল ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা হতো। ইখওয়ানের ডাক্তাররা সপ্তাহের একেক দিন একেক জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী ক্যাম্প স্থাপন করে এই সেবা প্রদান করত। ইখওয়ানের ফার্মেসিতে ওষুধপত্রও তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যেত। তা ছাড়া ইখওয়ান বিনামূল্যে খতনা এবং এ উপলক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে উৎসবেরও আয়োজন করত। এসব কারণে দিনদিন ইখওয়ানের সার্বিক কার্যক্রম ভালোভাবেই বিস্তৃত হচ্ছিল। শুধু অর্থের জোগানটাই ছিল একমাত্র সংকট। সে কারণে আর্থিক ইস্যুতে তারা খুবই সতর্ক ছিল। বিশেষ করে টাকা কোথা থেকে আসত, কোথায় খরচ হতো, কীভাবে কার মাধ্যমে হতো– এই বিষয়ে তথ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষণ থাকত। এই সুযোগে সারা দেশে জাকাত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি স্থানীয় মসজিদ কমিটির সাথে সমন্বয় করে

এই অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করত। বিভিন্ন দেশে কর্মরত ইখওয়ানের অন্যান্য শাখাগুলো ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাহায্যে যে অর্থ পাঠাত, জাকাত কমিটিগুলো সেই অনুদান ব্যবস্থাপনারও দায়িত্ব পালন করত।[২৬]

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম গাজায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর চিন্তা শুরু হয়। কেননা, সে বছরই প্রথম মিশর ও অন্যান্য আরব দেশ থেকে অসংখ্য ফিলিস্তিনি ছাত্র গ্রাজুয়েশন শেষ করে দেশে ফিরতে শুরু করে। এর আগে ১৯৭০-এর শেষের দিকে পশ্চিম তীরে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক কলেজ ও স্কুলকে রূপান্তর করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বিরজেইত কলেজ ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্টস এবং সাইন্সে চার বছরের গ্রাজুয়েশন কোর্স চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৫ সালে বিরজেইত কলেজের নাম পালটে বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের ১১ জুলাই। দ্বিতীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেখানে চালু করা হয় তা হলো– বেথেলহাম ইউনিভার্সিটি অব দ্য হলি ল্যান্ড। এটি ছিল মূলত ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের একটি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে উচ্চতর ডিগ্রিও দেওয়া হতো। তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি হয় নাবলুসে ১৯৭৭ সালে, যার নাম– আন নাজাহ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও একটি স্কুলকে রূপান্তর করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামিক বিষয়াদির বাইরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স চালু হয়।

গাজায় প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তার নাম– ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়।[২৭] এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বোর্ডমেম্বার ছিলেন ইখওয়ানের কতিপয় নেতা-কর্মী, যারা আল মাজমাউল ইসলামি বা ইসলামিক সেন্টারের সদস্য ছিলেন। এই বোর্ড কমিটির সভাপতি ছিলেন শেখ আহমাদ ইয়াসিন। বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রার শুরু থেকেই বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়ে। এমনিতেও গাজাতে ইখওয়ানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ করে স্থানীয় ফাতাহ আন্দোলন খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তার ওপর গাজাতে ইখওয়ানের তত্ত্বাবধানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হোক তা তারা কোনোভাবেই চায়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা সর্বাত্মকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে।

---

২৬. যদিও ইজরাইল এই জাকাত কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলত; এমনকী তারা এটাও বলত, জাকাত সংগ্রহের নামে আনা এই সব অর্থ দিয়ে মূলত উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, কিন্তু তা মোটেও সত্য ছিল না। এমনকী ইজরাইলও বিষয়টির অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি করেছিল, তারাও এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

২৭. গাজা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে জানতে রেফারেন্স নং ১০ ও ১-তে চোখ বোলাতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাক ইখওয়ান কখনোই তা চায়নি। তাই তারা পিএলও চেয়ারম্যান এবং ফাতাহ নেতা ইয়াসির আরাফাতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা বক্তব্য প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কমিটিও নির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি তখনও জানতেন না– কমিটির অর্ধেকেরও বেশি সদস্য ফিলিস্তিন ও জর্ডানের ইখওয়ানের দায়িত্বশীল। আর বাকি অর্ধেক ফাতাহ সদস্য হলেও তারা ইখওয়ানের ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। মূলত এ কারণেই তাদের বাছাই করা হয়েছে।[২৮]

তা ছাড়া পিএলও চেয়ারম্যান চাচ্ছিলেন, কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও যেন ইখওয়ানের পূর্ণ সহযোগিতা পান। ইয়াসির আরাফাত সব সময় নিজেকে ফিলিস্তিনের জাতির পিতা এবং সকল ইসলামিস্টসহ ফিলিস্তিনি জনগণের মূল নেতা মনে করতেন। তবে ইসলামপন্থিরা তাকে কখনোই নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি; পারার কথাও না। ইখওয়ানের সাথে বিভিন্ন সময় করা বৈঠকে যদিও তিনি নিজেকে ইখওয়ানের সাবেক সদস্য হিসেবে দাবি করতেন, তারপরও ইসলামপন্থিরা তার ব্যাপারে কখনোই সহজ হতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর প্রচণ্ড বিবাদ দেখা দেয়। বিশেষ করে বোর্ড কমিটি ও ট্রাস্টি সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রথমত যে বিষয়টি নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়– বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি কে হবে। ইখওয়ান চেয়েছে তাদের কোনো সদস্য এই দায়িত্বে আসুক। অন্যদিকে ইয়াসির আরাফাত তার সমর্থক ছাড়া অন্য কাউকে মেনে নিতেই চাচ্ছিলেন না। একটা সময় এই মতবিরোধ সংঘর্ষে রূপ নেয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে। ইখওয়ান প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ এমনকী সংঘাতের পথ মাড়িয়ে হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। যাহোক, গাজায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ফিলিস্তিনের ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামি আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। ইসলামিক আন্দোলনও এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে গাজা উপত্যকায় ইখওয়ানের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত সুযোগ নিয়ে ইখওয়ান ইসলামি আন্দোলনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাধ্যমে পালন করার সুযোগ পায়।

---

২৮. ইখওয়ানের যেসব সদস্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটিতে ছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলেন মুসা আবু মারজুক; যিনি সে সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইখওয়ানের দায়িত্বে ছিলেন। জর্ডান ইখওয়ানের দুজন সদস্যও এই কমিটিতে ছিলেন, তারা হলেন কান্দিল শাকির এবং ইশাক আল ফারহান।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে অসংখ্য তরুণ-তরুণী ছুটে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও যথেষ্ট ভালো ছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ে যেমন জ্ঞান লাভ করত এবং একই সঙ্গে ইসলামিক চেতনা সম্বন্ধেও ধারণা পেত। এভাবে উন্মুক্ত পরিবেশে ইসলামকে জানার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের জনগণকে দখলদার ইজরাইলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করে।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ফিলিস্তিনের জনগণ যারা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে জর্ডান, সৌদি আরব, কুয়েতসহ বিভিন্ন দেশে বসবাস করছিল, তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐকতান ছিল। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল– পশ্চিম তীর থেকে যদি ইখওয়ানের কোনো সদস্য পাওয়া যেত, তাহলে তাকে জর্ডানভিত্তিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হতো। আর যারা গাজা থেকে উঠে আসত, তাদের সংগঠনের ফিলিস্তিন শাখায় কাজ করতে হতো। ১৯৭৮ সালে উভয় এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের একক একটি প্লাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নতুন একটি সংগঠন আবির্ভূত হয়, যার নাম– তানজিম বিলাদুশ-শাম (দ্য অর্গানাইজেশন অব দ্য ল্যান্ড অব গ্রেটার সিরিয়া)। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন আম্মানভিত্তিক ইখওয়ান নেতা আব্দুর রহমান খলিফাহ। নাম শুনেই বোঝা যায় সংগঠনটির কার্যক্রমটি বৃহৎ সিরিয়া অঞ্চল, লেবানন, জর্ডান এবং ফিলিস্তিন জুড়েই বিদ্যমান। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ফিলিস্তিনের ভেতরে এবং আশেপাশে যে ঘটনাগুলো ক্রমাগত ঘটে যাচ্ছিল, তা নিরূপণে এই ধরনের একটি একীভূত প্রচেষ্টার দরকার ছিল।

১৯৭৯ সালে ইখওয়ানের সমর্থন আরও বেড়ে যায়। কেননা, এই সময়ে নতুন নতুন অনেক সদস্য ইখওয়ানে যোগ দেয়। ইখওয়ানের এই সমর্থন এবং গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল– একই সময় মিশরে তাদের মূল সংগঠনটি এক ধরনের জাগরণের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭০-এর শুরুর দিকে মিশরে ইখওয়ানের কারাবন্দি নেতারা ধীরে ধীরে মুক্তি পায়। তারা মুক্তি পেয়েই শুধু নিজ দেশ নয়; বরং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন।

দীর্ঘদিন জালিম শাসকের দমন-পীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করে কারামুক্ত মানুষগুলো যেখানেই যাচ্ছিলেন, সেখানেই বীরোচিত সম্মান ও মূল্যায়ন পাচ্ছিলেন। অনেক যুবক ও তরুণই এই কারামুক্ত ইখওয়ান নেতা-কর্মীদের মধ্যে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের ছায়া দেখছিল। অন্যদিকে মিশর, কুয়েত আরও অন্য ৫৬ দেশে যেসব ফিলিস্তিনি ছাত্ররা অধ্যয়ন করার জন্য গিয়েছিল, তারাও সেখানে ইখওয়ানের শীর্ষ নেতা বিশেষ করে হাসান আল বান্না, আব্দুল কাদির আওদাহ এবং সাইয়্যেদ কুতুবের

বইগুলো পড়ার সুযোগ পাচ্ছিল। ইখওয়ানের শীর্ষ নেতাদের সরাসরি তাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ পেয়ে ফিলিস্তিনিরা খুবই উদ্‌বেলিত ছিল। এ কারণেই ১৯৭৯ সালটি ছিল ইখওয়ানের শক্তিশালী হওয়ার বছর।

অন্যদিকে, ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অসংখ্য ঘটনা ঘটে যায়। ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনি সে বছরই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের দালাল শাসক শাহকে উচ্ছেদ করেন। খোমেনি রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র চালু করেন। তিনি নতুনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইজরাইলের বিরুদ্ধে যেভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা অনেক ফিলিস্তিনিকেই আশান্বিত করেছিল। সে বছরই আফগানিস্তানকে মুক্ত করার জিহাদ শুরু হয়। ইরানের লড়াই আর আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সফলতার গল্প– এই দুটো জিনিসের প্রভাব প্রচণ্ড আবেগে রূপান্তরিত হয়ে গাজা ও পশ্চিম তীরের রাস্তাঘাটে প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন সে সময় কিছুটা সংশয়ের মধ্যে ছিল। গোটা '৭০-এর দশক জুড়েই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কৌশলের ফাঁদে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে পিএলও ছিল বেশ কোণঠাসা। পিএলও এই অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য কখনো কখনো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ফায়দা নিত, কখনো-বা অপ্রত্যাশিত কিছু সমঝোতা করত। ফলে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন ক্রমশ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছিল।

১৯৮২ সালে ইজরাইল লেবাননে সামরিক অভিযান চালায়। এর আগে সাত বছর ধরে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ চলে আসছিল। ইজরাইলি সেনারা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে পৌঁছায়। ফলে পিএলও-কে লেবানন থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে হয়। বৈরুত যখন ইজরাইলি সেনাদের দখলে ছিল, তখন তার কমান্ডে ছিলেন তৎকালীন ইজরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন। সেই সময়ে ইজরাইলের প্রত্যক্ষ মদদে লেবাননে ইজরাইলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী 'দ্য ক্রিশ্চিয়ান লেবানিজ ফোর্স' সাবরা এবং শাতিলা নামক এলাকায় দুই থেকে তিন হাজার ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[২৯] এই ঘটনায় গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ, ক্রোধ ও হতাশা দেখা দেয়।

---

[২৯]. সাবরা এবং শাতিলা এলাকায় ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে ১৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৪০ ঘণ্টা ধরে এই গণহত্যা চালানো হয়। এই এলাকায় লেবাননের মধ্য আয়ের কর্মজীবীরা বসবাস করতেন। লেবানন সরকার আজ অবধি এই গণহত্যার হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানাতে পারেনি। তবে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের হিসাবে– সেই ৪০ ঘণ্টায় আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। শাবরা ও শাতিলা গণহত্যা সম্পর্কে উইকিপিডিয়া ও *আল জাজিরা* সংবাদ থেকে তথ্য পেতে পারেন। রেফারেন্স নং ১২ ও ১৩।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে, যাতে তারা নিজেদের লক্ষ্য পূরণে কার্যকর কর্মসূচি হাতে নেয়। ইখওয়ান সেই পর্যন্ত যত সামাজিক কাজ করেছিল, তার সকল সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, তারা ফিলিস্তিনের প্রয়োজনে কোনো পদক্ষেপ দেখাতে পারছিল না। এর আগে ইখওয়ান বামপন্থি ও জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনা করে বেশ ভালো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, কিন্তু এবার তাদের পালটা প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হলো। অনেকেই বললেন– এই সব জাতীয়তাবাদী বা বামপন্থিদের যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন, তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেখানে ইখওয়ান বসে বসে নিরাপদে সামাজিক কাজ করেছে, শিক্ষায় অবদান রেখেছে– এটা কি আদৌ মানা যায়?

কেউ কেউ বলতে শুরু করল– ইখওয়ান আসলে দখলদার ইজরাইলিদের দালাল। তারা ইজরাইলিদের সাথে সমঝোতা করেছে বলেই প্রতিরোধ আন্দোলন করছে না। বিনিময়ে ইজরাইলও তাদের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। আর এ ধরনের প্রচারণার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা ইখওয়ানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। তারা দাবি করে– আমেরিকা-যুক্তরাজ্য গং ইখওয়ানকে নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করেছে! ইখওয়ান হলো ইহুদিদের দালাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইসলামিক জিহাদ মুভমেন্ট

ইখওয়ানের দুঃসময় এবং দুর্দশা আরও দীর্ঘায়িত হয়, যখন ৮০'র দশকের শুরুর দিকে গাজায় ইসলামিক জিহাদ মুভমেন্ট ইন ফিলিস্তিন' নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংগঠনটি শুরু করেন ফাতিহ আশ-শিকাকি, যিনি ১৯৭৯ সালে কায়রোতে শিক্ষারত অবস্থায় ইখওয়ান থেকে বহিষ্কার হন। শিকাকির অপরাধ ছিল– তিনি ইখওয়ানের দায়িত্বশীলদের অনুরোধ ও আদেশকে উপেক্ষা করে একটি প্যামপ্লেট (প্রচারণাপত্র) তৈরি করেন, যার নাম ছিল– খোমেনি : ইসলামিক সমাধান এবং এর সম্ভাব্য বিকল্প। খোমেনিকে সমর্থন করে বই লেখাই হয়তো শিকাকির বহিষ্কারের মূল কারণ ছিল না; বরং এই ঘটনায় ইখওয়ানের ব্যর্থতাই প্রকাশিত হয়। কেননা, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মোকাবিলায় তারা কার্যকর কোনো সমাধান দিতে পারছিল না। সে সময়ে বাস্তবতা ছিল– অন্য সব ইস্যুকে ছাপিয়ে ফিলিস্তিনের ইস্যুকে ইখওয়ান যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারেনি। আশ শিকাকি ইখওয়ানের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি বরং বিশ্বাস করতেন– ফিলিস্তিন হলো সকল সংকটের মূল কারণ। আর সেই কারণে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করেই ইসলামি আন্দোলনগুলোর অগ্রসর হওয়া উচিত। শিকাকির চিন্তাই ঠিক ছিল। কেননা, এক দশক পর ইখওয়ানও তার চিন্তা ধরেই হাঁটতে শুরু করে।

যাহোক, শিকাকি ইসলামিক জিহাদ নামে যে নতুন সংগঠনটি গড়ে তোলেন, তাতে ইখওয়ান এবং ইখওয়ানের বাইরেরও অনেকেই শামিল হয়। ইখওয়ানের বাইরে থেকে আসে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ সালাহ। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৫ সালে শিকাকি আততায়ীদের হাতে নিহত হলে এই সালাহই ইসলামিক জিহাদের দায়িত্ব নেন। প্রথম দিকে শিকাকির এই সংগঠনটি 'দ্য ইসলামিক ভ্যান গার্ডস' নামে পরিচিত ছিল। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এসে ইসলামিক জিহাদ নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

১৯৮১ সালে গাজায় প্রত্যাবর্তন করার পর শিকাকি তার সংগঠনে ব্যাপকভাবে লোক অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেন, যা নিয়ে ইখওয়ানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব হয়। অবশ্য তত দিনে মসজিদ ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে ইখওয়ানের ভালো একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশই নতুন প্রজন্মের তরুণ কর্মীরা পরিচালনা করত। শিকাকি ভালো করেই জানতেন, ইখওয়ানের প্রকল্পগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। সেই কারণে তিনি শিক্ষা ও সমাজসেবার মতো খাতে ইখওয়ানের সাথে কোনো প্রতিযোগিতায় যেতে চাননি। সুতরাং তিনি সেই দিকেই মনোনিবেশ করলেন, যা তার চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার সংগ্রাম। অল্প সময়ে তিনি বেশ কিছু অনুসারীও পেয়ে গেলেন। ফলে ইজরাইল তাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করল। তিনি প্রথমবার কারাবন্দি হন ১৯৮৩ সালে। সেবার যদিও তিনি খুব বেশি দিন আটক ছিলেন না, তারপরও কারাগারের ভেতরে নানা মতাদর্শের ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হয়, যারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে কারাবন্দি হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকের সংঘাত-সংঘর্ষের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এবং কারও কারও প্রশিক্ষণও ছিল। তাই এই ধরনের ব্যক্তিদের দলে ভেড়ানোর ব্যাপারে শিকাকি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কেননা, এই ধরনের লোকদের আগমন তার দলকে আরও মজবুত করবে।

এর মধ্যে আবার ফাতাহ আন্দোলনের ইসলামঘেঁষা একটি গ্রুপ 'সারায়া আল জিহাদিল ইসলামি' নাম দিয়ে ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। পশ্চিম তীরের বিভিন্ন গোপন জায়গায় তাদের কার্যক্রম চলে। পিএলও নেতারা তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। পিএলও ধারণা ছিল, এই সংগঠনটি এ ধরনের কৌশল নিয়ে খুব একটা সফল হতে পারবেন না। সারায়া আল জিহাদ প্রথমবারের মতো নিন্দিত হয়, যখন তাদের সশস্ত্র যোদ্ধারা একটি ইহুদি স্থাপনার ছাদ থেকে গোলাগুলি শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে হেবরন শহরে প্রবেশ করার সময় ছয়জনকে হত্যা এবং আরও ১৭ জনকে আহত করে।[৩০] শিকাকি একটা পর্যায়ে

[৩০]. একজন ফিলিস্তিনি যুবক ইজরাইলি এক সেনার কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে- এই অভিযোগে তাকে হত্যা করা হলে তার প্রতিক্রিয়ায় হেবরন সিটি সেন্টারের ইহুদি বসতির ওপর এই হামলা চালানো হয়। তথ্যসূত্র : দ্য ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর। রেফারেন্স নং ১৪।

সারায়া আল জিহাদের সঙ্গে এক ধরনের জোট গঠন করেন। কেননা, এই দলের নেতাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনের ভেতরে ও বাইরে অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ আজ্জাম।[৩১] তিনি ইখওয়ানের একজন সদস্য, যিনি আফগান জিহাদের সময় আরব শাখার সদস্যদের নেতৃত্ব দিতেন।

যাহোক, সারায়া আল জিহাদ ইজরাইলিদের ওপর যেভাবে হামলা চালাত, তা দেখে আরব ও ইজরাইলসহ সবাই বেশ অবাক হয়ে যায়। আল জিহাদ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর, ইজরাইলের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই ঘটনায় একজন ইজরাইলি নিহত এবং প্রায় ৭০ জন আহত হয়।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে গাজা এবং পশ্চিম তীরে ইখওয়ানের যেসব তরুণ ছিল, তারা সারায়া আল জিহাদের অপারেশনগুলোতে ভীষণ রকম আন্দোলিত হয়। তারা উপলব্ধি করে– কেন আমরা অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছি না? ইতোমধ্যে ইখওয়ানের শেখ ইয়াসিন প্রতিরোধ কর্মসূচি নিয়ে ভাবছিলেন এবং বেশ কিছু পরিকল্পনাও তৈরি করছিলেন। অবশ্য, সে বিষয়ে অন্য কারও ধারণা ছিল না। ইখওয়ানের অনেক নেতাই প্রতিরোধ আন্দোলনে ইখওয়ানের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান চাপটি সহ্য করতে পারছিলেন না। তারাও মানসিক পীড়নে ভুগছিলেন। কেননা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু করতে না পারার ব্যর্থতা ও মনস্তাপ তাদের ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছিল।

খুব সম্ভবত এই প্রতিরোধ সংগ্রাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনাগুলো দলের অনেকের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কেননা, যত বেশি মানুষ বিষয়টা জানবে, ঝুঁকিও তত বেড়ে যাবে। বাহ্যিকভাবে ইখওয়ানের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইখওয়ান হয়তো বাইরের কোনো শক্তির অপেক্ষায় বসে আছে, যারা এসে অবৈধ দখলদারিত্ব থেকে মুক্তি দেবে। এত চাপ আর সমালোচনার পরও ইখওয়ানের মূল কাজ আগের মতোই চলল। ইখওয়ান মনে করত– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ইস্যুটি অনেক বড়ো পরিসরের কাজ, যা ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। আর সেই কাঙ্ক্ষিত কাজটিই তারা করে যাচ্ছে।

এ দিকে যেসব ফিলিস্তিনি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তারাও সামরিক কর্মকৌশল প্রণয়নের জন্য ইখওয়ানকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে বিদেশে থাকা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেও স্থানীয় ইখওয়ান যোগাযোগ করে।

---

৩১. আব্দুল্লাহ আজ্জামকে ১৯৮৯ সালের ২৪ নভেম্বর পেশোয়ারেই হত্যা করা হয়। তবে তার হত্যার রহস্য আজ অবধি উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।

তাদের নিয়ে ১৯৮৩ সালে আম্মানে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ফিলিস্তিন ইখওয়ানের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। জর্ডান, কুয়েত, সৌদি আরব এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকেও প্রতিনিধিরা এখানে অংশ নেয়। এর আগে কুয়েতের প্রতিনিধিরা ফিলিস্তিনের জন্য একটি ইসলামিক গ্লোবাল প্রোজেক্ট চালু করার সুপারিশ করে, যা এই সম্মেলনে উত্থাপিত হয়। এখান থেকেই ফিলিস্তিনের ইখওয়ানকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আর্থিক ও লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। একই সময়ে প্যালেস্টাইন কমিটি[৩২] নামে ভিন্ন একটা গ্রুপ কুয়েতের কাছ থেকে ইখওয়ানের জন্য ৭০ হাজার ডলার অনুদান পায়। এই টাকা ইখওয়ানকে দেওয়া হয়, যাতে তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনতে পারে এবং একই সঙ্গে কিছু ব্যক্তিকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আম্মানে পাঠানো হয়।

সে সময় কেবল শেখ ইয়াসিন এবং তার কিছু ঘনিষ্ঠজন এই গোপন প্রকল্পটি সম্বন্ধে জানতেন। ১৯৮২ সালে প্রকল্পটির পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়, তবে ইখওয়ানের গাজা শাখার অন্য নির্বাহী সদস্যরা এবং ফিলিস্তিনের বাইরেও অন্য কেউ এটি জানতেন না। যারা গাজার ইখওয়ান কর্মীদের আম্মানে প্রশিক্ষণে পাঠানোর জন্য টাকা প্রেরণ করতেন, তারা কিছুটা জানতেন। গাজার কিছু ইখওয়ানকর্মী জর্ডানে প্রশিক্ষণ শেষে গাজায় ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিল ইখওয়ানের প্রথম সামরিক শাখার সদস্য।

শেখ ইয়াসিন অস্ত্র ক্রয় করার জন্য দুটো পন্থা অবলম্বন করেন। প্রথমটি, ইজরাইলের এমন কিছু অস্ত্র কেনা, যা পুরোপুরি বিক্রির জন্য প্রস্তুত! দ্বিতীয়টি, এমন কিছু অস্ত্র, যা ইজরাইলি সেনাবাহিনীর অধীনেই তৈরি হয়েছে। যেসব ইজরাইলি কর্মকর্তা ও সেনারা মাদক সেবনে অভ্যস্ত ছিল, তারা মাদক কেনার জন্য এই অস্ত্রগুলো গোপনে বিক্রি করত। যাদের ওপর অস্ত্র ক্রয়ের দায়িত্ব ছিল, তারা এ বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ ছিল না; বরং তারা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। এই অতিরিক্ত সতর্কতা ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে একসময় দালাল চক্রের কাছে ধরা পড়ে এবং অস্ত্র কেনার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। যারা ধরা পড়ে, তাদের ওপর ইজরাইল প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। কে এই অস্ত্রগুলো কিনছে বা কারা এর মূল পৃষ্ঠপোষক, তা বের করার জন্য তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকে শেখ ইয়াসিন ভেবেছিলেন– অস্ত্র কিনতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা, কিন্তু তার ভুল ভাঙতে সময় লাগে না। তিনি জানতে পারলেন, আটককৃতরা তীব্র অত্যাচারের মুখে দায়িত্বশীলদের নাম ফাঁস করে দিচ্ছে।

---

৩২. এই প্যালেস্টাইন কমিটি ইখওয়ানের নির্বাহী শাখার সেক্রেটারিয়েটের অধীনে ছোট্ট পরিসরে কাজ শুরু করলেও কালক্রমে এরাই হামাস প্রতিষ্ঠা করে এবং হামাসের মূল নিয়ন্ত্রক বডি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

শেখ ইয়াসিন চিন্তা করলেন– যদি এভাবে শীর্ষ দায়িত্বশীলদের নাম ফাঁস হতে থাকে, তাহলে একসময় তার নামটাও জেনে যাবে। মাত্র দুজন লোক অস্ত্র কেনার কার্যক্রমের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা জানত। তিনি তাদের অনতিবিলম্বে দেশ ছাড়ার আদেশ দেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ড. আহমাদ আল মিলহ, যিনি পালিয়ে ইয়েমেনে চলে যান এবং আজ অবধি সেখানেই আছেন। আর অন্যজন হলেন ড. ইবরাহিম আল মাকাদমাহ, যিনি অনেক চেষ্টা করেও পালাতে না পেরে আটক হন। তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়। একটা পর্যায়ে তিনি শেখ ইয়াসিনের নাম বলে দেন। এর পরপরই শেখ ইয়াসিনকে আটক করা হয়।

সেই সময় গুজব রটে যায়, ইখওয়ান তার ফিলিস্তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করার জন্য অস্ত্র কেনা শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই গাজায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে ফাতাহ এবং বামপন্থিদের সঙ্গে যে মতবিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, এই গুজব সেই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৮৪ সালের ১৫ এপ্রিল ইজরাইলের এক সামরিক আদালত, ইজরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শেখ ইয়াসিনকে ১৩ বছর কারাদণ্ড প্রদান করে। ইবরাহিম আল মাকাদমাহকেও আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এই ঘটনার আরেকজন অভিযুক্ত ছিলেন সালাহ শিহাদাহ, কিন্তু আদালত তাকে শাস্তি দেয়নি। কেননা, তিনি তার অপরাধ ও সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেননি। এরপরও ইজরাইল তাকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং এই ঘটনার পর প্রায় দুই বছর তাকে গৃহবন্দি রাখা হয়। ইখওয়ান যত অস্ত্র কিনেছিল, তার অর্ধেকই ইজরাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাকি অস্ত্রগুলো দ্বিতীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল বলে তারা উদ্ধার করতে পারেনি। ১৯৮৭ সালে যখন ইন্তিফাদা অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই অস্ত্রগুলো দিয়েই ইজরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যাহোক, কারাদণ্ড পাওয়ার এক বছর পার না হতেই ১৯৮৫ সালের ২০ মে, ইজরাইল ও পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্যা লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন–এর জেনারেল কমান্ড নেতা আহমাদ জিবরিলের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি বন্দি-বিনিময় চুক্তির আওতায় শেখ ইয়াসিন মুক্তিলাভ করেন। পিইএলপি ইতঃপূর্বে যে ৩ জন ইজরাইলি সেনাকে আটক করেছিল, তাদের বিনিময়ে শেখ ইয়াসিনসহ মোট ১ হাজার ১৫০ জন ফিলিস্তিনি কারামুক্ত হন।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের ভেতরে সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে তখনও বিতর্ক চলছিল। ইখওয়ানের অনেক নেতা মনে করত, শেখ ইয়াসিনের এই অস্ত্র কেনার ঘটনায় জন্য তাদের সামাজিক কার্যক্রমের ভাবমূর্তি অনেকটাই বরবাদ হয়ে গেছে। তারা বলেন– স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ করে ইজরাইলকে কখনোই পরাজিত করা সম্ভব নয়।

কেননা, তারা আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো থেকে অবিশ্বাস্য রকমের সহযোগিতা পায়। প্রকারান্তরে ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলো এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তাই বাস্তবিক অর্থে স্বাধীনতাকামীদের জন্য কোনো দিক থেকেই ভালো ইঙ্গিত ছিল না। এই বাস্তবতাটিকে উপেক্ষা করে যদি ইজরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়, তাহলে তা ইসলামি আন্দোলনের সকল অর্জনকেই ধূলিসাৎ করে দেবে।

১৯৮২ সালের পর থেকে ফিলিস্তিনের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, এমনকী পশ্চিম তীরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও প্রচুর ছাত্র বের হওয়া শুরু করে। ফলে ইখওয়ানে যুবক জনশক্তির অন্তর্ভুক্তি বেড়ে যায়, কিন্তু একই সময়ে ইখওয়ানে দুটি পৃথক ধারার অবস্থান দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একটি ধারা হলো সেই প্রজন্ম, যারা ১৯৭০-এর দিকে জর্ডানে পড়াশোনা করেছে। তারাই ১৯৮০ সালের দিকে ইখওয়ানের নেতৃত্বে চলে আসে; যদিও তাদের মাথায় জর্ডানের শিক্ষাব্যবস্থার চিন্তাধারাই বিদ্যমান ছিল। তাদের এই চিন্তাধারা মূলত অনেকটা মসিহর জন্য অপেক্ষার মতো ছিল। অর্থাৎ কখনো ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে সেই পথ ধরে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা হবে– এ টাইপের ভাবসাব।

জর্ডানের এই চিন্তাদর্শন যারা ধারণ করত, তারা মূলত ইখওয়ানের প্রবীণতম সদস্য। বয়সের ব্যবধান এবং সমসাময়িক ঘটনাবলির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না পারায় তারা অপেক্ষা করার কৌশল হাতে নিয়েছিলেন। নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে, এ বিষয়টি বোঝার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না। আর যুবকদের চাহিদাকে ধারণ করতে না পারায় তাদের অন্তর্ভুক্তিও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ক্যাম্পাসগুলোতে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েক দফা সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত, জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থিরা এক হয়ে ইসলামপন্থিদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করতে করতে কোণঠাসা করত।

ইখওয়ানের ভেতরে দ্বিতীয় যে ধারাটি লক্ষ করা যায়– তরুণদের একটি প্রজন্ম, যারা স্থানীয় পর্যায়ে লেখাপড়া সম্পন্ন করেছে। ইরানের বিপ্লব এবং আফগানিস্তানের জিহাদের ঘটনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা ক্যাম্পাসে প্রায়শই নানা ধরনের তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতো। তরুণ এই ইখওয়ান সদস্যরা দলের 'ধীরে চলো' নীতিতে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে তত্ত্ব আর বাস্তবিক কৌশলের মধ্যে অমিল দেখে অনেকটাই হতাশ ছিল। তারা জানত– হাসান আল বান্না ইখওয়ান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অন্যায়, অবিচার, সাম্রাজ্যবাদ মোকাবিলা এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য, কিন্তু তারা চোখের সামনে সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

অন্যদিকে, শিকাকির ইসলামিক জিহাদ বেশ কিছু জিহাদি পদক্ষেপ নেওয়ায় জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল এবং একই সঙ্গে ক্যাম্পাসেও তাদের অবস্থান মজবুত হচ্ছিল। ফলে ইখওয়ান তার অবস্থান ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল। যখন বামপন্থি বা জাতীয়তাবাদীরা সমালোচনা করত, এর পালটা জবাব দেওয়ার মতো কোনো উত্তরও তাদের ছিল না। বামপন্থি ও জাতীয়তাবাদীরা যেখানে অসহায় মানুষদের মুক্তির জন্য প্রতিরোধ চালাচ্ছে, তখন ইখওয়ান বাড়িতে বসে একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছে। ইখওয়ান তাদের এই গৃহস্থালি কৌশলকে 'হারিম' বলে অভিহিত করত। হারিম অর্থ– ব্যক্তিগত বা গোপন কুঠুরি, যেখানে বাইরের পুরুষরা প্রবেশ করতে পারে না।

অন্যদিকে, যদিও শেখ ইয়াসিনের সামরিক ও অস্ত্র কেনার কার্যক্রমটি সফল হতে পারেনি, তারপরও তার এই প্রচেষ্টা অসংখ্য তরুণকে আশান্বিত করে। তারা দলের নীতিগত কৌশলে পরিবর্তনের আভাস পায়। পশ্চিম তীর থেকে আসা ইখওয়ানের কিছু সম্ভাবনাময় নেতা পরিবর্তনের ব্যাপারে একমত ছিলেন। তারা এই ব্যাপারে দলকে নিরন্তর চাপও দিতে থাকেন। পশ্চিম তীরের এই ইখওয়ান সদস্যরা অবশ্য গাজা থেকে আসা ছাত্রদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। এদেরই একজন ইসমাইল আবু শানাব, যিনি ছিলেন আন নাজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গাজার ইখওয়ানও ইজরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। কেননা, তারা ইজরাইলি দখলদারদের দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি জর্ডান থেকে আসা নেতাদের সেকেলে চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারেও তারা বিরক্ত ছিল। ধীরে ধীরে ইখওয়ানের শীর্ষ নেতৃত্ব ইজরাইলের সাথে সংঘর্ষে যাওয়ার অনুমতি দিতে শুরু করে।

এরই অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের জুন মাসে বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামপন্থি গ্রুপগুলো ক্যাম্পাসে মাইকে ঘোষণা দেয়, তারা ইজরাইলের নৃশংসতার প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করতে যাচ্ছে। তারা সাধারণ ছাত্রদেরও এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়, তবে ইজরাইলি সেনারা এই প্রতিবাদ সমাবেশে বাধা দেয়। ইজরাইলি দমন-পীড়নে দুজন শহিদ এবং ২০ জন আহত হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ইসলামি আন্দোলন প্রথমবারের মতো শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী হয়। এই শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামি আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এটা ছিল একটি স্রোতের সূচনা। এরপর থেকে ইখওয়ানের সদস্যরা এই ধরনের কার্যক্রমে শুধু অনুমতিই পেত না; বরং তাদের ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কমূসচিতে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণাও দেওয়া হতো। যে ছাত্ররা এই ধরনের সাংগঠনিক নীতি পরিবর্তনের পেছনে নেয়ামক হিসেবে কাজ করলেন, তারাই পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পেলেন। এই সিলসিলাটি শুরু হয় ১৯৮০-এর পর থেকেই।

১৯৮৩ সালে আম্মান সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাগুলো অনুমোদন করা হয়, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুয়েত, জর্ডান ও সৌদি আরবে কর্মরত ফিলিস্তিনি ইখওয়ানের শাখাগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। একই সময়ে ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থি যে ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে পড়াশোনার জন্য যায়, তারাও তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ফিলিস্তিনি ছাত্রদের যত্ন নেওয়া এবং ফিলিস্তিনের জন্য সম্পদ জোগাড়। তারা মূলত ফিলিস্তিনের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে একটি নিরাপদ, কার্যকর এবং প্রভাববিস্তারকারী যোগাযোগ চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত জার্নালে ফিলিস্তিনের বিষয়ে লেখালেখি এবং বই প্রকাশ করে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফিলিস্তিনের ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপারে ইতিবাচক জনমত তৈরি হয়।

১৯৮৫ সালে ফিলিস্তিন কমিটি নতুন একটি স্পেশালাইজড কাঠামো গঠন করে, যার নাম– 'দ্য ফিলিস্তিন অ্যাপারেটাস'। এই কাঠামোর কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে কর্মরত ফিলিস্তিনি ইখওয়ানের কর্মকাণ্ডগুলোর সমন্বয় এবং নতুন কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে কি না তা নির্ধারণ করা। এই জিহাজই হলো বিশ্বজনীন নেটওয়ার্কের মূল নিউক্লিয়াস, যা পরবর্তী সময়ে হামাসের লজিস্টিক সাপোর্ট জোগানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। জিহাজের তিন শীর্ষ নেতাই পরবর্তী সময়ে ১৯৯০ সালের দিকে এসে হামাসের সিনিয়র নেতায় পরিণত হন। এদের একজন হলেন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সাবেক প্রধান খালিদ মিশাল, যিনি দীর্ঘদিন ধরে কুয়েতে অবস্থান করছিলেন। আরেকজন হলেন মুসা আবু মারজুক, যিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং সেখান থেকে ফিরে গাজা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। আর তৃতীয়জন ইবরাহিম ঘোশেহ, যিনি হামাসের প্রথম রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্যদিকে, শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও তার সঙ্গীরাও নিয়মিত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে এসে শেখ ইয়াসিনের ভিন্ন একটি কৌশলও চোখে পড়ে। একদিকে তিনি বলছিলেন– তাদের এখনও সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় হয়নি, তাই আরও কিছুদিন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। আর ভেতরে ভেতরে তিনি কারাগারে যাওয়ার আগে যে সামরিক কাঠামোর ভিত্তি গড়ে গিয়েছিলেন, তা আবারও সুসংগঠিত করা শুরু করেন। ১৯৮৭ সালের ১৭ নভেম্বর নতুন সংগঠনের কার্যক্রম শুরুর একটি তারিখ নির্ধারণ করেন। এই নয়া সংগঠনের দায়িত্ব দেন সালাহ শিহাদাহকে। সংগঠনটির নাম দেওয়া হয়– দ্য প্যালেস্টাইন মুজাহিদিন। এই সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ইজরাইলি সৈন্য এবং ফিলিস্তিনে তৈরি হওয়া অবৈধ ইহুদি বসতিগুলোর ওপর হামলা চালানো। একই সঙ্গে তিনি মাজেদ নামে আরেকটি

নিরাপত্তা সংগঠন তৈরির জন্য আল সিনওয়ার ও রাওহি মুসতাহাকে[৩৩] দায়িত্ব দেন। এই সংগঠনটির কাজ ছিল ইজরাইলের পক্ষে যারা কাজ করছে, তাদের পাকড়াও করা, বিচার এবং শাস্তি প্রদান করা। সংগঠন দুটো প্রথম ইন্তিফাদার আগ পর্যন্ত তেমন কোনো কাজ করতে পারেনি।

ইন্তিফাদার আগে ইসলামিক জিহাদই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের স্বপ্নকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে নানা ধরনের ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে বাইরের পর্যবেক্ষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন : ১৯৮৭ সালের ১৫ মে ইসলামিক জিহাদের ছয়জন সদস্য গাজার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৯৮৭ সালের ২ আগস্ট ইসলামিক জিহাদের একজন সদস্য গাজার মিলিটারি পুলিশের কমান্ডার ক্যাপ্টেনকে দিনে-দুপুরে গাজার প্রধান সড়কে তার নিজের গাড়িতেই হত্যা করে। ১৯৮৭ সালের ৬ অক্টোবর গাজা শহরের আল শুজাইয়াহ নামক এলাকায় ইসলামিক জিহাদের সদস্যরা ইজরাইলি সেনাদের একটি পেট্রোল অভিযানের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন ইজরাইলি সেনা এবং নয়জন-এর ইসলামিক জিহাদের সদস্য নিহত হয়।

অর্থাৎ একদিকে প্রতিরোধ কর্মসূচির নামে যেমন সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার ফলে গাজা ও পশ্চিম তীরের জনগণের মধ্যে হতাশাও বেড়ে যায়। উদ্‌বেগ আর অজানা আশঙ্কা যেন সবাইকেই গ্রাস করছিল। সকলেই বুঝতে পারছিল, আগামী দিনে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তবে তা ভালো কিছু হবে নাকি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করবে, তা নিয়ে বেশি পেরেশান ছিল। কেউ কেউ জীবনটাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বড়ো কোনো বিস্ফোরণ ঘটার ইঙ্গিত পাচ্ছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়।

---

৩৩. এই দুজন ব্যক্তি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা জীবনের প্রায় ২০টি বছর কারাগারেই পার করেছেন। রাওহি মুসতাহাকে প্রথমে সাত বছরের কারাবাস দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তা বিভিন্ন মামলায় বাড়িয়ে সর্বমোট ২০ বছরে বৃদ্ধি করা হয়। ইয়াহিয়া আল সিনাওয়ারও দীর্ঘ কারাভোগ করে বের হয়েছেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসমাইল হানিয়া হামাসের রাজনৈতিক শাখার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইয়াহিয়া এখন হামাসের গাজা শাখার প্রধান মনোনীত হয়েছেন। তিনি হামাসের অন্যতম ত্যাগ স্বীকারকারী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমানে তাকে সংগঠনের দ্বিতীয় প্রভাবশালী নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অধ্যায়-৩
ইন্তিফাদা : প্রেক্ষাপট ও পরিণতি

প্রথম ইন্তিফাদা

১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর। শুরু হয় প্রথম ইন্তিফাদা। ইন্তিফাদা একটি বিপ্লব। যখন বেসামরিক নাগরিক প্রশাসনকে অসহযোগিতা মাধ্যমে প্রচলিত আইনগুলো অমান্য এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্ন করে, তখন ইন্তিফাদা জন্ম হয়। ১৯৮৭ সালের ইন্তিফাদা ইতিহাসে নজিরবিহীন। হাজারো বেসামরিক মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাদ দিয়ে দিনের পর দিন বিক্ষোভ করছে, ইজরাইলি স্থাপনায় পাথর ছুড়েছে– এমনটা মূলত ভাবা যায় না।

ইন্তিফাদা– এর শাব্দিক অর্থ প্রকম্পিত করা, জেগে ওঠা।[৩৪] তবে পারিভাষিক অর্থে ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের দুইটি বড়ো ইসলামি আন্দোলনকে ইন্তিফাদা বলা হয়। '৮০-র দশকের শেষ এবং ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, যা ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চলে। এটা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের মতো; যেখানে গেরিলা পদ্ধতিতে দখলদার ইজরাইলি সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়।

৯ ডিসেম্বর জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে একটি বেসামরিক গাড়িতে ইজরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর আঘাতে চার ফিলিস্তিনির মৃত্যুর প্রথম ঘটনায় ইন্তিফাদা শুরু হয়।

---

[৩৪]. What is Intifada শীর্ষক ওয়েবসাইট। এই ব্যাপারে আরও জানতে পারবেন রেফারেন্স ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ সূত্র থেকে।

এই ইন্তিফাদায় নিরস্ত্র প্রতিরোধ এবং আইন অমান্য– এ দুই ধরনের কৌশল[৩৫] প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে ছিল সাধারণ ধর্মঘট, গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে ইজরাইলি সামরিক, বেসামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন, অর্থনৈতিক বয়কট– যার মধ্যে ছিল ইজরাইলি বসতিতে পাথর নিক্ষেপ, ইজরাইলি পণ্য প্রত্যাখ্যান, ট্যাক্স দিতে অস্বীকার, ইজরাইলি লাইসেন্সে ফিলিস্তিনে গাড়ি চালানোয় অস্বীকৃতি, দেয়াল লিখন, ব্যারিকেড সৃষ্টি[৩৬] এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলের মধ্যে ইহুদি বসতিতে ব্যাপক পাথর নিক্ষেপ।

ইন্তিফাদা চলাকালে ইজরাইল প্রায় ৮০০০০ সৈন্য মোতায়েন করে। প্রথম দিকে তারা সরাসরি গুলি ছুড়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে। প্রথম ১৩ মাসে ৩৩২ জন ফিলিস্তিনি এবং ১২ জন ইজরাইলি নিহত হয়। শিশু, যুবক ও বেসামরিক জনতাকে হত্যার পর তারা 'জবরদস্তি, শক্তি ও আঘাত'-এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের হাড় ভেঙে দেওয়ার নীতি অবলম্বন করে। এই নীতিটি মূলত ইজরাইলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের মাথা থেকে আসে। হাড় ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি ইন্তিফাদাকে দমন করার চেষ্টা চালান। ভাবতে অবাক লাগে, সন্ত্রাসী মানসিকতার এই ব্যক্তিটি পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। যাহোক, বিতর্কিত হাড় ভেঙে দেওয়ার কৌশল প্রসঙ্গে তার বিখ্যাত উক্তিটি হলো–

> 'এই সরকার সব ধরনের সংঘাত ও সন্ত্রাসকে কঠোর হস্তে দমন করবে। তারা ইজরাইলের কোনো নাগরিককে ক্ষতি করার সুযোগ হামাস বা ইসলামিক জিহাদকে দেবে না। আর খুনি সংগঠনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে আপনি যাই করুন না কেন– সেটাই আইনি, সেটাই বৈধ।'

কিশোরদের লাঠি দিয়ে প্রহার করায় ইজরাইলি সৈন্যদের ভাবমূর্তি বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক হিসেবে প্রচারিত হয়। এতে তারা সরাসরি প্রাণে না মেরে প্রাণঘাতী প্লাস্টিক বুলেট ছোড়ার নীতি গ্রহণ করে। ইন্তিফাদার প্রথম বছরে ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী ৩১১ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, যার মধ্যে ৫৩ জনের বয়স ১৭ বছরেরও কম। সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন-এর মতে– প্রথম দুই বছর ১৮ বছরের কম বয়সি আনুমানিক ৭% ফিলিস্তিনি গুলি, প্রহার বা কাঁদানে গ্যাসের আঘাতে আহত হয়।[৩৭] ১৯৮৭-১৯৯৩ এই ছয় বছরে আইডিএফ আনুমানিক ১২০৪ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। প্রথম দুই বছরে আইডিএফ-এর আঘাতে আহত ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুর চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

---

[৩৫]. Ruth Margolies Beitler (2004) রেফারেন্স তালিকা নং ২০।
[৩৬]. বিবিসি'র প্রতিবেদন। রেফারেন্স নং ২১।
[৩৭]. Arthur Neslen (2011) রেফারেন্স নং ২২।

ইন্তিফাদার কর্মকৌশল

অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক ঘরবাড়ি ধ্বংস ও নিপীড়নের বীভৎস পন্থা অবলম্বন করে। কারফিউ জারিসহ ইজরাইলিদের জন্য হুমকি হতে পারে এমন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ করে দেয়। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে ও অন্যত্র নির্বাসনে পাঠায়। তারা ভাবে– ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু এটা ছিল তাদের মারাত্মক ভুল চিন্তা।

ব্যবহৃত টায়ার থেকে নেওয়া রাবারের চাকতিতে একটি লোহার পেরেক ঢুকিয়ে ফিলিস্তিনিরা এক ধরনের টায়ার ছিদ্রকারী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম ইন্তিফাদার সময় এ ক্ষুদে অস্ত্রগুলো পশ্চিম তীরের প্রধান সড়কে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর। ইজরাইলে কাজ শেষে ফিরতি ফিলিস্তিনি যাত্রীদের বহনকারী একটি গাড়িকে একটি ইজরাইলি সেনা ট্যাংক চাপা দেয়। এতে চারজন নিহত হয়। শত শত ফিলিস্তিনি শ্রমিক এই ঘটনার সাক্ষী। নিহত শ্রমিকদের জানাজা দ্রুত একটি বড়ো বিক্ষোভে রূপ নেয়, যেখানে ক্যাম্পের ১০০০০ জনতা উপস্থিত ছিল। ক্যাম্পে গুজব ছড়িয়ে পড়ে– দুই দিন আগে গাজায় কেনাকাটা করার সময় ছুরিকাঘাতে এক ইজরাইলি ব্যবসায়ীর নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই তারা ইচ্ছাকৃত ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের হত্যা করেছে। এর পরের দিন গাজা উপত্যকায় একটি ইজরাইলি গাড়িতে ফিলিস্তিনিরা হামলা করলে ইজরাইলি বাহিনীর হামলায় এক যুবক নিহত ও ১৬ জন আহত হয়। জনতার বিক্ষোভ চলতেই থাকে।

বিক্ষোভ দ্রুতই পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ছড়িয়ে পড়ে। যুবকরা প্রতিবেশীদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারা ময়লা-আবর্জনা, পাথর ও টায়ার জালিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি এবং ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়। যেসব সৈন্য জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করছিল, তাদেরও প্রতিরোধ করে। ফিলিস্তিনি দোকানদাররা তাদের ব্যাবসা বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকরা ইজরাইলি প্রকল্পগুলোতে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এই সকল কার্যক্রমকে ইজরাইল 'দাঙ্গা' হিসেবে অভিহিত করার চেষ্টা করে। তারা মিডিয়ার কাছে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের স্বার্থে দমনকে প্রয়োজনীয় এবং ন্যায়সংগত হিসেবে ঘোষণা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে অভূতপূর্ব বিক্ষোভ মিছিল ও বাণিজ্যিক ধর্মঘটে আন্দোলিত হতে থাকে। এই বিক্ষোভে নারী– শিশুসহ হাজারো বেসামরিক জনগণ শামিল হয়। ইজরাইলি বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান, রবার বুলেট ও গোলাবারুদ নিয়ে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তারপরও বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব হয়নি; বরং প্রতি মুহূর্তে তা আরও বেগবান হয়।

ফিলিস্তিনিদের এই অভ্যুত্থানে ইজরাইলের প্রতিক্রিয়া ছিল কঠোর। ইন্তিফাদার শুরুর দিকে তারা অনেক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। যেহেতু প্রথম দিকের বেশিরভাগ নিহত ব্যক্তিই ছিল বেসামরিক ও যুবক, তাই আইজ্যাক রবিন নির্মম ও নিষ্ঠুর উপায়ে তাদের দমন করার চেষ্টা করে। তারা ফিলিস্তিনিদের গণগ্রেফতার এবং ত্বরিত শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়। যেমন : পশ্চিম তীরবর্তী স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১২ মাসের জন্য বন্ধ রাখা। শুধু প্রথম বছরেই ১৬০০ বারের বেশি রাউন্ড দ্য ক্লক কারফিউ জারি করা হয়। বন্ধ করা হয় ফিলিস্তিনিদের জন্য পানি, বিদ্যুৎ ও জালানি সরবরাহ। একটা পর্যায়ে ২৫০০০ ফিলিস্তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো উন্মুক্ত কারাগারের বাসিন্দা হয়। ফিলিস্তিনি খামারগুলো থেকে গাছপালা উপড়ে ফেলা এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। প্রথম বছর ১০০০-এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়। অধিবাসীরাও ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ট্যাক্স দিতে অস্বীকারকারী ফিলিস্তিনিদের সম্পদ ও লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। যেসব পরিবারের সদস্যরা পাথর নিক্ষেপকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, তাদের ওপর সাধ্যাতীত জরিমানা আরোপ করা হয়।

ইন্তিফাদার ফলাফল

ইন্তিফাদা কোনো সামরিক যুদ্ধ ছিল না; গেরিলা যুদ্ধও নয়। পরিস্থিতির ওপর যাদের সীমিত নিয়ন্ত্রণও ছিল, তারা কখনোই আশা করেনি এমন একটি তৃণমূল আন্দোলন ইজরাইলের বিরুদ্ধে এভাবে সফলতা অর্জন করবে। তবে পরবর্তী সময়ে এসে বিশ্লেষকরা ইন্তিফাদার ফলাফল নির্ণয় করেন, যার বেশিরভাগ ছিল ফিলিস্তিনিদের জন্য ইতিবাচক। যেমন–

- প্রতিবেশী কোনো আরব রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই ইজরাইলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৮]
- জেরুজালেম শহরটি সবার জন্যই উন্মুক্ত– এমন একটি ধারণা ইন্তিফাদার আগ পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান ছিল, কিন্তু ইন্তিফাদা সেই ভাবভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে; যার দায়ভার ইজরাইলের ওপরই বর্তায়।
- পিএলও'র জনপ্রিয়তা ও সমর্থন কুড়ানোর জন্য পশ্চিম তীরে জর্ডান বাড়তি প্রশাসনিক ও আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

---

৩৮. জাতিসংঘ প্রতিবেদন, যা ১৯৯১ সালের ৩১ জলাই প্রকাশিত হয়। তথ্যসূত্রটি বিস্তারিত রেফারেন্স অধ্যায়ে ২৩ নং তালিকায় দেওয়া আছে।

- আয়রন ফিস্ট বা শক্ত হাতে দমন-নীতির ব্যর্থতা– ইজরাইলের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করে। পশ্চিম তীরের সঙ্গে জর্ডানের ছিন্ন করা আইনি ও প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে পিএলও'র একক অবস্থানের প্রতি মার্কিন স্বীকৃতিকে এই ইন্তিফাদাই প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র ইজরাইলের আইজ্যাক রবিনকে চাপ দিয়ে পিএলও'র সঙ্গে আপস ও সংলাপের মাধ্যমে সহিংসতার অবসান ঘটাতে বাধ্য করেছিল।
- ইন্তিফাদার ফলে ফিলিস্তিনিরা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।
- ফিলিস্তিনিরা ইন্তিফাদার মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো দেখিয়েছিল, ইজরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে দুটি দিক রয়েছে।
- অনেক পশ্চিমা মিডিয়া প্রকাশ্যে ইজরাইলের সমালোচনা করেছিল, যা তারা আগে কখনোই করেনি।[৩৯]
- জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইজরাইলের সমালোচনা হয়েছিল।
- ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সদ্য সৃষ্ট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তির জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন করেছিল ইন্তিফাদা।
- ইন্তিফাদা আইডিএফ-এর গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলী কার্যক্রমের অনেক বর্বরতা প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় ইজরাইলের দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমস্যা উন্মোচিত হয়েছিল। ইজরাইলের এই কাজগুলো পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

ইন্তিফাদা : ইখওয়ানের বিবর্তনের প্রকৃত প্রেক্ষাপট

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– কোনো সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার আলোকে ইন্তিফাদা আসেনি। ইন্তিফাদা শুরু হয়েছিল একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যা সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভের ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ ঘটায়। একটি জনবিস্ফোরণ ঘটতে পারে– এমন ধারণা ফিলিস্তিনের ইখওয়ান অনেক দিন আগে থেকেই করছিল। আর সে কারণেই তারা ১৯৮৩ সাল থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। ইন্তিফাদা যেদিন ঘটল,

---

[৩৯]. ফরেন পলেসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট। রেফারেন্স নং ২৪।

সেদিনই ফিলিস্তিনের ভেতরে ও বাইরে ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত সবগুলো সংস্থা একই সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের যে লড়াই, সেখানে নিজেদের উপযোগিতা সৃষ্টির জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ইন্তিফাদাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ পুঁজি করে অগ্রসর হওয়া ছাড়া ইখওয়ানের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। কারণ, তারা যদি সক্রিয় না হতো, তাহলে হয়তো তাদের আন্দোলনটাই নিঃশেষ হয়ে যেত। অন্যদিকে বাস্তবতা হলো– ইন্তিফাদার চেতনাকে ধারণ করার মতো আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বৈশ্বিক সমর্থন কেবল ইখওয়ানেরই ছিল।

ইখওয়ানের জন্য ইন্তিফাদা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত। তারা দখলদারিত্ব থেকে নিজ ভূখণ্ডকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা জানত, এই ইন্তিফাদা হলো দীর্ঘমেয়াদি একটি লড়াইয়ের সূচনা মাত্র। ইখওয়ান তার নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং গাজার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং পুরোনোদের মধ্যেও গতির সঞ্চার করে। তারা ইজরাইলিদের সহযোগিতা না করার জন্য জনগণকে আহ্বান, মিছিল-সমাবেশের আয়োজন, ইজরাইলি পতাকাতে আগুন দেওয়া এবং টায়ার পুড়িয়ে বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে। ইন্তিফাদা ছিল দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন-নিপীড়ন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও অবহেলার দরুন জনগণের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। তবে এই সময়ে ইখওয়ান শুধু যে দখলদারিত্বের অবসান চেয়ে স্লোগান দিয়েছে তা নয়; বরং ইজরাইল রাষ্ট্রের বিলুপ্তির দাবিতেও স্লোগান দেয়। যারা এই মিছিল-সমাবেশে অংশ নিত, তাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু।

এই ফিলিস্তিনিরা তখনই উদ্বাস্তু হয়, যখন ইহুদিরা তাদের বাড়িঘর দখল করে নেয়। ইজরাইলিদের এই অন্যায় দখলদারিত্বকে ফিলিস্তিনিরা 'নাকাবা' বা মহাবিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করে। নাকাবাটি সংঘটিত হয় ১৯৪৮ সালে, যেদিন ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের নিজ এলাকা থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে ইজরাইল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭-৪৯ সাল, এই দুই বছরের মধ্যে ৭ লাখ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। ইজরাইল দাবি করত, আরবের রাজনীতিবিদ ও সামরিক শাসকদের নানা অপকর্মের কারণেই এই মানুষগুলো গৃহহীন হয়েছে। মুখে যাই বলুক না কেন, ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এই বিশালসংখ্যক উদ্বাস্তুর মধ্যে ৭৫ শতাংশই ইজরাইলি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের শিকার।

তারা যে শুধু সামরিক অভিযান চালিয়েই এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘরছাড়া করেছে তা নয়; বরং মানসিকভাবে নানা ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমেও নিজ এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছে। তবে ১৯৪৮-৪৯ সালের সামরিক অভিযানের পর

জোর করে অনেক ফিলিস্তিনিকে তাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করে। এই সময়ে তাদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর গণহত্যাও সংঘটিত হয়।[৪০]

ইন্তিফাদা শুরু হলে তিউনিসিয়াতে থাকা পিএলও নেতারা ভিন্ন কৌশলে এগোয়। ইয়াসির আরাফাত ও তার পরামর্শকরা বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের শান্তিকামী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিএলও'র ওপর আরও চাপ বাড়িয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র বলে– পিএলও যদি সত্যই নিজেদের শান্তিকামী দাবি করে, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সব ধরনের সহিংসতার পথ পরিহার করতে হবে।

পিএলও নেতাদের পক্ষেও ইন্তিফাদাকে কাজে লাগানোর যথেষ্ট কারণ ও সুযোগ ছিল। শুরু থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল– ইন্তিফাদার নিয়ন্ত্রণ এবং আন্দোলনের ফসল নিজেদের ঘরে তোলা। পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করার ব্যাপারেও তারা বেপরোয়া ছিল। তারা চাচ্ছিল, যাতে সমস্ত শান্তি প্রক্রিয়া তাদের সঙ্গেই আলোচনা করে অব্যাহত রাখা হয়। এসব নানা চিন্তা-ভাবনাকে সামনে রেখে পিএলও নেতারা তাদের নেতা-কর্মীদের ইখওয়ানের সঙ্গে মিলে ইন্তিফাদায় ভূমিকা রাখার নির্দেশ দেয়। তারা যেন গাজা ও পশ্চিম তীরে ইজরাইলের দখলদারিত্বকে ইহুদিদের জন্য দুঃস্বপ্ন বানাতে পারে।

অন্যদিকে, ইজরাইলিরা প্রথম প্রথম ইন্তিফাদাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তারা মনে করেছিল, অন্য আন্দোলনগুলোর মতো ইন্তিফাদাও দুই-একদিন পর শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তারা দেখে, ইজরাইলি সৈন্যদের সঙ্গে একেবারে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষগুলো দিনের পর দিন বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর গাজার পথে-ঘাটে লড়াই করছে। এতে ইজরাইল পুরোপুরি ঘাবড়ে যায়। তারা কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে গাজার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়, তবে ব্যর্থ হয়। কারণ, তারা বুঝতে পারে– এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলে তা ইন্তিফাদার আগুনকে আরও বাড়িয়ে দেবে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে তরুণরা ক্লাস না করে রাজপথে নেমে আসবে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

---

৪০. এ রকম বহিষ্কারের একটা বড়ো উদাহরণ দেওয়া যায় লিডডা ও রামলি শহরের ক্ষেত্রে। সেখান থেকে প্রায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি নাগরিককে উচ্ছেদ করা হয়। আর ইজরাইল রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দেওয়ার পরও গণহত্যা অব্যাহত রাখে। যেমন : ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে কিবয়া এলাকায় একটি গণহত্যা চালানো হয়, যাতে কয়েকশো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়। এই গণহত্যার ব্যাপারে ১৯৫৩ সালের ১৮ অক্টোবর মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি বুলেটিনও প্রকাশ করে। রেফারেন্স নং ২৫-এ এই ঘটনার লিংক পাওয়া যাবে।

বাস্তবতা হলো, সেই সময় ইজরাইলের কোনো কৌশলই কাজ করছিল না। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু ছিল। তাই যখনই তারা প্রতিবাদ কর্মসূচিগুলোকে দমন করতে কঠোর হতো, তখনই তা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হতো।

এদিকে ইজরাইলের বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত ফিলিস্তিনি শ্রমিকরাও হঠাৎ করে বয়কট কর্মসূচির ডাক দেয়। তারা সে সময় কাজ না করে বাড়িতে বসে থাকে কিংবা প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়। সকল মসজিদ থেকে একযোগে মাইকে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো হতো কিংবা হামদ-নাত, গান পরিবেশন চলত। অনেক সময় বিক্ষোভকারীদের আগামবার্তা দিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা অথবা কারও কোনো বিপদ কিংবা রক্তের প্রয়োজন হলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হতো।

ফিলিস্তিনের বিভিন্ন জায়গায় ইখওয়ানের যে শাখাগুলো কাজ করছিল, সেগুলোকে একীভূত করার যে সিদ্ধান্ত ইখওয়ান নিয়েছিল, ইন্তিফাদার সময় তার সুফল পেতে শুরু করে। ১৯৮০ সাল থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরের ইখওয়ান নির্বাচিত একটি কাউন্সিলের কমান্ডে পরিচালিত হচ্ছিল। এই প্রতিনিধিরা গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এই কাউন্সিল জরুরি বৈঠক আহ্বান করে, যাতে গোটা ফিলিস্তিনে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমগুলো সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে ইজরাইল আগে থেকেই অবরোধ আরোপ করেছিল। এর আগে এই শিবিরগুলোতে ইখওয়ানের বেশি কাজ হতো, কিন্তু ইন্তিফাদার পর শেখ ইয়াসিন এই শিবিরগুলো শান্ত রাখার চেষ্টা করেন, যাতে ইজরাইল তাদের ওপর আরও চড়াও হয়ে দুর্ভোগ বাড়ানোর সুযোগ না পায়। একসময় ইন্তিফাদা দমনের জন্য ইজরাইল দেখামাত্র গুলির আদেশ দেয় এবং পাথর ছোড়া কিশোরদের নির্মমভাবে প্রহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ইজরাইলের এসব জঘন্য আচরণ সাধারণ জনতাকে আরও উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তোলে। জনগণ আরও বেশি তেজদীপ্ত হয়ে ইজরাইলি সেনাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ইন্তিফাদা শুরু হয়েছিল নিরস্ত্র ও অহিংস প্রতিরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে। অস্ত্র ছিল কেবল প্রতীকী হাতিয়ার মাত্র। মূলত পাথর ছোড়া আর ইজরাইলের সৈন্যদের বর্বরতার সামনে সাহস করে বুক পেতে দেওয়াই ছিল ইন্তিফাদার অনন্যতা। কিন্তু যখন ইজরাইলিরা সেই নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলি চালাল, নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন শুরু করল, তখনই অল্প-বিস্তর ককটেল বিস্ফোরণ শুরু হলো। পরবর্তী সময়ে সহিংসতার মাত্রাও আরেকটু বেড়ে গেল। শেখ ইয়াসিন ইন্তিফাদা সম্বন্ধে বলতেন,

'ইন্তিফাদাও চলতে থাকবে আর ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগও অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে আমরাও দৃঢ় চেতনা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম ও লড়াই চালিয়ে যাব।'

প্রথমদিকে ইজরাইল নিশ্চিত হতে পারেনি, এই ইন্তিফাদা ও বিক্ষোভ মূলত কে পরিচালনা করছে। তবে সন্দেহ করেছিল শেখ ইয়াসিন ও তার সংগঠনকেই। ইজরাইল এরপর শেখ ইয়াসিন হুমকি-ধামকি এবং তাকে দক্ষিণ লেবাননে নির্বাসনের ভয় দেখায়। শেখ ইয়াসিন অবশ্য চলমান ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে। একবার তাকে গাজাস্থ ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের মূল ঘাঁটি সারায়াতে ডেকে পাঠানো হয়। শেখ ইয়াসিন তখনও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর যখন প্রথমবারের মতো হামাসের প্রচারণাপত্র বিতরণ করা হয়, সেই প্রচারণাপত্রেও কারও কোনো স্বাক্ষর ছিল না। প্রচারণাপত্রের শেষে শুধু সংগঠনের নাম দেওয়া ছিল– দ্য ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট। আর আরবিতে তিনটি অক্ষর দেওয়া হলো, যা ইংরেজিতে রূপান্তর করলে হবে– এইচএমএস।[৪১] এই প্রচারণাপত্র পেয়ে ইজরাইল প্রাথমিকভাবে ইখওয়ানের ভেতরে কট্টর ইজরাইলবিরোধী ব্যক্তিদেরই শত্রু হিসেবে টার্গেট করেন। ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ইসলামিক সোসাইটি আশ-শাতির পরিচালক খলিল আল কোয়া প্রথম আটক হন। এই মানুষটিও ফিলিস্তিনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার বয়স যখন দেড় বছর, তখন ১৯৪৮ সাল। ইজরাইলি সেনারা সেই সময় তার জন্মস্থান দখল করে নেয়। তার পরিবার শিশু আল কোয়াকে নিয়ে গাজায় পালিয়ে আসে। ১৯৮৮ সালে ইজরাইল তাকে লেবাননে নির্বাসনে পাঠায়, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত খলিল আল কোয়ার প্রায় গোটা জীবনটাই কাটে শাতি নামক গণ-উদ্বাস্তু শিবিরে। খলিল আল কোয়ার পর ১৯৮৮ সালের ১৫ জানুয়ারি গ্রেফতার হন হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি। এরপর হামাসের নিরাপত্তা শাখার মাজেদ-এর নেতা ইয়াহইয়া সিনওয়ার ও রাওহি মুসতাহা গ্রেফতার হন।

ইজরাইলিরা মূলত সুযোগ খুঁজছিল, যাতে ইন্তিফাদার পুরো দায়টা হামাসের নেতাদের ওপর চাপানো যায়। ১৯৮৮ সালের আগস্টে সেই সুযোগটা পেয়েও যায়। কেননা, সেবারই প্রথম হামাস তাদের সনদ প্রকাশিত করে, যেখানে তারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেয়– যতদিন ফিলিস্তিন স্বাধীন না হবে আর ইজরাইল নামক রাষ্ট্রটি মুছে দেওয়া না যাবে,

---

[৪১]. আরবি হারাকা মুভমেন্ট বা আন্দোলন শব্দের প্রথম বর্ণ হলো এইচ। আরবি মুকাওয়ামা রেসিসটেন্স বা প্রতিরোধ শব্দের প্রথম বর্ণ হলো এম। আর এস হলো ইসলামিক শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এস বর্নের আগে এ বর্ণটিও যোগ হয়। ফলে শব্দটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় হামাস হিসেবে। হামাস হলো আরবি শব্দ, যার অর্থ আবেগপূর্ণ উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও সাহস।

ততদিন তারা লড়াই অব্যাহত রাখবে।[৪২] এরই মধ্যে জেরুজালেমে এক ব্যক্তিকে আটক হয়। তার আটকের সঙ্গে সামগ্রিক ঘটনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইজরাইলি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনে স্বীকার করে– এই ইন্তিফাদা ঘটানোর জন্য সে হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহিম আল ইয়াজুরিকে টাকা পাঠিয়েছে। সাথে সাথেই ইয়াজুরিকে আটক করে অমানবিক অত্যাচার চলানো হয়। নির্যাতনে ইয়াজুরি স্বীকার করেন– তিনি ওই টাকা পেয়েছেন। একই সঙ্গে গাজায় হামাসের কোন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে সেই টাকা বিতরণ করা হয়েছে, তাও ফাঁস করে দেন। এভাবে ইজরাইলের কাছে ইন্তিফাদার সামগ্রিক চিত্রই পরিষ্কার হয় এবং তারা সেই মোতাবেক কাজ শুরু করে।

১৯৮৮ সালের আগস্টে তারা হামাসের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার ও আটক অভিযান শুরু করে। হামাসের নেতারা অবশ্য এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কায় আগাম সতর্কতাও নিয়ে রেখেছিলেন। তারা একটি ছায়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে ইজরাইলিরা প্রথম সারির নেতাদের আটক করলেও দলে যেন নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি না হয়।

মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে শেখ ইয়াসিন ছাড়া হামাসের শীর্ষ ১২০ জন নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। ফলে আগে আটক হওয়া রানতিসির সঙ্গে কারাবাসে যোগ দেন হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সালাহ শিহাদাহ, ইবরাহিম আল ইয়াজুরি, মুহাম্মাদ শামাহ, আব্দুল ফাত্তাহ দুখান ও ইসা আন-নাসার। যদিও আটককৃতদের অনেকেই নির্যাতনের মুখে স্বীকার করে, শেখ ইয়াসিনই এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা! তারপরও ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ তাকে আটক না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মূলত শেখ ইয়াসিনকে মুক্ত রেখে তার কাজের ধরন বা নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিল। শেখ ইয়াসিন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার মাত্র ৩ বছরের মাথায় কীভাবে এত বড়ো একটি সংগঠন গড়ে তুললেন কিংবা কীভাবে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন, সেটাই ছিল ইজরাইলের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় ও মাথা ব্যাথার কারণ! তাই তারা শেখ ইয়াসিনকে আটক না করলেও তার ওপর ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করে।

ঘটনাচক্রে এই গণগ্রেফতারের ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা না থাকলেও একই সময়ে হামাসের দুটি সামরিক সেলের কিছু সদস্য গ্রেফতার হয়। তারা জাবালায়া ও বেইত হানুনে কাজ করত। এই দুটি সামরিক শাখা মূলত ইজরাইলি সহযোগীদের পরাস্ত করার কাজ করত, কিন্তু এই কাজের বাইরে তারা গাজা ও পশ্চিম তীরে টহলদার পাঁচটি ইজরাইলি গ্রুপের ওপরও হামলা চালায়। এই সময় তারা নিজেদের

---

৪২. হামাস চার্টার বা ঘোষণাপত্র পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তৈরি কিছু বিস্ফোরক ব্যবহার করে। এই অভিযানগুলো পরিচালনা করে ১৯৮৮ সালের ২৪ জুলাই, যেদিন ছিল পবিত্র ঈদুল আজহা। ঘটনার পরপরই তাদের সদস্যদের সনাক্তও আটক করা হয়। তারপর কালক্ষেপণ না করেই বিচারের আওতায় আনা হয়। পরবর্তী সময়ে এই দুটি সামরিক সেলকে পরিচালনার জন্য সালাহ শিহাদাহকে সন্দেহ করা হয়।

এদিকে হামাসের ছায়া নেতৃত্ব ইন্তিফাদার প্রতিদিনের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলোকে চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্যদিকে, শেখ ইয়াসিন ও তার সহযোগীরা মিলে নতুন আরেকটি সামরিক সেল গঠন করেন, যার নাম– সেল-১০১। এই সেলের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ শারাতিহা। তাকে বাছাই করার কারণ ছিল দুটো। প্রথমত, তার অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়ত, অন্য যে কারও তুলনায় তিনি ইজরাইলি সেনাদের জিজ্ঞাসাবাদে অনেক বেশি নির্লিপ্ত ও দৃঢ় থাকতে পেরেছিলেন। হামাস তাকে নেতৃত্বের ভার দিয়ে এমন একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করেন, যা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় ও সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত। তারা এর নাম দেন– ডেড স্পট টেকনিক। এই কৌশলের ধরন ছিল– কারও নাম না জানিয়ে কোনো একটা জায়গায় গোপনবার্তা রেখে আসা। যিনি বার্তাটি গ্রহণ করবেন, তিনিই কেবল বার্তাটি পাওয়ার কিছুক্ষণ আগে এ সম্পর্কে জানতে পারবেন। শারাতিহা তার এই কাজের জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে লোক বাছাই করেন। নতুন বাছাইকৃত লোকেরাও তার সাথে ডেড স্পটের মাধ্যমে যোগাযোগ করত। ফলে নিরাপত্তার বিষয়টি মোটামুটি নিশ্ছিদ্র ও নিরাপদ রাখা সম্ভব হতো। এত সব সতর্কতা অবলম্বণের কারণ, যাতে সদস্য পরিচয়ের আড়ালে ইজরাইলের কোনো চর তাদের সেলে ঢুকে না পড়ে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো না হলেও ইসলামপন্থি আন্দোলনে যারা আসত, তারা মনের ভেতরে সব সময় শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করত। কিন্তু তাদের না ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ, আর না ছিল অভিজ্ঞতা! অধিকাংশ সময়ে তারা যা করত, সেগুলোর কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাবও পড়ত না। তবে এ সকল ইসলামপন্থিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ বুঝে নেওয়ার আগ্রহ ছিল। এরা প্রথম অপারেশনে একজন ইজরাইলি ঠিকাদারকে টার্গেট করে, যে কিনা গাজার শায়াখ রাদওয়ান নামক এলাকায় একটি কূপ খননের কাজ পেয়েছিল। ওই ঠিকাদার মার্শাল আর্ট জানত। ফলে সে নিজেকে আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা করতেও সক্ষম হয়। ইসলামপন্থিদের দ্বিতীয় অপারেশনে তারা একটি ইহুদি বসতিতে আগুন জালিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এই কাজেও তেমন একটা প্রভাব পড়েনি। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে তারা যে অপারেশন দুটি পরিচালনা করে, তাতে ইজরাইলে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। আর এর পরপরই ইজরাইল হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৮৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নতুন গঠিত সামরিক সেলের সদস্যরা ইজরাইলে বেড়াতে যায় এবং সেখানে সার্জেন্ট আভি সাসপোর্টাসকে অপহরণ করে। এই সার্জেন্টকে নিয়ে তারা কী করবে, তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তাই তারা তাকে হত্যা করে মাটি চাপা দেয়! এর পরপরই ১৯৮৯ সালের ৩ মে তারা সার্জেন্ট ইলান সাদনকে অপহরণ করে হত্যার পর মাটি চাপা দেয়। সাদনকে খুঁজতে এসে ইজরাইলি বাহিনী সাসপোর্টাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে। আর সাদনের মৃতদেহ খুঁজে পেতে সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়। কেননা, সাত বছর পর গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে তারা সাদনের মৃতদেহ চাপা দেওয়ার স্থানটি সনাক্ত করে। এতদিন সময় লাগার অনেকগুলো কারণ ছিল। যে গাড়িতে সাদনকে অপহরণ করা হয়, সেই গাড়ির নাম্বার প্লেটটি ছিল ইজরাইলি। আর গাড়িটিও ছিল চোরাই মার্কেট থেকে সংগ্রহ করা। ইজরাইলিরা সেই গাড়িটির সূত্র ধরে এমন একটি স্থানে পৌঁছায়, যেখানে হামাসের সামরিক শাখার প্রধান বসবাস করতেন।

তারা গাড়িটি রেখে দিয়েছিলেন, যাতে এটি ব্যবহার করে আবারও ইজরাইলে প্রবেশ করে আরও কিছু অপহরণ করতে পারেন। ইজরাইলি সেনাবাহিনী যত দিনে তাদের নিখোঁজ সেনার অপহরণের গোটা চিত্রটি আবিষ্কার করতে পারে, তত দিনে সামরিক শাখার সকল সদস্য ফিলিস্তিন থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। তবে শারাতিহাই[৪৩] শুধু পালাতে পারেননি; ফলে গ্রেফতার হন। ইজরাইলি বাহিনী তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। একটা পর্যায়ে তিনি একজনের নাম ফাঁস করেন, যিনি ছিলেন ডেড স্পটের অন্যতম প্রধান সমন্বয়কারী। ওই ব্যক্তিও পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার হন। প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে তিনি স্বীকার করেন, তারা সকল অর্থ ও নির্দেশনা সরাসরি শেখ ইয়াসিনের কাছ থেকেই পান। তাৎক্ষণিকভাবে শেখ ইয়াসিনকেও আটক করা হয়। এটা ছিল হামাসের বিরুদ্ধে ইজরাইলের দ্বিতীয় দফা গ্রেফতার অভিযান। এই অভিযানে তারা গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে হামাসের ১৫০০ নেতা-কর্মীকে আটক করে।

পরবর্তী সময়ে শেখ আহমাদ ইয়াসিন ১৯৮৯ সালেল ১৮ মে তার গ্রেফতার এবং গ্রেফতারপরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে বলেন–

---

৪৩. শারাতিহা এর আগেও দুইবার গ্রেফতার হন, কিন্তু তিনি কোনোবারই কোনো তথ্য ফাঁস করেননি। তবে এবারের নির্যাতন তিনি সহ্য করতে পারেননি। তা ছাড়া তাকে বলাও হয়েছিল যে, তাকে হত্যা করার আদেশ আছে, তবে একবারে নয়, ধীরে ধীরে। শারাতিহা সম্পর্কে শেষ যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো– তিনি এখনও ইজরাইলের কারাগারেই আটক আছেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় নিয়েই তিনি সেখানে আছেন।

'আমি বাড়িতেই ছিলাম। সেই সময়গুলোতে প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকত। বাড়িতে সেদিন কিছু মেহমানও ছিলেন, যারা কারফিউ শুরু হওয়ার আগে নিজেদের বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন। ইজরাইলি সেনারা রাত ৯টা ৫ মিনিটে আমার বাড়ি ঘেরাও করে। কিছু সেনাকে গাড়িতে রেখে বাকিরা দেয়াল টপকে প্রবেশ করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, আমার মতো সামান্য এক ব্যক্তিকে আটক করার জন্য গোটা ব্যাটিলিয়ন চলে এসেছে। গোয়েন্দা সংস্থার কিছু লোক আমার কাছে এসে বলল– "আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।" আমি বললাম– "আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে কাপড় পরার সুযোগ দিন।" ওরা সুযোগ দিলে কিছু পোশাক এবং আমার হুইল চেয়ারটিও সঙ্গে নিলাম। ওরা জানতে চাইল– "আপনার ছেলে কোথায়?" আমি বললাম– "এই তো এখানেই আছে।" বলল– "তাকেও নিয়ে চলুন। সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।" তারা আমার ছেলে আব্দুল হামিদকেও নিল। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর, অল্প কিছুদিন আগেই পরিচয়পত্র পেয়েছে।

যাহোক, তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে একটি রুমে বসালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে গালি দেওয়া শুরু করল। শুরু হলো নির্যাতন। তারা আমার মুখে থুতু ফেলল এবং একই সঙ্গে চড়-থাপ্পড় মারা শুরু হলো। একটা ট্রে এনে তার ওপর আমার মাথাটি উপুর করে রাখল। এরপর পেছন থেকে আমার ঘাড়ের রগগুলো ওপর থেকে নিচে আবার নিচ থেকে ওপরে কীভাবে যেন চাপ দিলো। মনে হচ্ছিল রগগুলো যেন ভর্তা হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। এবার তারা আমার বুকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকল, যতক্ষণ না বুকটা ব্যথায় নীল হয়ে যায়। তারপর তারা আমার ছেলেকে নিয়ে এলো। তারা আমার সামনে তাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে চারজন মিলে পাগলা কুকুরের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন তার গলা চেপে ধরল, একজন তাকে মারতে শুরু করল, আরেকজন শারীরিকভাবে অপদস্থ করা শুরু করল। সে পাগলের মতো চিৎকার করছিল। আমাকে বলল– "যদি তোর ছেলের প্রতি মায়া থাকে, তাহলে স্বীকার করে নে। তাহলেই সব শেষ হয়ে যাবে। হামাস তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন আর নিজের দায় অস্বীকার করে তুই কি তোর দলকে বাঁচাতে পারবি?"

আমি তাদের সাফ জানিয়ে দিলাম– আমার কিছুই বলার নেই। তারা চলে গেল। কয়েক ঘণ্টা পর আবারও এসে আমার ছেলের ওপর বেদম প্রহার শুরু করল। তাদের অত্যাচার এতটাই ভয়াবহ ছিল, সে প্রায় মরেই গিয়েছিল। তারপর ওরা তাকে নিয়ে যায়।

পরবর্তী চারটি দিন আমি এক ফোটাও ঘুমাতে পারিনি। এই চারটি দিন আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও হুইল চেয়ার থেকে নামতে দেয়নি। দুই-তিন ঘণ্টা পর পর এসে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আমার ওপর অত্যাচার করত। আমি অজ্ঞান হয়ে চেয়ারেই পড়ে থাকতাম। জ্ঞান ফেরার পর দেখি- আমাদের সামরিক শাখার অন্য নেতারা- যারা আমার আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন- তাদেরও আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথমে এলেন সালাহ শিহাদাহ। তিনি আমাকে দেখিয়ে বলেন- "আমি আপনার কাছ থেকে ২ হাজার ৫০০ ডলার নিয়েছি। এর বেশি কিছু আমার বলার নেই।"

এরপর আমার কাছে সেই সব ব্যক্তিদের আনা হয়, যারা হামাস কর্তৃক অপহৃত ইজরাইলি সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করত। তারা আমাকে দেখিয়ে বলল- "আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, ইজরাইলের সহযোগীদের হত্যা করা জায়েজ।" আমার মনে হলো- তারা ইজরাইলিদের কাছে কী কী স্বীকার করেছে, এটা আমাকে অবহিত করল। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছিল, তখন ইজরাইলি সেনারা চারদিকে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল। তাদের জানার বেশি আগ্রহ ছিল, আমার পরে এই আন্দোলনের কে নেতৃত্ব দেবে? আমি বলেছিলাম- "এটা একটা তৃণমূল সংগঠন। আপনি একটি গাছকে উপড়ে ফেললে নতুন চারা থেকে আবারও গাছ জন্ম নেবে।" আমি আরও বললাম- "আমার যতটুকু দায় তা অস্বীকার করার কোনো মানসিকতা আমার নেই। আমার বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, তা দিয়েই আমার বিচার শুরু করা যায়। আমি ইজরাইলের সহযোগীদের হত্যা করার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছিলাম। আর একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে দখলদার ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার আমার আছে।"'"[৪৪]

---

[৪৪]. *আল জাজিরাকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ ইয়াসিন এসব তথ্য জানান। তবে তার ওপর যে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেই কথাগুলো তারই ঘনিষ্ঠ সহচর ও বর্তমান হামাসের রাজনৈতিক শাখাপ্রধান ইসমাইল হানিয়াও নিশ্চিত করেছেন। হানিয়া সে সময় কারাগারে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেই গুটিকয়েক হামাস নেতাদের মধ্যে একজন, যাদের ডেকে এনে দূর থেকে শেখ ইয়াসিনের ওপর চালানো নির্যাতনগুলো দেখানো হতো- যাতে তারা ভয় পান এবং তাদের মনোবল ভেঙে যায়। হানিয়া জানান, শেখ ইয়াসিন প্রতিবন্ধী ও হুইল চেয়ারে বসা থাকলেও তাকে ইজরাইলি সেনা ও কারা কর্মকর্তারা প্রায়শই কয়েক তলা সিঁড়ির ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতেন। আবারও তাকে ওপরে নিয়ে এসে একইভাবে ফেলে দেওয়া হতো। তার দাড়িকে চেয়ারের সাথে বেঁধে দিয়ে টানানো হতো। তিনি অত্যাচার সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

দুই দফা গণগ্রেফতার হামাসকে বিপর্যস্ত করে। কারণ, এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে সংগঠনের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির সকলেই আটক হয়। ইজরাইল এই আন্দোলনকে অনেকটাই কাবু করে। তবে এটাও ঠিক, ইজরাইলের এই দমনাভিযানের ফলে হামাসের সামরিক সক্ষমতার বিষয়টি প্রথমবারের মতো অনুধাবন করা যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে হামাস গঠনের প্রস্তুতি চলেছিল, ততদিনে এর কিছু আলাদা শক্তিও তৈরি হয়েছিল। ইজরাইলের এসব দমন-পীড়ন ফিলিস্তিনের বাইরে থাকা জিহাজগুলোকে উদ্‌বিগ্ন করে। অবশ্য, এর আগের বছরই জিহাজের নেতৃত্বের কাঠামোতে বিভিন্ন স্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জিহাজে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ছিল ইশতিহারি বা দ্য কনসালটেটিভ কাউন্সিল, আর নিচের দিকে ছিল তানফিধি বা দ্যা অ্যাক্সিকিউটিভ কমিটি। যে কমিটিগুলো হামাসের বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্টগুলো সরবরাহ করত, সেগুলোকে এবং গণকমিটিগুলো তত্ত্বাবধান করত এই তানফিধি। তবে ইশতিহারির সদস্যরা নির্বাচিত ছিল না। সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল– ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরের দায়িত্বশীলরা ভোটের মাধ্যমে নির্বচিত হবেন। আর ফিলিস্তিনের বাইরে যেখানে ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেখানেও এই ধরনের নির্বাচন হতে পারে। তবে যেখানে সংখ্যা একেবারেই নগণ্য, সেখানকার হিসাব ভিন্ন হতে পারে।

১৯৮৯ সালের বিপর্যয়ের পর গোটা তানফিধির দৃষ্টি মুসা আবু মারজুকের দিকে চলে যায়। মারজুক তখন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি গবেষণা করছিলেন। সংগঠনের লোকেরা তাকে দ্রুতই গাজায় ফিরতে বলে; যদিও মারজুক নিয়মিতই গাজায় যাতায়াত করতেন। তার একমাত্র করণীয় ছিল ক্ষতিগ্রস্ত সংগঠনটিকে যতটা পারা যায় সংগঠিত করা। মারজুক আগাগোড়াই শেখ আহমাদ ইয়াসিনের ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। তাই তাকে কেউ কখনোই অপ্রত্যাশিত বা অনুপ্রবেশকারী মনে করত না; বরং অনুগত বন্ধু বলেই বিবেচনা করত। আবু মারজুক জনসম্মুখে আবু উমর নামে পরিচিত।

গাজায় ফিরলেন আবু মারজুক। নতুন করে কাজ করতে গিয়ে দেখেন, শুধু গুটিকয়েক লোক বাহিরে আছে। কারণ, ইতোমধ্যে সিনিয়র দায়িত্বশীলদের প্রায় সকলেই গ্রেফতার হয়েছেন। যে অল্প কয়েকজন ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল তখনও মুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে সাইয়্যেদ আবু মুসামিহ ছিলেন অন্যতম। বাধ্য হয়েই আবু মারজুক তার ওপর বেশি ভরসা রাখেন। বাদবাকি যারা ছিলেন, তারা মূলত চলমান সংকটের পূর্বে সংগঠনে তেমন প্রভাবই রাখতেন না। তাই যা কিছু আছে, তাই নিয়ে লড়াই করার প্রস্তুতি নেন আবু মারজুক। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, যারা জেলে আছেন তারা পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে মুক্ত হবেন। আবু মারজুক একটি প্রাদেশিক নতুন কাঠামো গঠন করে আবারও ছুটিতে যান। তবে এটা ঠিক, গ্রেফতার অভিযানে যে ১৫০০ জন আটক হয়েছিল, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যেই তাদের অনেকেই ছাড়া পায়। কেননা, ইজরাইল তাদের হুমকি মনে করছিল না।

এটাই ছিল হামাসের সাংগঠনিক ইতিহাসের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। কেননা, এই সময়ে হামাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকর হয়ে বাহ্যিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করে। আগে লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া ছাড়া এই অভ্যন্তরীণ কাঠামোর তেমন কাজই ছিল না। ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাহ্যিক কাঠামোটি সংগঠনে অর্থায়ন, পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া অব্যাহত রাখে।

সংগঠনকে নতুন কাঠামো দান করার পাশাপাশি আবু মারজুকের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। তার ইচ্ছা ছিল– এমন একটি কৌশল প্রণয়ন, যাতে আর কখনোই গোটা সংগঠন বিলুপ্ত বা ধ্বংস হওয়ার মতো অবস্থায় না পৌঁছায়। তিনি চিন্তা করলেন, হামাসের গোটা নেতৃত্ব যদি ফিলিস্তিনে থাকে, তাহলে ইজরাইল দমন-পীড়ন বা গ্রেফতার অভিযান চালিয়ে বারবার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সক্ষম হবে। এ জন্য বিশ্বের অন্যান্য শহরে যেমন : কুয়েত, আম্মান, লন্ডন ওয়াশিংটনে বসে কিছু মানুষ কাজ করবে। এতে তারা দূর থেকে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতিগুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। হামাসের কিছু নেতা বাইরে থাকলে তারা যে শুধু ইজরাইলের পীড়নের হাত থেকে বাঁচবে তা-ই নয়; বরং পিএলও'র নানা কুচক্র থেকেও নিরাপদ থাকতে পারবে। কেননা, হামাসের শীর্ষ নেতারা জেলে যাওয়ার পর পিএলও নিরবচ্ছিন্নভাবে হামাসের মধ্যম সারির নেতাদের নিজেদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেছে। তারা এই কাজ করছে কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে প্রলোভন কিংবা কাউকে আবার ভিন্ন কোনো কৌশলে।

আবু মারজুকের নতুন কাঠামো কাজ শুরুর পর সবকিছু আবারও স্বাভাবিক রুটিনে চলে আসে। ইজরাইল প্রতিবছর একটি গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করত। ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে গ্রেফতার অভিযানের মাত্রা ছিল ব্যাপক। তবে, তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। আর তা ছাড়া আবু মারজুকের সময়োপযোগী কৌশলের কারণে হামাসের পুনরায় সংগঠিত হওয়ার কাজটিও বাধাগ্রস্ত হয়নি। ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রতিরক্ষামূলক নতুন কাঠামোর ওপর ভর করে হামাস বিপর্যয়ের ধাক্কা অনেকটাই সামলে ওঠে। ব্যাপারটা এমন– এরপর ইজরাইল হামাসের ওপর যখনই কোনো আঘাত হানে– হোক সেটা কম কিংবা বেশি– তাতে হামাসের ব্যাপারে জনগণের সহানুভূতি আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। হামাসের প্রতি অমানবিক আচরণগুলো কীভাবে হামাসকে পিএলও'র বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে– ইজরাইল প্রথমদিকে এটা বুঝতেই পারেনি।

হামাসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার তখনই সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়, যখন পিএলও তার নিজের সংবিধান বাতিল করে। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা দেন,

পিএলও ইজরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং তারা জাতিসংঘের ২৪২ ও ৩৩৮ নং প্রস্তাবনার আলোকে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি আলোচনায় অংশ নেবে। পিএলও'র এই ঘোষণায় লাখো ফিলিস্তিনি শরণার্থীর অধিকার ও নিজ ভূমিতে ফেরার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। এই ঘোষণার ফলে পিএলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্রদের আস্থাভাজন হয়ে যায়, কিন্তু একই সঙ্গে লাখো ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু এবং বিভিন্ন দেশে বসবাসরত হাজারো নাগরিকের আস্থা ও বিশ্বাসকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে।

আর পিএলও'র গ্রহণযোগ্যতা যত কমে, হামাসের জনপ্রিয়তাও ততই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে।

ছুরির যুদ্ধ

হামাসের সামরিক সক্ষমতাকে পুনরুজ্জীবিত, দলকে সংগঠনিত করা ছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয় অপরিহার্য ছিল। আর ইজরাইলের কিছু কর্মকাণ্ড সেই প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে দেয়। ১৯৯০ সালের ৮ অক্টোবর ইজরাইলি বর্বর সেনারা জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদ কম্পাউন্ডে ঢুকে নামাজরত মুসুল্লিদের ওপর গুলি চালায়। এতে ২২ জন ফিলিস্তিনি শাহাদতবরণ করেন এবং ২০০ ফিলিস্তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। ওই দিন ইহুদিরা মুসলিমদের পবিত্র মসজিদে 'টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল'[৪৫] নামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করছিল। এর মধ্য দিয়ে তারা সেখানে উপাসনালয় স্থাপন করতে চেয়েছিল। এ জন্য সেদিন মুসলিমরা সেখানে একত্রিত হয়েছিল। একই দিনে নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যার খবর পেয়ে আমির সাউদ আবু সারহান নামে একজন ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তিনজন ইজরাইলি সেনাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। অভিযোগ করা হয়, আমির সাউদ হামাসের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ছুরি দিয়ে হত্যার এই ঘটনা নতুন এক যুদ্ধের সূচনা করে, যাকে বলা হয় 'ওয়ার অব দ্য নাইভস' বা ছুরি দিয়ে যুদ্ধ।

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাফাতে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় কর্মরত ইজরাইলিদের ওপর গাজার দুইজন নাগরিক ছুরি দিয়ে হামলা চালায়। এই দুইজন সেদিন সকালেই গ্রিন লাইন পার হয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাদের নাম- মারওয়ান আল জায়িঘ ও আশরাফ আল বালুজি। তারা হামাসের নামে এই ঘটনাটি ঘটায় এবং দাবি করে, হামাসের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই হত্যাকাণ্ডটি চালিয়েছে।

---

[৪৫]. এই আন্দোলনটির সূচনা করেন গারসন সলোমন নামক একজন প্রাক্তন ইজরাইলি সেনা কর্মকতা। ১৯৬৭ সালে এই আন্দোলনটি সূচনা করেন। সলোমন দাবি করেন, তিনি নিজে সরাসরি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনেছেন, যাতে ঈশ্বর তাকে ইহুদিদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে বলেছেন।

এই ঘটনার পর তারা অবশ্য পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়। এ দুজন হলো ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম মুতারাদুন বা পালাতক। তবে শীঘ্রই এ রকম পলাতকের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। তারা অবশ্য হতাহতের কাজে না গিয়ে বরং ইজরাইলি সেনাদের পাথর ছুড়ে উধাও হয়ে যেত। ফলে তারা আইনের চোখে পলাতক থেকে যায়।

১৯৯০ সালের ২৪ ডিসেম্বর জাফার ছুরিকাঘাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামাসের সর্বশেষ অংশের বিরুদ্ধে ইজরাইল চূড়ান্ত পর্যায়ের দমন-পীড়ন শুরু করে। হামাসের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক আছে– এ রকম অভিযোগে তারা গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে প্রায় ১৭০০ জনকে আটক করে। ১৯৮৯ সালে মুসা আবু মারজুক হামাসের যে নতুন কাঠামো তৈরি করেছিলেন, এর সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই এই গ্রেফতার অভিযানে আটক হয়। পূর্বের তুলনায় এবারের অভিযানে পশ্চিম তীর অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, ইজরাইল অভিযোগ করেছিল দুই ছুরিকাঘাতকারীকে পশ্চিম তীরের কোনো এক বাসিন্দা আশ্রয় দিয়েছিল। তবে ইজরাইলের সেই নিপীড়নের পরও হামাস সেই ক্ষতিটি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। যেহেতু নেতৃত্বের অনেকটাই তখন বিদেশে থাকা দায়িত্বশীলরা নিয়েছিলেন, তাই ইজরাইলি নির্যাতনে তাদের কার্যক্রমে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। বাইরের দায়িত্বশীলদের কার্যক্রম আরও বিকশিত হয়, যখন হামাসের শীর্ষ চার নেতা ফিলিস্তিনের ভেতর থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। ততদিনে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ইমাদ আল আলামি, ফাদল আল জাহার, মুস্তাফা আল কানু ও মুস্তাফা আল লিদাভি লেবাননে চলে যান। এরপরেই তারা হামাস আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কাঠামোর আওতায় প্রবেশ করে।[৪৬]

এদিকে ইজরাইলের একটি সামরিক আদালতে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের বিচার শুরু হয়। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে মামলার শুনানি শুরু হয়। কয়েক দফা শুনানির পর ১৯৯১ সালের ১৬ অক্টোবর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ১৫ বছরের কারাদণ্ড। ইজরাইলি সামরিক প্রসিকিউটর তার বিরুদ্ধে হামাস প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ফিলিস্তিনি ও ইজরাইলি সেনা হত্যাসহ যতগুলো অভিযোগ আনে, আদালতে তার সবগুলোই প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয়। শেখ ইয়াসিন আদালতে ইজরাইলি সেনাদের অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করলেও হামাস প্রতিষ্ঠার পুরো দায় গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার

---

[৪৬]. ইমাদ আল আলামি হলেন হামাসের রাজনৈতিক শাখার পলিট ব্যুরোতে স্থান পাওয়া সর্বশেষ নেতা। আগে তিনি ইরান থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি দামেস্কে থেকেই হামাসের দায়িত্ব পালন করেন। আর ফাদল আল জাহর ২০০৫ সালে গাজা থেকে ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার, তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন।

দুই সপ্তাহ আগে ৩৪ বছর বয়স্ক মুহাম্মাদ আল শারাতিহাকে ইজরাইলি সেনাদের অপহরণ ও হত্যার দায়ে তিনবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত আরও ৩০ বছরের কারাবাস দেওয়া হয়।

হামাসের বিরুদ্ধে ইজরাইলের ক্র্যাকডাউনের একটি বড়ো প্রভাব পড়েছিল। এতে পলাতক হামলাকারীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে যাদের সুযোগ ছিল, তারা দেশ ত্যাগ করে। আর যারা দেশ ছাড়তে পারেনি, তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। যারা এ রকম পালিয়ে ছিল, তারা চিন্তা করে– নিজেরা তো স্বাধীনতা হারিয়েই ফেলেছে, তাই নতুন করে কিছু হারানোর নেই। তখন তাদের একমাত্র কাজ হয় ছোটো ছোটো গ্রুপ গঠন করে ইজরাইলিদের ওপর হামলা চালানো। এভাবেই হামাসের সামরিক শাখা 'কাতিব আল শহিদ ইজ্জাদিন আল কাসসাম' বা 'দ্য মার্টার ইজ্জাদিন আল কাসসাম ব্রিগেড' জন্ম নেয়।

এই শাখাটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সামরিক শাখার (মুজাহিদুন আল ফিলাসতিনিয়ুন) কোনো অংশ ছিল না; বরং সম্পূর্ণ নতুন সত্তা নিয়ে কাজ শুরু করে। এই শাখার অধিকাংশ সদস্যই ছিল তরুণ। আর তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইজরাইলিদের নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া।

তা ছাড়া আগের সামরিক শাখাটির অর্থাৎ মুজাহিদুন আল ফিলাসতিনিয়ুনের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যই তখন কারাগারে ছিলেন। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে লম্বা কারাবাসের শাস্তিও ঘোষণা হয়েছিল। তবে ইন্তিফাদাসহ ফিলিস্তিনের স্বাধীকার আন্দোলনে এই মুজাহিদুনদের কার্যক্রম সব সময়ই প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ইজরাইলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদীদের যে লড়াই, মুজাহিদুন আল ফিলাসতিনিয়ুন ছিল সেই লড়াইয়েরই একটি ইসলামিক সংস্করণ।

অন্যদিকে, কাসসাম ব্রিগেড ছিল সরাসরি ইন্তিফাদার একটি ফসল। মূলত ফিলিস্তিনিদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ইজরাইলিদের বর্বরভাবে মোকাবিলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সামরিক শাখার আবির্ভাব ঘটে। প্রথমদিকে ইন্তিফাদা ছিল নাগরিকদের এক ধরনের অসহযোগ আন্দোলন। উদ্দেশ্য– ইজরাইলিদের ওপর চাপ সৃষ্টি, যাতে তারা ফিলিস্তিনিদের সাথে আরও মানবিক আচরণ করে। কিন্তু ইজরাইলিরা এই ইন্তিফাদাকে পাশবিক উপায়ে দমন করার চেষ্টা করায় ফিলিস্তিনের মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে সহিংস উপায়ে প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে।

আল কাসসাম ব্রিগেড তাদের এই ছুড়ি যুদ্ধ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। আর ডিসেম্বর মাস থেকেই হামাসের পরবর্তী প্রচেষ্টা শুরু হয়,

যাকে হামাস 'ওয়ার অব সেভেন ডেইজ' বা 'সাত দিনের যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করে। ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর গাজায় কর্মরত একটি সশস্ত্র গ্রুপ গাজার আল শুজাইয়াহ থেকে বেইত লাহিয়াগামী সড়কে টহলরত একটি ইজরাইলি সেনাদলকে ঘিরে তিন ইজরাইলি সেনাকে হত্যা করে।

একইভাবে ১২ ডিসেম্বরে আরেকটি সশস্ত্র দল হেবরনে টহলরত অপর একটি ইজরাইলি সেনা দলকে ঘেরাও এবং তিন ইজরাইলি সেনাকে হত্যা করে। ১৩ ডিসেম্বর সকালে আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ ইজরাইলি সীমান্ত পুলিশের সার্জেন্ট মেজর নিসিম টোলেডানোকে অপহরণ করে। সে তখন তার বাসভবন থেকে বের হয়ে পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। হামাস সদস্যরা তাকে অপহরণ করে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। রামাল্লাস্থ ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস অফিসে ওইদিনই সকাল ১১টায় দুজন মুখোশ পরিহিত সদস্য ইজরাইলের জন্য একটি বার্তা পাঠায়। তারা এক পুলিশ সেনাকে অপহরণের খবর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তাদের মুক্তির জন্য ৩টি শর্ত দেয়। শর্তগুলো ছিল–

১. ইজরাইলি কর্তৃপক্ষকে ওইদিন রাত ৯টা পর্যন্ত একটি ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়। তা নাহলে সেই অপহৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার ঘোষণা দেওয়া হয়।
২. ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের একজন প্রতিনিধি এবং মিশর, ফ্রান্স, সুইডেন ও তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে অবিলম্বে শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সেইসঙ্গে তারা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে আর কখনো গ্রেফতার করবে না– এই নিশ্চয়তাও চাওয়া হয়।
৩. শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মুক্তির ঘটনাটি ইজরাইলি টেলিভিশনে প্রকাশ্যে দেখানোর দাবি জানানো হয়।

১০ ঘণ্টার এই ডেডলাইন চলা অবস্থায় ইজরাইল গোটা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। সর্বশেষ ১৯৭৩ সালে মিশরের সাথে যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার পরে এই ধরনের জরুরি অবস্থা আর কখনোই ঘোষণা করা হয়নি। ইজরাইলিরা সময়ক্ষেপণ করতে চাইছিল। কেননা, তারা বুঝতে পারছিল না– অপহরণকারীরা কতটা সিরিয়াস। সেইসঙ্গে তারা চিন্তা করছিল, এই সময়ের মধ্যেই তারা অপহরণকারীদের সনাক্ত করতে কিংবা যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেটা খুঁজে বের করতে পারবে। তবে এই ঘটনাটির পরই হামাস গোটা বিশ্বের নজরে চলে আসে। সকল আন্তর্জাতিক মিডিয়া হামাসের এই কাজটিকে প্রচার শুরু করে। অপহরণকারীদের দুর্বল করার জন্য ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ তাদের সর্বশেষ অস্ত্রটি কাজে লাগায়। তারা ইজরাইলি টেলিভিশনে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

তাদের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল, শেখ ইয়াসিন অপহৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করবেন, আর তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে অপহরণকারীরা হয়তো তাকে ছেড়ে দেবে।

এই সাক্ষাৎকারটি অস্বাভাবিকভাবে হামাসকে গোটা বিশ্বে পরিচিত করে তোলে। সাক্ষাৎকারটি দেওয়ার সময় শেখ ইয়াসিনকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল! কারণ, এমনিতেও তিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী; তার ওপর দীর্ঘদিনের কারাবরণ তাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিল। তিনি সেই সাক্ষাৎকারে অপহৃত ব্যক্তিকে জীবিত রাখতে অপহরণকারীদের প্রতি অনুরোধ এবং একই সঙ্গে তিনি ইজরাইলি কর্তৃপক্ষকেও অপহরণকারীদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। এই প্রথম হামাসের ইতিহাসে শেখ ইয়াসিন ইজরাইলি জনগণ তথা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ্যে কিছু কথা বলার সুযোগ পেলেন। যদিও এটা ছিল খুবই কম সময়ের জন্য, তারপরও এই সময়ের মধ্যেই তিনি ফিলিস্তিন ও ইজরাইলিদের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। ইজরাইলি টিভিতে দেওয়া তার সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণী নিম্নরূপ–

প্রশ্নকর্তা : ‘একটি সশস্ত্র দল একজন পুলিশ সদস্যকে অপহরণ করেছে এবং তার বিনিময়ে আপনার মুক্তি দাবি করছে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?’

শেখ ইয়াসিন : ‘কোনো মানুষই স্বাধীনতা হারাতে চায় না। কোনো মানুষই পরাধীন থাকতে চায় না। আমি মনে করি, সাম্প্রতিক এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি বন্দি মানুষকেই মুক্তি দেওয়া উচিত।’

প্রশ্নকর্তা : ‘যদি এই অপহৃত পুলিশ সদস্যকে তারা মেরে ফেলে?’

শেখ ইয়াসিন : ‘আমি তাদের পরামর্শ দেবো এটা না করার জন্য। কেননা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের দাবিগুলো মানার সুযোগ দেওয়া দরকার।’

প্রশ্নকর্তা : ‘নীতিগতভাবে এই পুলিশকে হত্যা করার ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী?’

শেখ ইয়াসিন : ‘এই পুলিশ হত্যা, ফিলিস্তিনিদের হত্যা কিংবা সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যা– সবই আসলে একই সূত্রে গাঁথা। এসব হত্যাকাণ্ডের কারণ একটাই তা হলো– অবৈধ দখলদারিত্ব। যখন এই দখলদারিত্বের অবসান ঘটবে, তখন সব সংকটেরও সমাধান হবে।’

প্রশ্নকর্তা : ‘পুলিশ সদস্যের অপহরণ নিয়ে যদি কিছু বলতেন।’

শেখ ইয়াসিন : 'এই ঘটনাটি কি আলাদা কিছু? সেটাও কিন্তু মূল সমস্যার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। প্রতিদিন উভয়পক্ষের লোক হতাহত হচ্ছে। যখন আমরা দখলদারিত্ব বন্ধ করব, তখনই এসব বন্ধ হবে।'

প্রশ্নকর্তা : 'কিন্তু তারা যদি অপহৃত পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে, তখন কী হবে?'

শেখ ইয়াসিন : 'আমি মনে করি না যে তারা ওই পুলিশ সদস্যকে হত্যা করবে। অপহরণকারীদের কিছু উদ্দেশ্য থাকে, কিছু দাবি-দাওয়া থাকে। কর্তৃপক্ষের উচিত সেগুলো শোনা এবং তা সমাধানের চেষ্টা করা।'

প্রশ্নকর্তা : 'দখলকৃত এলাকায় যে হামাস নামক সংগঠনটি কাজ করছে, তার ওপর আপনার প্রভাব কতটুকু?'

শেখ ইয়াসিন : 'জেলে বসে আমি এই ব্যাপারে কী বলব! আমি বন্দি অবস্থায় কীভাবেই-বা আমার প্রভাব মূল্যায়ন করব?'

প্রশ্নকর্তা : 'কিন্তু আপনি তো দর্শনার্থী বা কারাবন্দির মাধ্যমে কিছু খবর নিশ্চয়ই পান।'

শেখ ইয়াসিন : 'যতটুকু আমি মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি, তাতে বুঝতে পারি– হামাস ক্রমশই বড়ো হচ্ছে।'

প্রশ্নকর্তা : 'হামাসের বড়ো হওয়া বলতে আপনি কী বোঝাতে চান?'

শেখ ইয়াসিন : 'আমি বোঝাতে চাই, এই সমস্যার সমাধান কেবল ইসলামেই আছে।'

প্রশ্নকর্তা : 'শান্তি প্রক্রিয়া এবং ওয়াশিংটন বৈঠক নিয়ে আপনার কী মত?'

শেখ ইয়াসিন : একজন ফিলিস্তিনিও নেই, যে কিনা শান্তি চায় না। প্রতিটি ফিলিস্তিনি নাগরিক শান্তি পছন্দ করে, তবে শান্তি জিনিসটা একেকজনের কাছে একেক রকম। শান্তি পাওয়ার পথও একেকজনের কাছে একেক রকম।'

ইজরাইলিরা অবশ্য অপহরণকারীদের দাবি মানতে অস্বীকার করে। ফলস্বরূপ, অপহৃত পুলিশ সদস্য টোলেডানোকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিম তীরের মালেহ আদুমিম নামক একটি ইহুদি বসতির নিকটস্থ খালে। এই ঘটনার পরপরই তৎকালীন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন এবং ১৬ ডিসেম্বর তিনি হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের নির্দেশ দেন। ১৭ ডিসেম্বর মাত্র একদিনের মধ্যেই ২ হাজার ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়। এর মধ্যে ৪১৫ জন হামাস ও ইসলামিক জিহাদ নামক সংগঠনের নেতা-কর্মী। এই ৪১৫ জনের অনেকেই

নতুন এই অভিযানে আটক হয়েছিলেন। আবার এমনও অনেকে ছিলেন, যারা আগে থেকেই কারাগারে ছিলেন। আবার কাউকে কাউকে সরাসরি নিজেদের বাসা থেকে তুলে আনা হয়েছিল। এদের সবাইকেই একটি গাড়িতে তুলে সরাসরি লেবানন সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নো ম্যানস ল্যান্ডের বরফ আচ্ছাদিত এলাকায় তাদের ফেলে দেওয়া হয়। এটা ছিল মানবতার সঙ্গে ইজরাইলিদের নৃশংসতম রসিকতা।

বিশ্বব্যাপী প্রচারণা

সারা পৃথিবী এই ৪১৫ জন মানুষেকে আটকের ফুটেজগুলো দেখেছিল। কীভাবে কতগুলো লোককে ইজরাইলিরা চোখ বেঁধে, হাতকড়া পড়িয়ে, পেছন থেকে হাতগুলো বেঁধে গাড়ির ভেতরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হয়েছিল। গোটা দৃশ্যই বিশ্ববাসী মিডিয়ার কল্যাণে দেখেছিল। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু ঘটনা দেখে বিশ্ববাসীর মর্মবেদনা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। কিছু প্রভাবশালী ইজরাইলি হাইকোর্টের কাছে একটি রুলিং চেয়ে আবেদন করে, যাতে ইজরাইলি সরকার অন্যায়ভাবে এই মানুষগুলোকে বিতাড়ন করা থেকে বিরত থাকে।

এই মানুষগুলোকে জুমরিয়েহ ক্রসিং দিয়ে সবচেয়ে উত্তরে, দক্ষিণ লেবাননের ইজরাইল আরোপিত নিরাপত্তা জোনে নেওয়া হয়। অবশ্য, লেবানিজ সেনারা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ইজরাইল তাদের সীমান্ত বরাবর টেনে নেয়। এরপর মানুষগুলোকে সেখানে ফেলে চলে যায়। ইজরাইলিরা দাবি করে– যেহেতু ভূখণ্ডটি লেবাননের সীমানাধীন, তাই তাদের কিছু করার সুযোগ নেই। ডিসেম্বরের সেই ভয়ংকর শীতের রাতে ৪১৫ জন ফিলিস্তিনি খোলা আকাশের নিচে তুষারপাতের মধ্যে পড়ে থাকে। তাদের অধিকাংশেরই দীর্ঘক্ষণ হাতকড়া পড়ে থাকায় হাতে ঘা হয়ে গিয়েছিল। এরপর মারাত্মক শীতে পড়ে থাকায় তাদের শরীরে পচন ধরে, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যাংগ্রিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইজরাইল তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য হয়। তারা চেয়েছিল হামাসকে শাস্তি দিতে, কিন্তু তাদের কাজ-কর্মে বরং হামাসের উপকার হয়। আগে ইজরাইল নিজেদের ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসের শিকার হিসেবে পরিচয় দিত। কিন্তু নিজেদের বর্বরতার কারণে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং জেনেভা কনভেনশনের ৩৩ ও ৪৯ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হচ্ছিল। এমনকী ইজরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের সমর্থন দিচ্ছিল না। ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ৭৯৯ নং প্রস্তাবনা অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবে ইজরাইলের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

বিশেষ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন করছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবনায় ইজরাইলকে ভবিষ্যতে এরূপ পদক্ষেপ না নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক এবং ক্ষমতাধর পক্ষ হিসেবে আহ্বান জানানো হয়– তারা যেন বিতাড়িত সবাইকে অবিলম্বে ফিরিয়ে এনে নিজ ভূমিতে বসবাসের সুযোগ করে দেয়।

মারজ আল জুহুর নামে একটি পরিত্যক্ত ভূমি ছিল। আগে সেখানে কোনো মানুষ বসবাস করত না। কিন্তু কয়েক দিনের মাথায় সেখানে একটি বসতি গড়ে উঠে, যা গোটা বিশ্বের মানুষের আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জন করে। গোটা বিশ্ব থেকে সাংবাদিকরা এই শিবিরে ছুটে আসে। যারা বিতাড়িত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ১৬ থেকে ৬৭ বয়সি। এই মানুষগুলো তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিল। এর মধ্যে ১৭ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, যাদের ডক্টরেট ডিগ্রিও আছে! ১১ জন ডাক্তার। আবার ডাক্তারদের মধ্যে কিছু ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ১৪ জন প্রকৌশলী, ৩৬ জন ছিলেন ব্যবসায়ী। আর ৫ জন সাংবাদিক। অন্যদিকে ১০৯ জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের। ২০৮ জন ছিলেন বিভিন্ন মসজিদের ইমাম।

বাস্তবিক অর্থে তারা ছিল প্রত্যেকেই প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। তাদের চেনা পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। এটা ঠিক, প্রতিটি গ্রেফতার বা বিতাড়নমূলক অভিযানের পর হামাসের নেতৃত্বে কিছু শূন্যতার সৃষ্টি এবং সার্বিকভাবে একটু ধাক্কা খেত। কিন্তু সেটা সাময়িক। কারণ, প্রতিটি দমনাভিযানের পরই হামাসের নতুন নেতারা সামনে চলে আসত। প্রাথমিকভাবে তাদের হয়তো অভিজ্ঞতার কিছুটা ঘাটতি ছিল, কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিত এবং দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করত। আর এই বিষয়টি হামাসকে অন্য সকল আন্দোলন থেকে সব সময় আলাদা করেছে। হামাস এমন এক সংগঠন, যারা কিনা প্রতিটি বিপর্যয় থেকে কিছু না কিছু অর্জন করেছে। যেমন : সর্বশেষ বিতাড়ন কার্যক্রমে শতাধিক নেতা-কর্মী নির্বাসনে পাঠালেও হামাস সেখান থেকেও কিছুটা লাভবান হয়েছে।

বিতাড়িতদের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ড. আব্দ-আল আজিজ আল রানতিসি। এই বিতাড়িতদের প্রথমবার যেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তারা সেখানেই জোর করে থাকতে চাইল। নতুন করে কোনো শিবিরে যেতে চেয়েছিল না। এমনকী তারা প্রত্যাবর্তন করে ইজরাইলেও প্রবেশ করার চেষ্টা চালায়, কিন্তু ইজরাইলি সেনারা গুলি করে তাদের প্রতিহত করে। পরবর্তী সময়ে এই বিতাড়িতরা নিজেরাই

মুখাইয়াম আল আওদাহ বা দ্য ক্যাম্প অব রিটার্ন চালু করে। এক পর্যায়ে তাদের বৈরুত যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, তারা সেখানে একবার গেলে গোটা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। ষড়যন্ত্রটা এমন ছিল, তারা একবার দেশ ছাড়লে আর কখনোই ফিরতে পারবে না। আর ইজরাইলিরা ঠিক এটাই চেয়েছিল। কিন্তু তারা সেই ফাঁদে পা না দিয়ে, কোনো বিকল্প চিন্তা না করে নিজেদের বর্তমান ভাগ্যকে মেনে নেয়। যেহেতু এই গ্রুপে অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্র ছিল, তাই তারা ক্যাম্পেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেন, যার নাম দেওয়া হয় ইবনে তাইমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে মুখাইয়াম ক্যাম্পটি একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

মারজ আল জুহুরে এসে ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে থাকা হামাসের নেতারা প্রথমবারের মতো পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মত-বিনিময়ের সুযোগ পায়। তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সাময়িক এই নির্বাসনটি তাদের জন্য শাপেবর হয়ে ওঠে। শুধু বাইরে থাকা নেতাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগই নয়; ভেতরে ছিল অথচ যোগাযোগ ছিল না– এমন মানুষদেরও আবার নতুন করে এই ক্যাম্পে পাওয়া যায়।

সাধারণত ইজরাইলি অবরোধ, এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার বিধিনিষেধের কারণেই এক দেশে থাকার পরও হামাস নেতারা সহজে একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেত না। মারজ আল জুহুরে যেহেতু অবারিত মেলামেলার সুযোগ পেয়েছিল, তাই তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। কাজটি হলো– নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দলের নীতি ও কৌশলের ব্যাপারে যতটুকু ভিন্নমত ছিল, তা নিবারণ করার চেষ্টা। তা ছাড়াও তারা তাদের জনসম্পদ ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যাপারে একটি মূল্যায়ন করেন। একই সঙ্গে বিগত বছরগুলোতে একের পর এক বিপর্যয়ের কারণে নেতৃত্বে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেগুলোও পুনর্নির্ধারণ এবং ফিলিস্তিনের ভেতর-বাইরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনে প্রচেষ্ট চালান। আর সফলও হন। নির্বাসনে থাকা অবস্থায় আরেকটি বড়ো কাজ তারা করেন তা হলো– সামরিক প্রশিক্ষণ। হামাস এই সুযোগে বিতাড়িত ও নির্বাসিত মানুষদের নানা ধরনের সামরিক কৌশল এবং হাতিয়ার ব্যবহারের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়।

দুইজন ইজরাইলি সেনার অপহরণকে কেন্দ্র করে হামাস যে সংকটে পড়ে, তার আগে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো হামাসের নামই সেভাবে জানত না। আর জানলেও তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করত না। হামাসের কার্যক্রম কী কিংবা হামাস কী অর্জন করতে চায়, তা নিয়েও তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এবারের সংকটের পর

বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা হামাস নিয়ে আগ্রহী হয়। তারা হামাসের ওপর নতুন নতুন রিপোর্ট, গল্প রচনা ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করে। ফলে হামাস অল্প সময়েই গোটা পৃথিবীতে আলোচিত সংগঠনে পরিণত হয়।

কিছু মানুষ যারা নির্বাসনে ছিলেন যেমন : ড. আব্দ-আল আজিজ রানতিসি, ড. মাহমুদ আল জাহার অধ্যাপক আজিজ দুয়াক নিয়মিত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, কথা বলেন, সাক্ষাৎকার দেন। অধ্যাপক আজিজ দুয়াক একবার সিএনএন-এর 'ল্যারি কিং লাভ' অনুষ্ঠানে আসেন। সেই দিনটি ছিল বড়োদিন এবং অধ্যাপক দুয়াক তার বক্তব্যে গোটা বিশ্বের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি বড়োদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন– তার মতো কিছু খ্রিষ্টানও আছে, যারা জিরো ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যেও একটি উদ্বাস্তু শিবিরে এবারের বড়োদিনটি পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তার এই বার্তা হামাসকে ভিন্নভাবে গোটা বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এমনকী বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে পরিচিত করায়; সবাইকে নাড়া দিয়ে যায়। ফলে একদিকে ফিলিস্তিনের সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নতুনভাবে সৃষ্টি, অন্যদিকে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি নানা পর্যায়ে হামাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এমনকী জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ পশ্চিমা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও হামাসের যোগাযোগ তখন থেকেই শুরু হয়।

নির্বাসনে যাওয়ার প্রায় ৮ মাস পর ১৯৯৩ সালের ১৫ আগস্ট এই নির্বাসিত ব্যক্তিরা ইজরাইলের একটি প্রস্তাবে রাজি হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রায় অর্ধেক নির্বাসিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এবং বাকিদের ডিসেম্বরের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসেই ১৮১ জন নিজ ভূমিতে ফিরে যায়। এদের বেশিরভাগ নিজেদের ঘরে ফেরে। অবশ্য এর মধ্য থেকে কাউকে আবার ইজরাইলি কারাগার বা ডিটেনশন সেন্টারেও নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পিএলও ও ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের মধ্যে 'ডিক্লেরেশন অব প্রিন্সিপাল' স্বাক্ষরিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর অবশিষ্ট নির্বাসিত ব্যক্তিদের দখলকৃত ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এবারও কাউকে বাড়িতে না পাঠিয়ে সরাসরি কারাগারে পাঠানো হয়।

অধ্যায়-৪

হামাস প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব ও কর্মকৌশল

এতক্ষণ ফিলিস্তিনের তৎকালীন ইতিহাস, আরব-ইজরাইল যুদ্ধ, বিভিন্ন দেশে ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠা ও ভূমিকা, ফিলিস্তিন ইখওয়ানের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বিবর্তনের দৃশ্যপট, প্রথম ইন্তিফাদা এবং হামাসের আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা অব্যাহত থাকবে; বরং আমি বলব, পাঠকদের জন্য চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় বিষয়গুলো বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বেশি পাওয়া যাবে। তবে হামাসের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি যেহেতু চলে এসেছে, তাই এখন দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন চিন্তাধারা, দলীয় ঘোষণাপত্র, সংবিধান এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো উপস্থাপন করা সমীচীন হবে। এই অধ্যায়টি পাঠকসসমাজ তো বটেই, পাশাপাশি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জন্যও চিন্তার খোরাক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কেননা, এখানে হামাসের প্রতিষ্ঠাকালীন সনদ নিয়ে যেমন কথা বলা হয়েছে, একই সঙ্গে ঘোষণাপত্রের যে দিকগুলো সমালোচনার শিকার হয়েছে– সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি হামাস দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে যে সংশোধনগুলো এনেছে, তা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্র বা দলীয় কর্মকৌশলগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা, এই কর্মকৌশল ও দলীয় অবস্থান তৎকালীন ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়েই করা হয়েছে। এই কর্মকৌশল ও ঘোষণাপত্র ফিলিস্তিনের মানুষকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল বলেই হামাস পশ্চিমা জগতের নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও জনগণের ভোটে বিজয় লাভ করেছিল। দলীয় কাঠামোর এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে আমরা আবারও হামাস প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের দিকে ফিরে যাব।

এ কথা ঠিক, হামাস তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ভীষণ ভুল বোঝাবুঝির শিকার। পশ্চিমারা যেমন হামাস সম্বন্ধে নিজেদের মতো ধারণা করে, তেমনই আরব বিশ্বের নেতারাও এর উদ্দেশ্য নিয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিল না। এমনকী অনেকেই হামাসকে ইজরাইলিদের সৃষ্টি কিংবা তাদের মুক্তি-আন্দোলনের ঘোষণা জনগণকে বোকা বানানোর নাটক হিসেবেও বিবেচনা করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হামাসের সংবিধান, ঘোষণাপত্র ও নীতিগত অবস্থান সামনে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হামাস যদিও তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা রকম প্রতিকূল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছিল, তারপরও সেই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেন– 'আমি পুরো বিশ্বকে একটা কথা খুব জোর গলায় জানিয়ে দিতে চাই। ইহুদিরাষ্ট্র হওয়ায় আমরা ইজরাইলিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি- ব্যাপারটি এমন নয়। আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি কেননা, ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের হত্যা করেছে, মাটি দখল এবং বাড়িঘর কেড়ে নিয়েছে। তারা নারী ও শিশুদের ওপর অন্যায়ভাবে হামলা এবং আমাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন আমরা শুধু আমাদের হারানো অধিকারটুকুই ফেরত চাই, আর কিছু নয়। আর এ অধিকার ফিরে পেতেই আমরা এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছি।'

শেখ আহমাদ ইয়াসিনের ওপরের কথাটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় 'দ্যাট ইজ উই স্ট্রাগল ফর' (এই কারণেই আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি) এই বক্তব্যটিতেও। আর এটাই ছিল ১৯৯০ সালে রচিত হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর পক্ষ থেকে রচিত একটি ঘোষণাপত্রের[৪৭] প্রধান শিরোনাম। এই ঘোষণাপত্রকে হামাসের পক্ষ থেকে প্রথম মেমোরেন্ডামও বলা হয়। সেই সময়ে আম্মানে কর্মরত ইউরোপীয় কূটনৈতিকরা হামাসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে চাইলে হামাসের রাজনৈতিক শাখা এই মেমোরেন্ডামটি রচনা করে। লেখাটির শুরুতে আরও বলা হয়- 'ইসলামিক রেসিসটেন্ট মুভমেন্ট (হামাস) মূলত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য– দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।'

পূর্বে হামাসের যে সনদ রচিত হয়েছিল, সেই তুলনায় এই রাজনৈতিক কলামটির ভাষ্য ও প্রকাশভঙ্গি অনেকটাই আলাদা। হামাসের সনদটি ছিল আরবি ভাষায়। এর নাম ছিল আল মিথাক (অঙ্গীকারপত্র)। সনদপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল– হামাস আসলে কী করতে চায় তা মানুষকে জানানো। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালের

---

৪৭. এই অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশে গোটা মেমোরেন্ডামটি পাওয়া যাবে।

১৮ আগস্ট অর্থাৎ হামাস প্রতিষ্ঠা হওয়ার নয় মাসের মধ্যেই। এরপর থেকে হামাস নেতারা এই সংবিধানের কথা বলেছেন বা এর কোনো বক্তব্যকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে হামাস নেতাদের ভাষ্য দৃশ্যত ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা বা পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবীর মতোই মনে হয়েছে। সেই নেতিবাচক ভাবমূর্তি থেকে বের হয়ে আসার নিমিত্তে ২০০৪ সালের ৭ই মার্চ ইজ্জাদিন আল কাসসামের তাদের ওয়েবপেইজে একটি বিবৃতিটি প্রকাশিত করে। গাজায় অবস্থানরত হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা ড. আব্দ-আল আজিজ রানতিসি এই বত্তব্যটি রচনা করেন। বিবৃতি প্রকাশের ১০ দিন পরেই তিনি ইজরাইলিদের হাতে শহিদ হন। বিবৃতিটি ছিল–

হামাসের সকল কর্মকৌশল মূলত চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা :

- আমাদের জন্মভূমিটি অন্যায়ভাবে দখলদাররা কবজা করেছে, কিন্তু আমরা এই মাটির এক ইঞ্চিও ছাড় দেবো না।
- আমাদের শত্রু তথা ইহুদিদের পক্ষে ক্ষমতাধরদের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে, যা এই মুক্তিসংগ্রামে খুবই স্পষ্ট। এই অন্যায্য সহযোগিতা ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে।
- আমাদের শত্রুরা যেভাবে রণসজ্জায় সজ্জিত, আমরা সেভাবে অস্ত্রের প্রয়োগে বিশ্বাস করি না। তবে আমাদের বুকে আছে দৃঢ় বিশ্বাস, যা আমাদের অভ্যন্তরে এক ধরনের সংকল্প তৈরি করে। আর তা হলো লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরাজয় স্বীকার করব না এবং নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটব না। আর এই বিশ্বাস আমাদের ধর্ম, যা জন্মভূমির প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার সাহস জোগায়।
- গোটা আরব ও মুসলিম উম্মাহ প্রকৃতার্থে দুর্বল, ক্ষীণকায় ও বিভক্ত। তাই তারা ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে এক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ফিলিস্তিনি জনগণের আবেগ, অনুভূতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তারা ইহুদিদের নগ্নভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেই যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হামাসের কার্যক্রমের দুটি লক্ষ্য রয়েছে–

  ১. দখলদারদের প্রতিরোধ এবং ইহুদি আগ্রাসনকে মোকাবিলা করা

  ২. ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষা এবং সব ধরনের অভ্যন্তরীণ বিভাজন থেকে ফিলিস্তিনের মানুষকে হেফাজত করা। কেননা, বিভক্তি-বিভাজন সব সময়ই প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করে।

উল্লেখ্য, হামাসের প্রথম সনদটি শুরু থেকেই সমালোচনার মুখে পড়ে। কেননা, সমালোচকরা একে বরাবরই কট্টর লেখনী এবং ইহুদিবিরোধী একটি দলিল হিসেবেই বিবেচনা করত। ১৯৯০ সালের শেষ অবধি এই সংবিধান নিয়ে হামাসের ভেতরেও কেউ তেমন একটা ভাবেনি। প্রাথমিকভাবে এই সংবিধান প্রণয়ণের পেছনে হামাসের উদ্দেশ্য ছিল— ফিলিস্তিনের ভেতরে ও বাইরে থাকা আরবদের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরা। এর বাইরে দুনিয়ার অন্য মানুষরা হামাসকে কী চোখে বিবেচনা করল, তা নিয়ে খুব একটা ভাবনাও ছিল না।

যখন এই সংবিধানটি রচিত হয়, সে সময়ে এটাই ছিল হামাসের আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের একমাত্র প্রতিচ্ছবি। হামাস জন্ম নিয়েছিল ইখওয়ানের জঠর থেকে। তাই ফিলিস্তিন বিষয়ে ইখওয়ানের যা ধ্যানধারণা কিংবা ইখওয়ান যেভাবে বহির্বিশ্বকে বিবেচনা করত, হামাসের সংবিধানে তা-ই প্রতিফলিত হয়। এই সংবিধানের প্রথম পৃষ্ঠা শুরু হয়েছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত দিয়ে। সেখানে সূরা আল ইমরানের ১১০-১১২ নং আয়াত লেখা ছিল। এর পরই ছিল ইমাম হাসান আল বান্নার একটি মন্তব্য, যেখানে তিনি বলেছিলেন— ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং টিকে থাকবে, যতক্ষণ না ইসলাম একে সমূলে উচ্ছেদ করে; যেমনটা আগেও করেছিল।'[৪৮]

তবে পরবর্তী সময়ে হামাসের অনেক নেতাই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে পারেনি। তারা দলীয় কৌশল নির্ধারণে কিছুটা নমনীয় হতে চাইলেও পারছিল না। কেননা, এই সংবিধানটি তাদের চিন্তাধারার বাস্তবায়নে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছিল। অনেকেই মনে করছিল, যে পরিমাণ সময় ও যত্ন নিয়ে সংবিধানটি রচনা করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। আবার সংবিধানটি রচনা হওয়ার পরও হামাসের অঙ্গসংগঠনগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো আলোচনায় বসেনি। খালিদ মিশাল মনে করতেন, এই সংবিধানটি সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংগঠনের একটি অপরিহার্য দলিল হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছিল; তেমন ভাবনা-চিন্তা করে লেখা হয়নি। তিনি আরও মনে করতেন, এই সংবিধান প্রকৃতার্থে হামাসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি। তিনি এটিকে শুধু একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করতেন, যার মাধ্যমে হামাসের প্রতিষ্ঠাকালীন দর্শন অনুধাবন করা যায়। আবার এই দলিল কোনো মৌলিক বিষয়ও ছিল না, যেখান থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুত হওয়া যাবে না। আবার এমনও নয়, সকল কার্যক্রম এই সংবিধানের মাধ্যমেই বৈধতা দিতে হবে।[৪৯] ইবরাহিম গোসেহও

---

৪৮. হামাসের প্রথম চার্টারে এই উদ্ধৃতিটি আছে। চার্টার বা সনদটি পরবর্তী সময়ে সংযোজন করা হয়েছে।
৪৯. হামাস : এ স্টোরি ফ্রম উইথিন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন– 'সংবিধানের কোনো ধারাই ঐশীবাণী নয়। এগুলো প্রয়োজন অনুসারে পর্যালোচনা ও সংশোধনও করা যাবে। তবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু না হয়।'

বাস্তবতা হলো, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় ইন্তেফাদার আগ পর্যন্ত সংবিধান প্রশ্নে হামাসের ভেতরে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি। যদিও হামাস নিয়ে যতটুকু বিতর্ক ছিল, তার অন্যতম কারণই এই সংবিধানটি। প্রতিষ্ঠার অনেকটা সময় পরে হামাসের নীতি-নির্ধারকরা উপলব্ধি করলেন, তাদের চিন্তাধারার খুব সামান্যই এই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে।[৫০]

হামাসকে বরাবারই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইজরাইল তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কারণে। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নীতি-নির্ধারকরা বুঝতে পারলেন, এই একপেশে নেতিবাচক প্রচারণার বিপরীতে তাদেরও কিছু করা দরকার। বহির্বিশ্বের সঙ্গে হামাসের যোগাযোগ তখন খুব একটা ভালো ছিল না। ৯০'র দশকের মাঝামাঝি হামাসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা জর্ডানে অবস্থান করতেন। সেই সময়ে তাদের সঙ্গে পশ্চিমা কূটনীতিকদের যোগাযোগ থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা স্তিমিত হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে হামাস আবারও অনুভব করে, সংগঠনের ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনার পর সকল ইসলামি সংগঠনকে আল কায়েদার সঙ্গে মেলাতে শুরু করছিল– এটা হামাসের জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। বিশেষ করে গোটা পশ্চিমা মিডিয়ায় পলিটিক্যাল ইসলামকে ভয়ংকর দানবীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। আর এই প্রচারণার নেপথ্যে কাজ করেছিল ইজরাইল।[৫১]

এসব বিষয় সামনে রেখে ২০০৩ সালের প্রথমার্ধ থেকে ২০০৫ সালের শেষ অবধি হামাসের নেতারা নিজেদের মধ্যে সিরিজ বৈঠক করেন। তারা সংগঠনের সনদটিকে

---

[৫০]. হামাস : এ স্টোরি ফ্রম উইথিন।

[৫১]. ৯০'র দশকের শুরুর দিকে তৎকালীন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সে সময় তিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে যুক্তরাষ্ট্র পলিটিক্যাল ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে ইজরাইলকে সহযোগিতা করে। রবিন পলিটিক্যাল ইসলামকে বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। শুধু ফিলিস্তিন নয়; বরং আলজেরিয়া, মিশর ও তিউনেশিয়ার মতো দেশ, যেখানে পলিটিক্যাল ইসলাম ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর হওয়ার জন্য রবিন আহ্বান করেন।

পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে একমত হন। এই দীর্ঘ আলোচনার পরিণতিতে নতুন আরেকটি সংবিধানের খসড়া প্রণীত হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারিতে ফিলিস্তিনে নির্বাচনে হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর সংবিধান রচনা ও প্রণয়নের কাজটি আবারও স্থগিত হয়।

হামাসের প্রথম সনদ[৫২]

> 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তাহলে ওদের জন্যই ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার থাকলেও অধিকাংশই পাপাচারী। সামান্য কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পিছু হটবে। কেননা, তাদের সাহায্য করা হবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে, সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওদের ওপর এসেছে আল্লাহর গজব। ওদের ওপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এ জন্য, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ওরা নাফরমানি করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।' সূরা আলে ইমরান : ১১০-১১২
>
> 'ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং টিকে থাকবে, যতক্ষণ না ইসলাম একে সমূলে উচ্ছেদ করে; যেমনটা আগেও করেছিল।' –শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না।
>
> 'গোটা মুসলিম জাহান এখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই এই মুহূর্তে সকলের প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো– অপরের জন্য অপেক্ষা না করে, অন্যরা কী করছে তা না ভেবে বরং নিজের থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, যাতে জ্বলন্ত সেই আগুনকে সে তার মতো করে হলেও একটু কমিয়ে বা নিভিয়ে দেওয়া যেতে পারে।' –শায়খ আমজাদ আল জাওয়াভি

---

৫২. হামাসের প্রথম চার্টারটি ছিল আরবি ভাষায়, যার নাম ছিল আল মিখাত হামাস। ১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসস্থ ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন ফর ডালাসের পক্ষে মুহাম্মাদ মাকদসি এটাকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। চার্টারটি ইংরেজি ভাষার লিংকও রেফারেন্স বিভাগে ২৬ নং সূত্রে দেওয়া আছে।

সূচনা : সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আমরা শুধু তাঁরই সাহায্য, নিয়ামত, করুণা ও হিদায়াত কামনা করি। দরুদ ও সালাম পেশ করি মানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবার, তাঁর সকল সাহাবি ও সহযোগী এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর।

হে মানব সকল, যারা বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সাগরের মাঝে বসবাস করছেন, যে বিশ্বাসী মানুষগুলো শুধু আল্লাহর আদেশ মেনে, তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় দায়িত্বানুভূতির সাথে সংগ্রাম করছেন। তাদের সেই দায়িত্বানুভূতি হলো সেই নিষ্কণ্টক বীজ, যা সকল হতাশার মাঝেও আমাদের আশাবাদী করে। সব ধরনের বাধা– বিঘ্নতা আর প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমাদের লড়াই করার অনুপ্রেরণা জোগায়, সাহস বাড়ায়।

যখন এই আন্দোলনের চিন্তাটি ক্রমশ পরিণত এবং বীজটা গভীরে রোপিত হয়, তখনই আস্তে আস্তে গাছটি বেরিয়ে আসে। এই গাছটার শিকড় অনেক গভীরে। পুরোপুরি বাস্তব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এবং সব ধরনের অলীক কল্পনা ও মোহকে হটিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে সংগঠনটি তার ন্যায্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। যারা স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর লড়াই করে যাচ্ছেন, সেই সব মুজাহিদের হাতে হাত রেখেই হামাস সামনে এগোতে চায়। রাসূলুল্লাহর (সা.) সাহাবিদের হাতে ফিলিস্তিন জয়ের পর থেকে এই মাটিতে যতজন শহিদ হয়েছেন, তাদের সকলের মতো হামাসও একই চেতনা লালন করে।

এটা হামাসের সংবিধান, যেখানে সংগঠনটির প্রকৃতি, পরিচয়, অবস্থান, প্রত্যাশাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের লড়াই খুবই কঠিন এবং এই লড়াইয়ে অনেক বেশি আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এটা এমন এক লড়াই, যেখানে একটি ধাপের সফলতার জন্য পরের ধাপের সফলতার প্রয়োজন, একটি ব্যাটেলিয়নের বিজয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাটেলিয়নের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আমাদের আরববিশ্ব ও মুসলিম জগতের সকল ব্যাটেলিয়নের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তাদের উদ্দেশ্য করে আমরা কুরআনের ভাষায় বলতে চাই–

> 'তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।' সূরা সোয়াদ : ৮৮
>
> 'আল্লাহ লিখে দিয়েছেন– আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' সূরা আল মুজাদালাহ : ২১
>
> 'বলে দিন– এই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা বুঝে-শুনেই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই। আল্লাহ পবিত্র; আর আমি মুশরিক নই।' সূরা আল ইউসুফ : ১১২

প্রথম পর্ব

আন্দোলনের সূচনা

আদর্শগত উৎপত্তি : অনুচ্ছেদ-১ : ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন ইসলামই এর পদ্ধতি। ইসলাম থেকেই এর ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এই সংগঠনের মৌলিক কৌশল কিংবা বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সবই ইসলামের ভিত্তিতে। ইসলাম অনুসারে এর কৌশল নির্ধারিত হয় এবং নিজেদের ভুলগুলো ইসলামের আয়নাতেই সংশোধন করা হয়।

মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক : অনুচ্ছেদ-২ : হামাস ফিলিস্তিনের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একটি শাখা। ইখওয়ানুল মুসলিমিন একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলন। ইখওয়ানুল মুসলিমিন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামি আন্দোলন যা রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজসেবা, আইন ও বিচার, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশীলন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কাঠামো ও গঠন : অনুচ্ছেদ-৩ : হামাস সেই সব মুসলিম সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত, যারা শুধু আল্লাহর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

> 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।'
> সূরা জারিয়াত : ৫৬

এই মানুষগুলো নিজেদের, জনগণের এবং দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। তারা হৃদয়ে তাকওয়া ধারণ এবং জিহাদের পূর্ণ চেতনা নিয়ে সকল চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ জন্য কোনো ধরনের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করতে ভয় পায় না।

> 'বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।' সূরা আল আম্বিয়া : ১৮

অনুচ্ছেদ-৪ : যে সকল মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হামাসের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মকৌশলের সাথে একমত হয়ে এই সংগঠনে যোগ দিতে চায়, তাদের সকলকেই আন্তরিকভাবে স্বাগতম ও অভিনন্দন।

হামাসের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য : অনুচ্ছেদ-৫ : ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে বিবেচনার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা থেকেই হামাসের উৎপত্তি। আল্লাহ আমাদের মালিক, রাসূল (সা.) আমাদের নেতা এবং কুরআন আমাদের সংবিধান।

ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়েছে– এ রকম মানুষ যেখানেই পাওয়া যাবে, তিনি এই সংগঠনের সাথে আত্মিকভাবে গণ্য হবেন। তাই এই আন্দোলনের শিকড় পৃথিবীর অনেক গহিনে, এর সর্বোচ্চ চূড়া জান্নাতে।

> 'তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ তায়ালা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন– পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।' সূরা আল ইবরাহিম : ২৪-২৫

ভিন্নতা এবং স্বাধীনতা : অনুচ্ছেদ-৬ : হামাস ফিলিস্তিনের মাটিতে একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন। এই আন্দোলন সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে। এটা ইসলামকে সকল কৌশলের নিয়ামক হিসেবে নির্ধারণ এবং কালিমার পতাকাকে ফিলিস্তিনের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে উড্ডয়ন করার স্বপ্ন দেখে। কেননা, কেবল ইসলামের ছায়াতলেই সকল মতের, ধর্মের ও বিশ্বাসের মানুষকে স্বস্তি ও তাদের অধিকারও নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলাম না থাকলে বরং অনধিকার, প্রতিহিংসা, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম; এমনকী যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেছেন– 'যখন একজন মানুষের ঈমানটাই হারিয়ে যায়, তখন সে তার নিরাপত্তাই হারিয়ে ফেলে। সে নিজেও তখন অন্য কারও জন্য নিরাপদ থাকে না। আর যে মানুষটি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চেষ্টা করে না, প্রকৃতপক্ষে তার কাছে জীবনের কোনো অর্থও থাকে না। তার কাছে জীবনটা থেকে যায় উদ্দেশ্যহীন। অন্যদিকে, যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ম ছেড়ে জীবনে সুখ খুঁজে পায় বা মনে করে ধর্ম না থাকলেও সুখী হওয়া সম্ভব, প্রকারান্তরে এ ধরনের মানুষ তার বন্ধু ও সহযোগীদের ধ্বংসের কারণ হয়।'

ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলনের বিশ্ববিদ্যালয় : অনুচ্ছেদ-৭ : বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা হামাসের এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। তারা এই আন্দোলনকে সহায়তা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন। এর আদর্শিক ও উদ্দেশ্যগত স্বচ্ছতার কারণে এই কাজটির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে আমাদের আন্দোলনকে মূল্যায়ন করাই হবে ন্যায়সংগত। যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে না, সে নিজের ভাগ্যকেই বিপর্যয়ে ফেলবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি বাস্তবতাকে না দেখে অজান্তে বা অবচেতনভাবে চোখ বন্ধ রাখে, তাহলে হঠাৎ একদিন অনুভব করবে– এই পৃথিবী তাকে রেখে সামনে এগিয়েছে; তবে এটা কখনোই কাম্য নয়।

ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছ থেকে যদি আঘাত আসে, তাহলে তা শত্রুর ধারালো তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক।

> 'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি। কেননা, তিনি চেয়েছিলেন তোমাদের যে ধর্ম দিয়েছেন, তার মাধ্যমেই তোমাদের পরীক্ষা নেবেন। অতএব, অধিক তৎপর হয়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সেই বিষয়, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।' সূরা আল মায়েদাহ : ৪৮

জায়োনবাদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে চলছে, হামাস তারই সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে আমাদের ইজ্জাদিন আল কাসসামের ভাইরা যে লড়াই শুরু করেছিলেন, আমরা তারই ধারাবাহিকতা বহন করছি। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮ এবং ১৯৬৮ সালে মুসলিম ব্রাদারহুড নতুনভাবে যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, আমরা সেই চেতনারও ধারক। যত সময়ই লাগুক না কেন, হামাস সক্রিয়ভাবে আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করে যাবে। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন–

> 'শেষ বিচারের দিনটি ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুসলিমরা তাদের হত্যা করবে। ইহুদিরা তখন বাঁচার জন্য একটি পাথর বা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকাবে, কিন্তু সেই পাথর বা গাছও তখন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং বলবে– "আমার পেছনে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে।" শুধু ঘারকাদ নামক গাছটি এমন করবে না। কেননা, এই গাছটার মালিকও হবে ইহুদি।' বুখারি ও মুসলিম

হামাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : অনুচ্ছেদ-৮ : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল (সা.) এই আন্দোলনের নেতা। কুরআন আমাদের সংবিধান। জিহাদ আমাদের পদ্ধতি। আর আল্লাহর পথে শাহাদাত আমাদের শ্রেষ্ঠতম কামনা।

⊱ দ্বিতীয় পর্ব ⊰

লক্ষ্য : অনুচ্ছেদ-৯ : হামাস এমন একটা সময়ে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যখন ইসলামিক চেতনার অভাব প্রকট হচ্ছে। একদিকে যেমন মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপরদিকে অপতৎপরতা, অপশক্তি, নিপীড়ন অন্ধকার মারাত্মক আকার ধারণ করছে। বিভিন্ন দেশ দখল হয়ে যাচ্ছে। দখলকৃত দেশের লোকজন চরম অসহায় ও অপমানজনক অবস্থায় আছে। সত্যপন্থি জাতিগুলো লোকসানে আর মিথ্যানির্ভর জাতিগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যতক্ষণ না ইসলাম তার হকপন্থি চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে, ততক্ষণ এই অবস্থা চলবে; বরং আরও খারাপের দিকে যাবে।

> 'আল্লাহ যদি একটি জাতিকে অপর জাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া জালিমের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।' সূরা বাকারা : ২৫১

অনুচ্ছেদ-১০ : হামাস সব সময় মজলুমের পক্ষে অবস্থান নেবে। সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে বিজয়ী আর মিথ্যাকে পরাভূত করবে।

⊱ তৃতীয় পর্ব ⊰

পদ্ধতি ও কর্মকৌশল

ফিলিস্তিন একটি ইসলামিক বিশ্বাসের নাম : অনুচ্ছেদ-১১ : হামাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি কিয়ামত পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। এই ভূখণ্ডের কোনো অংশ ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো দেশ বা জাতি, কোনো নেতা বা দল কেউ-ই ফিলিস্তিনকে ত্যাগ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। কেননা, ইসলাম এই ভূখণ্ডকে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য নির্ধারণ করেছে। শুধু ফিলিস্তিনের জন্যই এই নিয়ম নয়; মুসলিমরা যেখানে আছে, যে দেশগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে– প্রতিটির ব্যাপারে একই ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

এই বিষয়টা তখনই নির্ধারণ হয়ে গেছে, যখন মুসলিম সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো ইরাক ও শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) জয় করে। বিশাল এই এলাকা জয় করার পর এই ভূখণ্ডের কী পরিণতি হবে, তা নিয়ে উমর (রা.) সিনিয়র সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন– জমির যারা মালিক আছে,

তারা এই জমির সকল ফায়দা ও ফসল ভোগ করতে পারবে। তবে জমির প্রকৃত মালিকানা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের থাকবে। তাই এর অন্যথা করে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে যে যা সিদ্ধান্ত নিক না কেন, তা অন্যায় এবং গুরুতর অপরাধ।

> 'এটা ধ্রুব সত্য। তাই আপনি আনন্দচিত্তে আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।' সূরা আল ওয়াকিয়া : ৯৪-৯৫

হামাসের চোখে জাতি ও জাতীয়তাবাদ : অনুচ্ছেদ-১২ : হামাস মনে করে, জাতীয়তাবাদ মূলত ধর্মীয় আদর্শেরই একটি অংশ। কেননা, যখন কোনো মুসলিম দেশে শত্রুপক্ষ আগ্রাসন চালায়, তখন সেই শত্রুদের মোকাবিলা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ হয়ে যায়। এমনকী নারীরাও তখন নিজেদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং ক্রীতদাসরা তাদের মালিকের অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধে চলে যেতে পারবে বলে বিধান দেওয়া হয়েছে।

> 'নিশ্চয়ই সত্যপন্থি হিদায়াত সব ধরনের ভুল গোমরাহি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। যারা তাগুত ও অপশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে, তারা আসলে এমন একটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আছে, যা কখনোই ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।' সূরা আল বাকারা : ২৫৬

উদ্যোগ, শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন : অনুচ্ছেদ ১৩ : হামাস মনে করে, প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন, ফিলিস্তিনের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হলো গোটা ধর্মকেই ছেড়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের চেতনাটি এই আন্দোলনের কাছে ধর্মীয় চেতনার সমতুল্য।

> 'আল্লাহ তাঁর সকল কাজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আসলে এটা জানে না।' সূরা ইউসুফ : ২১

ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেউ এই প্রস্তাবকে অনুমোদন আবার কেউ-বা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেকেই আবার সম্মেলনে যোগ দিতে শর্তারোপও করেছেন। হামাস সম্ভাব্য এই অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এই মহলগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কী করেছে বা কী করতে পারে– সেটাও বেশ ভালোভাবেই জানা আছে। সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে হামাস মনে করে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কার্যত কোনো কাজে দেবে না। এই সম্মেলনগুলো প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের ভূমিতে ধীরে ধীরে অমুসলিমদের প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়।

> ‘ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হলো সরল পথ। যদি আপনি এই পবিত্র জ্ঞান লাভের পরও তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে কেউ-ই আল্লাহর কবল থেকে আপনাকে রক্ষা করতে বা সাহায্য করতে পারবে না।’ সূরা আল বাকারা : ১২০

জিহাদ ছাড়া ফিলিস্তিন সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এর বাইরে অন্য যেসব উদ্যোগ আছে যেমন : আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদি সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এখন অনেকেই ফিলিস্তিনিদের সম্মান, অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে! তবে ফিলিস্তিনিরা এসব কৌশলের তুলনায় অনেক বেশি মহান। কেননা, হাদিসে এসেছে–

> ‘শাম এলাকার (বৃহত্তর সিরিয়া) মানুষগুলো হলো এই পৃথিবীতে আল্লাহর চাবুক। এই জাতির লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ যাকে চান তার ওপর প্রতিশোধ নেন।’ আহমাদ ও তাবরানি

তিনটি পরিমণ্ডল : অনুচ্ছেদ-১৪ : ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার সংকটটি মূলত তিনটি পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলো হলো– ফিলিস্তিনি পরিমণ্ডল, আরব পরিমণ্ডল ও ইসলামিক পরিমণ্ডল। জায়োনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই তিনটি পরিমণ্ডলের কার্যকর ভূমিকার রাখার সুযোগ আছে। এর কোনো একটি পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করা হবে অন্যায়। কেননা, ফিলিস্তিন হলো ইসলামিক পরিমণ্ডলের একটি অংশ, আর এখানেই আছে মুসলিমদের প্রথম কিবলা এবং নবিজির মিরাজের স্মৃতি।

> ‘পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি; যিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। এই ভ্রমণটি করানো হয়েছিল যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।’ সূরা বনি ইজরাইল : ১

এটাই যেহেতু বাস্তবতা, তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য করণীয় হলো– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন। এ ক্ষেত্রে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য জিহাদ : অনুচ্ছেদ-১৫ : যখন শত্রুরা মুসলিমদের কোনো ভূমি দখল করে, তখন সেই ভূমি উদ্ধারে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হয়। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামটি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যানার হিসেবে জিহাদকেই ব্যবহার করতে হবে। সেটা সার্থকভাবে করার জন্য

ইসলামিক শিক্ষা ও জিহাদের প্রকৃত চেতনাকে গোটা উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষত ইসলামিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে গেলে, ইসলামিক ও প্রচলিত ঘরানার শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী, সংযোগস্থাপনকারী, সাংবাদিক ও ইসলামি আন্দোলন করছে– এমন যুবকদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে।

সালাহউদ্দিন আইউবির বিজয়ের পর সেই ভূখণ্ড কীভাবে আবার মিশনারিরা হাতিয়ে নিল, সেই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সালাহউদ্দিনের কাছে পরাজয়ের পর ক্রুসেডাররা ঠিকই বুঝেছিল, মুসলিমদের পরাজিত করতে হলে তাদের আদর্শকে সংশয়ের মধ্যে ফেলতে হবে, ঐতিহ্যকে মুছে দিতে হবে এবং মুসলিমদের স্বর্ণালি ইতিহাসকে পরিকল্পিতভাবে কলঙ্কিত করতে হবে। ঠিক এই কৌশল নিয়ে জেনারেল অ্যাডমুন্ড এলেনবাই জেরুজালেমে প্রবেশ করে বলেন– 'আজ ক্রুসেড শেষ হলো।' অন্যদিকে জেনারেল গুরুদ সালাহউদ্দিনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– 'সালাউদ্দিন দেখ, তোমার জেরুজালেমে আমরা আবার ফিরে এলাম।' বিভিন্ন রাজতান্ত্রিক দর্শন আদর্শিক আগ্রাসনের পথকে সহজ করে দিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ আমরা ফিলিস্তিনকে হারিয়ে ফেলেছি।

ফিলিস্তিন ইস্যুটি একটি ধর্মীয় ইস্যু। আমরা প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত করব। এখানে মসজিদুল আকসা আছে, যা বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই বিষয়টা গভীরভাবে ধর্মের সম্মানের সাথেও জড়িত।

মুসলিম প্রজন্মের প্রশিক্ষণ : অনুচ্ছেদ-১৬ : আমরা অবশ্যই আমাদের গণ্ডিতে থাকা মুসলিম প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেবো। এমন প্রশিক্ষণ; যাতে তারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে, নিয়মিতভাবে কুরআন পড়তে, জানতে ও মানতে উদ্বুদ্ধ হয়। সেইসঙ্গে নবিজির (সা.) হাদিস, জীবন-কর্ম এবং ইসলামিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিষয়গুলো সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো থেকে জানার চেষ্টা করে। যদি সঠিক শিক্ষানীতির আলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে তারা পৃথিবীকে ইসলামের চোখে দেখার মতো যোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে তাদের শত্রুপক্ষের শক্তি, তাদের বস্তুগত ও মানবিক সক্ষমতা, দুর্বলতা, কোন কোন শক্তি কীভাবে তাদের সাহায্য করছে এবং চলমান বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কেও সচেতন করতে হবে।

> 'হে আমার সন্তান! কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে শক্ত কোনো পাহাড়ের নিচে বা আকাশ ও জমিনের অন্য কোথাও, তবুও আল্লাহ ঠিকই তা উপস্থিত করবেন। আল্লাহর কাছে তা লুকোনোর কোনো সুযোগ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। হে আমার সন্তান!

> নামাজ কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' সূরা লোকমান : ১৬-১৮

মুসলিম নারীর ভূমিকা : অনুচ্ছেদ-১৭ : একটি ভূখণ্ড স্বাধীন করার জন্য নারীর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। কারণ, নারী ছাড়া পুরুষ আসবেই-বা কীভাবে। পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক পথে নিয়ে আসা এবং তাদের প্রশিক্ষিত করার মূল দায়িত্বটা নারীদেরই। আমাদের অনেকে এই দায়িত্বটি না বুঝলেও শত্রুরা কিন্তু ঠিকই বুঝেছে। তাই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করার কৌশল হিসেবে আমাদের নারীদের এই দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ জন্য তারা মিডিয়া ও সিনেমা জগতের পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। শিক্ষকদের তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন নানা সংস্থার মাধ্যমে মোটিভেশন করছে। ম্যাশন, রোটারি ক্লাব কিংবা ইন্টেলিজেন্স নানা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই কাজটি করে যাচ্ছে। যখন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের জীবন বিনির্মাণের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে, তখনই তাদের প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলো পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য।

অনুচ্ছেদ-১৮ : একজন মুজাহিদের বাড়িতে যে নারী আছেন, তার মৌলিক দায়িত্ব হলো বসতবাড়ির খেয়াল রাখা, সন্তানদের নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা, যাতে তারা জিহাদি দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচারাদিগুলো পালন করতে পারে। এ জন্য আমাদের কারিকুলাম ও স্কুলগুলো এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে নারীরা এই ধরনের দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। নারীরা অর্থ ব্যয়ে সাশ্রয়ী এবং বাহুল্যতা থেকে বিরত থাকবে– সংগ্রামের জন্য এটাও প্রয়োজন।

> 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।' সূরা আল আহজাব : ৩৫

স্বাধীনতা আন্দোলনে ইসলামিক আর্টের ভূমিকা : অনুচ্ছেদ-১৯ : আর্ট বা চিত্রকলার কিছু নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য আছে, যা দেখলেই বোঝা যায়– এটা ইসলামিক নাকি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলামের স্বাধীনতার জন্য ইসলামিক আর্টের বিকাশ প্রয়োজন। কারণ, এই ধরনের সৃষ্টিশীল কার্যক্রম কোনো একটি মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে নয়; বরং মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেয়।

একজন ইসলামিক আর্টিস্ট তিনি বই, কলাম, নিউজলেটার, আবৃত্তি, প্যামফ্লেট, কবিতা, নাশিদ, নাটক কিংবা যে বিষয়ে পারদর্শী হোক না কেন, তা সব সময় আদর্শিক ও প্রকৃত শিক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকতে হবে। কারণ, এই জগতের মানুষদের অনেক ধরনের সংগ্রাম-সাধনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তাই প্রত্যাশিত চেতনা সব সময়ই দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এর অন্যদিকও রয়েছে। যখন একজন আর্টিস্ট-এর মন হতাশায় ডুবে যায়, তখন ইসলামিক আর্ট তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করে; তার হৃদয়ে পুনরায় উত্তেজনা ও কর্মস্পৃহা ফিরিয়ে আনে।

সমাজকল্যাণ : অনুচ্ছেদ-২০ : মুসলিম সমাজ কাঠামোগতভাবে অনেকটা সমবায়ী সমিতির মতো। রাসূল (সা.) বলেছেন– 'সবচেয়ে ভালো মানুষ হলো আশারাইত সম্প্রদায়ের লোক। যখন তারা কোনো সমস্যায় পড়ে– তা বাড়িতে কিংবা ভ্রমণে থাকা অবস্থায়, তারা নিজেরা নিজেদের সব সম্পদ একত্রিত করে এবং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।' আর এটাই মুসলিম সমাজের অন্তর্নিহিত চেতনা হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে এই চর্চা কমে যাচ্ছে এবং প্রতিপক্ষরা একত্রিত হয়ে আমাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। তারা এখন মানুষের জমি কেড়ে দিচ্ছে, ডাকাতি করে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে, কারণে-অকারণে নারী ও শিশুসহ সব বয়সি মানুষকে হত্যা করছে।

এই নাৎসি ইহুদিরা শুধু পারে সন্ত্রাস, মানুষকে আতঙ্কিত এবং সম্পদ কেড়ে নিতে। তারা মানুষের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করে, তা কোনো পশুর সঙ্গে করাও বাঞ্ছনীয় নয়। কাউকে তার নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা প্রকারান্তরে তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

এই ধরনের বর্বর শত্রুকে মোকাবিলা করতে হলে সামাজিক প্রতিরোধের কোনো বিকল্প নেই। সবাই এক আত্মা, এক শরীর হয়েই শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের বন্ধন এতটাই মজবুত হবে যে, শরীরের একটি অঙ্গে আঘাত পেলে যেমন গোটা শরীরে তা অনুভূত হয়।

অনুচ্ছেদ-২১ : সমাজক ল্যাণের একটি কৌশল হলো– যার যা প্রয়োজন, তাকে তা সরবরাহ করা। এটা হতে পারে বস্তুগত সাহায্য, আধ্যাত্মিক কিংবা সমন্বিত কোনো সামাজিক প্রকল্প। আর হামাসে প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব হলো– তারা যেভাবে

নিজের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকবে, তেমনি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যও তারা সক্রিয় থাকবে। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো সুযোগ ছেড়ে দেবে না। জনগণের সুখে-দুঃখে শরিক হওয়া প্রতিটি হামাস সদস্যের অপরিহার্য কর্তব্য। এভাবে কাজ করলে সকলের মাঝে ভালোবাসা বেড়ে যাবে এবং জনগণের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। আর এই একতাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুকে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারব।

যে ক্ষমতাধররা আমাদের শত্রুদের সাহায্য করছে : অনুচ্ছেদ-২২ : আমাদের শত্রুরা আরও অনেক আগে তাদের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক অগ্রসর হচ্ছে। নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা বিপুল সম্পদও জমা করেছে। এই বিপুল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের সব গণমাধ্যম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছে। এই অর্থ বিনিয়োগ করেই তারা পৃথিবীর সব জায়গায় অস্থিরতা সৃষ্টি এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করছে। তারাই ফরাসি বিপ্লব, কম্যুনিস্ট বিপ্লবসহ বিখ্যাত সব বিপ্লবের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে। এই অর্থ ব্যবহার বিশ্বজুড়ে অসংখ্য গোপন সংস্থা চালু করেছে, যাদের কাজ হলো সামাজিক কাঠামোগুলো ধ্বংস এবং জায়োনবাদী আগ্রাসনকে আরও জোরদার করা। যেমন : ফ্রি ম্যাশন, রোটারি ও লায়ন ক্লাব। এই টাকা ও সম্পদ ব্যবহার করে তারা ঔপনিবেশিক শক্তি ও রাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে লালন-পালন করছে।

এই জায়োনবাদীদের ষড়যন্ত্রেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে। ফলে ইসলামি খিলাফতের পতন এবং তারা বিপুল পরিমাণ সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তারপর, বেলফোর ডিক্লেরেশনের মতো অন্যায্য একটি সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। তারা লিগ অব নেশনস-এর মতো একটি সংস্থা তৈরি করেছে, যাতে গোটা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারাই বাধিয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য সুবিধা আদায় করেছে। সেইসঙ্গে লিগ অব নেশনসকে বিলুপ্ত করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। এখনও পৃথিবীর যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তার মধ্যে এমন একটিও নেই, যার পেছনে তাদের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র কাজ করেনি।

> 'তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা দেশে দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।' সূরা আল মায়েদাহ : ৬৪

অতএব, বস্তুবাদী পশ্চিমা জগৎ এবং সমাজতান্ত্রিক প্রাচ্য তাদের সবটুকু সামর্থ্য ও সম্পদ দিয়ে আমাদের শত্রুদের সহযোগিতা করছে। যখনই বিশ্বের কোথাও ইসলাম তার স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সব অবিশ্বাসী বাতিলরা এক হয়ে তার মোকাবিলা করে। কারণ, সব অবিশ্বাসী এক আত্মা।

চতুর্থ পর্ব

ইসলামি আন্দোলন : অনুচ্ছেদ-২৩ : যারা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, হামাস তাদের প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। যদিও অনেকের সঙ্গে হামাসের চিন্তা ও দর্শনের ভিন্নতা রয়েছে, তারপরও তাদের প্রতি এই শ্রদ্ধা অটুট থাকবে। আর হামাস ততক্ষণ এই ভালোবাসা ধরে রাখবে, যতক্ষণ এই আন্দোলনগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হামাস এই সকল আন্দোলনকে নিজেদের জন্য সহায়ক এবং আল্লাহর দরবারে তাদের সফলতার জন্য দুআ করে।

> 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' সূরা আলে ইমরান : ১০৩

অনুচ্ছেদ-২৪ : হামাস কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় না। অভিশাপ দেওয়া বা কুৎসা রটনা করা মুমিনের কাজ নয়। তাই যখনই কোনো সংকট আসে, সত্যের প্রয়োজনে হামাস সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে সতর্ক করার চেষ্টা করে।

> 'আল্লাহ কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারও প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা আপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখ– আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহা শক্তিশালী।' সূরা নিসা : ১৪৮-১৪৯

ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : অনুচ্ছেদ-২৫ : সমসাময়িক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে হামাস চলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিচ্ছে এবং দিয়ে যাবে; যতক্ষণ না এটা সমাজতন্ত্র এবং ক্রুসেডবাদী পশ্চিমার আনুগত্য স্বীকার করে। হামাস কোনো ধরনের সুবিধাবাদকে সমর্থন করে না; বরং সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণই প্রত্যাশা করে।

> 'আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য। আর নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে থেকে যা কিছু পারো সংগ্রহ করো।' সূরা আনফাল : ৬০

অন্যদিকে, যারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করছে, তাদেরও এটা মেনে নিতে হবে– হামাস এই দেশের জন্য একটি ইতিবাচক ও সহায়ক শক্তি বই কিছু নয়। অতীত থেকে শুরু করে আজ অবধি হামাস যা বলেছে বা করেছে, এর মাধ্যমে তারা ফিলিস্তিনের জনগণকে একত্রিত করতে চেয়েছে;

কোনো বিভাজন চায়নি। তারা সংস্কার করেছে, ধ্বংসাত্মক কিছু করেনি। হামাস সব সময়ই আন্তরিক পরামর্শ, প্রকৃত সাধনা ও প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করেছে। যে বিতর্ক-বিভাজন বাড়ায়, হামাস তাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি। তারা কখনোই ধারণা বা গুজবকে পাত্তা দেয়নি।

> 'মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।' সূরা আল হুজুরাত : ৬

অনুচ্ছেদ-২৬ : হামাস মনে করে– ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচ্য বা পশ্চিমা শক্তির কাছে মাথা নত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে যেকোনো ধরনের আলোচনায় বসা যায়।

পিএলও : অনুচ্ছেদ-২৭ : পিএলও হলো হামাসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তারা আমাদের ভাই, পিতা, আত্মীয় বা বন্ধু। একজন মুসলিম কি কখনো তার ভাই, পিতা, আত্মীয় বা বন্ধুকে আঘাত করতে পারে? আমাদের জাতি এক, অবস্থান এক, গন্তব্য এক; এমনকী আমাদের শত্রুও একই। ঐতিহাসিক এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে পিএলও'র জন্ম হয়েছে। আদর্শিকভাবে যখন আমরা আগ্রাসনের শিকার হই, আরব দেশগুলো যখন কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, প্রাচ্যনীতি, মিশনারি কার্যক্রম ঔপনিবেশিকতার শিকার হয়ে যখন ক্রুসেডারদের কাছে পরাজিত হই, ঠিক সে ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে পিএলও'র জন্ম। আর নিজেদের কর্মকৌশল হিসেবে তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিটাকেই গ্রহণ করে নেয়।

ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ধর্মীয় নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আর নীতিমালা ও কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর ভিত্তিতে একটি সংগঠনের যাবতীয় কাজ, সিদ্ধান্ত ও অবস্থান নির্ধারিত হয়। আমরা পিএলও-কে সম্মান করি এবং আরব-ইজরাইলি সংগ্রামে তাদের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু তাই বলে কোনো কিছুর বিনিময়ে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসলামের ভবিষ্যৎকে ছাড় দিতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজেদের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না।

> 'ইবরাহিমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? এ তো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে।' সূরা আল বাকারা : ১৩০

যদি কখনো পিএলও ইসলামকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে একাত্ম হয়ে তাদেরই সেনা হিসেবে কাজ করব। একসঙ্গে লড়াই করে

শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, যাতে সেই মুহূর্তটি খুব জলদিই চলে আসে। যতক্ষণ এটা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত হামাসের সঙ্গে পিএলও'র সম্পর্ক হবে পিতা-পুত্রের কিংবা দুই ভাইয়ের সম্পর্কের মতো।

আরব দেশ ও ইসলামিক সরকার প্রসঙ্গে : অনুচ্ছেদ ২৮ : জায়োনবাদী আগ্রাসন খুবই ভয়াবহ এবং ব্যাপক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা এমন কিছু নেই যা করে না। ইজরাইলের চারপাশে যে মুসলিম দেশগুলো আছে, তাদের প্রতি ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিতে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। তারা যেন নিজেদের সীমান্ত ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের জন্য খুলে দেয়। কিন্তু তারা সম্মতি দেননি। আমরা শুধু মুসলিম দেশগুলোকে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ১৯৬৭ সালে ইহুদিরা যখন আমাদের প্রাণপ্রিয় বায়তুল আকসাকে দখল করে, তখন তারা মসজিদের সিঁড়িতে উল্লাস করে বলেছিল– 'মোহাম্মাদ মরে গেছে আর রেখে গেছে কতগুলো অকর্মণ্য নারীকে, যারা কিছুই করার যোগ্যতা রাখে না!' এখানে মুসলিমদের নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, নারীকে ছোটো করার জন্য নয়; বরং মুসলিমদের অক্ষম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য।

জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় সংস্থা, বুদ্ধিজীবী, আরব ও ইসলামিক জগৎ : অনুচ্ছেদ-২৯ : হামাস এসব প্রতিটি সংস্থা ও সংগঠনের প্রতি ঐকান্তিক টান অনুভব করে। তাদের সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে যেতে চায়। তাদের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে চায়। তারা যাতে হামাসকে মানবিক, বস্তুগত, মিডিয়া, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। হামাস নানা ধরনের সহায়ক সম্মেলন যথা– কলাম ও প্যামপ্লেট প্রকাশ করে ফিলিস্তিনের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে অবগত রাখতে চায়। কারণ, ইতঃপূর্বে যখন ক্রুসেডাররা আক্রমণ করেছিল, তখন মুসলিমরা একত্রিত হয়ে তাদের পরাজিত করে ইসলামিক সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

> 'আল্লাহ লিখে দিয়েছেন– আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' সূরা আল মুজাদালাহ : ২১

অনুচ্ছেদ-৩০ : আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে যত লেখক শিক্ষাবিদ, মিডিয়াকর্মী, প্রশিক্ষক ও অন্যান্য নানা ধারায় যারা নিয়োজিত আছেন, তাদের সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান– দয়া করে বিভিন্ন দেশে জায়োনবাদীদের আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন।

জিহাদ মানে শুধু অস্ত্র নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা নয়। সুন্দর বক্তব্য, তথ্যনির্ভর কলাম, সহায়ক গ্রন্থও অনেক বড়ো জিহাদ হতে পারে; যদি নিয়ত সহিহ এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য হয়।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে হামাসের অবস্থান : অনুচ্ছেদ-৩১ : হামাস একটি মানবতাবাদী সংগঠন। ইসলাম মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্য ধর্মের মানুষের ব্যাপারে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়, হামাস তারই চর্চা করে। তাই যারা ইসলাম ও হামাসের ন্যায্য সংগ্রামের ওপর আঘাত করে না, তাদের কাউকেই হামাস কখনো আঘাত করে না।

ইসলামের ছায়াতলেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের সহাবস্থান সম্ভব। ইসলামের অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার নজির রয়েছে। অন্যদিকে, যখন ভিন্ন ধর্মের কেউ রাষ্ট্রক্ষমতায় যায়, তার উচিত ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই না করা।

ইসলাম প্রত্যেককে তার অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় এবং যারা অধিকার কেড়ে নেয়, তাদের প্রত্যাখ্যান করে। ইহুদিদের সংগ্রাম ও লড়াই কখনোই চূড়ান্তভাবে টিকে থাকবে না। যদিও তারা দমন-পীড়নের মাধ্যমে টিকে আছে, তারপরও কিয়ামত অবধি আমরাই টিকে থাকব।

> 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' সূরা মুমতাহিনা : ৮

ফিলিস্তিনিদের একঘরে করার প্রচেষ্টা : অনুচ্ছেদ-৩২ : বিশ্ব জায়োনবাদ ও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ের প্রক্রিয়া থেকে আরব দেশগুলোকে বের করে আনতে পারে। এতে ফিলিস্তিন একা হবে। ইতোমধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মিশরকে সরিয়ে নিয়েছে। এখন চেষ্টা করছে অন্যান্য আরব দেশগুলোকেও নানা চুক্তির ফাঁদে ফেলে এই লড়াই থেকে বের করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে হামাস প্রতিটি মুসলিম দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, তারা যেন এই বিষয়ে সচেতন থাকে, অন্যকে সচেতন করে এবং কোনোভাবেই জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পিছু না হটে। কেননা, আজ ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে, দুদিন পর তা অন্য দেশে ঘটবে। এভাবে একটার পর একটা দেশ কবজায় নিয়ে নেবে। তারা নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত গোটা জনপদ নিজেদের আওতায় নিয়ে যেতে চায়।

> 'আর যারা সেদিন তাদের থেকে কোনো কৌশল বা নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে পিছু হটবে, অবশ্যই তারা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।' সূরা আনফাল : ১৬

আমাদের করণীয় হলো– সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে নাৎসি ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, নাহলে নিজেদের ভূমি হারাব, দেশ থেকে নির্বাসিত হব। এর ফলে অপশক্তিগুলো মাটিতে গেড়ে বসবে এবং নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামে হামাস নিজেদের অগ্রপথিক বিবেচনা করে। তারা ফিলিস্তিনের মাটিকে মুক্ত করতে এই লড়াই চালিয়ে যাবে। এখন আরব ও মুসলিম দেশগুলোর জনগণকে এবং অন্যান্য মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনকেও এই সংগ্রামে সহযাত্রী হতে হবে।

> 'আর ইহুদিরা বলে– আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিশাপ; বরং আল্লাহর হাত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পলনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরি আরও বেড়ে যাবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।' সূরা আল মায়েদাহ : ৬৪

অনুচ্ছেদ-৩০ : হামাস এই ধরনের কতগুলো সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাস, বিশ্বজনীন ভাষা এবং সকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সামনে এগোতে চায়। শত্রুর মোকাবিলা করতে চায়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য– মুসলিমদের, ইসলামিক সভ্যতা ধর্মীয় সকল স্থাপনাকে সুরক্ষা করা। এর মধ্যে মূল স্থাপনা হলো মুসলিমদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসা। এই লক্ষ্য পূরণে মুসলিম উম্মাহ, দেশগুলোর সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে উজ্জীবিত করতে চায়; তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগাতে চায়।

> 'যাদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে– তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সৎ পথের পথিককে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও শক্তিধর।' সূরা আল হাজ : ৪০

পঞ্চম পর্ব

ঐতিহাসিক দলিল

শত্রুর মোকাবিলা করার ইতিহাস : অনুচ্ছেদ ৩৪ : সৃষ্টির শুরু থেকেই ফিলিস্তিন গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ও আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেমনটা রাসূল (সা.) তাঁর প্রিয়তম সাহাবি মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন–

> 'আমার প্রস্থানের পর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য শাম এলাকাটি (বৃহত্তর সিরিয়া ও ফিলিস্তিন) উন্মুক্ত করে দেবেন। আল আইরিশ (সিনাই উপদ্বীপের একটি শহর) থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত গোটা এলাকার নারী-পুরুষ আর শিশুরা কিয়ামত পর্যন্ত অটল থাকবে। আর তোমাদের মধ্যে যে এই অঞ্চলের কোনো উপকূলীয় এলাকা জেরুজালেম পছন্দ করবে, মনে রাখবে তাকেও কিয়ামত অবধি জিহাদের মধ্যেই লিপ্ত থাকতে হবে।'

অনেকেই ফিলিস্তিনকে নিজেদের আয়ত্তে নিতে চেয়েছে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে উদ্দেশ্য হাসিল করেছে। একটা লম্বা সময় পর্যন্ত ক্রুসেডাররাও একই চেতনা নিয়ে মুসলিমদের পরাজিত করতে চেয়েছে। আর যতক্ষণ না মুসলিমরা ধর্মীয় চেতনায় একত্রিত হতে পেরেছে, ততক্ষণ তারা ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করতে পারেনি।

> 'ওদের জানিয়ে দাও– যারা সত্যকে অস্বীকার করছে, খুব শীঘ্রই তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, একত্রে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে সবাই কষ্টকর এক আজাবের বিছানার ওপর আরোহণ করবে।' সূরা আলে ইমরান : ১২

অনুচ্ছেদ-৩৫ : হামাস সব সময় সালাউদ্দিন আইউবির হাতে ক্রুসেডারদের পরাজয় ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা, আইনা জালুত যুদ্ধে কাতুজদের কাছে তাতারদের পরাজয় এবং তাতারদের অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে পৃথিবীর মুক্তিসহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি স্মরণ করে এবং তা থেকে শিক্ষা নেয়। আমাদের নিয়ত যদি সহিহ, প্রচেষ্টাগুলো সৎ, সোনালি অতীত থেকে শিক্ষা নিই এবং আদর্শিক আগ্রাসনের ফাঁদে না পড়ি, তাহলে এই মোকাবিলা কঠিন হবে না।

পুনশ্চ : অনুচ্ছেদ-৩৬ : হামাস বারবার ফিলিস্তিনের মানুষ, আরববিশ্ব বিশ্ব মুসলিমের কাছে স্পষ্ট করে বলছে– তারা কোনো জাগতিক খ্যাতি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কিংবা নিছক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার জন্য এত কিছু করছে না। এই আন্দোলন একমাত্র ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ব্যক্তি,

সংগঠন কিংবা রাষ্ট্রীয় সকল পরিচয়ের জন্য ইসলামকেই মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে। হামাসের কর্মীরা মূলত একজন সৈনিক। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের হিদায়াত দেন এবং সত্যের ওপর অটল রাখেন।

> 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।' সূরা আল আরাফ : ৮৯[৫৩]

সনদের সমালোচনা

প্রথম সমস্যাটি ছিল ভাষা নিয়ে। হামাসের প্রথম গঠনতন্ত্রে যে ধরনের শব্দ চয়নে রচিত, তা শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই সংকটের কারণে হামাস ফিলিস্তিনপন্থি ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার মুসলিম এবং ফিলিস্তিনের বাইরের অমুসলিমদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইখওয়ানের মতোই। যে সময় এই সংবিধানটি ইখওয়ানের ভাবধারায় তৈরি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে ইখওয়ান নিজেই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু হামাস সংশোধন করেনি।

এই সংবিধানটি দলীয় মানুষদের জন্য ঠিক থাকলেও জনসাধারণের জন্য খুব একটা প্রনিধানযোগ্য ছিল না। ধারণা করা হয়– গঠনতন্ত্রটি রচনা করেছিলেন আব্দ-আল ফাত্তাহ দুখান;[৫৪] যিনি ছিলেন হামাসের সাতজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন ইখওয়ানের ফিলিস্তিন শাখার অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শেখ ইয়াসিনের পর অনেকবার তিনি দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসেবে সংগঠনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। হামাসের প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান রচনার সময় তিনি গাজাতে ইখওয়ানের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৮৫ সালের মে মাসে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় শেখ আহমাদ ইয়াসিন মুক্তি পাওয়ার পর দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগ পর্যন্ত দুখানই দলকে পরিচালনা করেছেন। আর তখনই সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়।

---

৫৩. এই গঠনতন্ত্রটি ১৯৮৮ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত হয়।

৫৪. আব্দ-আল ফাত্তাহ দুখান ১৯৩৭ সালে আল মাজতলা জেলায় জন্ম নেন। ১৯৯২ সালে ইজরাইল যে ৪০০ জন ফিলিস্তিনিকে দক্ষিণ লেবাননে নির্বাসনে পাঠায়, তিনি তার একজন ছিলেন। তিনি বহুবার ইজরাইলিদের হাতে আটক ও কারাবরণ করেছেন। ২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি ফিলিস্তিনে যে সংসদ গঠিত হয়, তিনি ছিলেন সেখানকার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। তিনি ৪০ বছরের বেশি শিক্ষকতা করেন। কুরআনের দায়ি হিসেবে তার সুপরিচিতি ছিল। ১৯৯৫ সালে কায়রোতে পিএলও'র সাথে হামাসের যে সমঝোতা বৈঠক হয়, তিনি তার পেছনের অন্যতম কারিগর ছিলেন।

একনজরে গঠনতন্ত্রটিকে পড়লে মনে হবে, এটা কোনো সাংগঠনিক নোটিশ। এতে না হামাসের সত্যিকারের চেতনা ফুটে উঠেছিল, না বহির্বিশ্বের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বার্তা ছিল। যদিও সে সময়ে হামাসের অনেক নেতাই এ ধরনের গঠনতন্ত্র রচনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তারা এর ভাষা বা শব্দ নিয়েও কোনো আলোচনা-সমালোচনা করেননি। দৃশ্যত মনে হয়, প্রতিপক্ষ পিএলও'র সংবিধানের সাথে পাল্লা দিয়ে সংবিধানটি রচিত হয়েছে। পিএলও'র গঠনতন্ত্রটি ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার হওয়ায় তাতে ফিলিস্তিনি জনগণের ইসলামি চেতনাকে ধারণ করা হয়নি।

এখন হামাসের অনেক নেতাই অনুভব করেন, সংগঠনের আদর্শ ও চিন্তাধারাগুলো আরও সর্বজনীন ভাষায় প্রথম সনদে তুলে ধরা যেত। তাহলে এই গঠনতন্ত্র হয়তো মুসলিম-অমুসলিম সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেত। হামাসের অনেক নেতা মনে করেন, সকল বিষয়কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, যারা ভিন্ন ধর্মের মানুষ– তারা সেই ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারবে না।

ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের দখলদারিত্ব ও স্বাধীকার আন্দোলনটি একটি সর্বজনীন ইস্যু। তাই এর ওপর ভিত্তি করে সংবিধানটি রচনা করা উচিত ছিল। উচিত ছিল ফিলিস্তিন সংকটকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসহ সংবিধানে তুলে আনা। এই ইস্যুটির জন্ম সাম্প্রতিক সময়ে নয়; বরং ১৯ শতকে ইউরোপে এই সংকটের শিকড় রচনা করা হয়। ইউরোপিয়ানরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের মাথার ওপরে ঝুলতে থাকা ইহুদি সংকটকে ফিলিস্তিনিদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডে তথাকথিত ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতিহাসের এই বাস্তবতাটি সংবিধানে তুলে ধরলে তা বরং সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেত। কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবির যথার্থতা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়।

যেমন : প্রথম সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে মুসলিমরা ফিলিস্তিন জয় করে এবং একে ওয়াকফ জমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে যুদ্ধ বিজয়ের পর যেমন সেই ভূমিগুলো বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করার ছিল, ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে তা রহিত করা হয়। আর কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য এই জমি পবিত্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।[৫৫]

যারা শান্তিচুক্তির নামে ফিলিস্তিনের একটি অংশ ইজরাইলের হাতে তুলে দিতে চায়, তারা হামাসের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদকে বরাবর নিন্দা করেছে। কেননা, এই কথার কারণে শুধু আমেরিকা বা ইজরাইল নয়; বরং প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে,

---

৫৫. তথ্যসূত্র : হামাস চার্টার।

তাদের সাথেও হামাসের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। হামাসের অনেক দায়িত্বশীল মনে করেন, ফিলিস্তিনকে কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ করার এই বিষয়টি একান্তই ইসলামি শরিয়তের একটি পরিভাষা, যা সকলের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে।

হামাসের প্রথম সংবিধানের যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে বেশি সংকট হয়েছিল তা হলো- ইহুদিদের ব্যাপারে সংগঠনটির দৃষ্টিভঙ্গি। এ জন্য গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দচয়ন কিছুটা হলেও দায়ী। অধিকাংশ ফিলিস্তিনি নাগরিক ইজরাইলিদের 'ইয়াহুদ' বলেই আখ্যায়িত করে থাকে। ইয়াহুদ হলো ইংরেজি জিউস (Jews) শব্দের আরবি প্রতিরূপ। এখন জায়োনবাদী হিসেবে আমরা যেভাবে ইজরাইলিদের সম্বোধন করি, ফিলিস্তিনে এর খুব একটা প্রচলন ছিল না। যারা সেক্যুলার শিক্ষায় পড়াশোনা করেছে, তাদের কেউ কেউ জিয়োনিস্ট শব্দের সাথে পরিচিত ছিল। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা ইজরাইলিদের ইয়াহুদ হিসেবে আখ্যা দিত। সমস্যা হলো, ইয়াহুদ শব্দটিকে ইউরোপিয়ান ভাষায় অনুবাদ হলেও শুনতে অনেকটা সাম্প্রদায়িক শোনায়।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল এবং ৫ জুন আল জাজিরায় শেখ ইয়াসিনের দুটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এই সময় তিনি ইজরাইলিদের 'আল ইজরাইলিউন' আবার কখনো 'আল ইয়াহুদ' হিসেবে অভিহিত করেন। আবার ইজরাইলের বিভিন্ন কোর্টে আটক ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিগত ৩০ বছর ধরে আইনি সহযোগিতা দিয়ে আসছেন লিয়েহ তেসেহমেল নামক এক আইনজীবী। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, অধিকাংশ সময়ে তার ফিলিস্তিনি মক্কেলরা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইজরাইলিদের কিংবা ইজরাইলি সেনাদের 'আল ইয়াহুদ' নামেই সংজ্ঞায়িত করেন। এই আইনজীবী আশঙ্কা করেন, যেভাবে ফিলিস্তিনিরা ইজরাইলিদের ইয়াহুদ নামে সমালোচনা করেন, তাতে বিভিন্ন দেশে থাকা ইহুদিরাও ধারণা করতে পারে- ফিলিস্তিনিরা হয়তো তাদের ব্যাপারেও একই রকমের শত্রুতাভাবাপন্ন মানসিকতা লালন করে।

পরবর্তী সময়ে এসে সমস্যাটি ব্যাপকভাবে ধরা দেয়। আরব বিশ্বের অন্য যেসব জায়গায় ইহুদিরা বসবাস করত, ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর তারা ইজরাইল রাষ্ট্রে বসতি গড়তে শুরু করে। বিশেষ করে ইরাক, ইয়েমেন ও মরক্কো থেকে অনেক ইহুদিকে ইজরাইল রাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয়। তারা সেখানে সস্তায় শ্রমিক হিসেবে নিম্নমানের কাজ করত। উল্লেখ্য, নবগঠিত ইজরাইলে ইউরোপ থেকে অনেক ইহুদিই এসেছিল, যাদের 'আশকেনাজিম' হিসেবে ডাকা হতো। এই আশকেনাজিমরা সেই নিম্নমানের কাজগুলো করতে চাইত না। তারা নয়া ইহুদিরাষ্ট্রে প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে আরব দেশগুলো থেকে আসা ইহুদিদের

(এদের বলা হতো সেফারদিক বা মিজরাহি) তুলনায় ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিদের সামাজিক অবস্থান বেশ উন্নত ছিল। কিন্তু একটা সমাজে তো শুধু অভিজাত শ্রেণির জন্যই কাজ থাকে না; বরং সমাজকে টিকিয়ে রাখতে স্বল্প আয়ের অনেক কাজও করতে হয়। আর নয়া ইজরাইলরাষ্ট্রে নিম্ন আয়ের কাজগুলো আরবীয় ইহুদিরা করত।[৫৬]

বিংশ শতকের গোড়া অবধি গোটা মুসলিম জাহানে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করত। ইসলামি খিলাফত যা কয়েক শতাব্দী ধরে তিনটি মহাদেশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার অধীনে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; একটি জীবনদর্শন, যা কিনা একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আর ইসলামি রাষ্ট্রে একজন খ্রিষ্টান বা ইহুদি কতটা সম্মান ও অধিকার পাবে, ইসলাম সেটা পরিষ্কারভাবে বলেছে। সে কারণেই ইসলামিক রাষ্ট্রের অধীনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায় না। এই কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, ইসলামিক সভ্যতা যার ওপর ভর করে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেটা গড়ে তোলার পেছনে খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে, ইহুদিরা ইউরোপে থাকাকালীন শুধু নির্যাতন আর দমন-পীড়নই সহ্য করেছে। ফলে বেশ আগে থেকেই ইহুদিরা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে চলে আসত। কেননা, মুসলিম শাসকরা তাদের অভ্যর্থনা জানাত এবং নবির শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করত। তাই ইউরোপে 'জিয়োনিস্ট' আন্দোলন শুরু করার আগ পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি মুসলিমদের একটি সহানুভূতিশীল মানসিকতা ছিল।

জিয়োনিস্ট আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এই মানসিকতা পালটাতে শুরু করে। কারণ, ইউরোপিয়ানরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলনটি শুরু করেছিল, যাতে ইহুদিরা জোরপূর্বক মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে অবস্থান নেয়। মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মাটির ওপর এরূপ ইহুদি আগ্রাসনকে ঈমান ও মাতৃভূমির ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু জিয়োনিস্ট আন্দোলনের প্রতি মুসলিমদের এই আক্রোশকে

---

৫৬. সেফারদি ও মিজরাহি হলো দুই ইহুদি গোত্র, যারা ইজরাইল নামক ইহুদি রাষ্ট্রেও অবর্ণনীয় বৈষম্যের শিকার হয়। তাদের সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। নিম্নমানের আবাসন সুবিধা দেওয়া হতো এই দুই গোত্রের মানুষকে। আবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পেতেও তাদের অনেক কাঠখড় পোহাতে হতো। এই দুই গোত্র সম্পর্কে আরও জানতে রেফারেন্স তালিকার ২৭ ও ২৮ নং সিরিয়ালে দেওয়া লিংকগুলো ভিজিট করতে পারেন।

ইউরোপিয়ানরা বরাবরই ইহুদিদের প্রতি আক্রোশ হিসেবে উপস্থাপন করে। মূলত জিয়োনিস্ট আন্দোলনটি যারা শুরু করেছিল, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে ইজরাইল নামক ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রাথমিকভাবে এখানে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না।

বিশজুড়ে ইহুদিদের সমর্থন পাওয়ার জন্য জিয়োনিস্ট আন্দোলনের প্রবক্তরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ইহুদি সেন্টিমেন্ট জুড়ে দেয় এবং ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে কিছু ধর্মীয় কারণ ও ব্যাখ্যাও দাঁড় করায়। অনেক আরব ও সাধারণ মুসলিম আজ অবধি জায়োনবাদীরা যে অইহুদিও হতে পারে, তা বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ ইহুদিদের মধ্যে অনেকেই জায়োনবাদী প্রকল্প সমর্থন করে না। তারা বরাবর ইজরাইল নামক রাষ্ট্রের কট্টর সমালোচক। শুধু তাই নয়; এদের অনেকে ইজরাইল নামক রাষ্ট্রকে বৈধতাও দিতে চায় না।[৫৭]

হামাসের প্রথম সংবিধানে ফিলিস্তিন ইস্যুটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন এটা মুসলিম ও ইহুদিদের দ্বন্দ্বের একটি পরিণতি। এই ধারণাটি আজও মুসলিম বিশ্বের অনেক জায়গায় আছে। ইজরাইলকে বারবারই ইহুদি ধর্মের সাথে মিলিয়ে চিত্রায়িত করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের এই ফিলিস্তিন সংকটকে অনেক মুসলিমই ধর্মীয় সমস্যা মনে করে। সাধারণ ইহুদি এবং ইহুদিদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠার জিয়োনিস্ট আন্দোলনকারী ইহুদিদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা অনেকে বুঝতেই পারে না।

হামাসের প্রতিষ্ঠাকালীন সংবিধানের ১৭, ২২, ২৮ এবং ৩২ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সংবিধান প্রণেতারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন– যাতে দেখানো যায়, ইহুদিদের বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার খায়েস আর ফিলিস্তিন দখল করার ঘটনা একইসূত্রে গাঁথা। মুসলিম চিন্তাবিদদের ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান প্রণেতারা কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র তত্ত্বটিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ মনে করেন, ইসলামি যুগের একেবারে শুরু থেকেই ইহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এমনকী আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর মদিনায় বিভিন্ন ইহুদি গোত্রের ষড়যন্ত্রের কথা তারা একইভাবে উল্লেখ করেন। তবে ইহুদি মাত্রই

---

৫৭. ২০০২ সালের ১ মে আল জাজিরাতে ইহুদি রাব্বি ইসোরেল ডেভিড একটি সাক্ষাৎকার দেন। তিনি এসে জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। ইহুদিদের মধ্যেও এমন কোনো গ্রুপ থাকতে পারে, এটা তখনই সবার সামনে আসে। তিনি নিউটুরেই কার্তা ইন্টারন্যাশনাল নামক জায়োনবাদী ইহুদি সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে সেই সাক্ষাৎকারে অংশ নেন। নিউটুরেই কার্তা সম্বন্ধে জানতে উইকিপিডিয়াতে অনুসন্ধান করতে পারেন। লিংক রেফারেন্স তালিকার ২৯ নং সিরিয়ালে।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী– এই ধরনের ভাবনাটি প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎপদ। পরবর্তী সময়ে মিশরের দার্শনিক আব্দেল ওয়াহাব আল মিশরি[৫৮] আট খণ্ডের *এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য জিউস* বইটির সম্পাদনা করেন। তাতে অবশ্য মুসলিমদের চিন্তার ভ্রান্তিটি অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে।

সে কারণেই এখন হামাসের নেতৃবৃন্দসহ অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ মনে করেন, ফিলিস্তিন ইস্যুটি একটি ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। এ জন্য জিয়োনিজমের সাথে সংঘাতকে নিছক ধর্মীয় ইস্যু হিসেবে না দেখে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু হিসেবেই বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। এভাবে ব্যাখ্যা করলে কুরআন ও হাদিসের বিশ্লেষণের সঙ্গে আজকের সংকটকে মেলানো যাবে বলে অনেকে মনে করেন।

সাধারণভাবে ইহুদিদের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদে। সেখানে বলা হয়েছে– কেবল ইসলামের ছায়াতলেই মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সহাবস্থান সম্ভব। বাস্তবিক কারণেই এত বছর পরে এসে সকল ইহুদিকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়টি সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এখানে জিয়োনিস্টদের ষড়যন্ত্রকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বলা উচিত, অনেক ইহুদি জিয়োনিস্টদের এসব ষড়যন্ত্রের সাথে একমত নয়। সেইসঙ্গে ফিলিস্তিন সংকটের প্রকৃত কারণ ও ইতিহাসকে এমনভাবে গঠনতন্ত্রে তুলে ধরা উচিত, যাতে বিশ্ব জনমত ইজরাইলের আগ্রাসীদের প্রতি নয়; বরং ফিলিস্তিনের মজলুমদের ব্যাপারে সৃষ্টি হয়। সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য এই সংবিধানে সর্বজনীন মানবাধিকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করা দরকার। হামাসের নতুন সংবিধান যেন সাধারণ ইহুদিদের জন্য আতঙ্কের কারণ না হয়– তা নিশ্চিত করা দরকার।

হামাসের লড়াই জিয়োনিস্ট ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে; সাধারণ ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়– এটা পরিষ্কার করা উচিত। ফিলিস্তিন ইস্যুটি মুসলিম আর ইহুদিদের মধ্যে দ্বন্দ্বেরও কোনো বিষয় নয়। ইজরাইলিদের হাতে ২০০৪ সালে শাহাদাতবরণ করার[৫৯] আগ পর্যন্ত শেখ ইয়াসিন নিজেও এই বিষয়টি বারবার পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। হামাসের নতুন সংবিধানে এটাও আলোকপাত করতে হবে–

---

[৫৮]. আব্দেল ওয়াহাব আল মিশরি মিশরের একজন প্রখ্যাত স্কলার ও ইতিহাসবিদ। তিনি এই মর্মে মত দেন যে, ইজরাইল রাষ্ট্রের কাঠামো ও কৌশল দেখে বোঝা যায় যে, ঔপনিবেশবাদিরাই বিশেষ এক উদ্দেশ্যে ইজরাইলকে সৃষ্টি করেছে। তার সম্বন্ধে আরও জানতে পারবেন https://en.wikipedia.org/wiki/Abdel_Wahab_El-Messiri এই লিংকে।

[৫৯]. শেখ ইয়াসিনের শাহাদাতের ঘটনার বিবরণী এই বইয়ের পরবর্তী অংশে পাওয়া যাবে।

ইসলাম ইহুদি ধর্মকে ভিন্ন একটি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং এই ধর্মের অনুসারীদেরও পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার তাগিদ দিয়েছে। মুসলিম ও ইহুদি যেভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী সহাবস্থান করেছে, আজকের দিনে এসেও একইভাবে সহাবস্থান করা সম্ভব– এটি সংবিধানে অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত।

খালিদ মিশাল নিজেও কানাডার একটি টিভিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন– ফিলিস্তিন স্বাধীন হলে সেখানকার মানুষ বা হামাসের কর্মীরা সকল ইহুদিকে হত্যা বা সাগরে ডুবিয়ে মারবে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি এই সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা এবং ফিলিস্তিনের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেও এটাকে একবারের জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন– 'ওরা ইহুদি বলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি ব্যাপারটি তা নয়। তারা আমাদের ভূখণ্ড চুরি করেছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস ও আগ্রাসন চালিয়েছে, তাই ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। যারা এই আগ্রাসনের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই; তা সে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান। এমনকী কোনো মুসলিম শক্তিও যদি আমাদের জমি দখল করে, আমরা তার বিরুদ্ধেও লড়াই করব। আমাদের সংগ্রাম আগ্রাসী ও দখলদারদের বিরুদ্ধে; কোনো ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নয়।'[৬০]

হুদনার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি

হামাসের নতুন গঠনতন্ত্রে অনেক বিষয়ে পরিবর্তন আনা হলেও একটি বিষয়ে পূর্বের অবস্থান বলবৎ আছে তা হলো– ইজরাইল নামক রাষ্ট্রটির সক্রিয় বিরোধিতা। ১৯৮৭ সালে হামাস বলেছিল, তাদের সংগঠনের জন্মই হয়েছে গোটা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য। পশ্চিম তীর ও গাজায় ফিলিস্তিনি মানুষের ওপর দখলদার ইজরাইলি শক্তি যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হামাসের জন্ম ও উত্থান ঘটে। তা ছাড়া হামাসের জন্মের পেছনে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিও আছে।

হামাস মনে করত, ফাতাহ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের একক প্লাটফর্ম হিসেবে নিজেদের দাবি করলেও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের স্বার্থ রক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফিলিস্তিনের জনগণের একটি বড়ো অংশই জানত, উদ্বাস্তুরা যে ক্যাম্পে জন্ম নিচ্ছে, তা তাদের আসল বাড়ি নয়। তাদের আসল বাড়ি তথাকথিত গ্রিন লাইনের ওপারে, যেখানে ইউরোপ ও বিশ্বের নানা স্থান থেকে আসা

---

৬০. খালিদ মিশাল ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে বৈরুতে ওয়ালিভিয়া ওয়ার্ডকে এই সাক্ষাৎকারটি প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে সেলি শেয়িল এটাকে 'হামাস : বিহাইন্ড দ্য মাস্ক' নামে একটি ডকুমেন্টারিতেও ব্যবহার করেন। ডকুমেন্টারির ভিডিও লিংক পাবেন রেফারেন্স ৩০-এ।

ইহুদিরা জোর করে বসতি স্থাপন করেছে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিন এবং লাখো ফিলিস্তিনি ফাতাহ ও পিএলও'র ভূমিকায় হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ, একটা সময় এই সংগঠনটি ফিলিস্তিনের জনগণের নিজ ভূমে ফেরার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। মূলত এই হতাশাগুলো থেকেই হামাসের জন্ম।

তাই ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হামাসের পক্ষে অসম্ভব। হামাস মনে করে, ইজরাইল হলো মুসলিমদের কলিজার ভেতরে উপনিবেশিক পরাশক্তির গেঁথে দেওয়া একটি বিষফোঁড়া। ইজরাইলকে জন্মই দেওয়া হয়েছে উম্মাহর জাগরণের গতিকে স্তব্ধ করা এবং এই অঞ্চলে পশ্চিমাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। আরেকটি বিবেচনার জায়গাও আছে। ফিলিস্তিন একটি ইসলামিক ভূখণ্ড– এই ভূখণ্ডকে আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে রেখেছে একটি বিদেশি পরাশক্তি। হামাস দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর বিদেশি শক্তির দখলদারিত্বকে বরদাশত করতে পারে না। ফিলিস্তিন নামক ভূখণ্ডটি শুধু মুসলিমদের জমি নয়; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এই ফিলিস্তিনেই আছে মুসলিমদের প্রথম কিবলা এবং তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক মসজিদ।

ফিলিস্তিনকে এই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি শুধু যে হামাস একাই অনুধাবন করে তা নয়; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বের সকল আলিম ও ইসলামি চিন্তাবিদ ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। গত এক শতাব্দীতে মুসলিম পণ্ডিতরা ফিলিস্তিনের বিষয়ে অসংখ্য ফতোয়া দিয়েছেন এবং ফিলিস্তিনের দখলদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রথম ফতোয়াটি আসে ইজরাইল প্রতিষ্ঠার ঠিক আগ মুহূর্তে। ১৯৩৫ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রায় দুই শতাধিক আলেম একসঙ্গে জেরুজালেমে আসেন এবং ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের কোনো অংশের ওপর ইহুদি রাষ্ট্রের বিষয়টি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন সংকট ও সংঘাতের সময় এই ধরনের ধর্মীয় সম্মেলন এবং সেখান থেকেও একই ধরনের ফতোয়া জারি করা হয়েছিল।

১৯৫২-১৯৭০ সাল পর্যন্ত মিশর শাসন করেন জামাল নাসের। সেই সময়ে ঐতিহাসিক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইজরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ শায়খ ইউসুফ আল কারজাভিও একই ধরনের অবস্থান ব্যক্ত করেন।[৬১] '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি

---

৬১. আল আজাব আল তাইয়্যিব আল তাহিরকে ১৯৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারজাভি তার এই অবস্থানের কথা জানান। এই সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সময়ে *Pretending Democracy: Israel, and Ethnocratic State* বইতে সন্নিবেশিত হয়। বইটির বিস্তারিত রেফারেন্স ৩১-এ দেওয়া আছে।

কুয়েতে ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্সিয়ালের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে প্রায় ৩ শতাধিক আলিম অংশগ্রহণ করেন। তারাও শায়খ ইউসুফ আল কারজাভির ইজরাইলবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংহতি প্রকাশ করেন।

পরবর্তী সময়ে বাহরাইনে আরেকটি জুরিস প্রুডেন্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকেও একই ফতোয়া এসেছিল। তবে এই সব ফতোয়া কিংবা ধর্মীয় আইন কিন্তু ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়; বরং ইহুদিদের দখলদারিত্ব বা সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে এই সব ফতোয়া রক্তপাত ও উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে ইজরাইলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধেও নয়। হুদনা শব্দের আবির্ভাব এই ধারণা থেকেই। হুদনা অর্থ যুদ্ধবিরতির জন্য করা শান্তিচুক্তি।

হুদনার প্রসঙ্গটি সামনে আসে '৯০ দশকের গোড়ার দিকে। হামাসের রাজনৈতিক শাখার তৎকালীন প্রধান মুসা আবু মারজুক সেই সময়ে এই হুদনার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জর্ডান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *আল সাবিল* পত্রিকায় তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন। কাছাকাছি সময়ে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিন– যিনি সেই সময়ে কারাবন্দি ছিলেন– তিনিও বেশ কিছু সাক্ষাতে হুদনার প্রসঙ্গে নির্দেশনা দেন। সেই সময়ে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে শেখ ইয়াসিন ও মুসা আবু মারজুক আরও কয়েকবার হুদনার প্রস্তাব দিলে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি। পরবর্তী সময়ে হামাস আরও বেশ কয়েকবার হুদনা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল।

ইসলামের পরিভাষায় হুদনা বৈধ একটি বিষয়। রক্তপাতের অবসান এবং সহিংসতা হ্রাসের জন্য শত্রুপক্ষের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হুদনা করা যায়। এই হুদনা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। শরিয়তের ভাষায় যাকে হুদনা বলা হয়, তার সাথে পশ্চিমা শান্তিচুক্তির বেশ পার্থক্য আছে। উদাহরণ হিসেবে অসলো-শান্তিচুক্তির কথা বলা যায়। এই চুক্তির আওতায় পিএলও ইজরাইল নামক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু হুদনাতে কখনোই কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয় আসবে না। দখল করা জমিগুলোকে ইজরাইলিদের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে– এমন বিষয়ে কোনো চুক্তি হামাস করবে না। ১৯৪৮ সাল থেকে ফিলিস্তিনিদের যেভাবে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তা অস্বীকার করে সেই জমির মালিকানা ইজরাইলিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কোনো অধিকার হামাসের নেই। বর্তমান অবস্থায় হামাস হুদনার শর্ত হিসেবে যতটা সম্ভব হারিয়ে যাওয়া জমিগুলো উদ্ধার এবং ইজরাইলি কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করার দাবি তুলতে পারে।

হামাস নেতারা হুদনার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে ১২ শ শতাব্দীর ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সেই সময়ে মুসলিম ও ক্রুসেডাররা প্রায় ২০০ বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১১৯২ সালে রামাল্লাতে সালাউদ্দিন আইউবির সঙ্গে রাজা রিচার্ডের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে। শান্তিচুক্তিটি প্রায় তিন বছর তিন মাস স্থায়ী হয়। চুক্তি চলমান থাকা অবস্থায় জাফা থেকে এক্রে পর্যন্ত গোটা উপকূলের নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্রুসেডারদের হাতে। ক্রুসেডাররা জেরুজালেম সফর করতে এবং মুসলিমদের সঙ্গে ব্যাবসা করারও সুযোগ পেত।

হুদনা প্রসঙ্গে ইতিবাচক মন্তব্য করতে গিয়ে হামাস নেতারা হুদায়বিয়ার সন্ধির কথাও উল্লেখ করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে রাসূলুল্লাহর (সা.) নেতৃত্বাধীন মুসলিম সম্প্রদায় ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উভয় পক্ষ ১০ বছর এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে একমতও হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। ফলে মাত্র দুই বছরের মাথায় হুদায়বিয়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো– একবার যদি কোনো মুসলিম সম্প্রদায় কারও সঙ্গে হুদনা স্বাক্ষর করে, তাহলে তা মানা ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে যায়।

হুদনা স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে হামাসের প্রথম শর্ত ছিল ১৯৬৭ সালের ৪ জুন তৈরি সীমান্তরেখা বাতিল করা। এটা বাতিল হওয়ার অর্থ ছয় দিনের আরব যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাইল পূর্ব জেরুজালেমসহ যেসব জমি দখল করেছিল,[৬২] তা বাতিল হয়ে যাওয়া। পাশাপাশি ইজরাইলিদের কারাগারে ও ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক থাকা বন্দিদের মুক্তি দেওয়া।

আত্মঘাতী হামলা

ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থানে আত্মঘাতী বোমা হামলার যে সিলসিলা তৈরি হয়েছিল, তার অবসান ঘটানোর জন্যই শেখ ইয়াসিন হুদনার ধারণার প্রবর্তন করেন।

এপ্রিল, ১৯৯৪। শেখ ইয়াসিন তখন ইজরাইলে বন্দি। সেই সময়ে ইজরাইলের গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা জানায়, হামাসের সামরিক শাখার কর্মীরা আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তারা শেখ ইয়াসিনকে এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানায়। মূলত ১৯৯৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি

---

৬২. ১৯৬৭ সালের ৫ জুন ইজরাইল মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধটি ছয় দিন স্থায়ী হয়, যার ফলে ইজরাইল ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীর ছাড়াও সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান হাইটস দখল করে নেয়। এই যুদ্ধের পরিণতিতেই আড়াই লাখ ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়ে পড়ে। ছয় দিনের এই যুদ্ধের বিষয়ে জানতে লিংক দেখুন ৩২ নং রেফারেন্সে।

হেবরনের আল হারাম আল ইবরাহিমিমি মসজিদে মার্কিন বংশোদ্ভূত ইহুদি বারুচ গোল্ডস্টেইন ইজরাইলি বাহিনীর সহায়তায় নামাজরত মুসল্লিদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ২৯ জন নিহত এবং প্রায় শ'খানেক লোক আহত হয়। বর্বর এই ঘটনাটিই হামাসের সামরিক শাখাকে আত্মঘাতী হামলার দিকে ঠেলে দেয়।

আত্মঘাতী হামলার কৌশল প্রথমদিকে ভীষণ সমালোচনার মুখে পড়ে। ইজরাইলের সৈন্যদের পাশাপাশি অনেক ফিলিস্তিনি এই ধরনের বোমা হামলায় আহত হতো। অনেকে ধারণা করল, এই ধরনের কর্মকাণ্ডে ফিলিস্তিনের ন্যায্য ইস্যুটাই প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে! ফাতাহ এবং পিএলও এই আত্মঘাতী বোমা হামলার বিরোধিতা করছিল। কারণ, এই সব কাজ চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যহত করার আশঙ্কা ছিল।

হামাসের মুখপাত্র বলেছিলেন, বারুচ গোল্ডস্টেইনের মতো ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাসী ইহুদিদের হামলা থেকে বিরত রাখতে আত্মঘাতী হামলার কোনোই বিকল্প নেই। সময়ের সাথে সাথে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মানসিকতাও পালটাতে থাকে। জনগণের একটি বিরাট অংশ মনে করল, যেহেতু আমেরিকা ও ইউরোপ নগ্নভাবে ইজরাইলকে সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা দিচ্ছে, তাই ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে লড়াইয়ে কোনো ভারসাম্য থাকছে না। ইজরাইল সব সময়ই ফিলিস্তিনিদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে। তাই লড়াইয়ের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এই ধরনের আত্মঘাতী হামলা কিছুটা হলেও সুবিধা দেবে। দেখা যায়, যেসব নারী-পুরুষ আত্মঘাতী বোমা হামলায় জীবন দিচ্ছে, সাধারণ মানুষের অনেকে তাদের দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী হিসেবে বিবেচনা করছে। বিশেষ করে নির্যাতন ও অসহায়ত্ব বেড়ে গেলে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা আত্মঘাতী বোমা হামলার দিকে ঝুঁকত।

তবে প্রকৃত তথ্য হলো– আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারে ফিলিস্তিনের জনগণের মতামত সব সময় একই রকম ছিল না। এই বিষয়ে অনেক জরিপ করা হয়েছে। ফলাফল কখনোই এক রকম আসেনি। তবে সবগুলো জরিপে দেখা গেছে, কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মানুষ এই আত্মঘাতী বোমা হামলাকে সমর্থন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নরওয়ের 'ফাফো' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গাজা উপত্যাকায় একটি জরিপ চালায়। সেখানে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল– 'ইজরাইলকে রাজনৈতিক সমঝোতায় বাধ্য করার জন্য আত্মঘাতী বোমা হামলা অপরিহার্য। আপনার মতামত কী?' জরিপে অংশ নিয়ে ৬১ শতাংশ মানুষ 'হ্যাঁ' মতামত দেয়।

২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর *জেরুজালেম পোস্ট* একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ২০০৩ সালের ৪ অক্টোবরে হাইফাতে চালানো আত্মঘাতী বোমা হামলাকে

সমর্থন করেছে ৭৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি। এই জরিপটি চালিয়েছিল রামাল্লাস্থ প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চ নামক একটি প্রতিষ্ঠান।[৬৩] এর আগে ২০০২ সালের ১১ থেকে ১৩ জুন সময়ের মধ্যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ইনফরমেশন সার্ভিস গাজা ও পশ্চিম তীর এলাকায় একটি জরিপ চালায়। সেই জরিপে প্রশ্ন করা হয়– 'পিএলও আত্মঘাতী বোমা হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আপনি কি একমত?' এই জরিপে ৮১ শতাংশ মানুষ পিএলও'র অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে। ৫২ শতাংশ মানুষ জানায়, তারা মনে করে– পিএলও আন্তর্জাতিক চাপে আত্মঘাতী বোমা হামলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। মাত্র ১১.৩ শতাংশ মানুষ মনে করে, এই ধরনের আত্মঘাতী বোমা হামলা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে দুর্বল এবং বিশ্ববাসীর সামনে ফিলিস্তিনি শাসকদের বিব্রত করবে।

আত্মঘাতী বোমা হামলার ধর্মীয় সংকটও ছিল। এই কৌশলটি ছিল সুন্নি মুসলিমদের কাছে একেবারেই অপরিচিত ও অগ্রহণযোগ্য; বরং শিয়ারা ছিল এই কৌশলের সঙ্গে বেশি পরিচিত। ৮০'র দশকে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় ইরান বেশ কয়েকবার এই কৌশল প্রয়োগ করে সফল হয়েছে। ১৯৮২ সালে ইজরাইলিরা লেবানন দখল করার পর লেবানিজরা এই কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করে। লেবাননে আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৮২ সালের ১১ নভেম্বর। ওই দিন আহমেদ কাসির নামে একজন শিয়া যুবক, টায়রে নামক এলাকায় ইজরাইলি গভর্নরের অফিসে গাড়ি চালিয়ে ঢুকে ৪৪০ পাউন্ডের বিরাট একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ৭৪ জন ইজরাইলি নিহত হয়।

তবে আত্মঘাতী বোমা হামলা যে শুধু মুসলিমরা ঘটায়– তা কিন্তু নয়। শ্রীলংকার তামিল টাইগার, যারা পৃথক তামিল রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আসছিল, তারাও ১৯৮৭ সাল থেকে আত্মঘাতী বোমা হামলা শুরু করে। তামিল টাইগাররা ২০০'রও বেশি আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে বলে জানা যায়। তামিল বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে তাদের চিন্তাধারার বিরোধী রাজনীতিবিদকে হত্যা করতে এই কৌশল কাজে লাগিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯১ সালে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধিকে হত্যা করে। ১৯৯৩ সালে হত্যা করে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিঙ্গে প্রেমাদাসাকে। একইভাবে ১৯৯৯ সালে শ্রীলংকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুংগাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার আগ পর্যন্ত লেবানন ও ফিলিস্তিনের ইসলামি দলগুলো নারীদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় অংশ নেওয়া সঠিক মনে করেনি। হামাস শুরু থেকেই

---

৬৩. এই জরিপের বিস্তারিত ফলাফল পাবেন ৩৩ নং রেফারেন্সে।

নারীদের সম্পৃক্ত করার বিরোধী ছিল, কিন্তু একটা পর্যায়ে বাধ্য হয়ে অনুমতি দেয়। বিশেষ করে দলের নারী কর্মীরা বেপরোয়া আচরণ শুরু করলে হামাস নমনীয় হতে বাধ্য হয়। হামাসের প্রথম আত্মঘাতী নারী কর্মীর নাম ওয়াফা ইদরিস, যিনি জেরুজালেমের ইয়াফা সড়কে বোমা হামলায় জীবন দেন।

এটা পরিষ্কার, লেবাননে আত্মঘাতী হামলায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় হামাসও এই পথে পা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই কৌশলকে কেন্দ্র করে হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতাদের জবাবদিহি এবং বিব্রত হতে হয়েছে। তারা এসব হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে সেভাবে যুক্তও ছিলেন না। মূলত এই অপারেশনগুলো পরিচালনা করত হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জাদিন আল কাসসাম ব্রিগেড। হামাসের মুখপাত্ররাও দলের রাজনৈতিক ও সামরিক শাখাকে আলাদা রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাস্তানাবুদ হতেন।[৬৪] হামাস বরাবর দাবি করেছে, তার রাজনৈতিক শাখাটি শিক্ষা, ত্রাণ ও মিডিয়াসংক্রান্ত। অন্যদিকে সামরিক শাখাটি স্বাধীন এবং তারা তাদের মতো করে সিদ্ধান্ত ও কৌশল প্রণয়ন করে। তবে ইজরাইল, আমেরিকা কিংবা ইউরোপিয়ানরা হামাসের এই ব্যাখ্যায় কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ২০০৩ সালে পশ্চিমারা হামাসসহ আরও কয়েকটি সংগঠনকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার দায়ে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। শুধু তাই নয়; বারবার দায় অস্বীকার করা সত্ত্বেও হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতাদের ইজরাইলি সেনা ও মোসাদ সদস্যরা কয়েকবার হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। অনেক হামাস নেতাই এই সব হামলায় শাহাদাতবরণ করেন, আবার কেউ-বা পালিয়ে বেঁচে যান।

তাহদিয়াহ

ইজরাইলকে শান্তিচুক্তিতে বাধ্য এবং বেসামরিক নাগরিকদের ইজরাইলি নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষায় ইজরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হামাস আত্মঘাতী বোমা হামলার পথ বেছে নিয়েছিল। শেখ ইয়াসিন ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে ইজরাইলি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে গাজায় ফিরে আসেন। এরপর প্রস্তাব দেন, যদি ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর হামলা, তাদের জমি দখল ও বাড়িঘর ধ্বংস বন্ধ এবং কারাগার থেকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেয়, তাহলে আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করা হবে। এর দুই বছর পর হামাসের সামরিক শাখা কাসসাম ব্রিগেডও একই ধরনের একটি শান্তিপ্রস্তাব দেয়, সেখানেও একই ধরনের প্রস্তাব ছিল।[৬৫]

---

৬৪. আব্দ-আল আজিজ আল রানতিসি আল কাসসাম ওয়েবসাইটের সাথে সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান। সাক্ষাৎকারটি বিস্তারিত পাবেন রেফারেন্স ৩৪-এ।

৬৫. ১২ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে বিবিসি শেখ ইয়াসিনের এই বক্তব্যের ওপর প্রতিবেদন প্রচার করে।

অন্তত তিনবার হামাস ও তার মিত্ররা অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল, যাকে তাহদিয়াহ (শান্ত পরিস্থিতি) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সর্বশেষ তাহদিয়ার সময়সীমা ছিল ২০০৬ সালের ৯ জুন পর্যন্ত। এর আগের বছর মার্চ মাসে কায়রোর একটি বৈঠকে এই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সূচনা হয়। এই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিটি ২০০৫ সালের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবতার কারণে তা ২০০৬ সালের জুন পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। প্রথম তাহদিয়াহ হয়েছিল ২০০২ সালে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এলেস্টার কুকের মধ্যস্থতায়। ইজরাইলের জন্য এই তাহদিয়ার অবসান ঘটে। কারণ, ২০০২ সালের ২২ জুলাইতে ইজরাইলিরা হামাসের শীর্ষনেতা সালাহ শিহাদাকে হত্যা করে। এর এক বছর পর হামাস ও ইসলামিক জিহাদ একপক্ষীয়ভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়। হামাস নেতা আল আজিজ এই ঘোষণা দেন। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন– মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার সৌজন্যে এবং তিনি যেন ইজরাইলিদের সঙ্গে সমঝোতায় সুবিধা করতে পারেন, তার জন্য এই যুদ্ধবিরতি। দ্বিতীয় তাহদিয়া মাত্র সাত সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কারণ, সাত সপ্তাহ পরেই ২০০৩ সালের ২১ আগস্ট ইজরাইল হামাসের আরেক নেতা ইসমাইল আবু শানাবকে হত্যা করে।

প্রকৃতপক্ষে ইজরাইলিরা কখনোই হামাস বা তার মিত্র সংগঠনগুলোর যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়নি কিংবা এ ধরনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। তারা এই সংগঠনগুলোকে বরাবরই হুমকি হিসেবে বিবেচনা এবং নিধন করেছে।

তবে ইজরাইলিরা এই যুদ্ধবিরতিকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় অনেক ফিলিস্তিনি এ ধরনের একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতির ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। কারণ, এমন যুদ্ধবিরতিতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। ২০০৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিলে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মাঝে হতাশা বেড়ে যায়। ২০০৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ইজরাইল শেখ ইয়াসিনকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। শেখ ইয়সিনের সঙ্গে ছিলেন ইসমাইল হানিয়া। ইজরাইল তাদের ওপর ৫০০ পাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করে। তারা বেঁচে গেলও ১৫ ফিলিস্তিনি আহত হয়। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে সাংবাদিক গ্রাহাম উসারকে[৬৬] দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ ইয়াসিন বলেন–

> ‘আমরা ইজরাইলিদের ৫০ দিন মেয়াদের একটি হুদনা (যুদ্ধবিরতি) দিয়েছিলাম, কিন্তু ইজরাইলিরা তা রক্ষা করেনি। তারা তাদের আগ্রাসন,

[৬৬]. এটা নিয়ে পরবর্তী সময়ে গ্রাহাম উসারের একটি বই বের হয়, যার বিস্তারিত জানা যাবে রেফারেন্স নং ৩৫-এ।

> হত্যা ও অন্যান্য অপরাধও আগের মতোই করে যাচ্ছে। তারা এখনও আমাদের ভূমিতে চুরি করে বসতি স্থাপন করছে। গোটা গাজা ও পশ্চিম তীরে তারা অসংখ্য ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে। গতকালই তারা গাজাতে তিনটি টাওয়ার ধ্বংস করেছে। কেননা, এই টাওয়ারগুলো তাদেরই গড়া অন্যায় বসতি স্থাপনার কাছাকাছি ছিল। এবার আপনারাই আমাকে বলুন, এগুলোতে এতদিন ধরে যারা বাস করে এসেছে, তারা এখন কোথায় যাবে? তাই এই বিষয়ে হামাস কিংবা ফাতাহ কী ভাবছে, তা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা এখন গোটা ফিলিস্তিনের স্বার্থের ইস্যু।'

ইজরাইলিরা একইভাবে ড. মাহমুদ আল জাহহারকেও[৬৭] হত্যা করার চেষ্টা করে। ইজরাইলি বিমানবাহিনী তার বাড়ির ওপর বোমা হামলা চালিয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আল্লাহর ইচ্ছায় ড. জাহহার এই যাত্রায় বেঁচে গেলেও তার পা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই হামলায় তার বড়ো ছেলে নিহত হয়। তার স্ত্রীও আহত হয়ে আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ এবং তার বড়ো মেয়েও মারাত্মক আহত হয়। একই বছরের নভেম্বর মাসে একটি জনসভায় শেখ ইয়াসিন বলেন–

> 'একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি আসলে কোনো কাজেই আসছে না। অতীতে আমরা যতবার যুদ্ধবিরতিতে গিয়েছি, তাতে কোনো কাজ হয়নি। কারণ, ইজরাইলিরা তা মানেনি। তারা ফিলিস্তিনি জনগণের শান্তি বা নিরাপত্তা নিয়ে মোটেও উদ্‌বিগ্ন নয়।'

এই জনসভায় আহত ড. জাহহার ফিলিস্তিনি জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

হুদনা নিয়ে যাদের মধ্যে দ্বিধা আছে তারা মনে করেন, এটা আসলে কিছুই না; বরং ইজরাইলকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে সাময়িক স্থগিত করা। তবে সার্বিকভাবে বিচার করলে হুদনার কিছু সুবিধাও আছে। হুদনা সাময়িকভাবে হলেও রক্তপাত বন্ধ ও দুর্গতি হ্রাস করে। একে শ্বাস নেওয়ার মতো একটি সুযোগও বলা যায়।

হামাসের প্রথম স্মারক[৬৮]

১৯৯০ সালের শেষ দিকে এসে পশ্চিমা কূটনৈতিকদের অনুরোধে জর্ডানস্থ তৎকালীন হামাসের প্রবাসী শাখার নেতারা এই স্মারকপত্রটি রচনা করেন। স্মারকপত্রটি নিম্নরূপ–

---

৬৭. মাহমুদ আল জাহহার হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং হামাস গাজা শাখার অন্যতম শীর্ষনেতা। ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে ২০০৬ সালে হামাসের যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে আল জাহহার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রেফারেন্স ৩৬-এ তার সম্পর্কে লিংক দেওয়া আছে।

৬৮. রেফারেন্স ৩৭ ও ৩৮-এ এই স্মারকপত্রের উৎস দেওয়া আছে।

> ‘ইসলামিক রেসিসটেন্স মুভমেন্ট (হামাস) ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী একটি আন্দোলন, যা দখলদারদের হাত থেকে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড এবং ফিলিস্তিনের মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের শেষার্ধে ফিলিস্তিনে প্রথমবারের মতো ইন্তিফাদা সংঘঠিত হয় এবং তার পরপরই হামাসের আবির্ভাব ঘটে। ইজরাইলি দখলদারিত্ব ও বর্বরতার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মানুষের যে ক্ষোভ ও আক্রোশ, মূলত তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হামাসের জন্ম। হামাস এই ভূখণ্ডের ইতিহাসের এক অনিবার্য বাস্তবতা।’

এই আন্দোলনের যাত্রা শুরুর ইতিহাস সম্পর্কে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেন–

> ‘হামাস ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। কারণ, ইজরাইল হলো বিশ্বের সবচেয়ে বর্বর, আগ্রাসী ও দখলদার রাষ্ট্র; যারা আমাদের নাগরিকদের প্রতিটি দিনকে, প্রতিটি রাতকে দুর্বিষহ করে তুলছে।’

হামাসের ইতিহাসের শিকড় প্রোথিত আছে অনেক গভীরে। বিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, হামাস হলো তারই ধারাবাহিকতা। ‘হামাস’ নামের ভেতরেই এই সংগঠনের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। হামাসের নামের মধ্যে ইসলাম আছে। কারণ, হামাসের সকল নীতিমালা ও আদর্শের মূল ভিত্তিই হলো ইসলাম এবং ইসলামি আদর্শ। এককথায়, ইসলামই হামাসের সকল কাজের মূল নিয়ামক শক্তি।

হামাসের এ আন্দোলনটি যে পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে, তাতে এই সংগঠনের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো– ইজরাইলের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা সমঝোতা করার সুযোগ নেই। কারণ, এই মুহূর্তে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের ক্ষমতার মধ্যে কোনো ভারসাম্য নেই। শেখ ইয়াসিন যেমনটা বলে গেছেন–

> ‘এ রকম দুটি পক্ষের মধ্যে কখনোই কার্যকর আলোচনা হওয়া সম্ভব নয়, যার একটি পক্ষ ভীষণ রকম শক্তিশালী ও শোষণকারী, আর অন্য পক্ষটি দুর্বল ও ভয়ংকরভাবে শোষিত। আর তাই জুলুমের অবসান হওয়া ছাড়া কোনো সংলাপই সফল হতে পারে না।’

হামাসের স্বাধীকার আন্দোলন সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার ওপর ফিলিস্তিনি জাতির মুক্তি ও স্বাধীকার আন্দোলনটি বিগত ৭০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কারণেই ফিলিস্তিনের জাতীয় সংবিধানের প্রথম ১০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে হামাসের সংবিধান ও ঘোষণাপত্রের অবিশ্বাস্য রকমের সাদৃশ্য রয়েছে। বাস্তবতা হলো–

ফিলিস্তিনের জাতীয় গঠনতন্ত্রের ঘোষণাবলির সঙ্গে ১৯৮৭ সালে হামাসের প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলো– বিশেষ করে আরব লিগ, ওআইসি, ন্যাম আন্দোলন এমনকী জাতিসংঘও ঐকমত্য পোষণ করেছে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইজরাইল যেভাবে গাজা ও পশ্চিম তীরকে দখল করেছে, তা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নং প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে অবৈধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পিএলও ও ইজরাইলের মধ্যে তথাকথিত অসলো-শান্তিচুক্তি হওয়ার পরও হামাস তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে! কারণ, হামাস মনে করে– এই শান্তিচুক্তি দখলদারিত্বের অবসান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনের অধিকাংশ মানুষ অসলো-চুক্তিকে একটি ব্যর্থ চুক্তি বলেই বিবেচনা করে। আর সে কারণে ইজরাইলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নির্ধারণে পিএলও যে কৌশল বেছে নিয়েছে, তার ব্যাপারে ফিলিস্তিনিরা মোটেও সন্তুষ্ট নয়।

যারা অসলো-চুক্তিটি সম্পাদন করেছিলেন, তারা বলেছিলেন– এই চুক্তি দখলদারিত্বের অবসান ঘটাবে! কিন্তু অসলো-চুক্তির এত বছর পর এসেও যে বাস্তবতা আমাদের সামনে তা হলো–

- ১৯৬৭ সালে ইজরাইল অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনের যে ভূমিগুলো দখল করেছিল, তা আজও দখল করে আছে।
- যা আগে কখনোই হয়নি, এখন তাই হয়েছে। গাজা ও পশ্চিম তীরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ বিশাল ঘনবসতিপূর্ণ জনবসতিকে বৃহৎ কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। আর ইজরাইলের প্রতিনিধি হিসেবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এ দুটি এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
- অবৈধভাবে নির্মিত ইহুদি বসতিগুলো এখনও বলবৎ রয়েছে। সেইসঙ্গে নতুন করে অসংখ্য ইহুদিশিবির নির্মাণ করা হচ্ছে।
- জেরুজালেমকে বিস্তৃত করা হচ্ছে এবং পবিত্র এ শহর থেকে আরবের ও আরবীয় ঐতিহ্যের সকল চিহ্ন মুছে ফেলা হচ্ছে।
- ইহুদি বসতিতে বসবাসরত ইহুদিরা যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, সে জন্য বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সে কারণে বিপুল পরিমাণ জমি নতুন করে দখল করা হয়েছে।
- এখনও ইজরাইলের কারাগারগুলোতে হাজারো ফিলিস্তিনি বন্দি অবস্থায় আছে।

- ইজরাইল নানাভাবে ফিলিস্তিনিদের ওপর জুলুম করছে। প্রতিদিনই অসংখ্য বাড়িঘর ও স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। গাজাকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ফিলিস্তিন, বিশেষত গাজার ওপর বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক অবরোধ চলছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস এবং ফসল ও গাছপালা নিধন করা হচ্ছে।
- অর্থনৈতিক অবস্থা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেকটাই শোচনীয়।

বলতে গেলে শান্তি প্রক্রিয়া দখলদারিত্বের অবসান এবং ফিলিস্তিনিদের অবস্থারও উন্নতি করতে পারেনি। তাই যারা বলেছিল– ফিলিস্তিনিদের আর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, তাদের এ কথাটি বাস্তবিক কারণেই বাতিল হয়ে গেছে।

পশ্চিমা দেশগুলো হামাসকে একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে দাঁড় করতে চায়! কিন্তু বাস্তবতা হলো– হামাসকে কেবল একটি সামরিক সংগঠন হিসেবে পুরোপুরি চিত্রায়িত করা যায় না। তা ছাড়া ফিলিস্তিনিদের কাছে হামাসের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। হামাস হলো একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তৃণমূল সংগঠন, যার একটি সামরিক শাখাও রয়েছে। তবে তা কাজ করে কেবল ইজরাইলি দখলদারিত্ব আর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। হামাসের সমস্ত কার্যক্রম জনসম্মুখে এবং জনগণকে নিয়েই পরিচালিত হয়। তাদের সামরিক শাখার আলাদা নেতৃত্ব আছে এবং লোক নিয়োগ করারও পৃথক প্রক্রিয়া রয়েছে।

দখলকৃত এলাকায় হামাসের সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, কোনো মহল শত সাধনা করেও ফিলিস্তিনিদের মন থেকে হামাসকে মুছে দিতে পারেনি। বাস্তবতা হলো– ইজরাইলের সকল অনুমান, আশঙ্কা ও প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করে হামাস ফিলিস্তিনের মাটিতে অসংখ্য সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এগুলোর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে সেবা প্রদান করেছে। ইজরাইলিরা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বলেছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার অর্থই ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

১৯৭০ সালের পর ফিলিস্তিনে অসংখ্য সামরিক সংগঠন জন্ম নিলেও হামাসের সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্য হলো– হামাসের উত্থান হয়েছে ফিলিস্তিনের মাটিতেই। তারা কোনো বিদেশি অ্যাজেন্ডায় জন্ম নেয়নি। হামাস তার সকল মনোযোগ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডেই আটকে রেখেছে। কারণ, তারা ফিলিস্তিনকেই সকল প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। হামাস তার সশস্ত্র সংগ্রামকে ফিলিস্তিনের মধ্যে সীমিত রেখেছে। এই সংঘাতকে কখনোই ফিলিস্তিনের বাইরে যেতে দেয়নি।

হামাসের এক সময়ের রাজনৈতিকপ্রধান খালিদ মিশালকে হত্যার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বাইরে যুদ্ধকে ঠেলে দিতে হামাসকে উসকানি দেওয়া হয়েছিল। হামাস সচেতনভাবেই সেই ফাঁদে পা দেয়নি। হামাসের এ ভূমিকার কারণে ইজরাইল ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা বিশ্ববাসীর কাছে হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত করানোর সুযোগ হারিয়েছে। এ ঘটনার দ্বারা হামাস প্রমাণ করেছে, তারা একটি স্বাধীকার আন্দোলন এবং তার যাবতীয় সামরিক কার্যক্রম কেবল দখলদার প্রশাসনের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়।

হামাসের সামরিক শাখা অনেকগুলো শহিদি অপারেশন পরিচালনা করেছে। পশ্চিমা দেশগুলো এগুলোকে আত্মঘাতী বোমা হামলা হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। তবে এ ধরনের অপারেশন মূলত ইজরাইলের সামরিক কাঠামোগুলোকে টার্গেট করেই পরিচালনা করা; বেসামরিক মানুষকে হত্যার জন্য নয়। নিরীহ মানুষকে টার্গেটের কাজ হামাসের মূল নীতিমালার বিরোধী। ইজরাইল যখন বেসামরিক নাগরিক হত্যার চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন হামাসও তাদের সিদ্ধান্ত পালটায়।

হামাস কখনোই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করতে চায়নি। তার প্রমাণ, হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন অসংখ্যবার একপাক্ষিকভাবে ইজরাইলিদের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ইজরাইল প্রতিবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইজরাইলের এরূপ অসহযোগিতামূলক মানসিকতা এবং একের পর এক নিরীহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি নাগরিককে হত্যার ঘটনাই হামাসকে কিছু কিছু সময় কঠোর হতে বাধ্য করেছে।

হামাস যদিও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং পিএলও'র বেশ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকৌশলের সঙ্গে একমত ছিল না, তারপরও ফিলিস্তিনিদের ভোগান্তি যেন না বাড়ে তা নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেতন থেকেছে। হামাস মনে করে– অসলো-চুক্তির পর যারা আশাবাদী হয়েছিলেন, তারাও হতাশ। ইয়াসির আরাফাত ও তার ঘনিষ্ঠভাজনদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে বুঝেছিলেন, তারা আসলে মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন। তারা উপলব্ধি করেছেন– চুক্তি দিয়ে কিছুই হবে না; বরং দখলদারিত্বের অবসানে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

হামাস বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষকে নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে। হামাস আরও মনে করে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা পাওয়ার লড়াইয়ে তারা বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের সাহায্য ও সমর্থন পাবে। আর সত্যিকারের শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন সর্বত্র ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত হবে।

একই সঙ্গে হামাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শক্তিশালী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যখনই কোনো মজলুম জনগোষ্ঠী মুক্তির লড়া শুরু করেছে, তারা কেউ-ই ক্ষমতার আনুকূল্য পায়নি। হামাস মনে করে- এমন একদিন আসবে, যখন ইজরাইল বাস্তবতাকে অনুধাবন করে এবং ফিলিস্তিনের ওপর অন্যায় দখলদারিত্ব থেকে সরে আসবে।

হামাস দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করছে- ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব যুদ্ধের পরে ইজরাইল ফিলিস্তিনের যেসব ভূমি অন্যায়ভাবে দখল করেছে- তা যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে হামাস ইজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবে। ইজরাইল যদি নিম্নোক্ত শর্তগুলো মেনে নেয়, তাহলে হামাস ইজরাইলের সঙ্গে সব ধরনের শত্রুতার অবসান ঘটাবে।

- গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইজরাইলি সকল সেনা প্রত্যাহার
- পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় ইজরাইল অন্যায়ভাবে যেসব ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে, অবিলম্বে সেগুলো প্রত্যাহার
- ইজরাইলি কারাগারে আটক সকল ফিলিস্তিনি বন্দিকে অবিলম্বে মুক্তি এবং
- ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

হামাস মনে করে, ওপরোক্ত বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। কোনো মহল যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সততার সঙ্গে এগিয়ে আসে, হামাস তার দিকে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। ইজরাইল যদি ওপরোক্ত শর্তগুলো মানতে রাজি হয়, তাহলে হামাস যেকোনো ধরনের আলোচনায় যেতেও প্রস্তুত।

হামাসের বিশেষ কার্যক্রম

সামাজিক কর্মকাণ্ড : মাত্র ৩৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এক চিলতে এলাকা গাজা। জনসংখ্যা প্রায় আঠারো লাখ! প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি মানুষের বাস। মিশরের সঙ্গে ১১ এবং ইজরাইলের সঙ্গে ৫২ কিলোমিটার সীমানা। সামনে রয়েছে অবারিত ভূমধ্যসাগর, যা ইজরাইলি নৌ-বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ। এ ছাড়া গাজার ১৮ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তু। এমন একটি ভূখণ্ডে অবরোধের মধ্যে থেকেও হামাস প্রায় ১২ বছর ধরে সরকার পরিচালনা করছে।

ইজরাইলি বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উঠে এসেছে– হামাসের কার্যক্রমের ৯০% হলো সামাজিক, শিক্ষা বিস্তার, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক। এর মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসা, মসজিদ স্থাপন, স্কুল ও শিশুশিক্ষা অর্থায়ন, খেলাধুলার জন্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। শত অবরোধের মধ্যেও হামাস বার্ষিক ৭০-৯০ মিলিয়ন ডলারের একটি বাজেট দিতে সক্ষম, যার প্রায় ৮৫% অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে। প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে বরাদ্দ মাত্র ১৫%। (*কিংডম অফ গড* (২০০৭), লেখক : রুভন পাস)

এ ছাড়া ইজরাইলি আগ্রাসনে শহিদ হওয়া ফিলিস্তিনিদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এককালীন ও নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয় হামাস। যার পরিমাণ ৫০০ থেকে ৫০০০ ডলার। এ ছাড়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িঘর, স্কুল বা মসজিদ পুনর্নির্মাণেও সহায়তা দেয়।

হামাস যদিও ইসলামি আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু জোরপূর্বক কাউকে ইসলামি অনুশাসন মানতে বাধ্য করার কোনো নজির কখনো দেখায়নি। হামাস সরকারের দাওয়াহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ফাদিলা' বা Virtue Committee' নামে কিছু নাগরিক কমিটি আছে। এই কমিটি জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার আহ্বান জানায়। একবার হামাস সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুলছাত্রীদের জোর করে হিজাব পরানোর একটি উদ্যোগ নিলেও পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ করা হয়। এ ছাড়াও হামাস জোর করে আঞ্চলিকভাবে শরিয়াহ আইন কায়েম করার পক্ষপাতী নয়।

শিক্ষা : টানা ১২ বছর অবরোধ এবং নানা ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে গাজা উপত্যকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে হামাস। ২০১২ সালের হিসাব মতে, গাজা উপত্যকায় শিক্ষার হার প্রায় ৯৯%। সেখানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় চার লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য ৬৮৩টি স্কুল আছে, যার মধ্যে ৩৮৩ টি স্কুল হামাস পরিচালনা করে।

স্বাস্থ্যসেবা : স্বাস্থ্যসেবায় হামাস নিজেকে এক অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। অব্যাহত অবরোধের কারণে খাদ্যের মান কমে যাওয়ায় গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শৈশবকালীন অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি; এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ইজরাইলি আগ্রাসনে আহত মানুষজনের চিকিৎসার প্রয়োজন তো রয়েছেই। হামাস পরিচালিত হাসপাতালে কম খরচ কিংবা বিনামূল্যে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়। মৃত্যু উপত্যকা গাজায় বর্তমান জন্মহার প্রায় ৪%। এ ছাড়া হামাস শিশুদের জন্য

অসংখ্য নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মাধ্যমে তাদের একবেলা খাবারও সরবরাহ করা হয়। হামাস বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা বা দাতা দেশ থেকে আসা সাহায্য ও আর্থিক অনুদানব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে, ফাতাহ গোষ্ঠী আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জ। হামাসের এই সামাজিক কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা শুধু গাজা উপত্যকায় নয়; বরং ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীর, এমনকী আশেপাশের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অনেক বেশি জনপ্রিয়।

মিডিয়া : ২০০৬ সাল থেকে হামাস চালু করেছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আল আকসা টিভি। হামাসের মিডিয়া গুরু ফাতহি হাম্মাদের মিডিয়া হাউজ আর-রিবাত কমিউনিকেশন্স-এর নেতৃত্বে রয়েছে নিজস্ব রেডিও স্টেশন ভয়েস অফ আল আকসা ও সংবাদ পত্রিকা *দ্য মেসেজ*। অনলাইন জগতে টুইটার ও ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে রয়েছে হামাসের সরব উপস্থিতি। এ ছাড়াও লন্ডন থেকে *আল ফাতিহ* নামে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

হামাসের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র[৬৯]

২০০০ সালে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো দ্বিতীয় ইন্তিফাদার আগে দ্বিতীয় স্মারকপত্রটি প্রণয়ন করে। নিচে তা তুলে ধরা হলো—

> **সংজ্ঞা :** দ্য ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট (হামাস) হচ্ছে ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের একটি আন্দোলন, যার আদর্শিক মূল ভিত্তি ইসলাম এবং আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা।

যেভাবে এ আন্দোলনটি বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে

আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিকড় (১৯৪৬-১৯৬৭) : হামাস হলো ফিলিস্তিনের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও গতিশীল উত্তরাধিকারী। এর শিকড় প্রোথিত হয় ১৯৩০ ও ৪০-এর দিকে; যখন ইয়াফা, হাইফা, জেরুজালেম ও গাজায় ইখওয়ানের শাখা চালু হয়। এভাবে সকল শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৪৬ সালের ৩০ মার্চ জেরুজালেমে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই প্রথম জায়োনবাদী প্রকল্পের মোকাবিলায় সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় সম্মেলনটি হয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে হাইফায়। সেই সম্মেলন থেকেই ঘোষণা দেওয়া হয়—

---

৬৯. যেহেতু হামাসের প্রথম চার্টার বা সংবিধান নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল, তাই এই ঘোষণাপত্রটিকেই অনেক ক্ষেত্রে হামাসের সংশোধিত সংবিধান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

ইখওয়ান এখন থেকে সর্বতভাবে চেষ্টা চালাবে, যাতে নিজেদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করা যায়। ফিলিস্তিনে যখন নাকবা (মহাবিপর্যয়) সংঘঠিত হয়, তখন ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইখওয়ানের ভূমিকা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। সে সময় মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক থেকে অসংখ্য ইখওয়ানকর্মী ফিলিস্তিনে চলে আসে। নাকবার পরপরই ইখওয়ান এই সংক্রান্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমও জোরদার করে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপের সূচনা (১৯৬৭-১৯৮০) : ১৯৬৭ সালের পরাজয় এবং তারই পরিণতিতে পশ্চিম তীর ও গাজা, সিনাই ও গোলান হাইটসের দখলদারিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিন ইস্যুটি অনেক বেশি জটিল হয়; পাশাপাশি বেশ কিছু বড়ো সংকটেরও সৃষ্টি হয়; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- আরব দেশগুলোর ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তারা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধের ব্যাপারেও নীরবতা পালন করে।
- অন্যদিকে, দখলদারদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনেক বেশি জোরদার ও শক্তিশালী হয়। ফিলিস্তিনের মানুষ তাদের সর্বস্ব দিয়ে গাজা ও পশ্চিম তীরকে দখলমুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই প্রেক্ষাপটে ইখওয়ানও তাদের সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।
- প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করা এবং আরবসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণের পক্ষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এটা ছিল ফিলিস্তিনসহ গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ। মূলত ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের কারণে আরব মুসলিমরা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে যে সংকটে পড়ে, তা থেকে উত্তরণের নিমিত্তে এ রকম একটি জাগরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এই ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখে ফিলিস্তিনের ইখওয়ান, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ভূমিতে ও প্রবাসে থাকা সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল।

- প্রথম পথটি ছিল ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক অভিযান শুরু।
- আর দ্বিতীয়টি ছিল, ফিলিস্তিনে জায়োনবাদীর দখলদারিত্ব এবং সার্বিকভাবে গোটা জায়োনবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণ।

এই লক্ষ্য অর্জনে ইখওয়ান নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করে–

- ইখওয়ানের কর্মীদের উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা দাওয়াতি কার্যক্রম এবং সামাজিক সংস্কারের দিকে আরও বেশি মনোনিবেশ করে।

- যুবকদের সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র ও গ্রাজুয়েটদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করা। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু ছাত্রকে দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো। তারা সেখানে অধ্যয়নরত সাধারণ ফিলিস্তিনি ছাত্রদের মাঝে কাজ করবে, আর তাদের মাধ্যমেই সংগঠনের পরবর্তী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ফিলিস্তিনে মসজিদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কাজ করা। কারণ, এই মসজিদগুলোই সমাজ পরিবর্তনে এবং প্রভাব বৃদ্ধিতে কাজ করবে।
- যত বেশি সম্ভব দাতব্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান চালু করা। বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় নতুন নতুন ইসলামিক সেন্টার ও ইসলামিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিম তীরে বেশি বেশি জাকাত কমিটি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করা।
- জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন ও আগ্রাসী অপশক্তির বিপরীতে ইসলামিক দর্শন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পেছনে আরও বেশি সমর্থন আদায় এবং সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা।
- ফিলিস্তিনে বসবাসরত মানুষ এবং ফিলিস্তিনের বাইরে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সহায়তার লক্ষ্যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যক্রম (১৯৮০-১৯৮৭) : এই পর্যায়ে এসে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, কার্যক্রম এবং প্রতিরোধ আন্দোলন একই সঙ্গে চলতে থাকে। মূলত এই সময়ে হামাসের সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনটি মোটামুটি স্পষ্ট হয়। এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমও শুরু হয়। এই পর্যায়ে এসে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তা হলো–

- ইসলামপন্থি ছাত্রদের নিয়ে ফিলিস্তিনের ভেতরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ফোরাম গঠন করা হয়।
- অসংখ্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখান থেকে দাওয়াত, সামাজিক সংস্কার ও পরামর্শ দেওয়ার কাজটি বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়।
- দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়, তবে তা ছিল গোপন ও পরোক্ষ।
- একেবারে তৃণমূল থেকে প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু এবং সে লক্ষ্যে সংগঠনের অভ্যন্তরে বেশ কিছু নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। এই কার্যক্রমটি চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যায় ১৯৮৬ সালে, যখন বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাওয়াদ আবু সুলায়মাহ ও সাইব ধাব শাহাদাতবরণ করেন। এর পরপরই গাজার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বড়ো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তখন থেকে ইজরাইলি সেনারা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘিরে রাখে।

- ফিলিস্তিনের বাইরেও জায়োনবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমমনা ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজ জোরদার করা হয়। সেক্ষেত্রে যে কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হয় সেগুলো হলো–

  ১. ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও নানা ধরনের সামাজিক ফোরাম সৃষ্টি করা।

  ২. দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটানো, যাতে ফিলিস্তিনের মানুষদের সহায়তা করা সহজ হয়।

  ৩. আরব ও মুসলিম বিশ্বে কর্মরত অন্যান্য ইসলামিক আন্দোলনের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যুর তালিকায় ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তারা ফিলিস্তিন ইস্যুতে এবং জায়োনবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে পারে।

এভাবে আন্দোলনে বিপুল হারে নতুন জনশক্তি অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, যার বেশিরভাগ ছিল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের মানুষের মধ্যে ইসলামিক সংস্কৃতির আবহকে ফিরিয়ে আনা হয়, যা '৭০ ও '৮০-র দশকে অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছিল। মূলত এ সবকিছুর বদৌলতে ফিলিস্তিনে হামাসের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম পরিচালনার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয়।

আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা (১৯৮৭-১৯৯৪) : এই পর্যায়ে এসে হামাস চূড়ান্তভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রথমবারের মতো হামাস প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে, একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসের আবির্ভাবের দিনটি বিবেচনা করা হয় ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল, যেদিন প্রথমবারের মতো ইন্তিফাদা সংগঠিত হয়। প্রজ্ঞাপনটি দিন কয়েক আগে ঘোষিত হয়েছিল। কারণ, ইতোমধ্যেই হামাস সক্রিয় এবং মাঠে-ময়দানে তাদের নানা কার্যক্রম খুব জোরেশোরে শুরু করছিল। কিন্তু ইন্তিফাদার দিনই হামাসের অস্তিত্বের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়। তখনই জনগণ বুঝতে পারে, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে নতুন করে একটি সংগ্রামের সূচনা ঘটছে, তবে এর পাশাপাশি দাওয়াত ও সামাজিক সংস্কারের মতো কর্মসূচিগুলোও চলমান থাকে।

এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলো ঘটে, তা নিম্নরূপ–

- প্রকৃতপক্ষে হামাস নামের নতুন এই আন্দোলনটিই ইন্তিফাদার সূচনা করে। ইন্তিফাদার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা অন্য যেকোনো সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, কেবল হামাসেরই সেই সক্ষমতা ছিল– যা দিয়ে তারা ইন্তিফাদার মতো একটি ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের জন্ম দিতে পারে।

- ইন্তিফাদাকে কেন্দ্র করেই হামাস পিএলও'র অধীনে না থেকে বরং স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে।
- হামাসের কারণেই ইন্তিফাদা নিছক একটি জনবিক্ষোভের রূপ থেকে বেরিয়ে এসে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নেয়।
- ১৯৮৭-১৯৯৪ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো গণগ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। ১৯৮৯ সালে শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রেফতার হন। ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালেও সংগঠনটির ওপর দিয়ে যথেষ্ট ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়। তবে হামাস প্রতিবারই বেশ সফলতার সঙ্গে এসব সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করে নতুনভাবে নেতৃত্বকে ঢেলে সাজায়। তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে।
- হামাস এই সময়গুলোতেই নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে। তারা ঘোষণা দেয়, পিএলও ও জায়োনবাদীদের মধ্যে কোনো চুক্তিকেই তারা স্বীকৃতি দেবে না। বিভিন্ন সময় বিবৃতি এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তারা নিজেদের এ অবস্থান ব্যক্ত করে। হামাস বিতর্কিত অসলো-চুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।

তা ছাড়া এই সময়ে (১৯৮৭-১৯৯৪) হামাস তার সামরিক ও প্রতিরোধ আন্দোলন মজবুত করে। হামাসের সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন আরব দেশে হামাসের পক্ষে সহানুভূতিও বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে হামাস বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করে। সর্বোপরি, হামাসের সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতাও এ সময়ে সকলের কাছে প্রমাণিত হয়। কারণ, হামাস প্রকাশ্যে আসার পর তাদের নিয়ে যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র শুরু হয়, তা তারা সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। তারা উত্তরোত্তর জনগণের কাছে নিজেদের অবস্থান ও ভাবভাবমূর্তি আরও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে।

অসলো-চুক্তির পরবর্তী পর্যায় (১৯৯৪-২০০০) : ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরে যে অসলো-শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, হামাস বরাবর সেই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। শুধু তাই নয়; এ চুক্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তারা জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সামরিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান করে এবং সাংগঠনিকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যায়।

উপসংহার : জন্মলগ্ন থেকেই হামাস অসংখ্য চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। ১৯৪৭ সালের হাইফা সম্মেলন থেকে এটা মোটামুটি পরিষ্কার,

জায়োনবাদীদের সকল প্রকল্প ও পরিকল্পনা ফিলিস্তিনের জাতীয় স্বার্থ এবং ইসলামিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাই জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘাত ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে হামাস তার সাংগঠনিক কার্যক্রম সেভাবে গুছিয়ে নিতে না পারলেও যখনই সুযোগ পেয়েছে– নিজেদের পুনঃসংগঠিত এবং নিজেদের কৌশল নিয়ে পর্যালোচনা করেছে। আর এটাই হামাসকে দীর্ঘ সময় জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সহায়তা করেছে।

হামাস ও জায়োনবাদী পরিকল্পনা

হামাস মনে করে, জায়োনবাদীদের সঙ্গে তাদের চলমান সংঘাতটি ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট এবং এটি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। জায়োনবাদীদের অশুভ পরিকল্পনা হলো- ফিলিস্তিনে একটি জায়োনবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা! আর তাই জায়োনবাদীদের এই পরিকল্পনা নস্যাৎ না করা পর্যন্ত হামাসের লড়াই চলবে। হামাস আরও মনে করে-

- জায়োনবাদীদের যে পরিকল্পনা, তা মূলত এই অঞ্চলে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের পরিকল্পনারই একটি অংশ। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে জায়োনবাদীদের স্বপ্নই পূরণ করা হবে; যে স্বপ্নটাকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান জায়োনবাদীরা অনেক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে জায়েজ করার চেষ্টা করে।
- জায়োনবাদী পরিকল্পনা হলো– ফিলিস্তিন থেকে নাগরিকদের জোরপূর্বক উৎখাতের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইহুদি বসতি স্থাপন করা।
- জায়োনবাদীদের পরিকল্পনা সব সময়ই ছিল সম্প্রসারণমুখী। তারা গোটা অঞ্চলে নিজেদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং এ এলাকার সম্পদকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই জায়োনবাদীরা শুধু ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়; বরং গোটা আরববিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্বের জন্যই বিরাট হুমকি।
- জায়োনবাদীরা কারও সঙ্গে সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়। তারা কেবল তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সমমনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতেই আগ্রহী। তাই তাদের সঙ্গে কোনো শান্তি-আলোচনা বা সমঝোতার চেষ্টা করা অর্থহীন।
- জায়োনবাদীরা এশিয়া ও আফ্রিকার গোটা মানচিত্রই পালটে দিতে চায়। তারা এই এলাকায় কোনো রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণকে বরদাশত করতে রাজি না।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি

হামাস মনে করে, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার চলমান আন্দোলন কখনোই সফল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনটি প্লাটফর্ম একসঙ্গে কাজ করবে। এগুলো হলো–

ফিলিস্তিনি ফোরাম : এই ফোরামগুলোই স্বাধীকার আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। এদের কাজ স্বাধীনতা ও প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত এবং জাতীয় স্বার্থ ও অধিকারকে সমুন্নত রাখা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য দুটি প্লাটফর্ম একই সঙ্গে কাজ করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরোধের এই মানসিকতা ধরে রাখা।

আরব ফোরাম : যেহেতু জায়োনবাদীদের কর্মকাণ্ড শুধু ফিলিস্তিন নয়; বরং গোটা আরব জাহানের জন্যই হুমকি, তাই এর মোকাবিলায় আরব দেশগুলোর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কতটা সক্রিয়ভাবে কাজ করবে, তার ওপর ফিলিস্তিনের স্বাধীকার আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করছে।

ইসলামিক ফোরাম : ফিলিস্তিনের ইস্যুটা যতখানি ফিলিস্তিনের, ততখানি আরবের; আবার ততখানি মুসলিম উম্মাহর। গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের এই বিষয়ে করণীয় আছে। কারণ, ফিলিস্তিনেই আছে মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস। এই বায়তুল মুকাদ্দাস থেকেই নবিজি তাঁর মিরাজ শুরু করেছিলেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো– যার যা আছে, সেই আলোকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার জন্য ভূমিকা রাখা। সে কারণে ফিলিস্তিনের নানা ফোরাম, আরবের নানা প্লাটফর্মের কাজের সফলতা নির্ভর করছে বিশ্বজুড়ে থাকা মুসলিমদের ভূমিকার ওপরও।

হামাসের সামরিক কার্যক্রম

হামাসের সামরিক কার্যক্রম মূলত ফিলিস্তিনকে মুক্ত এবং জায়োনবাদীদের প্রকল্প প্রতিহত করাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। হামাস মনে করে, তাদের সামরিক কার্যক্রমটি দখলদারিত্বকে অগ্রাহ্য করার এবং ফিলিস্তিনের মাটিতে তাদের ঠেকানোর জন্য আইনসিদ্ধ ও যৌক্তিক। আর ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইন এ ধরনের সামরিক কার্যকৌশল গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হামাসকে সুযোগ করে দিয়েছে।

হামাসের সামরিক কার্যক্রমটি কতগুলো নির্দিষ্ট কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিম্নরূপ–

- জায়োনবাদীদের সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত– তা কোনো ধর্মীয় কারণে নয়। সংঘাত এ জন্য, তারা আমাদের দেশ দখল ও পবিত্র ধর্মীয় স্থাপনাগুলো অপবিত্র করেছে এবং আমাদের জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে।

- আমাদের যাবতীয় প্রতিরোধ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো। এ কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না আমরা দখলদারদের পরাজিত করতে পারব।
- হামাসের সামরিক কার্যক্রম কেবল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমিত থাকবে। ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর দখল হয়ে যাওয়া ভূখণ্ডেই এই সংগ্রাম চলবে।
- হামাস কখনোই তার সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসামরিক ইহুদি নাগরিকদের টার্গেট করবে না। হামাসের টার্গেট হলো জায়োনবাদীদের সামরিক স্থাপনা।

হামাসের রাজনৈতিক কার্যক্রম

হামাসের সুস্পষ্ট ও বিশাল রাজনৈতিক কার্যক্রমও আছে। এই কার্যক্রম ফিলিস্তিনের আপামর জনগণ, আরব ও গোটা মুসলিম জাহানের সহায়তায় জায়োনবাদীদের আগ্রাসী প্রকল্পের অবসানে এবং একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে সংগঠন তার কৌশল পরিবর্তন করতে পারে। হামাসের কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকৌশল নিম্নরূপ–

ফিলিস্তিনি সংগঠনসমূহ ও হামাস

- হামাস মৌলিক কিছু অবস্থানের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গঠনে বিশ্বাসী। আন্দোলনের স্থায়িত্ব এবং কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।
- হামাস মনে করে, ফিলিস্তিনের জাতীয় কার্যক্রম ও বাস্তবতার ভেতরে এমন কিছু সুযোগ আছে, যা দিয়ে সফলতার সঙ্গে জায়োনবাদী প্রকল্পকে মোকাবিলা করা যায়।
- হামাস চায় সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু মৌলিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা। সম্ভব হলে হামাস ফিলিস্তিনে কর্মরত সকল সংগঠন, দল ও প্লাটফর্মের সঙ্গে ঐকবদ্ধভাবে কাজ করতে চায়।
- হামাস জাতীয় কার্যক্রমগুলো আরও জোরদার করতে আগ্রহী। হামাস মনে করে, জাতীয় যেকোনো কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হতে হবে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা এবং জায়োনবাদীদের প্রত্যাখ্যান ও ফিলিস্তিনের কোনো অংশে জায়োনবাদীদের জায়গা না দেওয়া।

- হামাস মনে করে, জাতীয় কার্যক্রম ও কৌশল নিয়ে ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ দল এবং সংগঠনগুলোর মধ্যে যত মত-বিরোধই থাকুক না কেন, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে কখনোই অস্ত্র তুলতে পারবে না। এ কারণে হামসাকে অভ্যন্তরীণভাবে কোণঠাসা করে রাখার জন্য, তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার দমন অভিযান পরিচালনা করার পরও তারা নিজেদের সংযত রেখেছে। হামাস সব সময় সবার ওপরে ফিলিস্তিনের স্বার্থকে নিশ্চিত এবং যেকোনো মূল্যে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের রক্তপাত পরিহার করতে চায়।
- হামাস মনে করে– যে দল যেভাবে চেষ্টা করছে, তাদের সকলের প্রচেষ্টাগুলো একত্রিত করা দরকার। এটা করা সম্ভব হলে ফিলিস্তিনে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব– যেখানে স্বাধীনতা, সমতা এবং রাজনৈতিক অধিকার থাকবে।

শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি

- হামাস বারবার নিশ্চিত করেছে– তারা শান্তির পক্ষে। সেই শান্তির মাধ্যমে অবশ্যই ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত হতে হবে। এ ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তার কোনো বিকল্প নেই। দুর্বলতা ও জিম্মি অবস্থায় থেকে এটা পাওয়া সম্ভব নয়।
- হামাস মনে করে– এখন পর্যন্ত দখলদারদের সাথে ফিলিস্তিনের অন্যান্য সংগঠনগুলো যেসব চুক্তি করেছে, তার বেশিরভাগ অগ্রহণযোগ্য। কারণ, এগুলোতে ফিলিস্তিনের জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের অধিকারের বিষয়টি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে।
- হামাস আরও মনে করে– এই সব তথাকথিত সমাধানের মাধ্যমে মূলত শত্রুদের টিকে থাকার সুযোগ, দখলদারিত্বকে বৈধতা, শত্রুদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা আরব ও ইসলামিক দেশগুলোর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক চালু করার সাহস পেয়েছে।

ওপরোক্ত কারণে এবং আরও বাস্তবতার আলোকে হামাস অতীতের স্বাক্ষরিত সব শান্তিচুক্তিকেই, বিশেষত অসলো-চুক্তি, ওয়াই নদী চুক্তি, শার্ম আল শেইখ চুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা মনে করে– এই চুক্তিগুলো মাধ্যমে ফিলিস্তিন ইস্যুকে একেবারেই হালকা করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এসব চুক্তিতে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের অধিকার খর্ব এবং পবিত্র স্থাপনাগুলোর ওপর নাগরিকদের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর নিজ ভূমিতে ফেরার অধিকারটিও নস্যাৎ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই চুক্তিগুলোর মাধ্যমে

নিজ ভূমিতে বসবাস করা ফিলিস্তিনি নাগরিকদের জন্মগত অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া এই চুক্তিগুলো মুক্তি-আন্দোলনের সত্যিকারের কৌশল থেকে ফিলিস্তিনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি এবং আস্থার সংকট বৃদ্ধি করেছে।

হামাসের আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও কর্মকৌশল

- হামাস দৃঢ়ভাবে মনে করে, যে সমস্ত দল বা সংগঠনগুলো দখলদারিত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিয়োজিত, সামান্য মত-পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে আহামরি কোনো সমস্যা হবে না।
- হামাস কখনো অন্য কোনো দেশের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। সেইসঙ্গে হামাস এটাও চায় না, তাদের রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে বাইরের কেউ নাক গলাক।
- হামাস আরব বিশ্বের এবং মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশের সরকারকে ফিলিস্তিন ও মুসলিম উম্মাহর সংকট নিরসনে আরও সক্রিয় রাখতে চায়। হামাস কখনো মুসলিম উম্মাহর কোনো সংকটে বিশেষ একটি মতের পক্ষে অবস্থান নিতে চায় না। এ ক্ষেত্রে হামাস সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধ রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।
- হামাস আরব ও ইসলামিক সরকারগুলোর একতায় বিশ্বাস করে এবং এ জন্য গৃহীত সকল পদক্ষেপে সহায়তা করতে আগ্রহী।
- হামাস প্রত্যাশা করে, সকল আরব ও ইসলামিক সরকার ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় এবং জায়োনবাদীদের মোকাবিলায় তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।
- হামাস বিশ্বের সকল ইসলামিক সংগঠন ও দলগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ, জায়োনবাদীদের মোকাবিলায় বিশ্বের সকল ইসলামিক সংগঠনগুলোর একতাবদ্ধ প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।
- হামাস সর্বাবস্থায় দল, মত, চিন্তা ও ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আন্দোলনের সাথে আলোচনায় বিশ্বাস করে। ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থে হামাস যেকোনো সময়, যে কারও সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছে।
- কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হামাস কারও সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখতে চায় না। হামাস কখনোই কোনো দেশ ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় না, যতক্ষণ না তারা ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন বা জায়োনবাদীদের সহায়তা করতে উদ্যোগী হয়।
- জায়োনবাদীদের সঙ্গে চলমান যে সংঘাত, হামাস এই সংঘাতকে সব সময় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

- সকল সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং সব রকমের দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করে, তা নিশ্চিত করতে হামাস সর্বদা প্রচেষ্টা চালায়। মূল উদ্দেশ্য হলো– একটি বিশ্বজনীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, যাতে তারা সবাই মিলে জায়োনবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদের অন্যায় দখলদারিত্বের অবসানে কার্যকর উদ্যোগ নেয়।

ইসলাম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি

হামাস মনে করে– ইসলাম হলো সেই ধর্মদর্শন, যেখানে একতা, সমতা, সহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। হামাসের আন্দোলন ভীষণ রকম মানবিক ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতিপূর্ণ। হামাস কারও বিরুদ্ধে শত্রুতাভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুসলিম উম্মাহর শত্রুতে পরিণত হয়। হামাস মনে করে, কেবল ইসলামের ছায়াতলে থাকলেই সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষের মধ্যে একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। হামাস এই বিষয়ে তার চেতনাটি নির্ধারণ করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে–

> 'ধর্মের ব্যাপারে কারও ওপর কোনো জবরদস্তি নেই।' সূরা বাকারা : ২৫৬

এ ছাড়া হামাস অপর একটি আয়াতও সব সময় বিবেচনায় নেয়–

> 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' সূরা মুমতাহিনা : ৮

এই সকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে হামাস সব সময়ই ভিন্ন ধর্মের মানুষকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হামাস ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে থাকা আদি খ্রিষ্টানদের তাদের একান্ত অংশীদার ও সহযোগী হিসেবেই বিবেচনা করে। হামাস মনে করে, এই খ্রিষ্টানরাও মুসলিমদের মতো একইভাবে জায়োনবাদীদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে। একটা সময়ে এই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জায়োনবাদীদের জাতিগত বিদ্বেষমূলক কৌশলের প্রতিবাদ করেছে। এই খ্রিষ্টানরা ফিলিস্তিনের জনগণের একটি অংশ এবং তাদেরও সেখানে বসবাস করবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

অধ্যায়-৫

অন্য দেশে হামাস

বেশ বড়ো একটা অধ্যায়জুড়ে হামাসের সনদ, কর্মকৌশল ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। আলোচনাটি তাত্ত্বিক হওয়ায় কারও কারও কাছে কিছুটা বিরক্তিকর লাগতে পারে। তবে হামাসকে জানতে কিংবা হামাসের বিবর্তনের প্রেক্ষাপট এবং দলের অভ্যন্তরে নানা ধরনের টানাপোড়েন বুঝতে হলে এই তাত্ত্বিক পর্যালোচনার কোনো বিকল্প নেই। হামাস যেভাবে তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন সংবিধান ঘোষণা এবং পরবর্তী সময়ে সেই সংবিধানের সীমাবদ্ধতাগুলো পর্যালোচনা করে সংশোধিত ঘোষণাপত্র দিয়েছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

মনে রাখতে হবে, হামাসের সংবিধানটি খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রচিত হয়েছিল। শেখ আহমাদ ইয়াসিন নিজেও তখন জেলে ছিলেন। দলের সব পর্যায়ের নেতারা সংবিধানে নিজেদের মত দেওয়ার সুযোগ পাননি। আব্দেল ফাত্তাহ দুখান নিজ কর্মতৎপরতায় সংবিধানটি প্রণয়ন করেছিলেন। সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে তিনি এই সংবিধান নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তা সংগঠন এখনও সম্মানের সাথে স্মরণ করে।

তাত্ত্বিক আলোচনায় বিরতি দিয়ে আমরা আবারও রাজনৈতিক ধারা বিবরণীতে ফিরে যাই। ফিলিস্তিন যখন ইন্তিফাদা আর হামাসের আবির্ভাবে উত্তপ্ত ছিল, তখন বিশ্ব পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে রূপ নিচ্ছিল। দুই পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব অনেক ছোটোখাটো রাষ্ট্রের ওপরও পড়েছিল। আমরা এই অধ্যায়টি শুরু করছি তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা, ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখলের বর্ণনার মাধ্যমে।

কুয়েত দখল

১৯৯০ সালের ২ আগস্ট, গ্রীষ্মকাল। কুয়েতের অনেক নাগরিকই ছিল দেশের বাহিরে। কুয়েতিরা আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল। তাই তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতে তারা অপেক্ষাকৃত সহনশীল আবহাওয়ার দেশে বেড়াতে যায়। বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে অনেকেই ছিলেন হামাসের দায়িত্বশীল। কুয়েতই ছিল তাদের সকল কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র। ১৯৮৭ সালে শুরু হওয়া ইন্তিফাদাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে সমর্থন কমিটি গঠন করা হয়, তার বেশিরভাগই ছিল কুয়েতে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যে কমিটিগুলো গঠিত হয়েছিল, সেগুলো কুয়েত থেকেই তত্ত্বাবধান করা হতো।

এর আগে কুয়েত ছিল সাংগঠনিক কাজ ও বসবাসের জন্য আরামদায়ক একটি দেশ। যেকোনো দলের কার্যক্রম গোপন ও নিরাপদে করার জন্য আরব অঞ্চলের মধ্যে কুয়েতই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। কুয়েতিরা এই অঞ্চলের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। আর কুয়েতের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণি ছিল আরব ইস্যু, বিশেষ করে ফিলিস্তিন সংকটের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল। তা ছাড়া ফিলিস্তিন ও জর্ডানের পরে কুয়েতেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ফিলিস্তিনি নাগরিক বসবাস করত। সেই সময় পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ ফিলিস্তিনি কুয়েতে বাস করত, যাদের অনেকেরই বেশ ভালো মান ও উচ্চ বেতন ছিল।

কুয়েতে থাকা পরিবারের অন্য সদস্যদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর ফিলিস্তিনে, জর্ডানের উদ্বাস্তু শিবিরে কিংবা সিরিয়া বা লেবাননে থাকা লাখো ফিলিস্তিনি পরিবারের জীবন নির্বাহ করত। গোটা '৮০-র দশকজুড়ে কুয়েতে ফিলিস্তিন ইখওয়ানের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই সেই সময় ফিলিস্তিনের জন্য কুয়েতের বিভিন্ন এনজিও যে অর্থ সংগ্রহ করত, সেগুলো ইখওয়ানের অধীনে থাকা বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে সরবরাহ করা হতো। পাশাপাশি যখন হামাস তার যাত্রা শুরু করল, তখন কুয়েতের ধর্মমনা জনসংখ্যার বিপুল অংশ এই সংগঠনটিকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দেউলিয়া পিএলও'র বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছিল।[৭০]

ঠিক এই সময়ে সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে ইরাকি সেনা প্রেরণ করে। কুয়েত দখল করতে সাদ্দাম হোসেনকে খুব বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু চিন্তায় পড়ে যান হামাস দায়িত্বশীলরা। তারা দ্রুতই বুঝতে পারেন, সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখল তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

---

৭০. কুয়েত সরকার পিএলও প্রশাসন বিশেষত ফাতাহ আন্দোলনকে '৮০-র দশক পর্যন্ত সরাসরি বা আরব লিগের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এসেছে, কিন্তু এরপর থেকে পিএলও নেতাদের দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয়ে তা যখন প্রকাশ্য আলোচনায় চলে আসে, তখনই এই সহযোগিতার ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

হলোও তাই। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করার পর অনেকেই চাকরি হারায়। যারা অভিযানের সময় কুয়েতের বাইরে অবস্থান করছিল, তারাও কুয়েতে ফেরার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্যদিকে, কুয়েতের কর্তৃপক্ষ সেখানে থাকা ফিলিস্তিনিদের একটি বড়ো অংশকে সাদ্দাম হোসেনের সহযোগী হিসেবে সন্দেহ করা শুরু করেছিল। ফলে ফিলিস্তিনিদের জন্য কুয়েতে বসবাস করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই হামাসের সমস্ত কার্যক্রম জর্ডানে স্থানান্তর করা ছাড়া উপায় ছিল না।

জর্ডানের হাশিমাইত (বনু হাশিম গোত্রেই রাসূল (সা.) জন্ম নিয়েছিলেন) শাসকপক্ষ অবশ্য সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। জর্ডানের সাধারণ মানুষ যদিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিল না। তবে এটা ঠিক, জর্ডানের বেশিরভাগ মানুষ সাদ্দাম হোসেনকে দখলদার হিসেবে বিবেচনা করত না; বরং তারা সাদ্দাম হোসেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক হিসেবে মনে করত। ১৯৮৯ সালে সংসদ নির্বাচনে জর্ডানের ইখওয়ান বেশ ভালো ফলাফল করায় সংসদে তাদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব ছিল। কুয়েত দখলের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর হুমকি দেয়, তখন হুমকির প্রতিবাদে জর্ডানে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল জর্ডানের ইখওয়ান। সেইসঙ্গে তারা একটি প্যান-ইসলামিক প্রতিনিধি দলও গঠন করেছিল, যাদের কাজ ছিল সৌদি আরব ও ইরাকের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা।

হামাসের নেতারা কুয়েত থেকে জর্ডানে আসার পর সেখানকার ইখওয়ান তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। সেইসঙ্গে হামাস অন্য কোথাও সদর দফতর স্থানান্তর করার আগ পর্যন্ত যাতে জর্ডানে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে, তা-ও নিশ্চিত করে। ফলে কুয়েত ছেড়ে আসায় হামাস যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল, জর্ডানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। জর্ডান ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে কাজ করা হামাসের জন্য বরং আরও ফলপ্রসূ হয়। তা ছাড়া জর্ডানের জনসংখ্যার অধিকাংশই বংশানুক্রমিকভাবে ফিলিস্তিনি এবং ফিলিস্তিনের সঙ্গে তাদের কোনো না কোনোভাবে আত্মিক সম্পর্ক আছে। তাই তারা ফিলিস্তিনিদের দাবির সঙ্গে শতভাগ একমত ছিল। অধিকন্তু জর্ডান ছিল আরব দেশগুলোর মধ্যে একটি দেশ, যেখানে সব ফিল্ডে যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকের দেখা পাওয়া যেত। আর তারা ফিলিস্তিনকে সহযোগিতা করাকে নিজেদের মৌলিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করত।

হামাসের নির্বাহী কমিটি তানফিধি; যারা ফিলিস্তিনের বাইরে হামাসের চলমান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করত, তার বেশিরভাগ সদস্যই ইরাক অভিযানের আগ পর্যন্ত কুয়েতে বসবাস করত। সেখান থেকে আম্মানে চলে আসার পর তাদের প্রাথমিক কাজ ছিল

পুরোনো সদস্যদের এক জায়গায় নিয়ে আসা এবং জর্ডান ইখওয়ান থেকে প্রয়োজনে নতুন কিছু সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা। হামাস কেবল তাদেরই সদস্য বানাত, যারা আগে থেকে ইখওয়ানের সদস্য হিসেবে কাজ করছিল। এর বাইরে অন্য কাউকে সদস্য বানানোর পূর্বে তারা তাদের মতো যাচাই-বাছাই করে নিত। তানফিধির সিনিয়র সদস্য ছিলেন মুসা আবু মারজুক; যিনি তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। তিনি ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে তানফিধি কমিটির অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আম্মান গমন করেন। কিছুদিন পর তিনি আবারও জর্ডানের বাইরে যান। তবে এরপর জর্ডান কর্তৃপক্ষ তাকে আর জর্ডানে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি। কারণ, তিনি জর্ডানের নাগরিক নন এবং জর্ডানে বাস করার জন্য তার কোনো অনুমতিও নেই।

তিনি ও তার সঙ্গীরা তখনও পর্যন্ত জর্ডানকে তাদের মূল কেন্দ্র বানিয়ে আন্দোলনের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাদের বিবেচনায় জর্ডানের চেয়ে নিরাপদ আর কোনো দেশ হতে পারে না। কিন্তু মুসা আবু মারজুককে জর্ডান কর্তৃপক্ষ ঢুকতে না দেওয়ায় তারা বুঝতে পারেন, জর্ডানের শাসক হামাসের কার্যক্রমে নজরদারি শুরু করেছে। জর্ডানে প্রবেশ করতে না পারায় আবু মারজুকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

হামাস যে ধরনের কাজ করে, তার জন্য জর্ডানের পরিবেশ অনুকূলে ছিল। অন্যদিকে, ইরাকে আক্রমণ চালানোর জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট গঠনের প্রক্রিয়া তত দিনে শেষ দিকে এসেছে। সে কারণেই জর্ডানের পরিবেশও জিহাদ করার মতো অনুকূলে আসে। ইজরাইলের দিক থেকে জর্ডানের ওপর আক্রমণের হুমকি থাকায় সেখানে পরোক্ষভাবে জরুরি অবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সম্ভাব্য যুদ্ধের আশঙ্কায় জর্ডানের সাধারণ মানুষকে আত্মরক্ষার তাগিদে অস্ত্র সংগ্রহ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। মূলত ইরাক ও ইজরাইলের মধ্যে টানাপোড়েনের মাঝে জর্ডান হয় বলির পাঠা। তাই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য জর্ডানের সামরিক বাহিনী জনসাধারণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে এবং পশ্চিম সীমান্তে ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল মোতায়েন করে। জর্ডানের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ ও মানসিক প্রস্তুতি দেখা যায়।

এমন পরিস্থিতিতে জর্ডানস্থ ইখওয়ানের অফিসে হামাস গোপনে একটি অস্ত্র ক্রয়সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে। স্থানীয় দুই-একজন শীর্ষ ইখওয়ান নেতা ছাড়া আর কেউ-ই এ বিষয় সম্পর্কে জানত না। এই অস্ত্র ক্রয়সংক্রান্ত কমিটির কাজ ছিল অস্ত্র কেনা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অস্ত্র ফিলিস্তিনে পাচার করার পরিবেশ না পাওয়া যায়,

ততক্ষণ মজুদ রাখা। তবে হামাস ও জর্ডানের মধ্যে এই মধুর হানিমুনের সময়টি সহসাই শেষ হয়। ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ৩০টি মিত্র দেশ 'অপারেশন ডির্জাট স্ট্রোম' নামক বিশেষ অভিযান শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল কুয়েতকে ইরাকি আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা। স্থলপথের মূল যুদ্ধ শুরু হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরাকি সেনারা পরাজয়ের আশঙ্কায় পিছু হটতে থাকে। ৩ মার্চ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। আরব অঞ্চলে এতদিন যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তা নিমিষেই নীরবতায় রূপ নেয়।

ইরাকের এই অপমানজনক পরাজয় জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। কারণ, সবাই ধারণা করেছিল– সাদ্দাম হোসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয়ী হবেন। বাস্তবতা হলো– সাদ্দাম হোসেন কিংবা জর্ডানের বাদশাহ হোসেন কেউ-ই চিন্তাই করতে পারেনি আমেরিকা ইরাকের ওপর হামলা চালাতে পারে।

খুব দ্রুতই জর্ডানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। এতদিন মানুষ চলাচলের ক্ষেত্রে যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত কিংবা যে সুযোগ-সুবিধা দিত, তা হঠাৎ করেই বেশ সংকুচিত হলো। জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বেশ জোরেশোরে কাজ শুরু করল। এর আগে সম্ভাব্য যুদ্ধের আশঙ্কায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই জর্ডান কর্তৃপক্ষ হামাসের অস্ত্র কেনা-বেচা ও মজুদ রাখার বিষয়টি জেনে যায়। এই সব কাজের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে হামাসের ১১ জন কর্মকর্তাকে আটক করা হয়। বিপদের গন্ধ পেয়ে তানফিধির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা তাৎক্ষণিক জর্ডান ত্যাগ করেন। মুসা আবু মারজুকের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক কমিটিগুলোতে কাজ করত, তারাও ওয়াশিংটনে চলে যান। তার পরবর্তী কয়েকটি মাস লন্ডনে থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এদিকে, জর্ডানের মন্ত্রিসভায় ইখওয়ানের পাঁচজন সদস্য ছিল। আর সময়টা ছিল তাদের ক্ষমতার অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় বছর।[৭১] ইখওয়ানের নেতারা হামাসের বন্দি কর্মকর্তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করে। তারা চেয়েছিল হামাসকে কেন্দ্র করে জর্ডান কর্তৃপক্ষ আর ইখওয়ানের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করতে। ইখওয়ান সংসদীয় দলের সাবেক নেতা মরহুম আহমাদ কুতায়াশ ছিলেন জর্ডানের অন্যতম প্রভাবশালী, সম্মানিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আম্মানস্থ হামাসের প্রতিনিধি

---

৭১. ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এই সরকার গঠিত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জর্ডানে এই সরকারের আমলে যে পরিমাণ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আর কখনোই হয়নি। এই সরকারের আমলেই পাঁচজন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ছাড়াও ইখওয়ান সংসদীয় দলের নেতা আব্দুল লতিফ আরাবিয়াত পার্লামেন্টের স্পিকার নির্বাচিত হন। সরকার ও বিরোধী দলের এ ধরনের সমঝোতা ও ঐকমত্য বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

ইবরাহিম গোশেহর সঙ্গে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী জায়েদ বিন সাকিরের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। সেই বৈঠকে সকল কারাবন্দিকে মুক্ত করার জন্য গোশেহ[৭২] প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

এক সপ্তাহ পর গোশেহ এই কারাবন্দিদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক মুস্তাফা আল কায়সির সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে আল কায়সি অস্ত্র কেনা ও মজুদের বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন– এটা মারাত্মক একটি ঘটনা। গোশেহ তার ব্যাখ্যায় বলেন– মূলত অস্ত্রগুলো আনা হয়েছিল ১৯৯১ সালে, যখন তৎকালীন জর্ডানিয়ান প্রধানমন্ত্রী মুদার বার্দান সম্ভাব্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গোশেহ আল কায়সিকে নিশ্চিত করেন, তারা জর্ডানের কোনো ক্ষতি করবেন না; করার ইচ্ছাও নেই। অস্ত্র যা জোগাড় করা হয়েছিল, তা ফিলিস্তিনে ব্যবহার করার জন্যই।[৭৩] এই দুটি বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে একটি রাজকীয় ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে হামাসের ১১ জন শীর্ষ কর্মকর্তা মুক্তি পান।

১৯৯২ সালের শেষদিকে পিএলও নেতৃবৃন্দ এবং জর্ডান কর্তৃপক্ষ কয়েক দফা আলোচনার পর একমত হন, বাস্তবিত অর্থে হামাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। একই সময়ে ইজরাইলও হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই সময়ে পিএলও হামাসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনের বাইরে কোথাও বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেয়। জর্ডান পিএলও'র উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তারা হামাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এমন একজন আরব রাজনীতিবিদকে জর্ডানের মাটিতে হামাসের উপস্থিতির বিষয়ে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানায়।

পিএলও'র আচরণে মনে হচ্ছিল, হামাসের সঙ্গে বৈঠকে দলের প্রধান ইয়াসির আরাফাতই হয়তো প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাহলে তার সঙ্গে হামাসের প্রতিনিধি হিসেবে কে বসবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তানফিধিকে নতুন করে গঠন করা হয়। তখনই প্রথমবারের মতো হামাসের রাজনৈতিক শাখা[৭৪] (আল মাক্তাব আল সিয়াসি) চালু করা হয়। এর প্রধান করা হয় মুসা আবু মারজুককে। এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে যদি হামাসের ওই নেতা-কর্মীদের নির্বাসনে পাঠানো না হতো, তাহলে হয়তো পরিস্থিতির এতটা অগ্রগতি হতো না।

---

[৭২]. গোসেহহ ছিলেন জর্ডান হামাসের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র।

[৭৩]. হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন

[৭৪]. হামাসের রাজনৈতিক শাখার দায়িত্ব, পরিধি ও বর্তমান কাঠামো সম্বন্ধে জানতে হলে রেফারেন্স ৩৯-এ লিংকে দেওয়া আছে।

কারণ, সেই ঘটনার পরপরই ফিলিস্তিনের ভেতরে ও বাইরে হামাসের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৩ সালের গোড়ার দিকে আল কায়সির সঙ্গে মুহাম্মাদ নাজ্জালের[৭৫] আরেক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নাজ্জাল ছিলেন জর্ডানের একজন নাগরিক। তিনি তানফিধির প্রভাবশালী সদস্যও ছিলেন। জর্ডানের কর্তৃপক্ষ এই সিরিজ বৈঠকগুলোর পর মোটামুটি একমত হয়, উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই হামাস অস্ত্র কিনেছিল। আর এই অস্ত্র দখলকৃত এলাকা ছাড়া আর কোথাও ব্যবহার করার ইচ্ছা হামাসের ছিল না। একই সঙ্গে তারা হামাসের সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান মুসা আবু মারজুক, তার সহকারী ও হামাসের ইরান শাখার নেতা ইমাদ আল আলামিকে জর্ডানে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। জর্ডান কর্তৃপক্ষ নাজ্জালকে স্পষ্টভাবে জানান- তারা হামাসের যেকোনো রাজনৈতিক ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেবেন, তবে জর্ডানের ভেতরে কিংবা জর্ডান-ইজরাইল সীমান্তে কোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেবে না। হামাসের কাছেও জর্ডান কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচকই মনে হয়েছিল।

এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসা আবু মারজুক ও ইমাদ আল আলামি জর্ডানে চলে আসেন। এরপর পূর্বের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আরও সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে কায়সির সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে হামাসকে প্রতিনিধিত্ব করেন মুসা আবু মারজুক, ইমাদ আল আলামি ও মুহাম্মাদ নাজ্জাল গোশেহ। অন্যদিকে, জর্ডানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আল কায়সি ও তার উপপ্রধান সামিহ আল বাত্তিকিহ। বৈঠকে জানানো হয়, খুব শীঘ্রই হামাসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী জায়েদ বিন শাকির একটি বৈঠক করবেন।

জর্ডান কর্তৃপক্ষ মূলত একটি নতুন রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ শুরু করতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে অল্প কয়েকদিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী জায়েদ বিন শাকির ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ধাওয়ান আল হিন্দাভি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে হামাসের চার নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী তাদের নিজের অফিসে স্বাগত জানান এবং উভয়পক্ষের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

---

৭৫. মুহাম্মাদ নাজ্জালের আদি বাড়ি পশ্চিম তীরে। তার পরিবার ১৯৪৮ সালের নাকবার পর জর্ডান চলে আসে। তিনি জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন এক বছর, তখন তার পরিবার কুয়েতে চলে যায়। কুয়েত ১৯৯০ সালে দখল হয়ে যাওয়ার পর তিনি আবার জর্ডানে ফিরে যান।

এমনকী জর্ডানের রাজাও এই বোঝাপড়া সম্বন্ধে অবগত বলে তিনি হামাস নেতাদের জানান। এটা ছিল মূলত একটি অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা। এভাবে হামাসের সঙ্গে জর্ডান কর্তৃপক্ষের যোগাযোগের দুটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ধারা মুহাম্মাদ নাজ্জালের সঙ্গে আল কায়সির যোগাযোগকে কেন্দ্র করে, অন্য ধারাটি আরেকটু নিচের দিকের কর্মকর্তারা পরিচালনা করত। যেমন : হামাসের পক্ষে থাকত নাজ্জালের সহকারী আল নাজ্জার আর জর্ডানের পক্ষে গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমজাদ আল হাদিদ।[৭৬]

জর্ডান কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, এই চুক্তিটি তাদের লাভবান করবে। সাধারণ জর্ডান নাগরিকদের মধ্যে হামাসের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা যেন কোনোভাবেই হুমকি হয়ে না ওঠে, তা তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। এর আগে ১৯৬০ সালে পিএলও'র সঙ্গে সংঘাতকে কেন্দ্র করে ১৯৭০ সালে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। জর্ডান কখনো চায়নি, ইজরাইলের সঙ্গে জর্ডানের পশ্চিম সীমান্তটি কোনো সামরিক কাজে ব্যবহৃত হোক। সেক্ষেত্রে হামাসের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং জর্ডানে তাদের উপস্থিতি ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকে তারা উত্তম সমাধান মনে করেছিল। কারণ, তাদের মনে যে একটা আশঙ্কা সব সময়ই ছিল তা হলো– জর্ডানের অনেক যুবক তখন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত। তাই তারা হামাসের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে হামলাও চালাতে পারে। একই সঙ্গে জর্ডান হামাসের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে পিএলও-কে এক ধরনের চাপে রাখতে চেয়েছিল।

বাদশাহ হোসেন ধারণা করেছিলেন– হামাস যেভাবে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাতে তারা হয়তো খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে পিএলও'র বিকল্প হয়ে উঠবে। তিনি ভেবেছিলেন, যেহেতু ইখওয়ানের সঙ্গে জর্ডানের দীর্ঘদিন ধরে ভালো সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্কের জের ধরে হামাসের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হবে। তাহলে হামাস তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করবে না।

অন্যদিকে, হামাসও জর্ডানের সকল শর্ত ও চুক্তি মেনে নিয়েছিল। কারণ, তারা এর মাধ্যমে জর্ডানে হামাসের স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি উপায় দেখছিল। আজ পর্যন্ত হামাস জর্ডানের সঙ্গে সংগঠিত সেই চুক্তিকে তাদের আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ক্রমাগত দমন-পীড়ন, অত্যাচার ও কারাবাসের কারণে যখন দলটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিল,

---

[৭৬]. হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

তখন জর্ডান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার কারণে তারা স্থায়ী সদর দফতর এবং একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা পেল। সেইসঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য হামাসের কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামও বিশ্ববাসী জানতে পারল। ফলে সংগঠনের গঠন-কাঠামো ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এলো। গোপন সংগঠন থেকে হামাস প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এলো এবং জনসম্মুখে একটি দৃঢ় আসন গেঁড়ে বসার সুযোগ পেল।

অন্য যেসব দেশের সরকার নিজেদের প্রয়োজনে হামাসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল, জর্ডান সরকারের পদক্ষেপে তারাও উৎসাহিত হলো। জর্ডানস্থ হামাসের রাজনৈতিক শাখা অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তির সুযোগে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলো। সেই সময়গুলোতে হামাস অনেকগুলো দেশের রাজধানীতে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পেল; যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তারা কেবল সুদানের রাজধানী খার্তুম এবং ইরানের রাজধানী তেহরানে কার্যক্রম চালিয়েছিল। জর্ডান শাসকদের আনুকূল্যের সুযোগ নিয়ে হামাস অল্প সময়ের মধ্যেই সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেনেও আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে তারা সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করে। হামাসের শীর্ষ নেতারাও বেশ কয়েকদফা এই দেশগুলোতে সফর করেন। পাশাপাশি হামাস মিশরের মাধ্যমে যোগাযোগের আরেকটি ধারা চালু করে, যার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকাসহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মোটকথা হামাস এই সময় আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতি লাভ করে।

জর্ডানে হামাসের কার্যক্রম বেশ ভালোভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু হামাসের এই সুখের প্রণয়ে ঝড়ের আভাস দেখা দিলো। ১৯৯৩ সালের শরতে হামাস নেতারা হঠাৎ করে জর্ডান শাসকদের আচরণে কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পান।

ঘটনার শুরু যেখান থেকে...

১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসের লনে বসে পিএলও ও ইজরাইল অসলো-চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। এই ঘটনাটা অনেকের জন্যই চমকে উঠার মতো। কারণ, এই চুক্তি স্বাক্ষরের আগ পর্যন্ত অনেকেই জানতে পারেনি, অসলোতে পিএলও ও ইজরাইলের প্রতিনিধিরা কয়েক দফা বৈঠকের মাধ্যমে এই চুক্তির বিভিন্ন দিকগুলো চূড়ান্ত করেছে। ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে সমঝোতা আলাপে কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসতে পারে, জর্ডান তা কল্পনাও করেনি। তাই অসলো-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্রই জর্ডান যেন ভিন্ন এক বাস্তবতায় পড়ে যায়।

তারা এই চুক্তিকে পিএলওর দিক থেকে এক ধরনের বেইমানি হিসেবেই বিবেচনা করে। ফলে জর্ডান ইজরাইলের সাথে গোপন সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু করে। আর স্বাভাবিকভাবে ইজরাইলের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় যাওয়ার জন্য হামাসের সাথে জর্ডানের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি নতুন করে কাটছাট করার প্রশ্ন আসে। তা ছাড়া হামাসকে জর্ডানের মাটিতে কাজ করতে না দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরাইল ও পিএলও দীর্ঘদিন ধরেই চাপ প্রয়োগ করে আসছিল।

চুক্তি বাতিল করার নিমিত্তেই জর্ডান কর্তৃপক্ষ হামাসের নেতাদের হয়রানি করা শুরু করল। হামাসের শীর্ষ নেতারাও বুঝতে পারলেন, তাদের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। হামাসের শীর্ষ নেতারা– যারা জর্ডানের বাইরে যাওয়া-আসা করছিলেন, তাদের বেশি বেশি তল্লাশি শুরু হলো। অনেক ক্ষেত্রে অসম্মান ও অপমান করা হলো। এভাবে একটা সময় জর্ডান কর্তৃপক্ষ শুধু চুক্তি লঙ্ঘনই নয়; বরং চুক্তির বিপরীতে চলতে শুরু করে।

জর্ডানের সাথে হামাসের সম্পর্কে টানাপোড়েন[৭৭]

জর্ডানের সাথে হামাসের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে, তা প্রথমবার বোঝা যায় ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল। এইদিন হামাসের সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেড আফুরায় একটি বোমা হামলার দায় স্বীকার করে। এই হামলায় আটজন ইজরাইলি নিহত এবং আরও ৪৪ জন আহত হয়। এর আগে আমেরিকান ইহুদি বারুচ গোল্ডস্টেইন[৭৮] হেবরনের ইবরাহিমি মসজিদে নামাজ চলাকালে একটি গণহত্যা চালিয়েছিল, যাতে ২৯ জন মুসলিম শহিদ এবং সহস্রাধিক লোক আহত হয়। মূলত এই বর্বর ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আল কাসসাম ব্রিগেড এই বোমা হামলা চালায়। তারা ঘোষণা দেয়, এ ধরনের আরও চারটি হামলার পরিকল্পনা তাদের আছে। এক সপ্তাহ কাসসাম ব্রিগেড হাদেরাতে আরেকটি বোমা হামলা চালায়, যাতে পাঁচজন ইজরাইলি নিহত

---

[৭৭]. এই ঘটনাটি বিস্তারিত প্রকাশিত হয় *মিডলইস্ট ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন* নামক একটি পত্রিকায় ২০০১ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর সংস্করণে। জর্ডান-হামাস ডিভোর্স শিরোনামের এই সংবাদে জর্ডানের সাথে হামাসের টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের শেষ পরিণতি আলোচনা করা হয়েছে। পত্রিকাটির অনলাইন লিংক পাবেন রেফারেন্স ৪০ নং-এ।

[৭৮]. আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ডাক্তার বারুচ গোল্ডস্টেইন ১৯৯৪ সালে কয়েক ডজন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে। ওই ফিলিস্তিনিরা তখন হেবরনে নামাজ আদায় করছিলেন। ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটে দাঁড়িয়ে শীতল কণ্ঠে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রবিন বলেন– তার (বারুচ গোল্ডস্টেইন) জন্ম অন্য কোথাও। এই খুনের ঘটনায় তার যে মানসিকতা এখানে দেখা গেছে, তা আমাদের মতো নয়; সাগরের অপর তীর থেকে সে এসেছে। এরা ইহুদি ধর্মমতের কেউ নয়! এরা আমরা নই।' রবিন বলতে থাকেন– 'তুমি বিদেশি আগাছা। তুমি এক অসভ্য আগাছা। ইহুদি ধর্মমত তোমাকে থুতু মেরে বহিষ্কার করছে।'

এবং আরও ৩০ জন আহত হয়। এই পর্যায়ে সাংবাদিকরা জর্ডানে হামাসের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ নাজ্জালের সঙ্গে যোগাযোগ করে আল কাসসাম ব্রিগেডের সম্ভাব্য হামলাগুলো সম্বন্ধে মতামত জানতে চায়। নাজ্জাল তাদের জানান, এই বোমা হামলাগুলো ইবরাহিমি মসজিদে চালানো গণহত্যারই প্রতিক্রিয়া। ইজরাইলের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেস হামাস নেতা নাজ্জালের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। সেইসঙ্গে জর্ডানের প্রতি আহ্বান করে- যেহেতু জর্ডানের সাথে ইজরাইলের চুক্তি রয়েছে, সেই চুক্তির আলোকে জর্ডানকে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে কেউ জর্ডানের মাটিতে বসে এ ধরনের বক্তব্য দিতে না পারে।

১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। জর্ডানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাজ্জাল ও গোশেহকে ডেকে পাঠায়। সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালামাহ হাম্মাদ ক্রোধের সুরে তাদের বলেন, নাজ্জাল মিডিয়াতে সঠিক বক্তব্য দেননি। আর জর্ডানে থেকে ইজরাইলের মাটিতে চালানোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পরের দিন শুক্রবার এই দুই নেতাকে আবারও আম্মানের পুলিশ সদর দফতরে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। জর্ডানের ওপর চতুর্মুখী চাপ আসছে, আর সে কারণে তাদের পাসপোর্টগুলো অবিলম্বে জর্ডান কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। দুই নেতাকে বলা হয়, তাদের জীবন ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে। তাই তাদের অনুরোধ করা হয়- যদি তারা কোনো ধরনের সন্দেহজনক ঘটনা দেখেন, তাহলে যেন সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে জানান। তাদের পাসপোর্ট জমা নেওয়া হয়; যদিও অল্প সময় পর আবারও ফেরত দেওয়া হয়।

সেই সময়ে বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু ঘটনার কারণে জর্ডানের সাথে হামাসের টানাপোড়েন আরও বেড়ে যায়। ইজরাইল ও জর্ডান ১৯৯৪ সালের ২৫ জুলাই ওয়াশিংটন ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ অক্টোবর দুই দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও জর্ডানের অনেক নেতাই হামাসকে আশ্বস্ত করেছিলেন, এই সব চুক্তির কারণে হামাসের কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু হামাস নেতারা ঠিকই বুঝেছিলেন, ইজরাইলের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির দিন থেকেই জর্ডানে তাদের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই আশঙ্কাকে সামনে রেখে হামাসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা মুস্তাফা আল কায়সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান- ওয়াদি আরাবাতে জর্ডান ও ইজরাইলের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, তার ফলে জর্ডানে হামাসের উপস্থিতির দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু আল কায়সি তাদের আবারও আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন- যদি হামাস পূর্বের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কেবল রাজনৈতিক ও প্রচার-প্রচারণার কাজ করে, তাহলে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। হামাস নেতারা তবুও আশ্বস্ত হতে পারেনি।

ইজরাইলের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির বেশ কয়েকটি পয়েন্ট এমন ছিল, ইজরাইল বা জর্ডান কোনো পক্ষই একজন অপরজনের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শত্রুতা মনোভাব পোষণ করবে না, বৈরী আচরণ করবে না। কেউ কারও ভূখণ্ডে এমন কোনো কাজ করবে না বা হতে দেবে না, যাতে অপরপক্ষের হুমকির কারণ হতে পারে। উভয়পক্ষ সন্ত্রাস মোকাবিলায় একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। আর কোনো পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না কিংবা অন্য কোনো দেশের সাথে কোয়ালিশনও গড়তে পারবে না। সেইসঙ্গে কোনো পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের নেতিবাচক বক্তব্য বা মিথ্যা প্রচারণা চালাবে না।

হামাস জর্ডানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির কোনো পয়েন্ট কখনো লঙ্ঘন করেনি। কোনো প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেনি। জর্ডানের মাটিতে বসে ইজরাইলের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানও চালায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরাইল ও পিএলও সর্বাত্মকভাবে জর্ডানস্থ হামাসের যেকোনো কাজকে, এমনকী সামান্য একটি বিবৃতিকেও ইজরাইলের বিরুদ্ধে বৈরী আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায়। সেইসঙ্গে দাবি করে– হামাসের এই সব কর্মকাণ্ড চলমান আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

অবশ্য বাদশাহ হোসেন এরপরও হামাসকে জর্ডানে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন– হামাসের উপস্থিতি আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাকে কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা দেয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, হামাস কখনোই জর্ডানের আইন-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি ছিল না। তাই তিনি হামাসকে জর্ডানে রেখেই শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব সহসা বুঝতে পারেন, তার চাওয়া কখনোই পূরণ হবে না। জর্ডানের ওপর ইজরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ আরও বেড়ে যায়, যখন ১৯৯৪ সালের ১১ অক্টোবর আল কাসসাম ব্রিগেড গোলানি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিজ থেকে নাচশন ওয়াচম্যান নামের একজন ইজরাইলি সেনাকে অপহরণের দায় স্বীকার করে।

তারা জিম্মি সেনাকে পশ্চিম তীরের রামাল্লাহর বীর নাবালা গ্রামের একটি বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখেন। এই অপহৃত সেনার মুক্তির বিনিময়ে তারা ফিলিস্তিনি অন্যান্য বন্দির মুক্তি দাবি করেন। তারা যেসব বন্দির মুক্তি দাবি করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শেখ আহমাদ ইয়াসিন এবং ইজরাইলের হাতে আটক দুই হিজবুল্লাহ সদস্য আব্দ-আল করিম উবায়েদ ও মুস্তাফা আল দিরানি। এদিকে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ধারণা করেছিলেন, তিনি জর্ডানস্থ হামাস নেতাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অপহৃত সেনাকে মুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু যখন দেখলেন জর্ডানে অবস্থানরত হামাসের রাজনৈতিক শাখার এই ঘটনায় কিছু করার মতো সামর্থ্য বা আগ্রহ কোনোটাই নেই, তখন পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েন।

ফিরে আসি সেনা অপহরণের ঘটনায়। মূলত সেই সময়গুলোতে সমঝোতা করার মতো হাতে সময়ও ছিল না। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের গোয়েন্দাসংস্থাগুলো ইজরাইলি সেনাকে লুকিয়ে রাখার স্থানটি সম্পর্কে কিছু তথ্যও সরবরাহ করেছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করেই ইজরাইল সিদ্ধান্ত নেয়, অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে প্রয়োজনে অপারেশন চালাবে।[৭৯] এদিকে অপহরণকারীরা অপহৃত সেনা ভাক্সম্যানের একটি ভিডিও ধারণ করেছিল। ভিডিওতে ওয়াচম্যান তখনও সামরিক পোশাক পরে ছিলেন। তার সাথে থাকা অস্ত্র ও আইডি কার্ডও সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল।

অপহরণকারীরা গাজার এক পরিচিত সাংবাদিকের মাধ্যমে ভিডিওটি মিডিয়াতে প্রচারের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ভিডিওটি প্রচার হওয়ার সাথে সাথে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সেই সাংবাদিককে গ্রেফতার এবং তার থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য- অপহরণকারী পর্যন্ত পৌঁছতে পারা। ইজরাইলের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন অপহরণকারীদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে রাজি। এমনকী তারা আরও জানায়, অপহরণকারীদের দাবি অনুযায়ী সকল ফিলিস্তিনি বন্দিকে ইতোমধ্যেই বাসে তোলা হয়েছে এবং বাসটি এরই মধ্যে গাজার ইরেজ চেকপয়েন্টের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে শেখ ইয়াসিন এই ঘটনা সম্বন্ধে জানান- 'ইজরাইলিরা একবার ভেবেছিল আমাকে নিয়ে ওই অপহরণকারীদের কাছে যাবে এবং আমাকে দিয়েই অপহরণকারীদের অনুরোধ করাবে, যাতে তারা অপহৃত সেনাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কী যেন একটা ভেবে তারা এই চিন্তা থেকে সরে আসে। সম্ভবত তারা ধারণা করেছিল, আমাকে দেখে অপহরণকারীরা জিম্মিকে মেরেও ফেলতে পারে।'

আল কাসসাম ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রয়োজন সাপেক্ষে নিজেদের একটি শহিদি সামরিক শাখায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। আল কাসসামের যোদ্ধারা ছিল তাদের মিশনে সফল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোনো কারণে যদি সফল না হতো, তাহলে ভাবত- তাদের জন্য মৃত্যুই শ্রেয়। যাই হোক, ইজরাইল অপহৃত সেনাকে উদ্ধারের জন্য সেনাদের একটি বিশেষ ইউনিটকে পাঠায়। এই অভিযানের ফলস্বরূপ আটক ইজরাইলি সেনা নিহত হয়। সেইসঙ্গে সকল অপহরণকারী নিহত হয়। যে স্পেশাল ইউনিট এই অপারেশনটি চালিয়েছিল, তার কমান্ডারও নিহত হয়।

১৯৯৪ সালের জুলাইতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত গাজায় অবতরণ করেন। ইজরাইল আশা করেছিল, জর্ডানের হামাসকে শক্তভাবে প্রতিহত করতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলকে সহযোগিতা করবে।

---

৭৯. এই অপহরণ, অপহরণকারীদের ভিডিও টেপ উদ্ধার অভিযান ও পরিণতি সবই উইকিপিডিয়াতে পাওয়া যায়। লিংক রেফারেন্স নং ৪১-এ।

তা ছাড়া অসলো-চুক্তি অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের দমন বা ইজরাইলে হামলা বন্ধে পিএলও তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছিল না। আবার পিএলও দাবি করে, ইজরাইলে সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে তারা সব চেষ্টাই করছে, কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। কারণ, হামাসের শীর্ষ নেতাদের জর্ডান আশ্রয় দিয়েছে। ফলে তারা সেখানে নির্দ্বিধায় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে; এমনকী জর্ডানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সামরিক প্রশিক্ষণও চালিয়ে যাচ্ছে।

একটা পর্যায়ে ইয়াসির আরাফাত ইজরাইলে হামাসের হামলার পেছনে জর্ডানের মদদ দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। আরাফাত অভিযোগ করেন, জর্ডান পশ্চিম তীরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়, সেইসঙ্গে বোনাস হিসেবে গাজা উপত্যকা পেলে তো কথাই নেই। তাই তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে পিএলও-কে কোণঠাসা করতে হামাসের সঙ্গে অন্যায্য চুক্তি করেছে। ইয়াসির আরাফাতের এই অভিযোগের পরপরই আমেরিকা-ইজরাইল নড়েচলে বসে। তাদের জন্য এ বক্তব্য ছিল মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মতো। এরপর তারা শক্তভাবে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে জর্ডানের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অস্বস্তিকর অবস্থানে পড়ে যায় জর্ডান।

মুসা আবু মারজুককে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় একটি ঘটনা

১৯৯৫ সালের মে মাসের শুরুর দিকে জর্ডানের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতাদের জরুরিভাবে ডেকে পাঠান। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর উপপ্রধান খালিদ মিশাল ও ব্যুরোর অপর তিন সদস্য মুহাম্মাদ নাজ্জাল, ইবরাহিম গোশেহ ও ইমাদ আল আলামি। কোনো এক অজানা কারণে আবু মারজুক এই বৈঠকের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় ছিলেন। তাই তিনি সচেতনভাবেই বৈঠকে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

এটা বৈঠকটি ছিল জর্ডান কর্তৃপক্ষের সাথে মিশালের প্রথম কোনো বৈঠক। এই বৈঠকের আগ পর্যন্ত তিনি খুবই লো প্রোফাইল অবস্থায় ছিলেন। তার কাজকর্ম সম্বন্ধেও মানুষ তেমন একটা জানত না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তরিকতার সাথেই অতিথিদের বরণ করেন। বৈঠক চলাকালীন একটা পর্যায়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেন, হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর দুই সদস্য মুসা আবু মারজুক ও ইমাদ আল আলামিকে এই মাসের মধ্যে জর্ডান ছাড়তে হবে। হামাসের সাথে এই বৈঠকের দুই সপ্তাহ আগে ইয়াসির আরাফাতের দূত আব্দ-আল রাজ্জাক আম্মান সফরে এসেছিলেন। ধারণা করা হয়, সেই সফরেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আরাফাত তার দূত আল ইয়াহিয়াকে আম্মানস্থ হামাস নেতাদের সঙ্গেও

বৈঠক করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই বৈঠকে মূল বার্তা ছিল– হামাস যেন ফিলিস্তিনে সব ধরনের সহিংস কার্যক্রম বন্ধ করে। কারণ, এসব কর্মকাণ্ডের কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা অর্জন করতে চাচ্ছে, তা ব্যাহত হচ্ছে। হামাস অবশ্য সেই চিন্তাধারার সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

ফিরে আসি মারজুকের ঘটনায়। রাজনৈতিক ব্যুরোর দুই নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য হামাস নেতারা জর্ডানের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে; কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। জর্ডান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল– এই দুজন জর্ডান থেকে চলে গেলে তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান ইজরাইলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কিছুটা হলেও কমবে। কারণ, এরই মধ্যে জর্ডানের যেসব নাগরিক হামাসে যোগ দিয়েছে, জর্ডান সরকার তাদের বহিষ্কার করতে পারছে না। তাই নাগরিক নয় এমন দুজনকেই তারা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মূলত ১৯৯৫ সালের শুরু থেকেই জর্ডান সরকারের কার্যক্রম হামাসকে বিরক্ত করে তুলছিল। কারণ, এই বছরের শুরুতেই জর্ডান সরকার ইজরাইলের সাথে চুক্তি করেছিল। এই ঘটনার দুই মাস পর হামাসের এক শীর্ষ নেতাকে বিদেশ থেকে জর্ডানে ফেরার সময় গ্রেফতার করা হয়, যা নিয়ে হামাসের সাথে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে রীতিমতো তর্ক হয়। অবশ্য হামাস স্বীকার করে, তারা জর্ডানে যাদের নতুন করে কাজে লাগিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নেয়নি। পরিস্থিতি আরও জট পাকিয়ে যায়, যখন ইমিগ্রেশনে আটক সেই কর্মকর্তা নিজেকে হামাসের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন।

জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে হামাসের পক্ষ থেকে লেয়াজু করতেন ইসাম আল নাজ্জার। তিনি গোয়েন্দা কার্যালয়ে গিয়ে সেই আটক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। গোয়েন্দা কর্মকর্তা আল নাজ্জারকে বলেন– 'আমরা আপনাকে আটক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিচ্ছি। তবে শর্ত হলো– তাকে বলবেন, যাতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমাদের সহযোগিতা করেন।' ইসাম আল নাজ্জার গোয়েন্দা কর্মকর্তার অনুরোধ মেনে নেন। ফলে তিনি সেই আটক ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পান।

ইসাম আল নাজ্জার বন্দির সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তার যা করার কথা ছিল, করেন তার উলটোটা। তিনি ওই আটক ব্যক্তিকে বলেন– 'মুসা আবু মারজুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, আপনি যেন জিজ্ঞাসাবাদে কোনো সহযোগিতা না করেন; কোনো তথ্যই না জানান।' আল নাজ্জারের এমন আচরণ গোয়েন্দারা জেনে যায়। এরপর তাকে আর সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়; এর পর থেকে হামাসের সাথে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মারজুকের বহিষ্কারাদেশের পর জর্ডানের গোয়েন্দাসংস্থা ইসাম আল নাজ্জারকেও শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক তারা আল নাজ্জারকে পাসপোর্ট ও ফ্যামিলি কার্ড সারেন্ডার করতে বলে। সেইসঙ্গে তার জর্ডানের নাগরিকত্ব বাতিল করে মাত্র দুই বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দেয়। বেঁকে বসেন আল নাজ্জার। তিনি কোনোভাবেই পাসপোর্ট জমা দিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে জর্ডান গোয়ান্দারা তাকে দুই রাত আটকে রাখে। অবশ্য ইখওয়ান কর্মকর্তারা বিষয়টাতে হস্তক্ষেপ করলে সংকটের সমাধান হয়, তবে সেই সমাধানটি ছিল ক্ষণস্থায়ী। মূলত গোটা ঘটনায় হামাসের কৌশল মোটেও সঠিক ছিল না। আবু মারজুকের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, এই ঘটনায় তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়; বরং এর কারণে তার বহিষ্কারাদেশ বহাল রাখার যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়।

১৯৯৫ সালের ৩১ মে মুসা আবু মারজুক ও ইমাদ আল আলামি জর্ডান থেকে বেরিয়ে যান। মুসা আবু মারজুক চলে যান ইয়েমেনে আর ইমাদ আল আলামি যান সিরিয়ায়। মারজুক পরবর্তী ছয় সপ্তাহ ইয়েমেনে বসে তার ভবিষ্যৎ গন্তব্য ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করেন। ইয়েমেন ছাড়ার পর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, মিশর, সুদান ও সিরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে তৎপরতা চালান, তবে তার জন্য জরুরি ছিল পরিবারের কথা ভেবে কিছুটা স্থিতিশীল পর্যায়ে চলে যাওয়া। তিনি যেসব দেশে ভ্রমণ করেন, সেসব দেশে থাকার চেষ্টা করেছিলেন! হামাসের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব বিধায় দেশগুলো তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আরব আমিরাতে তার আগে থেকেই থাকার অনুমতি থাকলেও তার পরিবারকে অনুমতি দেননি! তাই আমিরাতের দরজাও মারজুকের জন্য বন্ধ হয়। সিরিয়া অবশ্য ইমাদ আল আলামির মতো তাকেও বরণ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু আবু মারজুক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলেন। এর আগে ১৭ বছর তিনি সেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে প্রবেশ করতে কানো ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাননি। তিনি এবং তার পরিবারের সবারই যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ড ছিল। সেখানে থাকার ও কাজ করারও অনুমতি ছিল। আবার তার ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকও। আর তারা ক্রমশ বড়ো হচ্ছিল। তাই বাবার সাথে এ দেশ, সে দেশ ঘোরাঘুরির ফলে পড়াশোনাসহ সার্বিক কাজে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে গোটা পরিবারের জন্যই কোথাও স্থির হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। তবে তার চিন্তার সঙ্গে হামাসের রাজনৈতিক শাখার অধিকাংশ সদস্যই একমত ছিলেন না। তারা বলেন– যেহেতু হামাসের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুবই খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে, তাই মারজুকের কোনোভাবেই

যুক্তরাষ্ট্রমুখী চিন্তা করার সুযোগ নেই। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তখন হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৮০] সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মারজুক তাদের চোখে অপরাধী। কিন্তু মারজুকের অভিমত ছিল ভিন্ন রকম। তার মন বলছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একবার যেতে পারলে সবকিছুই তার অনুকূলে চলে আসবে, কিন্তু তার মনের এই ইঙ্গিত মোটেও সঠিক ছিল না। ফলে কাঙ্ক্ষিত ঘটনাই ঘটল। ১৯৯৫ সালের ২৫ জুলাই নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে অবতরণ করা মাত্রই এফবিআই মারজুককে গ্রেফতার করে।

নিঃসন্দেহে মারজুকের গ্রেফতার হামাসের জন্য বেশ বড়ো আঘাত ছিল। ফলে আন্দোলন আবারও কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়। হামাসে ও মারজুকের সহযোগীরা তার আমেরিকা যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কোনোভাবেই মানতেই পারছিল না। তৃণমূলের কর্মীরাও এই ঘটনায় বেশ প্রতিক্রিয়া দেখাল। আগাম বিপদ বোঝার পরও মারজুক কেন ঘুরেফিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই গেলেন, সেটাই বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো। কিন্তু যত প্রশ্নই থাকুক, হামাস হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। মারজুকের মুক্তির জন্য হেন কিছু নেই, যা তারা করেনি। সেইসঙ্গে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত দেয়– তারা যদি মারজুককে ইজরাইলের হাতে তুলে দেয়, তাহলে তাদের ভয়াবহ পরিণতি মোকাবিলা করতে হবে।

এবার হামাসের নেতৃত্বে আসেন খালিদ মিশাল। তিনি দায়িত্ব পেয়ে মারজুকের জন্য ব্যাপকভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। হামাস নেতারা দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে তারা মারজুকের অন্যায় আটকাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। একই সঙ্গে খালিদ মিশাল বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কূটনীতিকের কাছেও চিঠি লিখেন। হামাসের পক্ষ থেকে ১৯৯৫ সালের ২৮ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল ও মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসানের কাছে পত্র দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই হামাস রেভারেন্ড জেসে জ্যাকসনের[৮১] কাছেও আরেকটা চিঠি প্রেরণ করে। ১ জুলাই হামাস চিঠি পাঠায় আরব লিগ এবং ওআইসি সেক্রেটারি জেনারেল বরাবর। সংকট ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে হামাসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করা হয়।

---

৮০. যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকল লেনদেন নিষিদ্ধ করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আমলে, ১৯৯৫ সালের ২৩ জানুয়ারি। এটা ছিল একটা নির্বাহী আদেশ, কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে।

৮১. রেভারেন্ড জেসে জ্যাকসন ছিলেন প্রভাবশালী একজন মার্কিন রাজনীতিবিদ ও মানবাধিকার কর্মী। তিনি ব্যাপ্টিস্ট প্রথার কড়া সমর্থক ছিলেন। ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে তিনি দুই দফা ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনও করেছিলেন।

এদিকে আবু মারজুকের গ্রেফতারের পর মার্কিন কর্তৃপক্ষকে বেশ দ্বিধান্বিত দেখা গেল। তারা বুঝতে পারছিল না মারজুকের বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ আনবে। কারণ, তার ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ বৈধ। ইজরাইলও মারজুককে নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। পরিস্থিতি বেশ জটিল হলো। মার্কিন প্রশাসন তার ব্যাপারে একমতে আসতে পারল না। আবু মারজুক বিশ্বাস করতেন– এফবিআই তাকে যেভাবে গ্রেফতার করেছে, সিআইএ সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনোভাবেই একমত হবে না। কারণ, সিআইএ জানত– তিনি আমেরিকাতে কোনো আইনবিরোধী কাজ করেননি। কিন্তু এফবিআই-এর অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গ্রুপ খুব সচেতনভাবে মারজুককে ইজরাইলিদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল।

১৯৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইজরাইল আমেরিকার কাছে মারজুককে নেওয়ার জন্য বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়। এই আবেদনের সাথে সম্পূরক হিসেবে মারজুকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সংবলিত ৯৫০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদনও জমা দেয়। মারজুকের আইনজীবীরা এই অন্যায় আবেদন প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করে। আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, যে আদালতে এই মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তার বিচারকরা স্বাধীন নয় এবং বিচার প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে না। এই মামলাটি যে বিচারক পরিচালনা করছিলেন, মারজুকের আইনজীবীরা শুরু থেকেই তাকে ইজরাইলের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করেন। যাহোক, বিচারক মারজুককে ইজরাইলের কাছে হস্তান্তর করার পক্ষে রুল জারি করেন। মারজুক তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার আইনজীবীরা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষী আদালতে নিয়ে আসার অনুমতি পায়নি। আবু মারজুক সংশ্লিষ্ট বিচারকের রুলের বিপক্ষে আপিল করেছিলেন, কিন্তু সেটাও খারিজ হয়ে যায়।

এদিকে জর্ডানের শাসক হামাসের ওপর দমন-পীড়ন বাড়িয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল– বাকিদেরও জর্ডান থেকে তাড়ানো। নিপীড়নের অংশ হিসেবে হামাসের রাজনৈতিক শাখার অন্যতম সদস্য সামি খাতির ১৯৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার পথে গ্রেফতার হন। তার বাড়ি তল্লাশি করে যাবতীয় কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা জব্দ করা হয়। একই সময়ে রাজনৈতিক শাখার আরেক সদস্য ইজ্জাত আল রিসিককেও গ্রেফতার করা হয়।

অন্যদিকে, ইজরাইল হঠাৎ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। সেখানকার স্থানীয় সরকারের পরিবর্তনের ফলে তারা কোনোভাবেই মারজুকে নিতে চাচ্ছে না। ইজরাইলের সিদ্ধান্ত বদল দেখে আবু মারজুক আসল ঘটনা বুঝতে পারলেন।

এবার তিনি রক্ষণাত্মক ভূমিকা ছেড়ে আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেন। তারই অংশ হিসেবে আইনজীবীদের সকল পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি আদালতের বন্দি বিনিময় আদেশের বিরুদ্ধে করা আপিলটি প্রত্যাহার করে নেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে ইজরাইলের কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানান। যদিও এ কাজটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, তবুও মারজুকের এবারের পদক্ষেপটি ছিল সঠিক। কিন্তু ইজরাইলিরা তাকে নিতে চাইল না। ১৯৯৬ সালের ২৯ মে অনুষ্ঠিত ইজরাইলি সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির শিমন পেরেস লিকুদ পার্টির বেনজামিন নেতানিয়াহুর কাছে পরাজিত হন। নেতানিয়াহু নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ও শিমন পেরেসের করা চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, নেতানিয়াহু হামাসকে মোকাবিলা করার কৌশল নির্ধারণ করেন তার পূর্বসূরিদের করা নানা ভুল থেকে শিখে। কারণ, এর আগে শিমন পেরেস হামাসের সামরিক কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশকে হত্যা করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার জন্য ইজরাইলকে চড়া মূল্য দিতে হয়। ১৯৯৬ সালের ৫ জানুয়ারি আয়াশকে হত্যা করার পর পালটা প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইলে ২৫ ফেব্রুয়ারি একবার এবং পরবর্তী সময়ে ৪ মার্চ আরেক দফা বোমা হামলা চালানো হয়। এতে ৬০ জন ইজরাইলি নিহত এবং কয়েকশো আহত হয়। এ জন্য নেতানিয়াহু শুরুতেই হামাসকে উত্তেজিত করার পক্ষে ছিলেন না। তাই মারজুককে নেওয়ার সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, এক মারজুকের জন্য তিনি বেশি কিছু হারাতে চাননি। তা ছাড়াও তিনি ভেবেছিলেন, আবারও ইজরাইল যদি হামলার স্বীকার হয়, তাহলে হয়তো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবেন না।

১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল ইজরাইল তার বন্দি বিনিময় আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে তখন মারজুককে মুক্তি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিলো! মুক্তি দিলে আবু মারজুক যাবেন কোথায়? নিজেদের ইমেজ বাঁচাতে এফবিআই পরিচালক লুইস ফ্রিহ আবু মারজুককে গ্রহণ করার জন্য জর্ডান ও মিশরের প্রতি আহ্বান জানান। কারণ, এই দুটি দেশের সাথে ইজরাইলের শান্তিচুক্তি রয়েছে। লুইস এই ব্যাপারে প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি জানান, যে দেশই মারজুককে গ্রহণ করুক না কেন, সেই দেশকে যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত কিছু শর্ত মেনে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

শর্তটি এমন ছিল– মারজুককে কখনোই লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, সুদান ও ইরানে যেতে দেওয়া যাবে না। নতুন দেশে যাওয়ার পর তাকে কমপক্ষে ছয় মাস সেখানেই থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত ছিল– মারজুককে সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দিতে হবে।

আর সর্বশেষ শর্ত ছিল– তিনি আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবেন না। জর্ডান ও মিশর দুই দেশই লুইসের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। এই দেশ দুটো জানায়– তারা বিশ্বাস করে না, মারজুক এই শর্তগুলো মেনে চলবেন। আর বল প্রয়োগ করে তাকে এই শর্ত মানতে বাধ্য করানোর কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। অন্যদিকে, আবু মারজুকও এসব শর্ত মানতে অস্বীকার করেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তবে জর্ডানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিরন্তর চাপ প্রদানের ফলে একটা সময়ে বাদশাহ হোসেন মারজুককে ফিরিয়ে নিতে রাজি হন। ১৯৯৭ সালের ৫ মে মারজুককে আবারও আম্মান নিয়ে যাওয়া হয়।

একেই বলে নিয়তির পরিহাস। এই জর্ডানই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের চাপে পড়ে মারজুককে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। দুই বছর পর সেই যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই তারা আবার আবু মারজুককে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। তখন জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার নয়া প্রধান হয়েছেন সামিহ আল বাত্তিখি। এর আগে তিনি আল কায়সির সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাত্তাখি আবু মারজুকের ফিরে আসাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। আবু মারজুকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি তাকে এক মাসের মধ্যে বসবাসের জন্য নতুন কোনো জায়গা বেছে নিতে বলেন।

এদিকে ইখওয়ানের পার্লামেন্ট সদস্য বাসাম আল উমুসের[৮২] সহযোগিতায় মারজুক প্রথমবারের মতো বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। তখন এক মাস সময় বেঁধে দেওয়ার কথা বললে বাদশাহ হোসেন তাকে আশ্বস্ত করেন। কিছুদিন পর আবু মারজুকের স্ত্রী-সন্তানরা জর্ডানে এলে তাদেরও একইভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।

আবু মারজুকের মুক্তি এবং বাদশাহর অতিথি হয়ে জর্ডানে ফিরে আসার পর জর্ডান ও হামাসের মধ্যে টানাপোড়েন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। এর আগের বছরটি হামাসের জন্য মোটেও স্বস্তিদায়ক ছিল না। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যখন আল বাত্তিখি জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। ইসলামপন্থিদের ব্যাপারে বাত্তিখির খুবই নেতিবাচক ছিলেন। বিশেষ করে হামাসকে সহ্যই করতে পারতেন না। তাই তিনি ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

আল বাত্তিখি এমন একটি সময়ে দায়িত্ব নেন, যখন ইজরাইল হামাসের সামরিক শাখার কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশকে হত্যা করে। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইজরাইলেও

---

[৮২]. বাসাম আল উমুস ছিলেন ইখওয়ানের সদস্য। তবে ইখওয়ান ১৯৯৭ সালের সংসদ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি দলের মধ্যে বিদ্রোহ করেন। পরে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী হলে বাদশাহ হোসেন তাকে জনপ্রশাসনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

পালটা বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জরুরি ভিত্তিতে ১৩টি আরব দেশসহ ৩০ দেশের সরকারপ্রধানকে নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন, যাতে আন্তর্জাতিক মহলগুলোর উদ্যোগে নেওয়া শান্তি প্রক্রিয়াটি ব্যাহত না হয়।

সম্মেলনটির নাম দেওয়া হয় 'শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের সম্মেলন', যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চে।[৮৩] এই সম্মেলনের ৩টি মূল লক্ষ্য ছিল। এগুলো হলো- শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা। সম্মেলনের শেষে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর পক্ষে একটি যৌথ ঘোষণা দেওয়া হয়, যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন-

- এই সম্মেলন সর্বাত্মকভাবে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে এবং একই সঙ্গে এই অঞ্চলে ন্যায়বিচার এবং স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখতে হবে।
- এই সম্মেলন নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করে।
- যারা শান্তির দুশমন, তারা যেন কখনোই তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারে কিংবা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়াকে কখনোই বিনষ্ট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও সম্মেলন একমত হয়।
- এই সম্মেলন যেকোনো প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নিন্দা জানায়।
- এই সম্মেলন ইজরাইলের ওপর সর্বশেষ সন্ত্রাসী হামলারও নিন্দা জানায়। যারা এই সব অপকর্ম করছে, তারা এই অঞ্চলের মানুষের ধারণ করা মূল্যবোধ ও চেতনাকে অসম্মান করছে। এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে সম্মেলন ঐকমত্য পোষণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারকে এই ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আরও বলেন- এই সম্মেলন থেকে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেগুলো হলো[৮৪]-

- ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যেকার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোকে সমর্থন করা। সমঝোতা প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এই চুক্তিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

---

৮৩. https://ecf.org.il/issues/issue/209

৮৪. বিবিসির প্রতিবেদন যেখানে শারম আল শেইখ সম্মেলনের সমঝোতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/976760.stm

- উভয় দেশেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফিলিস্তিনি জনগণের অর্থনৈতিক চাহিদাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে এই সব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- একটি ভালো সমাধানে পৌঁছার জন্য সমঝোতা প্রক্রিয়াকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা।
- পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।
- দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে, তা নিশ্চিতকল্পে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া।
- যারা সন্ত্রাসীদের মদদ দেয় এবং এই ধরনের কাজে উসকানি দেয়, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।
- কোনো দেশের ভূখণ্ডই যেন অন্য কোনো দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা কোনো দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর কাজে ব্যবহার করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোতে নতুন জনশক্তির অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো যেন টাকা জোগাড় করতে না পারে কিংবা অস্ত্র কেনা-বেচা অথবা মজুদ করতে না পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।
- কারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে টাকা দেয় তা সনাক্ত করা এবং এই লেনদেনের চ্যানেলগুলোকে নসাৎ করে দেওয়া।
- সহিংস সংগঠনগুলো যে সংস্থাগুলো মোকাবিলা করছে, তাদের জনশক্তিকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট সরবরাহ করা।[৮৫]

পর্যবেক্ষকগণ মত দেন– এই সম্মেলনে তেমন কোনো কিছুই অর্জন হয়নি; বরং হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যই এই আয়োজন। আর সেই সম্ভাব্য যুদ্ধে জর্ডানের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা কী করছে, তা খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে– এই সম্মেলনে এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হয়।

এই সম্মেলনের পর জর্ডান গোয়েন্দাপ্রধান সামিহ আল বাত্তিখি নানা উপায়ে হামাসের ওপর নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। তিনি যেন এমন একটা সম্মেলনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই আর দেরি করতে পারলেন না। প্রথমত, তিনি তার সংস্থার লোকদের প্রকাশ্যে অনুমোদন দিলেন, তারা চাইলেই হামাসের লোকদের হয়রানি

---

৮৫. বিনোদন কেন্দ্র শারম আল শেইখে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সঙ্গে ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চ বৈঠক শেষে দুই নেতা এই যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

ও গ্রেফতার করে নির্যাতন করতে পারবে। তিনি ধারণা করেছিলেন, এভাবে নির্যাতন চালালে হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই মনোবল হারিয়ে ফেলবে। এরপর চলে গ্রেফতার এবং অমানবিক কায়দায় জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের ধরন ও কৌশল দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তিনি অন্য কোনো দেশকে সহযোগিতা করছেন। হামাসের তথ্যমতে– ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রায় শতাধিক লোককে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থা আটক এবং তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালায়।[৮৬]

বাত্তিখি দ্বিতীয় যে কৌশলটি গ্রহণ করেন তা হলো– হামাসের দায়িত্বশীলদের নীরব বানিয়ে ফেলা। তিনি মিডিয়ার সঙ্গে তাদের কথা বলার সকল পথ বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে, ১৯৯৬ সালের মে মাসের শেষ দিকে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে হামাসের শতাধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। তারপর হামাসের গাজা শাখার মুখপাত্র মাহমুদ আল জাহারকে প্রচণ্ড চাপ দেয়। ফলে একটা পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন– তাদের সংগঠনের শহিদি অভিযানগুলো ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।

ইতোমধ্যে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন খালিদ মিশাল। দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি তখনও ফাঁস হয়নি।[৮৭] তিনি হামাসের জর্ডান শাখার মুখপাত্র ইবরাহিম গোশেহকে একটি বিবৃতি দিতে নির্দেশ দেন– শহিদি অভিযানের বিষয়ে হামাসের অবস্থান অপরিবর্তিত এবং মাহমুদ আল জাহারকে চাপ দিয়ে এমন কথা বলানো হয়েছে। গোশেহর এই বিবৃতির পরপরই আল বাত্তিখি তাকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলেন, ভবিষ্যতে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বললে গ্রেফতার করা হবে, কিন্তু এরপরও গোশেহ বাত্তাখির কথায় পাত্তা না দিয়ে মিডিয়ার সাথে কথা বলেন। ফলস্বরূপ তাকে আটক করা হয়; অবশ্য কিছুদিন পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জেরুজালেমে তিনটি হামলার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় আটজন ইজরাইলি নিহত এবং ১৭০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়। হামাস এই ঘটনার দায় স্বীকার করে। এর পরপরই *রয়টার্স* এই ব্যাপারে গোশেহর মতামত জানতে চায়।

---

৮৬. নির্যাতিতদের মধ্যে পাঁজন পরবর্তী সময়ে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থা জিআইডির বিরুদ্ধে মামলা করতেও চেয়েছিল, কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো বিধান না থাকায় তারা তা করতে পারেনি।

৮৭. মিশাল তখনও মুসা আবু মারজুকের উপপ্রধান হিসেবেই রাজনৈতিক শাখায় কাজ করছিলেন। মুসা আবু মারজুক যখন নিজ সিদ্ধান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, তখনই আসলে মারজুকের এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হামাসের মজলিশে শুরা মিশালকে রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।

গোশেহ তাদের দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান– দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সকল অধিকার ফিলিস্তিনিদের রয়েছে। আবারও ক্ষিপ্র হন বাত্তাখি। এই সাক্ষাৎকারের পর গোশেহকে ১৫ দিন জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়। এই সময় তিনি ছিলেন দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তাকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। সেই সময় প্রতিদিন চারজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করত।

হামাস ও জর্ডানস্থ ইখওয়ানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি

জর্ডানের গোয়েন্দাপ্রধান তার পরবর্তী কৌশল হিসেবে হামাসের সঙ্গে জর্ডানস্থ ইখওয়ানের দূরত্ব ও ভুল বোঝাবোঝি সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তার এই পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হতো না, যদি জর্ডানের ইখওয়ান নিজেরাই অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত না থাকত। তখন জর্ডানের ইখওয়ানের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে ভয়াবহ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে তারা জর্ডানে অনুষ্ঠিত ১৯৯৭ সালের সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে। এর আগে ১৯৯৬ সালের শুরুতে ইখওয়ানের একটি সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে সদস্যদের একটি ভোটাভোটির ফলাফলকে কেন্দ্র করে নেতারা নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বয়কট করার পেছনে মূলত তিনটি যুক্তি দাঁড় করানো হয়। প্রথম যুক্তি– জর্ডানের সরকার ১৯৯৩ সালে সংশোধিত একটি নির্বাচনী আইনকে বারবার প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। এই আইনটি প্রয়োগ করার কারণে ইখওয়ানের জন্য অনুকূল সংসদীয় আসনের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছিল। এই আইনের কারণে ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্ট (আইএএফ)-এর সংসদীয় আসন সংখ্যা ১৯৮৯ সালে ২২টি থাকলেও ১৯৯৩ সালে এসে তা ১৬-তে নেমে যায়। অন্যদিকে, এই আইনের কারণেই সংসদে সকল বিরোধীদলের সম্মিলিত শেয়ারের পরিমাণ ৭০ শতাংশ থেকে কমে ৩৫ শতাংশে নেমে আসে।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল– ভয়াবহ জালিয়াতি ও ভোট কারচুপি। কারণ, ১৯৯৩ সালের নির্বাচনেও সরকারি দল এই কাজ করেছিল। বিশেষ করে ইখওয়ানের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আল জারকা প্রদেশে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহতম জালিয়াতি হয়।

আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল– ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে জর্ডান ও ইজরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত ওয়াদি আরাবিয়া-চুক্তি। ইখওয়ান এই চুক্তির সর্বোচ্চ বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু তারা এটাকে আটকানোর মতো অবস্থায় ছিল না। তাই তারা নির্বাচন বয়কট করে সেই প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।[৮৮]

---

৮৮. জর্ডানস্থ ইখওয়ানের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব নিয়ে পরবর্তীকালে বেশ লেখালেখি হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ শিরোনামের এই সব প্রতিবেদনে ইখওয়ান ও আইএএফের সাংঘর্ষিক অবস্থানগুলো ফুটে ওঠে। রেফারেন্স ৪২ ও ৪৩-এ এ রকম কিছু সংবাদের লিংক পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে বিতর্ক শুধু এই কয়টি বিষয় নিয়ে ছিল না। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিটাই ছিল মূল ফ্যাক্টর। ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্ট (আইএএফ) ক্রমশ তার মূল সংগঠন ইখওয়ানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যদিও এই দুটি কাঠামো যারা চালাতেন, তাদের মধ্যে কিছু কমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তারা এক সময় ইখওয়ানের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। একটা পর্যায়ে আইএএফ স্বাধীনভাবে চলা শুরু করে। তারা আর ইখওয়ানের ছায়ায় থাকতে চায়নি। এটা বাস্তব, আইএএফ জনগণের এতটাই কাছে চলে গিয়েছিল, যা ইখওয়ান কখনোই পারেনি। আইএএফ-এর অনেক নেতাই জনগণের কাছে রাজনৈতিক সেলিব্রেটিতে পরিণত হয়, যা তারই অপর ভাইয়ের মনে হিংসার জন্ম দেয়। ইখওয়ান কমিটিতে যারা এ রকম জনপ্রিয় হওয়ার স্বপ্ন দেখত, তারা আইএএফর এই উত্থানকে ভালোভাবে নিতে পারল না। এমনকী ইখওয়ানের কেউ কেউ মনে কনে, সকল অর্জনের কৃতিত্ব চলে যাচ্ছে আইএএফর পকেটে! জনগণের কাছে ইখওয়ানের নেতারা অচেনাই থেকে যাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতিতেই জর্ডান ইখওয়ানের অভ্যন্তরে নেতৃত্ব নিয়ে স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইখওয়ান মনে করে– আইএএফকে হাতে আনার একমাত্র উপায়, তাদের ক্ষমতা কমিয়ে সাইডলাইনে ফেলে রাখা। আইএএফ নেতারা যদি নির্বাচনে অংশ না নেয়, তাহলে তারা আর জননন্দিত অবস্থানে থাকতে পারবে না। তাই ইখওয়ানের নির্বাহী কমিটি নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্বাচন বয়কট করার আরেকটি কারণ ছিল। ইখওয়ানের ভেতরে তখন হকস (বাজপাখি) ও ডোভস (ঘুঘু) নামক দুটি গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই সময়ে ইখওয়ানের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন ঘুঘু ব্লকের। বাজপাখি গ্রুপ অভিযোগ তোলে, বর্তমান নেতৃত্ব সরকারের সঙ্গে আপস করে টিকে আছে। আর এ কারণে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে জর্ডান ইখওয়ান অনেকটাই দূরে সরে গেছে। বাজপাখি গ্রুপের সদস্যরা ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিক এবং জনপ্রিয় বক্তা। তারা ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিজেদের সব সময়ই আন্তরিক বলেই দাবি করতেন। হামাসের নেতারা যখন জর্ডানে আসেন, তখন বাজপাখি ঘরানার নেতারা তাদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজপাখি ব্লকের নেতারা হামাস ইস্যুটিকে ঘুঘু ব্লকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

জর্ডানে হামাসের নেতারা ইখওয়ানের ভেতরের এই দ্বন্দ্বের বিষয় ভালোভাবেই জানতেন। তারপরও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। হামাস কর্মকর্তারা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন ও সুরক্ষার জন্য সব সময়ই আইএএফ-এর ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্বীকার করতেন। তা ছাড়া হামাসের ব্যাপারে জর্ডান সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে আইএএফ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু হামাসের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, জর্ডানের ইখওয়ান হয়তো ক্রমশ আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোর তুলনায় স্থানীয় ইস্যু নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বে; এমনকী ফিলিস্তিন ইস্যুটি নিয়েও তারা আর সেভাবে মাথা ঘামাবে না। এই ধারণাটি হামাসকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। এর আগে ইখওয়ানের কোনো দায়িত্বশীল ফিলিস্তিন ইস্যুকে গুরুত্ব না দেওয়ার সাহস করেনি। জর্ডান ইখওয়ানের উপপ্রধান ছিলেন ইমাদ আবু দায়াহ, যিনি তার দলকে আন্তর্জাতিক ইস্যু, এমনকী ফিলিস্তিন নিয়েও বেশি সম্পৃক্ত না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করেন। তার যুক্তি ছিল– যেহেতু হামাসের মূল কাজের ক্ষেত্র দখলকৃত ফিলিস্তিন, তাই তাদের নেতাদেরও সেখানে থাকাই বাঞ্ছনীয়; জর্ডানে নয়।

ইখওয়ানের ভেতরে এই ধরনের কথা শুরু হওয়ায় গোয়েন্দাপ্রধান বাত্তাখি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রসদ পায়। হামাসের ব্যাপারে তিনি আরও কঠোর হওয়া শুরু করেন। ১৯৯৬ সালের ৩১ আগস্ট তিনি তার অধীনস্থ আমজাদ আল হাদিদকে নির্দেশ দেন, যাতে তিনি হামাসের কন্টাক্ট পার্সন ইসাম আল নাজ্জারকে ফোন দিয়ে দেখা করতে বলেন। হামাসের এক নেতার জর্ডানে প্রবেশের সময় ইমিগ্রেশনে হয়রানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৫ মাস গোয়েন্দাদের সঙ্গে হামাসের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই ইসাম গোয়েন্দা কর্মকর্তার দাওয়াত পেয়ে খালিদ মিশালের সঙ্গে কথা বলেন। মিশাল তাকে বলেন– জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থা হামাসকে নিয়ে কী ভাবছে, এটা তাদের জানা দরকার।

পরে মূলত কী ঘটেছিল, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। ইসাম আল নাজ্জারের বর্ণনায়– যখন তিনি গোয়েন্দা কার্যালয়ে পৌঁছান, তখনই তাকে আটক করে কয়েকদিন বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ইখওয়ানের দুই পার্লামেন্ট সদস্য আব্দুল্লাহ আল আকায়লাহ ও বাসাম আল উমুস গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে তাকে ছেড়ে দিতে বললে তিনি মুক্তি পান। আল নাজ্জার মুক্তি পেয়েই সরাসরি খালিদ মিশালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি কান্না বিজড়িত অবস্থায় তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, গোয়েন্দা কার্যালয়ে তাকে একটি ঘরে একাকী ফেলে রাখা হয়। এর পাশাপাশি চলে চরম দুর্ব্যবহার। বন্দি অবস্থায় আমজাদ আল হাদিদের পেশাব খেতে দেওয়া এবং তার মলমূত্রের সঙ্গে মাখামাখি করানো হয়। একটা পর্যায়ে তাকে আমজাদ আল হাদিদের হাতে চুমু খেতে হয়েছে এবং গোয়েন্দারা সেই ছবি তুলে তার রুমের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

এই ঘটনায় খালিদ মিশাল শঙ্কিত ও উদ্‌বিগ্ন হন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আল নাজ্জারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কথা হামাসের রাজনৈতিক শাখার সকলকে অবহিত করেন। ব্যুরো এই ঘটনাটি ইখওয়ানের জর্ডান শাখার নির্বাহী বিভাগকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ইখওয়ানকে অবহিত করার পর তারা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রতিবেদন ও তথ্য চায়। কেউ কেউ এই ঘটনাটিকে মিডিয়ায় ফাঁস করে দেওয়ারও পরামর্শ দেন। আল নাজ্জার এই বিষয়ে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন– আল হাদিদ তাকে বলেছে, সে যদি তার হয়রানির কথা প্রকাশ করে, তাহলে ভবিষ্যতে তাকে গ্রেফতার করে স্থায়ীভাবে বিকলাঙ্গ করা হবে। ইখওয়ান তাতে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশ্বাস দেয়– গোয়েন্দারা যাতে নাজ্জারের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে গোটা ইখওয়ান তার পাশে থাকবে। এমন আশ্বাস পেয়ে নাজ্জার তার গোটা অভিজ্ঞতা তাদের লিখে দেন। সেই লেখাটি পরের দিন ইখওয়ানের সাপ্তাহিক পত্রিকা *আসাবিলে* প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। সেইসঙ্গে নাজ্জারের নিজ হাতে লেখা সেই প্রতিবেদন জর্ডানের ক্রাউন প্রিন্স হাসানসহ আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়।

প্রতিবেদনটি যেদিন *আসাবিল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেদিনই গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার করে। তারা ইসাম আল নাজ্জারকে আটক করার চেষ্টা চালায়। এরপর হামাস প্রধানমন্ত্রী আব্দ-আল করিম আল কাবারিতির কাছে সাহায্য চায়। প্রধানমন্ত্রী তাদের আশ্বাসও দেন, আল নাজ্জারকে হয়রানি করা হবে না এবং সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে।

আল নাজ্জারের জীবন আর কোনো দিনই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। গোয়েন্দাসংস্থা যদিও তাকে আর সেভাবে হয়রানি করেনি, কিন্তু তিনি হামাসের সিনিয়র দায়িত্বশীল ও সহকর্মীদের কাছ থেকে নানা ধরনের জটিলতার শিকার হন। তিনি অভিযোগ করেন, তার দায়িত্বশীলরা তাকে অহেতুক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে ফেলেছে। নাজ্জার আরও বলেন– সাবেক রাজনৈতিক শাখাপ্রধান আবু মারজুক গোয়েন্দাদের হাতে আটককৃত হামাস নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সহযোগিতা না করার যে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকেই বিপর্যয়ের সূত্রপাত। অন্যদিকে খালিদ মিশালের কারণে তিনি আল হাদির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, যার কারণে তাকে এই ফল ভোগ করতে হয়। তা ছাড়া সেই বাজে অভিজ্ঞতা লিখে প্রচার করার জন্য তিনি মিশালের সমালোচনা করেন।

এভাবে নাজ্জার একের পর এক অভিযোগ তুলতে থাকায় জর্ডান হামাস তার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা মনে করে– নাজ্জারের মানসিকতার যে অবস্থা, তাতে যেকোনো সময় তিনি হামাসের জন্য হুমকি হতে পারেন। নাজ্জারের কষ্ট লাঘব এবং এই সংকটের সমাধানকল্পে হামাসের দায়িত্বশীলরা নাজ্জারকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। নাজ্জার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে

হামাসের নেতারা তাকে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে ভালো চাকরির প্রস্তাব দেন, কিন্তু নাজ্জার জর্ডান ছেড়ে যেতে না চাইলে হামাস তাকে জারকা প্রদেশে ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। নাজ্জার প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি হলেও পরবর্তী সময়ে কাজে যেতে অস্বীকার করে। হামাসের নেতারা বুঝতে পারেন, নাজ্জার সমাধান নয়; বরং সমস্যা বাড়াতে চাইছে। তাই তাকে আন্তর্জাতিক হামাস ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

আল নাজ্জার হঠাৎ করে কেন এমন আচরণ করতে শুরু করলেন, তা নিয়ে হামাস ও ইখওয়ানের নেতারা একটা গোলকধাঁধায় পড়ে গেলেন। কেউ কেউ মনে করল, আল নাজ্জারের নির্যাতনের গল্পটা পুরোটাই বানোয়াট। আবার কেউ মনে করল, আল নাজ্জার সম্ভবত গোয়েন্দা সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। ফলে আটক ও নির্যাতন প্রসঙ্গে যে বর্ণনাটি তিনি দিয়েছেন, তার পুরোটাই গোয়েন্দা মিশনেরই অংশ। এর উদ্দেশ্য, ইখওয়ান ও হামাসের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা। মুহাম্মাদ নাজ্জাল অবশ্য এসব কোনো অভিযোগের সাথেই একমত ছিলেন না। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে তিনি আল নাজ্জারকে চিনতেন। মুহাম্মাদ নাজ্জাল বলেন, আল নাজ্জারের নির্যাতনের ঘটনা সঠিক এবং গোয়েন্দাদের সহযোগিতা করতে তার ওপর এখনও মারাত্মক চাপ রয়েছে। তবে আরেকটা কারণ হতে পারে, জীবনটা দুর্বিষহ হওয়ার জন্য হামাসের ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

নাজ্জারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং তার উত্তর শোনার জন্য আন্তর্জাতিক হামাস ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ট্রাইব্যুনালে বিচারের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার হামাসের সদস্যপদ এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে কাজ শুরু করলে তিনি আর কখনোই দায়িত্বশীল পদে উন্নীত হতে পারবেন না বলেও রুল জারি হয়।

এরপর নাজ্জার এই বিষয়টি নিয়ে জর্ডান ইখওয়ানের নির্বাহী কমিটির সহকারী সেক্রেটারি ইয়াহিয়া শাকরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন– তার কাছে হামাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, যা ইখওয়ান নেতাদেরও জানা দরকার। তাকে প্রশ্ন করা হয়, সেই তথ্যগুলো কী? তখন নাজ্জার বলেন– গোয়েন্দা কার্যালয়ে নির্যাতন সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণী লিখেছেন, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

এই তথ্য পেয়ে শাকরা মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি জানতে চান, এই মিথ্যা কাহিনিটি কেন প্রচার করলেন? নাজ্জার জানান, খালিদ মিশালই তাকে এই মিথ্যা গল্প বলতে বলেছে। গোয়েন্দা দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে যখন তিনি খালিদ মিশালের সঙ্গে দেখা করেন, তখনই মিশাল বলেন– হামাস জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থাকে বেকায়দায় ফেলার একটি পরিকল্পনা করেছে। তারই অংশ হিসেবে তারা

গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার শুরু করতে চায়। সেই মোতাবেকই খালিদ মিশাল ইসাম আল নাজ্জারকে গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আনতে বলা হয়। এরপর নাজ্জার জানান, তার কাছে এই মানুষগুলো সম্বন্ধে এমন তথ্য রয়েছে, যা জানাজানি হলে হামাস নেতাদের মুখোশ খুলে যাবে।

এই বর্ণনা শুনে শাকরা বলেন– 'আমরা আপনাকে খুব শীঘ্রই ইখওয়ানের নির্বাহী কার্যালয়ে ডাকব, যেখানে এই বিষয়ে আরেক দফা শুনানি হবে।'

হামাস নেতাদের কোনো কিছু না জানিয়ে নাজ্জারের অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গোপনে ইখওয়ানের একটা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নেতৃত্ব দেন ইখওয়ানের উপপ্রধান ইমাদ আবু দায়াহ। কমিটিতে আরও ছিলেন ইখওয়ানের নির্বাহী কমিটির সদস্য সেলিম আল ফালাহাত, হায়থাম আবু আল রাঘিব ও ইয়াহিয়া শাকরা।

মিশাল এই গোপন তৎপতা জানার সাথে সাথেই ইখওয়ানের নির্বাহী অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মিশাল তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন– আল নাজ্জার মিথ্যা কথা বলছেন। একই সঙ্গে হামাস এবং তাকে না জানিয়ে ইখওয়ান যে গোপন তদন্ত শুরু করেছে, তারও প্রতিবাদ করেন। ইখওয়ানের নির্বাহী অফিস মিশালের সেই প্রতিবাদকে আমলে না নিয়ে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

জর্ডানে হামাসের কর্মকর্তারা একই সঙ্গে জর্ডানের ইখওয়ানেরও সদস্য। তাই তারা ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের কাছেও জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ ছিলেন। যে বিষয়টি ছিল একটি রুটিন ওয়ার্ক, সেটাই একসময় উভয় সংগঠনের জন্য বিরাট সংকট হয়ে দেখা দেয়। কারণ, আগের পাঁচটি বছর ইখওয়ান কিংবা হামাস কেউ-ই নিজেদের ভেতর ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করেনি। এসব পরিবর্তনের আলোকে দুটি সংগঠনের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা গুরুত্ব দেয়নি। মূলত তখন হামাসের ওপর জর্ডান ইখওয়ানের কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। কারণ, তত দিনে হামাস নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় উভয় সংগঠনেরই উচিত ছিল নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে ঝালাই করে নেওয়া। কিন্তু তা সময়মতো না হওয়ায় দুই সংগঠনের মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, জর্ডান ইখওয়ান নিজেদের সব সময়ই হামাসের ওপর কর্তৃত্বশীল বলে মনে করত। কারণ, তারা জানত খালিদ মিশালসহ জর্ডানে অবস্থানরত হামাসের সকল নেতা প্রকৃতপক্ষে তাদেরই জনশক্তি; যদিও মিশাল বা তার সঙ্গীরা বিষয়টাকে সেভাবে ভাবত না। ১৯৮৯ সালে হামাসের সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই তারা নিজেদের স্বতন্ত্র কাঠামো হিসেবেই মনে করত,

কিন্তু এখানে হামাসের ভূমিকাটাও দ্বৈত আচরণমূলক ছিল। একদিকে তারা যেমন জর্ডান ইখওয়ানের সকল সুবিধা গ্রহণ করেছে, তেমনি দল চালাতে গিয়ে স্বাধীনভাবেই দল চালিয়েছেন; জর্ডান ইখওয়ানের জনশক্তিকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, দলে ভিড়িয়েছে। তাই জর্ডানের ইখওয়ানও মনে করত, হামাস বরাবর নিজেদের স্বার্থ এবং সমস্যাকেই গুরুত্ব দেয় এবং নিজেদের যা প্রয়োজন সেটাই করে। তাদের কর্মকাণ্ডে ইখওয়ানের কী প্রতিক্রিয়া হলো তা গুরুত্ব দেয় না। উভয়পক্ষের এমন ধারণাগুলো সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করল, যা সহজে পূরণ হওয়ার মতো ছিল না।[৮৯]

হামাসের সাথে কর্তৃত্ব নিয়ে এই দ্বন্দ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান আবু দায়াহ। তিনি মিশাল এবং তার সহকর্মীদের বললেন– তাদের মাথায় যদি শুধু ফিলিস্তিন থাকে, তাহলে তারা যেন ফিলিস্তিনে ফিরে গিয়ে দলীয় কার্যক্রম চালায়। আবু দায়াহর যুক্তি ছিল– ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ বা পিএলও তখনও কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী হয়নি। তাই হামাসের নেতারা যদি গাজা বা পশ্চিম তীরে ফিরে গিয়ে কিছু গঠনমূলক কাজ করতে পারে, তাহলে পিএলও মজবুত কোনো অবস্থানে যাওয়ার আগেই হামাস নেতারা নিজেদের একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু আবু দায়াহ বুঝতে পারেননি, হামাসের নেতাদের পক্ষে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তবে বরাবর তিনি ছিলেন অযৌক্তিকভাবে আশাবাদী মানুষ। তার ধারণা ছিল– হামাস নেতারা ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে চাইলে ইজরাইল বাধা দেবে না। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না, ফিলিস্তিনে কারা প্রবেশ করছে বা কারা বের হচ্ছে, তত দিনে এই বিষয়টার ওপর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে। তিনি এটাও বুঝতে পারেননি, ইজরাইলিদের দমন-পীড়নে দলটিকে নিঃশেষ হওয়া থেকে বাঁচাতে ১৯৮৯ সালে হামাসের নেতৃত্বকে দেশের বাইরের লোকদের কাছে দেওয়া হয়।

আর এই জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাজ্জারকেও ইখওয়ান নেতাদের ভুল বোঝাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। নাজ্জার তাদের বোঝাতে সক্ষম হন, হামাস ইখওয়ানকেই গিলে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আরও বলেন– তিনি এই সম্পর্কিত কিছু ডকুমেন্টসও দেখেছেন, যার শিরোনাম ছিল ইখওয়ানকে গ্রাস করার পরিকল্পনা। নাজ্জার তার দাবির স্বপক্ষে বেশ কিছু কাগজ ও প্রচারপত্রের কথা বলেন, যা তিনি গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে আটক থাকা অবস্থায় দেশব্যাপী ছড়ানো হয়েছিল।

[৮৯]. জর্ডান ইখওয়ান এবং হামাসের মধ্যকার এই দূরত্ব নিয়ে পরবর্তী সময়ে মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের ওয়েবসাইটে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকে এই বিবরণীগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যসূত্রগুলো রেফারেন্স তালিকার ৪৪ ও ৪৫-এ দেওয়া আছে।

নাজ্জার বলেন– ইখওয়ানের বিরুদ্ধে লেখা সেই প্রচারপত্রগুলো মূলত হামাসের নেতারাই লিখেছেন এবং প্রচার করেছেন। এর আগে এই কাগজগুলো সম্পর্কে ইখওয়ান ধারণা করেছিল– জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থাই তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অংশ হিসেবে এগুলো ছড়াচ্ছে, কিন্তু নাজ্জারের বক্তব্য শোনার পর তারা সংশয়ে পড়ে যায়। ইখওয়ান হামাসের বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালে খুবই গোপনীয়তা বজায় রাখে। এ সময়ে নাজ্জার তার দাবির স্বপক্ষে বেশ কিছু সাক্ষীও হাজির করে, যারা হামাসের পক্ষে কাজ করত। সাক্ষীরাও নিজেদের পরিচয় এবং সাক্ষ্যদানের বিষয়টি গোপন রাখার জন্য ইখওয়ানের কাছে অনুরোধ জানায়। তবে এত গোপন রাখার পরও হামাসের রাজনৈতিক শাখা সব জেনে যায়।

ইখওয়ান যখন এসব কাজ করছিল, ঠিক সেই সময়ই হামাসের আপিল ট্রাইব্যুনালে নাজ্জারের অভিযোগটির শুনানি চলমান ছিল। নাজ্জার ও হামাস উভয়ই নাজ্জারের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের পূর্বের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। হামাস আপিল করেছিল কারণ, তারা মনে করছিল– ট্রাইব্যুনাল নাজ্জারের অপরাধের তুলনায় লঘু শাস্তি দিয়েছে। আর নাজ্জার আপিল করেছিল কারণ, তাকে অভিযুক্ত করা সঠিক হয়নি। আপিল চলাকালে নাজ্জারের বিরুদ্ধে তার চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রমাণও ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া হয়। সেই সব প্রমাণাদি দেখে আপিল ট্রাইব্যুনাল নাজ্জারকে স্থায়ীভাবে দল থেকে বহিষ্কার করে। আপিল ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে বলে– নাজ্জার গোয়েন্দা অফিসে তার ওপরে হওয়া নির্যাতন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে গুরুতর অপরাধ করেছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয়– খালিদ মিশাল তাকে মিথ্যা বলতে বলেছেন, তাহলেই-বা তিনি কেন বলবেন; বরং নাজ্জারের উচিত ছিল খালিদ মিশালের সেই অন্যায় আবদারটি না শোনা।

ইখওয়ানের নেতারা যারা নাজ্জারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তদন্ত চলা পর্যন্ত তাকে সার্বিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া হবে, তারা নাজ্জারকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে ভীষণ উত্তেজিত হয়। হামাসের সিদ্ধান্ত বা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে পাত্তা না দিয়ে তারা নাজ্জারের ইখওয়ানের সদস্যপদ পুনর্বহাল এবং ট্রাইব্যুনালেরও তীব্র সমালোচনা করে। ইখওয়ান মনে করে– নাজ্জার যদি অন্যায় করেও থাকে, তারপরও হামাসের উচিত ছিল তাকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখা।

নাজ্জারের বিরুদ্ধে হামাসের অনেক গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ আনা হয়। সেইসঙ্গে নাজ্জার জনসম্মুখে হামাস নেতাদের দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিত্রায়িত করেছে বলে অভিযোগ আনা হয়। জনসম্মুখে এভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আসায় হামাসের নেতারা বিব্রতবোধ করেন। বেশ কিছু নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়–

তারা হামাসের দলীয় তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের নামে বাড়ি কিনেছে। অভিযুক্ত হামাস নেতারা অবশ্য পরবর্তী সময়ে প্রমাণ করেন, দলের টাকা নয়; বরং নিজেদের টাকা দিয়েই তারা এগুলো করেছেন।

হামাসের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আসায় ইখওয়ানের যেসব নেতারা এতদিন হামাসকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন, তারাও বেশ চাপে পড়েন। এর মধ্যে একজন ছিলেন ইবরাহিম ঘারায়বাহ। তিনি ইখওয়ানের উপপ্রধান আবু দায়াহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি জর্ডানের হামাস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনাসহ তাদের সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে পত্রিকায় কলাম লিখেন। ঘারায়বাহকে হামাসের মিডিয়াবিষয়ক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখেন ঘারায়বাহ আর এই কাজ করতে পারছেন না, তখন হামাস তার নিয়োগ বাতিল করে।

প্রথমদিকে ঘারায়বাহ হামাসের বিরুদ্ধে কলামগুলো ছদ্মনামে লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ নাম এবং স্বাক্ষর দিয়ে এই কলামগুলো প্রকাশ করেন। তার বন্ধু আবু দায়াহ তাকে এই ধরনের কলাম লেখা বন্ধ করতে বলেন। কারণ, অনেকেই ধারণা করছিল ইররাহিম ঘারায়বাহ আবু দায়াহর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় দায়াহর কথাগুলো নিজ নামে প্রকাশ করছেন। সেই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আবু দায়াহ এই কলাম লেখা স্থগিত করতে বলেন; কলামগুলো ঠিক ছিল না– এমনটা মনে করে নয়, কিন্তু ঘারায়বাহ লেখা বন্ধ করেননি। ফলে তাকে ইখওয়ান থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন অনেকেই মনে করেন, নাজ্জারের মতো ঘারায়বাহও তার পূববর্তী সহকর্মীদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কলামগুলো লিখছেন। ঘারায়বাহ তার কলামগুলোতে বারবার বলেন, হামাসের উচিত ফিলিস্তিনেই অবস্থান করা। কারণ, সেটাই তাদের আসল ঠিকানা। জর্ডান ভূখণ্ড তাদের সঠিক জায়গা নয়।

ইখওয়ানের কিছু কিছু নেতাও একটা পর্যায়ে হামাসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করে। বিষয়টি শুধু দুটি সংগঠনের মধ্যে বিবাদ বা ভুল বোঝাবুঝি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং জনগণও বিষয়টি সম্পর্কে জেনে যায়। জর্ডানের ভেতর-বাহির হামাস এবং ইখওয়ানের এই টানাপোড়েনের খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। শেষমেষ এই ভ্রাতৃপ্রতীম দুই সংগঠনের মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। এককথায়– জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সামিহ আল বাত্তিখি ফাটল ধরানোর জন্য যে পরিকল্পনা করেছিল, এভাবেই তা সফল হয়।

অধ্যায়-৬

শেখ ইয়াসিনের মুক্তি এবং বিশ্বজুড়ে সফর

জর্ডান হামাসের নানামুখী সংগ্রাম ও টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনা করার পর এবার ফিলিস্তিনে যাওয়া যাক। সেখানে তখনও হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিনসহ অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে। যখন জর্ডানে প্রবাস শাখার সংকট ও রাজনৈতিক শাখার পরিবর্তন হচ্ছিল, তখন ফিলিস্তিনে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির কতটুকু প্রভাব পড়েছিল, ইতিহাসের পর্যালোচনায় সেটাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৯৯৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, সকালবেলা। শেখ আহমাদ ইয়াসিনের স্ত্রী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সেদিনই শেখ ইয়াসিনের কারাবরণের নয় বছর পূর্ণ হয়। নিয়তি শেখ ইয়াসিনের জন্য এই দিনটি ভিন্ন কিছু পরিকল্পনা করেছিল। কারাবরণের প্রথম কিছুদিন শেখ ইয়াসিনকে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা নিয়মিত সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেতেন, কিন্তু কয়েকদিন পর ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ এই সুযোগটা বন্ধ করে দেয়। এক পর্যায়ে শুধু স্ত্রী ও কন্যা ছাড়া শেখ ইয়াসিনকে আর কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হতো না। আর এই সাক্ষাৎটিও খুব একটা সহজ ছিল না। প্রায় ছয় মাসে একবার তারা দেখা করার সুযোগ পেতেন।

অন্যদিকে, অনবরত নয় বছর কারাবাসের প্রভাবে শেখ ইয়াসিন ততদিনে শ্রবণশক্তি হারিয়ে প্রায় বধির হয়েছেন। এ জন্য পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সময় কথা বোঝার এবং বোঝানোর জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিতে হতো। তাই এই সাক্ষাৎটি পারিবারিক হলেও তাদের কোনো আলাপই গোপন থাকত না। এ জন্য শেখ ইয়াসিন এই সাক্ষাৎ নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে পড়ছিলেন।

তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কারাগারের একজন কর্মচারীর মাধ্যমে কথা বলছেন– এই বিষয়টি তাকে খুবই পীড়া দিত। সেদিন তিনি স্ত্রীকে অনেকটা ক্ষোভ এবং অভিমানে বললেন– 'তোমরা আর আমাকে দেখতে এসো না।' তার স্ত্রী এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসেন।

এর কয়েক ঘণ্টা পর আইনজীবীরা শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারা তাকে একটি আবেদনপত্র দেখালেন, যেখানে তার মুক্তি চাওয়া হয়েছে। শেখ ইয়াসিন দেখলেন– আবেদনে 'নেসেট' অর্থাৎ ইজরাইলের ৪০ জন সংসদ সদস্যেরও স্বাক্ষর রয়েছে, যারা তার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিতে উদ্‌বেগ প্রকাশ এবং অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করেছে। শেখ ইয়াসিন এই আবেদন নিয়ে আইনজীবীদের মাথা ঘামাতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন– এভাবে মুক্তি হলে সবাই বলবে, তিনি ইজরাইলিদের ভূমিকার কারণেই মুক্তি পেয়েছেন; আইনজীবীদের মাধ্যমে নয়।

কারাগারের ভেতরে শেখ ইয়াসিন কখনোই দিন, মাস গুনতেন না। তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবনসহ অতিরিক্ত আরও ১৫ বছরের কারাদণ্ড ছিল। তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন– অলৌকিক কিছু না ঘটলে কখনোই মুক্ত পৃথিবীতে যেতে পারবেন না। সেই ধারণা থেকে কারাগারের সময়টাকে তিনি সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। কারাগারেই তিনি কুরআন হেফজ করার সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণ সকল ইসলামিক নেতৃবৃন্দ কারাগারে গিয়ে কুরআন পাঠ বা মুখস্থ করার চেষ্টা বেশি করেন। কারণ, এতে তারা স্বস্তি এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। শেখ ইয়াসিনও তাই করলেন। ১৯৯০ সালের মধ্যেই তিনি গোটা কুরআন হেফজ করতে সক্ষম হলেন। এরপর কীভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে *আল মাজমু* নামক ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স বা ইসলামি বিচারিক শরিয়াতের ওপর লেখা ২৩ খণ্ডের বিশাল একটি এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে ফেলেন।[৯০] একই সঙ্গে তিনি ইসলামের ইতিহাস এবং আরবি ব্যাকরণের ওপরও বিস্তর পড়াশোনা করলেন। এগুলো পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাকিটা সময় তিনি নামাজ এবং আল্লাহর জিকির করতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে নফল নামাজ এবং কুরআন পড়তেন। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শেখ ইয়াসিন তুলকারাম জেলার বেইত লেইদের কুফর ইউনা জেলে আটক ছিলেন। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয়

---

৯০. বইটির মূল নাম *আল মাজমু শারহা আল মুহাতাব*। আল মুহাতাব অংশটি লিখেছেন আবু ইসহাক আল শিরজিকি। *আল মাজমু* হলো ২৩ খণ্ডের বিশাল এক ভলিউম। এই কাজটি কয়েক শতক ধরে চলেছে। এটা শুরু করেছিলেন আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে শরাফ আল নববি। পরবর্তী সময়ে তাকি আল দিন কাজটি নিয়ে এগোলেও শেষ করতে পারেননি। বইটি শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ নাজিব আল মুতির হাতে সমাপ্ত হয়।

একই জেলার তেলমন্দ কারাগারে। সেখানে তিনি ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বন্দি ছিলেন। এরপর নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এভাবে শেখ ইয়াসিনের দীর্ঘ নয় বছর পার হয়। এই দীর্ঘ সময়ে হামাস নেতারা কিংবা হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মুক্তির দাবি থেকে সরে আসেননি; বরং এই দাবির প্রতি জনসমর্থন বাড়ানোর জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ফর দ্য রিলিজ অব শেখ আহমাদ ইয়াসিন' নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রচারণা অভিযান শুরু করেন। এই মিডিয়া ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হতো হামাসের আম্মানস্থ কার্যালয় থেকে। শেখ ইয়াসিন আটক হয়েছিলেন ১৮ মে। তাই প্রতিবছর এই দিনটিকে ঘিরে গোটা আরব বিশ্ব এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে শেখ ইয়াসিনের কারাবরণ দিবস পালন করা হতো। আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁর ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, তাতে অনেকেই তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুব উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। তাই হামাস শেখ ইয়াসিনের মুক্তির দাবিতে ইজরাইলের ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে। তারা হুমকিও দেয়, যদি শেখ ইয়াসিনের কিছু হয়, তাহলে ইজরাইলের ওপর পূর্বের যেকোনো হামলার তুলনায় মারাত্মক আকারে সিরিজ হামলার ঘটনা ঘটবে।

ইজরাইলি রাজনীতিবদরা প্রাথমিকভাবে এই সব হুমকি-ধামকিকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিল না। যদিও ইজরাইলি গোয়েন্দাসংস্থাগুলো বারবার বলে আসছিল, তারা যাতে শেখ ইয়াসিনকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু ইজরাইলি সরকার তাতে কর্ণপাত করছিল না। গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য ছিল, শেখ ইয়াসিন কারাগারে মারা গেলে আরেকটি ইন্তিফাদার বিস্ফোরণ ঘটবে। ইজরাইলের কেউ কেউ পিএলও'র অবস্থান আরও সুসংহত করতে শেখ ইয়াসিনের মুক্তি চেয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, শেখ ইয়াসিন মুক্তি পেলে হামাস হয়তো একটু নমনীয় হবে। এরপর ভিন্ন কোনো কৌশলে হামাসকে অকার্যকর করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, শেখ ইয়াসিন কারাগারে বন্দি থাকলেও বাইরের ঘটনাবলি সম্বন্ধে কিছুটা অবগত ছিলেন। হামাসের যে বন্দিরা তার সঙ্গে আটক হয়, তাদের গ্রুপ করে পালাক্রমে তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপ তাকে ৪৫ দিন করে সেবা করার সুযোগ পেত। যখন একটা গ্রুপের সময় শেষ হতো, তখন যাওয়ার সময় নতুন গ্রুপের সাথে তাদের কথাবার্তা হতো। তারা বাইরের খবর জানার চেষ্টা করত। মূলত জেল কর্তৃপক্ষ শুরুর দিকে কিছু অমানবিক আচরণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা হামাসের সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি করে এবং হামাসের পছন্দমমতো বন্দিদের শেখ ইয়াসিনকে সেবা করার দায়িত্ব দেয়।

অন্যদিকে, জেল প্রশাসনের নির্ধারিত বিধি-ব্যবস্থাপনার বাইরে বন্দিরা নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম বানিয়ে নেয়। ইজরাইলিরা বেশ কয়েকবার তাদের পছন্দমতো লোককে শেখ ইয়াসিনের সেবার জন্য পাঠান, কিন্তু তিনি বারবার তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে, জেলের ভেতরে আটক থাকা হামাস বন্দিরাও নবাগতদের সুযোগ দিত না। তাই তারা তাদের মতো করেই শেখ ইয়াসিনের যত্ন নিত।

অন্য কয়েদির মতো শেখ ইয়াসিনেরও রেডিও ও টেলিভিশন দেখার সুযোগ ছিল, তবে শুধু ইজরাইলি চ্যানেলগুলোই দেখার সুযোগ দেওয়া হতো। তারপরও টেলিভিশনের সংবাদ দেখে তিনি কিছু খবর পেতেন। আবার ইজরাইলি কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন সময় তাকে নানা সংবাদ দিত। যখনই কোনো সহিংসতা ঘটত, ইজরাইলিরা শেখ ইয়াসিনের কারাকক্ষে আসত। তাদের প্রত্যাশা ছিল, শেখ ইয়াসিন হয়তো সহিংসতা কমানোর জন্য কোনো উদ্যোগ নেবেন। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে কারা কর্তৃপক্ষ ইজরাইলের 'ইসলামি মুভমেন্ট' নামক একটি সংগঠনের নেতা শেখ আব্দুল্লাহ নিমার দারভিশ এবং ইয়াসির আরাফাতের বিশেষ উপদেষ্টা ড. আহমাদ তিবিকে শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়। এই দুই ব্যক্তি ঘুরেফিরে ইজরাইলিদের মতোই কথা বলছিল। তারা গোটা সাক্ষাতে শেখ ইয়াসিনের কাছে গুম হওয়া ইজরাইলি সেনা আয়ান শ্যাডনের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার স্থানটি জানার জন্য চেষ্টা করে।

ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল, যাতে শেখ ইয়াসিন টিভিতে একটি বক্তব্য দিয়ে সহিংসতা রোধ করার জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ রকম একটি উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায় শেখ ইয়াসিন বলেছিলেন– 'আমি বেসামরিক নাগরিককে হত্যার বিরোধিতা করি। এই ধরনের হত্যাকাণ্ড আমি কোনোভাবেই সমর্থন করি না, কিন্তু তোমরাই এই ধরনের কাজ করার জন্য বাধ্য করছ। তোমরাই খুনোখুনির সূত্রপাত করেছ, আর এখন শুধু তার পালটা প্রতিক্রিয়াই ঘটছে। অতএব, তোমরা আমাদের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করো, তখন আমাদেরটাও স্বাভাবিকভাবেই থেমে যাবে।'

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– 'হামাস কেন বেসামরিক নাগরিকদের শুধু টার্গেট করে?'

শেখ ইয়াসিন উত্তরে বলেছিলেন– 'আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন, বেসামরিক ব্যক্তিকে টার্গেট করেই হামলা করা হচ্ছে? হয়তো হামলাকারী কোনো সামরিক ঘাঁটিতেই বিস্ফোরণ ঘটাতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে তা পথেই বিস্ফোরিত হয়েছে।'

শেখ ইয়াসিনকে ১৯৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি বেইত লিডে সংঘঠিত দুটি বোমা বিস্ফোরণ নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই জায়গাটি কাফার ইউনা কারাগারের এতটাই কাছে যে, কারাগার থেকে শেখ ইয়াসিন নিজেও সেই বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছিলেন। এই হামলায় ২২ জন ইজরাইলি সেনা নিহত এবং ৫৯ জন আহত হয়।[৯১]

---

[৯১]. ইসলামিক জিহাদ পরবর্তী সময়ে এই হামলার দায় স্বীকার করে।

শেখ ইয়াসিন তার উত্তরে বলেছিলেন– 'খোদার কসম! আমি খুবই ব্যথিত হয়েছি।'

ইজরাইলিরা পালটা প্রশ্ন করেছিল– 'কীভাবে আপনি ব্যথিত হলেন, কেনই-বা হলেন?'

শেখ ইয়াসিন বলেন– 'আমি ব্যথিত হয়েছি এই ভেবে, রক্তের হোলি খেলা এখনও শেষ হলো না।'

ইজরাইলিরা তাকে এই ধরনের সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

শেখ ইয়াসিন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন– 'এই সব অনুরোধ দিয়ে কাজ হবে না। সত্যিই যদি সহিংসতা ও রক্তপাত বন্ধ করতে চাও, তাহলে তোমরা আগে নৃশংসতা বন্ধ করো। তোমরা বেসামরিক লোককে হত্যা বন্ধ করো, আমরাও করব। কিন্তু তোমরা চাও আমরা হত্যা বন্ধ করি, আর তোমরা দিনের পর দিন তা দিব্যি চালিয়ে যাবে! এটা তোমাদের অযৌক্তিক অনুরোধ।'

জানা যায়, ইজরাইলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ধরনের একটি আলাপে শেখ ইয়াসিন একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত তা ১৯৯৪ সালের ঘটনা। হেবরনে নামাজরত কিছু মুসলিমকে ইজরাইলিরা নির্দয়ভাবে হত্যা করার পর হামাস তখন শহিদি অভিযান শুরু করেছিল। তখনই শেখ ইয়াসিন যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেছিলেন, হামাস এই ধরনের শহিদি অভিযান বন্ধ করতে পারে, তবে বেশ কিছু শর্ত-সাপেক্ষে। শর্তগুলো হলো–

- আর কোনো ফিলিস্তিনি নাগরিককে হত্যা করা যাবে না।
- ১৯৬৭ সালে ইজরাইল যে সীমানা আরোপ করেছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। গাজা ও পশ্চিম তীরকে ফিলিস্তিনিদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।
- কারাবন্দি সকল ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে হবে।
- ১৯৬৭ সালের পর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইজরাইল যেসব অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে, সবগুলো সরিয়ে নিতে হবে।

শেখ ইয়াসিন বলেন– যদি এই শর্তগুলো ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়, তাহলে হামাস ইজরাইলের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি আছে; যা ১৫, ২০ বা ৩০ বছরও স্থায়ী হতে পারে।

শেখ ইয়াসিন খুব ভালো করেই জানতেন, তিনি কারাগারে যাওয়ার পর এই কয়েক বছরে হামাস বিশাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এমনকী হামাসের সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেডও এখন অনেকটাই পরিণত। আল কাসসাম ব্রিগেডের বিষয়ে যদিও শুরু থেকেই স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তীব্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

শেখ ইয়াসিন এটাও জানতেন, হামাস প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে বেশি সংকট মোকাবিলা করেছে ১৯৯৬ সালে। কারণ, এই বছর তারা জর্ডান ও ফিলিস্তিন– উভয় দেশে ভয়াবহ দমন-পীড়নের শিকার হয়। একই বছরের জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া আয়াশ ইন্তেকাল করেন, যা সংগঠনের সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালের মার্চে মিশরের বিল ক্লিনটন বিশ্ব নেতাদের নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে বৈঠক করার পর হামাসের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়। এই সম্মেলনের পরপরই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গাজাতে মুহাম্মাদ দাহলান[৯২] এবং পশ্চিম তীরে জিবরিল আল রাজুবের নেতৃত্বে হামাসের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেফতার শুরু হয়। অন্যদিকে জর্ডান সরকারও সেখানে বসবাসরত হামাস নেতাদের বিরুদ্ধে দমনাভিযান শুরু করে। জর্ডানস্থ ইখওয়ানের ভেতরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্কলহ শুরু হয়ে যাওয়ায় তারাও সেই দুঃসময়ে হামাসের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।[৯৩]

এমনই এক পরিস্থিতিতে ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে একজন কারারক্ষী শেখ ইয়াসিনের সেলের সামনে আসে। সে দুই সেবককে বলে, তারা যেন শেখ ইয়াসিনকে নিয়ে দোতলায় কারা অফিসে আসে। দুই সেবক সেই কারারক্ষীকে জানায়– শেখ ইয়াসিন শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ, তাই তার জন্য ওপরে যাওয়া কঠিন। কেউ যদি শেখের সাথে কথা বলতে চায়, তাহলে তারা যেন সেলে এসে কথা বলে। কিন্তু কারারক্ষী সেবকদের সেই কথায় পাত্তা না দিয়ে শেখ ইয়াসিনকে কারা অফিসে নিয়ে যেতে বলে। বাধ্য হয়েই শেখ ইয়াসিন কারা অফিসে যান। যাওয়ার পর দেখেন– সেখানে পুলিশের তিনজন এবং সামরিক দুজন শীর্ষ কর্মকর্তা বসে আছেন। এই কর্মকর্তারা শেখ ইয়াসিনের সামনে অদ্ভুত এক প্রস্তাব পেশ করে।

তারা বলে– 'আপনার সামনে মুক্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার এক সুযোগ এসেছে। আপনি কি যাবেন?'

শেখ ইয়াসিন উত্তরে বলেন– 'অবশ্যই যাব।'

---

৯২. এই দাহলান ২০১৮ সাল থেকে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, যাতে ফাতাহ আন্দোলনের সাথে হামাসের দূরত্ব কমানো যায়। দাহলানকে নিয়ে হামাসের অনেকের মধ্যেই দ্বিধা ছিল। কেননা, দাহলানের পুরোনো ভূমিকার কথা মনে করে অনেকেই দাহলানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তথাপি, হামাস জাতীয় স্বার্থে দাহলানের সেই উদ্যোগে সাড়া দেয়। উদ্যোগ এখনও চলমান। তবে মজার ব্যাপার হলো– এখন এই পর্যায়ে এসে দাহলান হামাসের ভূমিকাকেই বেশি আন্তরিক মনে করছেন। সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ফাতাহর ভূমিকাকে হতাশাব্যঞ্জক হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন।

৯৩. আগের অধ্যায়েই জর্ডান ইখওয়ানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং ইখওয়ান ও হামাসের মধ্যকার দূরত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইজরাইলি কর্মকতা : জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তারা আপনাকে জর্ডানে নিয়ে যেতে চায়। এখন আপনি যদি সেখানে যেতে চান, তবে থাকতে পারবেন। বাদশাহ হোসেন নিজে আপনাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

শেখ ইয়াসিন : আমি জর্ডানে যাব না। আমাকে যদি মুক্তিই দেওয়া হয়, তাহলে নিজের বাড়ি চলে যাব। জর্ডানে গিয়ে সেখানকার বাদশাহর সাথে মিলে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃখিত, এই প্রস্তাব আমি মানতে পারলাম না।

ইজরাইলি কর্মকর্তাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, তারা শেখ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে আগ্রহী। তারা শেখ ইয়াসিনকে নানাভাবে প্রস্তাবে রাজি করাতে চেষ্টা করে। শেখ ইয়াসিন অবশ্য তখনও এই খেলাটির প্রকৃত কারণ বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে ইজরাইলিদের কোনো প্রশ্ন করতেও আগ্রহী ছিলেন না। ইজরাইলি কর্মকর্তারা অবশ্য তাদের কোনো কথাই লিখিত আকারে প্রস্তাব করতে রাজি হয়নি। তারা বারবার শেখ ইয়াসিনকে বলছিল– 'আপনার দায়িত্ব বাদশাহ হোসেন[৯৪] নিজে নিয়েছেন, তাই উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

শেখ ইয়াসিন তারপরও হাল ছাড়লেন না। তাদের মধ্যে সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। একটা পর্যায়ে শেখ ইয়াসিনের পীড়াপীড়িতে ইজরাইলি কর্মকর্তারা একটা কাগজে নিজেদের নাম লিখে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। আর সেই কাগজে লেখা ছিল শেখ ইয়াসিন জর্ডানে একটি সংক্ষিপ্ত সফর ও মেডিকেল চেকআপ শেষ করে ফিলিস্তিনে নিজ গৃহে ফিরে আসতে পারবেন।

শেখ ইয়াসিন শুধু নিজের মুক্তি নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হলেন না; এবার তিনি ভিন্ন এক ইস্যু নিয়ে তাদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করলেন। তিনি দাবি করলেন, তার সেবা করা দুই সেবককেও মুক্তি দিতে হবে। তাদের একজনের বিরুদ্ধে ১২ বছর এবং অপরজনের বিরুদ্ধে ৮ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে। ইজরাইলি কর্মকর্তারা দুজনকে নয়; বরং একজন সেবককে মুক্তি দিতে রাজি হয়। তার নাম রায়েদ বালবুল। শেখ ইয়াসিনও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

সেদিন রাতেই জর্ডান সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে শেখ ইয়াসিন ও তার স্ত্রীকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের আল হোসেন মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।

---

[৯৪]. জর্ডানের বাদশাহ হোসেন শেখ ইয়াসিনের মুক্তির জন্য যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি প্রতিবেদনেও জানা যায়। রেফারেন্স ৪৬-এ সেই প্রতিবেদনটির লিংক দেওয়া আছে।

রাত দুটোয় তারা সেখানে পৌছায়। অবাক করা বিষয়, সেই গভীর রাতে হাসপাতালে পৌছে শেখ ইয়াসিন দেখতে পান, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জর্ডানের বাদশাহ হোসেন নিজে প্রধানমন্ত্রী আব্দ-আল মাজালিকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাদের সঙ্গে জর্ডান প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং হামাসেরও কিছু শীর্ষ নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শেখ ইয়াসিন জানতে পারেন, বাদশাহ হোসেন নিজেই তার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কারণ, শেখ ইয়াসিনের মুক্তির মাত্র পাঁচ দিন আগে আম্মানে ইজরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দুজন সদস্য হামাসের তৎকালীন রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মিশালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালিয়েছিল।[৯৫] আর ঘটনাটা তার অজান্তে জর্ডানে সংঘঠিত হওয়ায় বাদশাহ হোসেন ইজরাইলের ব্যাপারে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনা হয়তো তার ব্যক্তিগত ভাব-মর্যাদাকে আঘাত করেছিল।

শেখ ইয়াসিনের বিশ্বজুড়ে সফর

শেখ ইয়াসিনের অপ্রত্যাশিত মুক্তিকে হামাস আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। শেখ ইয়াসিন গাজায় ফিরতে উদ্গ্রীব ছিলেন। কারণ, দেখতে চেয়েছিলেন তার অনুপস্থিতিতে সংগঠন কতটা বিকশিত হয়েছে। তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলেন, তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও দেশের মানুষ তাকে ভুলে যায়নি। তারা তাকে কেবল হামাসের নেতা হিসেবে বিবেচনা করছে না; বরং পিএলও'র থেকে বারবার প্রতারণার শিকার হওয়া মানুষগুলো তাকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। তার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে যে র‍্যালি হয়েছিল, তাতে লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি অংশ নিয়েছিল।

শেখ ইয়াসিনের পূর্ব থেকেই যেসব শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা ছিল, তা সাড়ে আট বছরের কারাবাসের পর আরও বৃদ্ধি পায়। তার শারীরিক অবস্থা প্রায় নাজুক হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে জর্ডানস্থ হামাসের নেতারা মিশরে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং সৌদিতে হজ পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক শেখ ইয়াসিন ১৯৯৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কায়রোর উদ্দেশ্যে গাজা ত্যাগ এবং ৪ মার্চ সৌদি আরবের জেদ্দা গমন করেন। তবে যে কয়দিন তিনি মিশরে ছিলেন, মিশরীয় কর্তৃপক্ষ তাকে প্রচণ্ড নজরদারির মধ্যে রেখেছিল। এ কয়দিনে কোনো দর্শনার্থী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ তো দূরের কথা;

---

[৯৫]. খালিদ মিশালকে হত্যার প্রচেষ্টার বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।

এমনকী কোনো ফোনও রিসিভ করার অনুমতি পাননি। বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে সম্পর্কিত মিশরীয় কর্তৃপক্ষ বরাবর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। আর সেই কারণে শেখ ইয়াসিনও দ্রুত মিশর থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

সৌদি আরবে হজ করার পাশাপাশি শেখ ইয়াসিন বিশ্বের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। ফিলিস্তিনের অনেক প্রবীণ ও নবীন ব্যক্তিত্ব; যারা পরিস্থিতির কারণে প্রবাসে স্থায়ী হয়েছেন, তাদের সঙ্গেও মত-বিনিময় করেন। প্রকৃতপক্ষে শেখ ইয়াসিনের সৌদি আরব সফরটি ছিল ফিলিস্তিনের ভেতরের জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক স্থাপনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত এবং সমাধানের জন্য কার্যকর কৌশল নিয়েও আলোচনার সুযোগ পেয়েছিল।

হামাসের একটি অংশ ফিলিস্তিনের বাইরে থেকে কীভাবে দল পরিচালনায় ভূমিকা রাখে, এত দিনে শেখ ইয়াসিন কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। তবে, এই প্রথম জর্ডানে থাকা হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতাদের বড়ো একটি অংশ হজ পালনে সৌদি আরব যাওয়ায় তিনি তাদের থেকে গোটা প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন। শেখ ইয়াসিন বুঝতে পারেন, হামাসের অভ্যন্তরীণ ও প্রবাসী শাখা আসলে একে অন্যের সম্পূরক। ফিলিস্তিনের ভেতরে হামাসের অনেক কাজই করা যাবে না, যদি না প্রবাসী শাখা তাদের সহযোগিতা করে। প্রবাস শাখাটি মূলত লজিস্টিক সার্পোট, তহবিল সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। সেইসঙ্গে প্রচার-প্রচারণাসহ গোটা মুসলিম জাহানকে হামাসের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত করে। ১৯৯৩ সালের অসলো-চুক্তির ফলে হামাসের প্রবাস ও অভ্যন্তরীণ শাখার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ইজরাইল, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং জর্ডান একত্রে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তবে শেখ ইয়াসিন মুক্তি পাওয়ার পর সেই প্রচেষ্টা একের পর এক অকার্যকর হয়ে পড়ে।

হজ পালন করার পর সৌদি আরবের তৎকালীন শাসক বাদশাহ আব্দুল্লাহ (তিনি তখন বাদশাহ ফাহাদের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন) তাকে অভ্যর্থনা জানান। বাদশাহ আব্দুল্লাহ শেখ ইয়াসিনকে যথেষ্ট সম্মান দেন। বাদশাহ আব্দুল্লাহ বলেন, তিনি শেখ ইয়াসিনের চোখে আরব জাহানের উত্থানের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। বাদশাহর এমন দৃষ্টিভঙ্গির পরপরই আরব অঞ্চলের বেশ কিছু দেশ শেখ ইয়াসিনকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানানো শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মধ্য এপ্রিলে শেখ ইয়াসিন কাতারের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ত্যাগ করেন। সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বরণ করেন কাতারের তৎকালীন আমিরসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

কাতারে থাকা অবস্থায় তিনি *আল জাজিরা* আরবি চ্যানেলকে অনেকগুলো সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।[৯৬] ২৫ এপ্রিলে দেওয়া এ রকমই এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইজরাইল ও আমেরিকার দাসত্ব করার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন। কাতার টেলিভিশনকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি নয়, তবে এরপরও ইজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় হামাস ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনোরূপ সংঘাতে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শেখ ইয়াসিন গাজা থেকে বেরিয়ে আসার পর তার বিভিন্ন কার্যক্রমে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ মোটেও খুশি ছিল না। তার ওপর এই ধরনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ায় তারা রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলো এবং হামাসের সাথে সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটল। সংকট আরও জটিল আকার ধারণ করে, যখন আল কাসসাম ব্রিগেডের শীর্ষ এক নেতা মুহিউদ্দিন আল শারিফকে রহস্যজনকভাবে হত্যা করা হয়। মহিউদ্দিন আল শরিফের হত্যাকারীরা এই হামলার ঘটনাটিকে ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা শরিফকে হত্যার পর পার্শ্ববর্তী ওয়্যার হাউজে একটি বিস্ফোরণ ঘটায়। ফিলিস্তিনের মানবাধিকার সংস্থা আল রাকিবের দেওয়া তথ্যনুযায়ী– এই বিস্ফোরণটি ঘটে ২৯ মার্চ রাত সাড়ে ৮টায়। বিস্ফোরণকারীর দেহ ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়। তবে তার পায়ে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তদন্তে জানা যায়, বিস্ফোরণের আগে সে আহত অবস্থায় ছিল। পরে অধিকতর তদন্তে আরও জানা যায়, শরিফকে গুলি করার চার ঘণ্টা পর এই বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়। তবে ঘটনাটি এমনভাবে প্রচার করা হয়, যেন ওই বিস্ফোরণেই শরিফের মৃত্যু হয়েছে।

অবশ্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ দাবি করছিল, হামাসের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের জের ধরে শারিফের সহযোগীরাই তাকে হত্যা করেছে। নিজেদের এই দাবি প্রমাণ করার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ হামাসের বেশ কয়েকজন নেতাকে আটক করে এবং তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে তাদের মতো করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু এত কিছুর পরও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিদের দিয়ে ইচ্ছামতো বক্তব্য আদায়ে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা নিজেদের দাবির সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

অন্যদিকে, হামাস কর্তৃপক্ষ শরিফকে হত্যার জন্য ইজরাইলকে দায়ী করে। তারা অভিযোগ করে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও শরিফকে হত্যার ব্যাপারে ইজরাইলকে সহযোগিতা করেছে। হামাস তাদের এই বক্তব্য লিফলেট আকারে ছাপিয়ে দেশের

---

[৯৬]. ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু করে ৫ জুন পর্যন্ত চ্যানেলটি মোট ৮টি পর্বে এই সাক্ষাৎকারটি প্রচার করে।

বিভিন্ন স্থানে প্রচার করে। বিশেষ করে গাজার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, আল নাজাহ এবং বারজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ব্যাপক প্রচারণাভিত্তিক ক্যাম্পেইন চালায়। ফলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার অভিযান চালায় এবং সকল লিফলেট জব্দ করে। হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল– এমন কিছু ছাত্রনেতাকেও সেই সময় গ্রেফতার করে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। এর পরপরই ৯ এপ্রিল হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা ড. আব্দ-আল আজিজ আল রানতিসিকেও আটক করা হয়। এর একদিন পরই নিজ বাড়ি থেকে আটক হন হামাসের আরেক শীর্ষ নেতা ড. ইবরাহিম আল মাকাদমাহ।

২৮ এপ্রিল শেখ ইয়াসিন পৌঁছান তেহরানে। ইরান তার এই সফরকে মোটামুটি রাষ্ট্রীয় সফর হিসেবেই বিবেচনা করে। ইরানিয়ান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান। এই সময় শেখ ইয়াসিন ইজরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের চলমান সংগ্রামে অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার জন্য ইরানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ইজরাইলের দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে। ইরান সফর শেষে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। ঠিক একই দিনে, লন্ডনে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে একটি শান্তি আলোচনা শেষ হয়– এতে অংশ নেন ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত, ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট। অবশ্য এই শান্তি আলোচনাতে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। তা ছাড়া শেখ ইয়াসিনও এই আলোচনাটিকে নিষ্ফল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র বরাবর একপেশে ভূমিকা পালন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, সময় নষ্ট এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিশ্ববাসীকে ভুল বার্তা দেওয়ার জন্যই লন্ডনে এই শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

শেখ ইয়াসিন দোহা, তেহরান ও আবুধাবিতে যেসব কথা বলছিলেন, সেগুলো ইয়াসির আরাফাতকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলছিল। তা ছাড়া শেখ ইয়াসিন যেভাবে বিভিন্ন দেশে সম্মান পাচ্ছিলেন এবং যেভাবে হামাস বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছিল, তাও তিনি ভালোভাবে নিতে পারছিলেন না।

একসময় ফাঁস হয়– শেখ ইয়াসিনের সফর সংক্ষিপ্ত এবং বিঘ্নিত করতে ইয়াসির আরাফাত বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম সম্প্রদায় আরাফাতের এমন একটি অপকৌশল জনসম্মুখে ফাঁস করে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কিছু মুসলিম সংগঠন শেখ ইয়াসিনকে তাদের দেশে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ৮ মে ইয়াসিনের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার কথাও ছিল।

মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলসহ অন্যান্য মুসলিম সংস্থার আয়োজনে কেপটাউনে ১০ মে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে শেখ ইয়াসিনের যাওয়ার কথা ছিল। হজ পালনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন মন্ত্রী শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখনই মূলত এই সফরের প্রোগ্রামটি চূড়ান্ত হয়। কিন্তু তখন ইয়াসির আরাফাতের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিলের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। সেই সম্পর্কের জের ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল শেখ ইয়াসিনের নির্ধারিত সফরকে বানচাল করে দেয়। ১০ মে যখন শেখ ইয়াসিন কুয়েত সফর করছিলেন, তখনই শেখ ইয়াসিন জানতে পারেন– দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সে দেশে তাকে নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও তিনি পূর্বের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলাকে সম্মান করা অব্যাহত রাখেন। শেখ ইয়াসিন জানান– অন্য কোনো সময়ে যদি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করার সুযোগ পান, তাহলে খুবই খুশি হবেন। পরবর্তী সময়ে এই সফর বাতিল নিয়ে বিবিসি দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে সরকারের মুখপাত্র জানায়, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণেই তারা শেখ ইয়াসিনের নির্ধারিত সফরটি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

আরাফাতের চাপে পড়ে ইরাক, জর্ডান ও লেবানন শেখ ইয়াসিনের ওপর একইভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই তিনটি দেশের রাজনৈতিক নেতারা আগে থেকেই শেখ ইয়াসিনের সফরের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিল। তাই আরাফাতের আপত্তি তাদের কাজটাকেই সহজ করে। জর্ডান ও লেবাননে বিরাটসংখ্যক ফিলিস্তিনি প্রবাসী নাগরিক বসবাস করত। তারাও শেখ ইয়াসিনকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। তাই ইয়াসিনের সফরের প্রভাবে তারা নতুন করে উত্তেজিত হয়ে পড়ে কি না, সেই আশঙ্কাও লেবানন ও জর্ডানের মধ্যে তীব্রভাবে ছিল।

অন্যদিকে লাখো উদ্বাস্তু এই বিকলাঙ্গ মানুষটিকে (শেখ ইয়াসিনকে) তাদের অমানবিক জীবনযাপনের সহযাত্রী এবং মুক্তি-সংগ্রামের একমাত্র প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করত। অনেকেই আশা করত, শতবর্ষ আগে তাদের পূর্বপুরুষরা যে ফিলিস্তিনের মাটি থেকে অন্যায়ভাবে উৎখাত হয়েছিল, সেখানেই তারা একদিন ফিরে যেতে পারবে। শেখ ইয়াসিনের সংগ্রামমুখর জীবন এবং বলিষ্ঠতা তাদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করত।

এই গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বাকি সব দেশেই শেখ ইয়াসিন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। কুয়েতে আরাফাতের কোনো প্রভাবই ছিল না। সাধারণভাবে কুয়েতিরা বরং আরাফাতকে অপছন্দই করে। কারণ, ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করার পর আরাফাত সাদ্দামকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে গালফ ওয়ারের যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর লাখো ফিলিস্তিনি প্রবাসীকে কুয়েত থেকে

বের করে দেওয়া হয়েছিল। এই তেলসমৃদ্ধ দেশটিতে সফরে গিয়ে শেখ ইয়াসিন কুয়েতের আমির শেখ জাবির আল আহমেদ আল সাবাহ এবং ক্রাউন প্রিন্স শেখ সাদ আল আব্দুল্লাহ আল সাবাহর সাথে বৈঠক করেন। এই বৈঠকের সময় শেখ ইয়াসিন কুয়েতি নেতাদের প্রস্তাব দেন, তারা চাইলে ইরাকের বিভিন্ন জেলে আটক থাকা কুয়েতি নাগরিকদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ইরাকের শাসকমহলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে তার এই প্রস্তাবটি হালে পানি পায়নি; ইরাক শুরুতেই তার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়।

অন্যদিকে, ইয়েমেনের পরিস্থিতি ছিল আরও ভিন্নরকম। শেখ ইয়াসিন ইয়েমেনে অবতরণ করার পর তৎকালীন ইয়েমেনি প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালেহ তাকে স্বাগত জানান। যদিও সালেহ ছিলেন আরাফাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সকল ভেদাভেদ ভুলে সকল ফিলিস্তিনিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন– ফিলিস্তিনিরা বিভক্ত থাকলে তাতে ইজরাইলিদেরই লাভ। শেখ ইয়াসিনের এই সফরগুলো নিয়ে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যকার টানাপোড়েন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সালেহ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তারপরও তিনি বেশ সাহসিকতার সঙ্গে শেখ ইয়াসিনকে বরণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই সফরে শেখ ইয়াসিন আবারও ইজরাইলি দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় শপথ ব্যক্ত করেন। শেখ ইয়াসিনের সম্মানে ইয়েমেনে একটি বিশাল সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালিতে লাখো ইয়েমেনি এবং ফিলিস্তিনি প্রবাসী নাগরিকরা যোগদান করেন। ইয়েমেনের ইসলামি আন্দোলনের মহিলা শাখার নেতৃবৃন্দও শেখ ইয়াসিনের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিলিস্তিনিদের চলমান সংগ্রামের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

এরপর ১৯৯৮ সালের ২১ মে শেখ ইয়াসিন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে পৌছান। সিরিয়া সরকারও তাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। তিনি সেখানে হাজারো ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ ইয়াসিন জানান– এই পর্যন্ত তিনি যত দেশ সফর করেছেন, তারা সকলেই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য হামাসের চলমান আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

শেখ ইয়াসিনের চার ম্যাসব্যাপী দীর্ঘ সফরের সর্বশেষ দেশ ছিল সুদান। সেখানে তিনি পৌছান ৩০ মে। সুদান পার্লামেন্টের স্পিকার হাসান আল তুরাবি তাকে স্বাগত জানান। তুরাবি ফিলিস্তিনি এই নেতাকে 'ইসলামিক জিহাদের নাড়ির স্পন্দন'

হিসেবে আখ্যায়িত এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তির জন্য তার গোটা জীবনের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। সুদানে এক সপ্তাহ অবস্থান করার সময় শেখ ইয়াসিন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় জর্ডান এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে থাকা হামাসের নেতারাও সুদানে এসে শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে পরবর্তী কৌশল প্রণয়নে হাত দেন। এসব কাজ করার জন্য তিনি সব সময় অনুকূল পরিবেশ পান না। সুদান সরকারের সম্মতিতে সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে শেখ ইয়াসিন তার সফর আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করেন।

এই দীর্ঘ সফর শেষে শেখ ইয়াসিন যখন তার নিজ ভূমি ফিলিস্তিনে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন থেকেই সমস্যা শুরু হয়। মিশরীয় সরকার তাকে মিশরে প্রবেশের ভিসা দিতে অস্বীকার করে। কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল না, ইজরাইল আদৌ তাকে গাজায় ঢুকতে দেবে কি না। আর গাজায় যেতে না পারলে পরবর্তী সময়ে তিনি মিশরে অনিশ্চিত সময়ের জন্য আটকা পড়বেন বলেও তাদের আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে, ইজরাইলি সরকারও দ্বিধায় পড়ে। কারণ, তারা বুঝতে পারছিল না, শেখ ইয়াসিনকে গাজায় ফিরতে দেওয়াটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, নাকি প্রবেশ না করতে দেওয়াটা।

অবশ্য এরপর ইজরাইল শেখ ইয়াসিনকে গাজায় প্রবেশ করতে দেওয়ার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয়। ততদিনে বিশ্বব্যাপী এই ভ্রমণের কারণে শেখ ইয়াসিনের একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেতানিয়াহু মনে করলেন, বাইরের দেশগুলোতে শেখ ইয়াসিন গেলেই বরং তারা আন্তর্জাতিকভাবে সংকটের মুখে পড়বে। তাই তিনি শেখ ইয়াসিনকে গাজার মধ্যেই আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই মোতাবেক ১৯৯৮ সালের ২২ জুন তাকে মিশরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। পূর্বের ন্যায় এবারও মিশরীয় কর্তৃপক্ষ তার ওপর তীব্র নজরদারি আরোপ করে। ২৪ জুন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি গাজা ছেড়ে যাওয়ার চার মাস পাঁচ দিন পর রাফা ক্রসিং দিয়ে শেখ ইয়াসিন আবারও গাজায় প্রবেশ করেন।

ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মহলের একটি বড়ো অংশ ভেবেছিল, শেখ ইয়াসিনের এই বিশ্ব সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল তহবিল সংগ্রহ করা। তবে হামাসের নেতারা তা অস্বীকার করে। হামাস নেতা ড. মাহমুদ আল জাহহার এই তহবিল সংগ্রহের অভিযোগকে ইজরাইলি প্রোপাগান্ডা হিসেবে অভিহিত করেন। গাজা ফেরার পরপরই সাংবাদিকদের সাথে মত-বিনিময়কালে শেখ ইয়াসিন এই তহবিল সংগ্রহসংক্রান্ত কথাবার্তার ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান,

ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানাতে এবং ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রামে তাদের সহায়তা পাওয়ার জন্যই তিনি এই সফরে বের হয়েছিলেন। তিনি তহবিল সংগ্রহের দাবিকে অস্বীকার করে বলেন– 'আমি কারও কাছেই টাকা চাইনি। আমি যাদের সাথে দেখা করেছি, তাদের কাছেই অকুণ্ঠ সমর্থন চেয়েছি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হামাসের বলিষ্ঠ অবস্থানকে আমি সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।' শেখ ইয়াসিন দাবি করেন– তিনি যেসব দেশে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, তাদের কাছে টাকা চাইলে তারা বরং বিব্রত হতো। উল্লেখ্য, যেসব দেশে শেখ ইয়াসিন গিয়েছিলেন, তার বেশিরভাগ দেশের সরকারপ্রধানরা মাত্র এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আহ্বানে শারম আল শেখে বৈঠকে মিলিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক কৌশল প্রণয়ন করেন। সেই বৈঠকের মূল সুপারিশ ছিল হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

যদিও তহবিল সংগ্রহকে সফরের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে শেখ ইয়াসিন স্বীকার করেননি, তবে বাস্তবতা হলো– এই সফরের পরপরই হামাস বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা পেতে শুরু করে। বিশেষ করে সৌদি রাজপরিবার, কাতার ও কুয়েতের শেখবৃন্দ, আরব আমিরাতের শাসকবৃন্দ এবং ইরানের নেতারা হামাসকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। সেইসঙ্গে দলটির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাও বরাদ্দ দেয়। মার্কিনিরা হামাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালালেও শেখ ইয়াসিনের সফরের পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হামাসের ভাবমূর্তি অনেকটাই উজ্জ্বল ও ইতিবাচক হয়। এটা ঠিক, বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাপ মোকাবিলা করেও হামাস তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল থেকে সরে আসতে রাজি হয়নি। ১৯৮৮ সালে যে গণগ্রেফতার হয়, সেখান থেকে শুরু করে খালিদ মিশালের হত্যা প্রচেষ্টা পর্যন্ত গোটা সময়টাতেই হামাস একটি বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি হিসেবে আবির্ভূত হয়; যে বিপ্লবের ছায়া সৌদি বাদশাহ শেখ ইয়াসিনের চোখেও দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও মার্কিন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক মুসলিম দেশই প্রকাশ্যে কোনো অবস্থান নিতে পারত না। তবে জানা যায়– যখনই এসব দেশের নেতারা একাকী কোথাও বসার সুযোগ পেতেন, তখনই তারা হামাস নিয়ে আলোচনা এবং তাদের পরোক্ষভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করতেন।

আরেকটা বিষয় রয়েছে যা হামাসকে এগিয়ে চলতে সহায়তা করছে। তা হলো– হামাসের নেতাদের সুনাম, তাদের আত্মত্যাগ, ভালো ব্যবহার, মানবিক আচরণ এবং সততা। এগুলো কোনো রাজনৈতিক কৌশল নয়; বরং এগুলো হলো দৃষ্টিভঙ্গি, যা ইসলামি মূল্যবোধের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে পালিত হয়। এসব গুণাবলি অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ফাতাহর নেতা-কর্মীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যেত না।

এই ধরনের মানবিক আচরণগুলোর প্রভাব হামাস ইতিবাচকভাবেই পেয়েছে। হামাস মূলত ফিলিস্তিনের জনগণের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নিরসনে কাজ করছিল। এই দুর্ভোগগুলো সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছু রাজনৈতিক সংকটও দায়ী। হামাসের সকল কার্যক্রমের একটি নৈতিক ভিত্তি ছিল– 'এই বিশ্বজগৎ আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ দেন, ক্ষমতা দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে কিছুই দেন না। আর যাকে যতটুকু সুযোগ বা ক্ষমতা দেন, তার জন্য তাকে শেষ বিচারের দিনে জবাবদিহি করতে হবে।'

হামাসের নেতারা এই দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে লালন করতেন। শুধু নেতারা নন; কর্মী পর্যন্ত এসব দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলতেনে। তাই তারা সম্পদকে যতটা না উপভোগ্য মনে করতেন, তার চাইতে বোঝা হিসেবেই বেশি বিবেচনা করতেন। হামাস নেতারা বলতেন– 'বুদ্ধিমান সেই, যে কিনা সম্পদ পেলেও তা নিজে এককভাবে ভোগ না করে বরং অন্যের কল্যাণের জন্য ব্যয় করে। এতে যেমন তার ওপর থেকে বোঝা কমে, ঠিক তেমনি পরকালের হিসাবেও অনেক পুণ্য যোগ হয়।' হামাসের এমন প্রচারণার কারণে অর্থশালী ব্যক্তিরা দান-খয়রাতের ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং তাদের দান যেন উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছায়, তা নিশ্চিতকরণে তৎপরতা চালায়।

উদাহরণস্বরূপ, গাজায় শেখ ইয়াসিনের ফিরে আসার পর হামাসের নেতারা পরামর্শ করে তার জন্য মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেখ ইয়াসিন তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। শেষমেষ অনেক জোরাজুরির পর তিনি অল্প কিছু অর্থ নিতে রাজি হন। পরিমাণটা এত অল্প যে হামাস নেতারা অবাক হন। কিন্তু শেখ ইয়াসিন তিনি মনে করেছিলেন, জীবন নির্বাহের জন্য এর চেয়ে বেশি অর্থ তার প্রয়োজন নেই। শেখ ইয়াসিনের এই দৃষ্টান্ত সংগঠনের সকল স্তরের নেতা-কর্মীরাই অনুসরণ করেছিলেন। তাই হামাসে কেউ নিছক টাকা উপার্জনের জন্য যোগ দিত না কিংবা হামাসে যোগ দিয়ে ধনী হওয়ার মতো কোনো সুযোগও ছিল না।

এভাবে একটা পর্যায়ে দাতারা বুঝে গেল– তারা হামাসকে যে টাকা দিচ্ছে, তার খুব সামান্য অংশ সামরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে; বরং সিংহভাগ ব্যয় হচ্ছে সামাজিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে। জাতিসংঘের রিলিফ কার্যক্রমবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ এবং অন্যান্য আরও নানা এনজিও সামাজিক যে কাজগুলো করে, হামাসও ঠিক একই ধরনের কাজ করে। আর ফিলিস্তিন নামক জাতিগোষ্ঠীকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে এই কাজগুলো করার কোনো বিকল্প নেই।

হামাসের এই সব জনকল্যাণমূলক কাজের বিপরীতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও পিএলওর কার্যক্রম ছিল একেবারেই বিপরীত। তাদের একেকজন কর্মকর্তা বেশ বড়ো অঙ্কের বেতন নিতেন। এ ছাড়া তারা নিরাপত্তা দেওয়ার নামে বেশ কিছু লোককে অনৈতিকভাবে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু তারা ফিলিস্তিনিদের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারত না; বরং তাদের চলাফেরা এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের এই নিরাপত্তাকর্মীরা মূলত ইজরাইলি সেনাদের বিকল্প হিসেবেই ভূমিকা রাখত। তা ছাড়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের এই কাঠামোটির মাঝে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও ছিল বেশ প্রকট। ফলে এই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আওতায় যারা কাজ করত, তারা ছিল সাধারণ ফিলিস্তিনিদের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যটাও ছিল বেশ দৃশ্যমান।

অধ্যায়-৭

খালিদ মিশালকে হত্যা প্রচেষ্টা

মোসাদের হত্যা মিশন

১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। খুব সকালের ঘটনা। আম্মানের রাবিয়া এলাকায় অবস্থিত ইজরাইলি দূতাবাস থেকে দুটি হুন্ডাই সেলুন কার বেরিয়ে গেল। গন্তব্য– শুমায়সানি নামক এলাকা, যেখানে খালিদ মিশাল বসবাস করতেন। প্রথম গাড়িটির লাইসেন্স প্লেট ছিল সবুজ রঙের। জর্ডানে সাধারণত এ ধরনের প্লেট ভাড়া গাড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। গাড়িটিতে ইজরাইলের কিডন ইউনিটের চারজন সক্রিয় সদস্য ছিল। ঘটনা বর্ণনার পূর্বে কিডন ইউনিট সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

কিডন শব্দটি বেয়োনেটের হিব্রু পরিভাষা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইজরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমগুলো এই কিডন ইউনিটের সদস্যরাই পরিচালনা করে। এরা মূলত ইজরাইলের চিহ্নিত শত্রুদের গোপনে হত্যা করে; যদিও এই ধরনের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইজরাইলি সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরাই সরাসরি এই কিডন সদস্যদের পরিচালনা করে। এই ইউনিটের সদস্যরা ইতঃপূর্বে অসংখ্য ফিলিস্তিনি নেতাকে হত্যা করেছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খলিল আল ওয়াজির; যিনি আবু জিহাদ নামে পরিচিত ছিলেন। তাকে ১৯৮৮ সালের ১৫ জানুয়ারি তিউনিসে ভয়ংকরভাবে হত্যা করা হয়। তারা ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি তিউনিসিয়াতে সালাহ খালাফকেও হত্যা করে। একই সঙ্গে হত্যা করা হয় সালাহ খালাফের উপদেষ্টা ফাখরি আল উমারি এবং পিএলও নিরাপত্তাপ্রধান হায়েল আব্দ-আল হামিদকে। কিডনের পরবর্তী শিকার হন ইসলামিক জিহাদের শীর্ষ নেতা ফাথি আল শিকাকি।

লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন থেকে ফেরার পথে মাল্টা প্রণালিতে তাকে হত্যা করা হয়। সময়টা ছিল ১৯৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর। হামাস নেতা ইঞ্জিনিয়ার আয়াশকেও মোবাইল বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করা হয় ১৯৯৬ সালের ৬ জানুয়ারি। এভাবে মোসাদ ফিলিস্তিন স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক পুরোধা ব্যক্তিত্বকে গোটা ৭০ ও ৮০'র দশকজুড়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পনামাফিক হত্যা করে।

ফিরে আসি আম্মানে, খালিদ মিশালের বাসা অভিমুখী মোসাদ অভিযানে। প্রথম গাড়িতে যে চারজন সদস্য ছিল– তাদের মধ্যে একজন ড্রাইভার, একজন নিরাপত্তাকর্মী আর বাকি দুজন হিটম্যান। দুই হিটম্যানের নাম ছিল যথাক্রমে জন কেনডাল এবং ব্যারি বেডস (বয়স ২৮ ও ৩৬ বছর)। মূলত তাদের ওপরই অপারেশনের মূল দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এই দুই আততায়ী ঘটনার মাত্র একদিন আগে জর্ডানে প্রবেশ করে। তারা ছিল কানাডার পাসপোর্টধারী।

দ্বিতীয় গাড়িটির গায়ে কূটনৈতিক লাইসেন্স প্লেট লাগানো ছিল। সেই গাড়িতে ছিল ব্যাকআপ দল, যারা প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। এই দলে একজন চিকিৎসকসহ মোসাদের চারজন সদস্য ছিল। তারা মিশালের বাড়ির সামনে মিশালের বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। সকাল ১০টার মিশাল বাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠেন। গাড়িতে ছিল ড্রাইভার, মিশালের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মুহাম্মাদ আবু সাইফ, আর সেইসঙ্গে ছিল মিশালের তিন বাচ্চা। জর্ডানে তখন ছুটির মওসুম চলছিল। তাই বাচ্চাদের স্কুল ছিল বন্ধ। কথা ছিল– বাচ্চারা মিশালের সাথে তার অফিসে (অফিসটি ছিল ওয়াসফি আল তাল সড়কে, শামিয়াহ নামক একটি ভবনে) যাবে। মিশালকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে তারপর তাদের সেলুনে নিয়ে চুল কাটানো হবে।

কিডন সদস্যদের গাড়িটি মিশালকে অনুসরণ করে অফিস পর্যন্ত পৌঁছে। আর কূটনৈতিক প্লেট লাগানো গাড়িটি নিকটস্থ মক্কা সড়কে অবস্থান নেয়। এবার তাদের মিশন শুরু। মিশাল যখনই গাড়ি থেকে নেমে অফিস ভবনে প্রবেশ করলেন, সাথে সাথেই আততায়ী কেনডাল এবং বেডস তার পেছনে ছুটে গেল। একজন আততায়ীর হাতে ছিল একটি ডিভাইস; যদিও সে হাতে ব্যান্ডেজ করে নিয়েছিল বিধায় বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু এ দুই আততায়ী খেয়াল করেনি, গাড়িতে তখনও মিশালের দেহরক্ষী আবু সাইফ রয়েছেন।

প্রথম আততায়ী পেছন থেকে এসে তার হাতে রাখা ডিভাইসটি আচমকা খালিদ মিশালের বাম কানে লাগালেন। পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে মিশাল জানিয়েছিলেন,

যন্ত্রটি কানে লাগানোর সাথে সাথে তার মনে হলো– যেন প্রচণ্ড জোরে বৈদ্যুতিক শক খেয়েছেন। যন্ত্রটি আসলে কী ছিল, তা তখনও জানা যায়নি। তবে মিশাল সেই যাত্রায় বেঁচে যান! ততক্ষণে তার দেহরক্ষী আবু সাইফ সেই দুই ইজরাইলি আততায়ীকে ধাওয়া করেন। অন্যদিকে, মিশালের গাড়িচালক তাকে তড়িঘড়ি করে অফিসে নিয়ে যায়।

আবু সাইফ সেদিন অনেকটা পথ দৌড়ে, আঘাতে পর্যুদস্ত হয়েও নিজের দক্ষতা ও পথচারীদের সহযোগিতা নিয়ে দুই আততায়ীকে ধরেছিলেন। তাকে সাহায্য করেছিলেন জর্ডানস্থ ফিলিস্তিনি লিবারেশন আর্মির কর্মকর্তা সাদ নাইম আল খতিব; যিনি ঘটনাচক্রে সড়কে আবু সাইফকে দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে আবু সাইফের মাথায় একজন আততায়ী ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয়, কিন্তু তারপরেও তিনি দুজনকে আটক করতে সক্ষম হন।

পরে সেই দুই আততায়ীকে জর্ডান পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আবু সাইফ জর্ডানের পুলিশকে জানান, এই দুই আততায়ী ইজরাইলের এজেন্ট এবং তারা হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মিশালকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। জর্ডান পুলিশ আহত আবু সাইফকে আল হোসেন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আবু সাইফ খালিদ মিশালের অফিসে ফোন দিয়ে জানান, তিনি দুই আততায়ীকে ধরতে পেরেছেন এবং তারা এখন জর্ডান পুলিশের জিম্মায় আছে।

এরই মধ্যে খালিদ মিশাল তার বাচ্চাদের ড্রাইভারের সাথে বাসায় পাঠিয়ে দেন। আর হামাসের কার্যালয়ের অন্য একজন স্টাফকে বলেন, তাকে জর্ডানস্থ হামাসের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ নাজ্জালের বাসায় নামিয়ে দেওয়ার জন্য। অবশ্য নাজ্জালকে ইতোমধ্যেই খালিদ মিশালের ওপর আক্রমণের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। নাজ্জাল তখন বাইরে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত বাসায় ফেরেন। একই সঙ্গে তার বাসায় হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন। তিনি গোটা ঘটনাটি নিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক এএফপির প্রতিনিধি রান্দা হাবিবের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। পরবর্তী সময়ে রান্দা হাবিব গোটা ঘটনাটি জর্ডানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী সামির মুতাভিকে জানান। মুতাভি বলেন, এই আক্রমণ সম্বন্ধে তিনি মোটেও অবগত নন। একই সঙ্গে তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত করারও আশ্বাস দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মুতাভি রান্দা হাবিবকে ফোন করে বলেন– 'এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

কানাডার পাসপোর্টধারী ওই দুই ব্যক্তি আসলে নিরীহ। তারা কেনাকাটা করছিল। খালিদ মিশালের সঙ্গে তাদের বাদানুবাদ হয়েছিল মাত্র! আর বাদানুবাদের মূল কারণ, মিশালের দেহরক্ষী আবু সাইফ তাদের হয়রানি করেছিল।'

তথ্যমন্ত্রী ঘটনাটি অস্বীকার করলেও এএফপি পুরো ঘটনাটি খালিদ মিশালকে হত্যার প্রচেষ্টা মর্মে হামাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করে। এই বিজ্ঞপ্তিটি সাথে সাথেই জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন পরিচালক সামিহ আল বাত্তিখির নজরে আসে। তিনি সাথে সাথেই উত্তেজিত হন এবং হামাসের গোটা দাবিকেই অসত্য ও বানোয়াট বলে মন্তব্য করেন। বাত্তিখি তাৎক্ষণিকভাবে হামাস নেতা মুসা আবু মারজুকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নাজ্জাল যে বিবৃতি দিয়েছে, তার প্রতিবাদ জানান। একপর্যায়েয় তিনি নাজ্জালকে মিথ্যাবাদী হিসেবেও আখ্যায়িত করেন। বাত্তিখি বলেন– তার সোর্সরা জানিয়েছে, কানাডার ওই দুই পর্যটক আর খালিদ মিশালের দেহরক্ষীদের মধ্যে বাদানুবাদ ছাড়া সেদিন সেখানে আর কিছুই ঘটেনি।

এদিকে মুহাম্মাদ নাজ্জালের বাড়িতে হামাসের বৈঠক তখনও চলছিল। সেই বৈঠকে খালিদ মিশাল সহকর্মীদের কাছে তার ওপর আক্রমণের ঘটনাটি বর্ণনা করেন। মিশাল জানান, আততায়ীরা পেছন থেকে তার ওপর আক্রমণ চালায় এবং এই কাজে তারা একটি অজানা যন্ত্র ব্যবহার করেছে। যন্ত্রটি তাকে স্পর্শ করেনি ঠিকই, কিন্তু তারপরও তার কানের ভেতরে বিকট একটি শব্দ বা অনুরণন সৃষ্টি করেছে। এর পরপরই তার মনে হয়েছে, তিনি বোধ হয় মারাত্মক বৈদ্যুতিক শক খেয়েছেন। মিশাল আরও জানান– এরপর থেকেই তিনি বেশ অসুস্থ, ক্লান্ত এবং ঘুমঘুম ভাব অনুভব করছেন।

খালিদ মিশালের শারীরিকভাবে সমস্যা হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে তার সহকর্মীরা দ্রুত তাকে জর্ডানের ইসলামিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুপুর ১টা ২০-এ তারা হাসপাতালে পৌঁছায়। এর পরপরই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। হাসপাতালের প্রাথমিক পরীক্ষাতেই দেখা যায়, মিশালের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। এদিকে হামাসের নেতা খালিদ মিশালের ওপর হামলা হয়েছে– ততক্ষণে এই খবর গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ইখওয়ানের সিনিয়র দায়িত্বশীলরা মিশালকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসেন। ইখওয়ান নেতা এবং তৎকালীন জর্ডান পার্লামেন্টের সদস্য ড. আব্দুল্লাহ আল আকাইলাহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করেন, যাতে গোটা ঘটনাটি বাদশাহ হোসেনকে জানানো হয়।

হাসপাতালে যখন এই পরিস্থিতি, তখন পুলিশের কাস্টডিতে থাকা দুই আততায়ীর অবস্থা একেবারেই ভিন্ন রকম। কানাডীয় পাসপোর্টধারী দুই ব্যক্তি জানান–

তারা সাধারণ পর্যটক হিসেবে ঘোরাফেরা করছিলেন, তখন আবু সাইফ কোনো উসকানি ছাড়াই তাদের ওপর চড়াও হয়। পুলিশের দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে জর্ডানস্থ কানাডা দূতাবাসে ফোন দেন। তিনি দুই কানাডীয় পাসপোর্টধারী আটকের বিষয়টি তাদের অবহিত করেন। তারা কানাডা দূতাবাসের কর্মকর্তাকে জলদি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। কিছুক্ষণ পরই দূতাবাসের জনৈক কর্মকর্তা পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়।

এর পরের ঘটনা দেখে সেই কানাডীয় কূটনৈতিক ও পুলিশের সদস্যরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। কেননা, আটক দুই ব্যক্তি প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করে। পুলিশের সামনে এমন ঔদ্ধত্য আচরণ মেনে নেওয়ার মতো ছিল না। একপর্যায়ে তারা পুলিশ কিংবা দূতাবাসের কোনো সহযোগিতা নিতে বা করতে অস্বীকার করে।

আবু সাইফ দুই আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগে একবার বক্তব্য দিয়েছিল। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর আবারও থানায় এসে একই কথা বলেন। তা ছাড়াও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তার কাছে আটক দুই ব্যক্তির কথাবার্তা বা আচরণ সন্দেহজনক হয়। তাই তিনি শুরু থেকে গোটা প্রক্রিয়াটি স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান। তারপরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই দুই আটক ব্যক্তিকে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার হাতে হস্তান্তর এবং পুনঃতদন্ত করার নির্দেশ দেয়।

জর্ডানস্থ মোসাদের একজন কর্মকর্তা এই আক্রমণ সম্বন্ধে জানত। মূলত সেই গোটা আক্রমণের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করছিল। যখনই এই দুই আততায়ী ধরা পড়ে, তখন পেছনের গাড়িতে থাকা ব্যাকআপ টিম দ্রুতই স্পট থেকে সরে যায়। এরপর সরাসরি ইজরাইলি দূতাবাসে গিয়ে মোসাদের এই কর্মকর্তাকে হত্যা মিশন সম্পর্কে জানায়। বিশেষ করে মিশনের ব্যর্থতা এবং দুই আততায়ী ধরা পড়ে যাওয়ার বিষয়টি ব্যাকআপ টিমের মাধ্যমে মোসাদের ওই কর্মকর্তা জানতে পারেন। তিনি সামিহ আল বাত্তিখিকে ফোন দিয়ে বলেন, আটককৃত দুই ব্যক্তি মোসাদের এজেন্ট এবং তাদের যেন কোনো হয়রানি করা না হয়। তিনি আরও জানান, ইজরাইলি সরকার খুব সহসাই বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

সে সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা যায়– চারজন আরব বংশোদ্ভূত দুষ্কৃতিকারীও এই হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। যে ভবনে মিশালের অফিস ছিল, তার দোতলায় তাদের একজন অফিস ভাড়া নেয়। অফিসটি বাহ্যিকভাবে জর্ডান-ইজরাইলি যৌথ হিরার ব্যবসার মূল কার্যালয় হিসেবে পরিচিত হলেও তা ছিল খালিদ মিশাল এবং তার সহকর্মীদের ওপর নজর রাখার জন্য। হিরার ব্যাবসার একজন অংশীদার ইজরাইলি নাগরিক ছিল, যে মিশালের ওপর হামলার পরপরই

গোপনে ইজরাইলে পড়ি জমায়। এই ঘটনায় জর্ডানের দুজন নাগরিকও মোসাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে, যারা মিশালের গতিবিধির তথ্য ইজরাইলের কাছে পৌঁছে দিত। এর বাইরে মোসাদের আম্মান শাখার মূল দায়িত্বশীলও এই মিশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মোটকথা মোসাদের মোট ১৩ জন এজেন্ট খালিদ মিশালকে হত্যার অভিযানটি পরিচালনা করে।

খালিদ মিশালের ওপর আক্রমণের ঘটনাটি বাদশাহ হোসেনের কানে পৌঁছালে তিনি সাথে সাথেই পুরো বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে আটক দুই মোসাদ সদস্য খালিদ মিশালকে হত্যা চেষ্টার কথা স্বীকার করে। তারা জানায়, ইতোমধ্যে মিশালের ওপর তারা এক ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ হোসেন খালিদ মিশালকে আল হোসেন মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। সেখানে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খালিদ মিশালকে পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করেন। শুধু তাই নয়; বাদশাহ হোসেন সেই সময় নিজের ক্যানসার রোগের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিকে। তিনি মিশালের চিকিৎসার জন্য মায়ো ক্লিনিক থেকেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে আসেন। সেইসঙ্গে এই ঘটনা তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে অবহিত করেন। তিনি বিল ক্লিনটনকে বলেন– 'আপনি ইজরাইলের ওপর চাপ দিন, যাতে খালিদ মিশালের ওপর তারা কোন ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে, তার প্রতিষেধক পাঠিয়ে দেয়।'

ক্লিনটন সব শুনে অবাক হয়ে যান। বিশেষ করে জর্ডানে এমন হামলা হতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হোসেনের সঙ্গে কথা বলার শেষ দিকে ক্লিনটন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেন– 'That man is impossible.' এখানে 'ইমপসিবল' শব্দটির অর্থ 'অসম্ভব' নয়; বরং 'অসহনীয়'। এটা বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বোঝাতে চাইলেন, উগ্রপন্থি ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এসব কাজ আর সহ্য করা যায় না; তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

যদিও মোসাদের আততায়ীরা চাইলেই খালিদ মিশালকে গুলি করে হত্যা করতে পারত, কিন্তু তারা বুঝে-শুনেই সেই পথে যায়নি। তারা চেয়েছিল ধীরে ধীরে এবং আন্তর্জাতি কোনো শোরগোলের সৃষ্টি না করে নীরবে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে। খালিদ মিশালের ওপর যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাতে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করে। মোসাদের এই উদ্দেশ্য ছিল হামাসকে একটি সতর্কতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আর তা হলো– তারা যেখানে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, ইজরাইল চাইলে

তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবে। একই সঙ্গে সরাসরি হত্যা না করায় ইজরাইল ধারণা করেছিল, তাদের ঘাড়ে কেউ সরাসরি দায় দিতে পারবে না, আর দিলেও তারা বলিষ্ঠতার সাথে তা অস্বীকার করতে পারবে।

তবে তারা যা ভেবেছিল তা হয়নি। ইজরাইল চেয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেন কোনো সংকট বা শোরগোল সৃষ্টি না হয়, কিন্তু ঘটনা ঘটল তার পুরো উলটো। আন্তর্জাতিকভাবে এমন একটি পরিস্থিতির তৈরি হলো, তাতে ইজরাইল খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ল। তখন ইজরাইল জর্ডানের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতির হাত থেকে রক্ষা এবং দুই এজেন্টকে মুক্ত করতে চেষ্টা শুরু করল। কারণ, এই দুইজন যদি বেশি সময় আটক থাকে, তাহলে তারা হয়তো জিজ্ঞাসাবাদে জর্ডানের স্থানীয় সহযোগীদের নামও ফাঁস করে দিতে পারে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদশাহ হোসেনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইজরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করল, যাতে তারা প্রয়োগকৃত বিষের প্রতিষেধক প্রেরণ করে। কারণ, প্রতিষেধক ছাড়া তাকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। উক্ত বিষের প্রতিক্রিয়া এতটাই মারাত্মক ছিল, আক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে বা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে সাথে সাথেই ফুসফুস অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর ব্যবহার করা ছাড়া শ্বাস নিতে পারবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ খালিদ মিশালের হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর পাঁচ দিন পর বাদশাহ হোসেন এক জনসমাবেশে বক্তব্য দেন। তিনি তার ভাষণে ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি পারস্পরিক ভরসা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিলম্বে শেখ আহমেদ ইয়াসিন এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি দাবি করেন। তার এই দাবি জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেখ ইয়াসিন মুক্ত হয়ে জর্ডানের ভূখণ্ডে অবতরণ করেন।

অন্যদিকে, শেখ ইয়াসিন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মূল আকর্ষণে পরিণত হন। সেই সুযোগে হামাস আরেকবার বিশ্ববাসীর সামনে গুরুত্ব সহকারে আবির্ভূত হয়। সেইসঙ্গে হামাস ও জর্ডানের যে অস্থিরতার জন্ম হয়েছিল, তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। হামাসের নেতারা অনুধাবন করেন, ইজরাইলি হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে হামাস ও জর্ডানের সম্পর্কটা ভালোর দিকে যেতে শুরু করেছে। হামাসের সঙ্গে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সম্পর্কও আগের তুলনায় ভালো হয়। যদিও তাদের চেষ্টা ব্যতিরেকে জর্ডানের বাদশাহ শেখ ইয়াসিনকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে তাদের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তিও কাজ করেছিল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ফাতাহ

বিগত দুই বছর ধরে হামাসকে একঘরে করার লক্ষ্যে যেভাবে কাজ করছিল, হামাসের এই উত্থানে তাতেও কিছুটা ভাটা পড়ল। ফলে চাকা উলটো দিকে ঘোরা শুরু করল। এতদিন আমেরিকা ও ইজরাইল উভয়ই ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের ওপর চাপ দিচ্ছিল, যাতে তিনি হামাসকে নির্মূল করার উদ্যোগ নেন। এবার পরিস্থিতি পালটে যাওয়ায় আরাফাত নিজেই জর্ডান সফর করেন। তারপর বাদশাহ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার। শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে দেখা করার পর ইয়াসির আরাফাত একটি বিবৃতি দেন। যেখানে তিনি দাবি করেন, শেখ ইয়াসিন বলেছেন– তিনি অসলো-চুক্তি মেনে নিয়েছেন এবং পিএলও যে প্রক্রিয়ায় শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছে, এর ওপরও তার আস্থা আছে। শেখ ইয়াসিন ও ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে বৈঠকের সময় মুসা আবু মারজুকও উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে মারজুককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, শেখ ইয়াসিন এই ধরনের কিছুই বলেননি। হামাসের ভেতরে নীতি নিয়ে মতবিরোধ আছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা মিডিয়ায় কয়দিন খুব প্রচারণা চলে। তারা হামাসের মধ্যে কট্টরপন্থি ও উদারপন্থি দুটি গ্রুপও আবিষ্কার করে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী– নমনীয় ও বাস্তববাদী ধারাটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ ইয়াসিন আর কট্টরপন্থি ধারাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন খালিদ মিশাল।

যাই হোক, দলের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিনকে মুক্ত করাতে যদিও হামাস বাদশাহ হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, তবে গোটা পরিস্থিতি এবং প্রক্রিয়াতে হামাসের জর্ডানস্থ নেতৃবৃন্দ বেশ বিস্মিতও ছিলেন। কারণ, শেখ ইয়াসিনকে মুক্ত করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো পরামর্শ করা হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। ইজরাইল হুমকি দেয়– যদি আটক দুই এজেন্টকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে তারা শেখ ইয়াসিনকে কখনোই গাজায় ফিরতে দেবে না। হামাসকে না জানিয়ে বাদশাহ হোসেন নিজেই এই চুক্তিটি নিয়ে কাজ এবং ইজরাইলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ইজরাইলের কাছে সুপারিশ করেছিলেন, যাতে ইজরাইলে আটক আরেক শীর্ষ হামাস নেতাকেও মুক্তি দেওয়া হয়। ইজরাইল অবশ্য সন্ত্রাসের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে তার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

৫ অক্টোবর ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকার একটি প্রেস রিলিজ ইস্যু করে। যেখানে তারা প্রথমবারের মতো জর্ডানে হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যা প্রচেষ্টার বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করে। সেই বিবৃতিতে অবশ্য তারা দাবি করে, ইজরাইলি জনগণকে নিরাপদে রাখা তাদের প্রধান দায়িত্ব

এবং তারই অংশ হিসেবে তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সন্ত্রাসের সাথে তারা কোনোরূপ আপস করবে না বলেও সেই বিবৃতিতে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, এই পরিকল্পনাটি মোসাদ করলেও গোটা মিশনটি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নিজেই অনুমোদন করেন। এ রকম একটি ঘটনা *টাইমস অব লন্ডন* পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ইজরাইলি কর্মকর্তারা ক্রুদ্ধ হন। তারা দাবি করেন– মোসাদ এই ধরনের অপারেশন পরিচালনায় বরাবর আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু নেতানিয়াহু নিজেই মোসাদকে চাপ দিয়ে এটি করিয়েছেন। *টাইমস*-এর সেই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, ইজরাইলে কয়েক দফা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নেতানিয়াহু খুবই ক্ষীপ্ত ছিলেন। তাই তিনি হামাসের নেতাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। হত্যা প্রচেষ্টায় কে মরবে, কীভাবে মারা হবে– এটা নিয়ে তার তেমন একটা মাথাব্যথাও ছিল না।

ইজরাইলি পার্লামেন্টের তৈরি করা একটি তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ইয়াতোম জানিয়েছিলেন, খালিদ মিশালকে হত্যার প্রচেষ্টার সাথে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তদন্ত কমিশনের কাছে ইয়াতোম আট ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্য দেন। তিনি এই মিশনের ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করেন। তিনি দাবি করেন, মোসাদের পরামর্শ বা সুপারিশের বাইরে গিয়ে এই কাজটি করার জন্য নেতানিয়াহু আদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন বরাবর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। তবে ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইতজহাক মোরদেচাই এবং শিন বেটের বলেছিলেন– মিশাল হলেন উপযুক্ত টার্গেট।[৯৭] ইজরাইলি টেলিভিশনের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ইয়াতোম সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় খুবই বিরক্ত ছিলেন! কারণ, এই অপারেশনটি পরিচালনা করবে তার টিম; অথচ অপারেশনের টার্গেট ঠিক করাসহ গোটা কৌশলই নির্ধারণ করে দিচ্ছিল বাইরের কিছু লোক।

যাই হোক, মোসাদের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ব্যর্থ এবং বিব্রতকর হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কমিটি সব ধরনের দায় থেকে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে মুক্তি দেয়। তারা এই অপারেশনের পেছনে কার কী দায়, তা নিয়ে খুব একটা পর্যালোচনা না করে বরং অপারেশন কেন ব্যর্থ হলো এ নিয়েই অনুসন্ধান করে। তদন্ত কমিটি এই অপারেশনকে অপরিপক্ক হিসেবে আখ্যায়িত করে। মোসাদপ্রধান ইয়াতোম সব ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করলে ২৪ ফেব্রুয়ারি নেতানিয়াহু তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

---

৯৭. মিশালকে টার্গেট করার এই বিষয়টি নিয়ে বিবিসিতেও একটি প্রতিবেদন প্রচার হয়। সেই নিউজের লিংক আছে রেফারেন্স ৪৭-এ।

উল্লেখ্য, ড্যানি ইয়াতোমের পদত্যাগের পর জর্ডান সরকার বিবৃতি দিয়ে এই ঘটনাকে স্বাগত জানায়। জর্ডানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাওয়াদ আল আনানি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ইয়াতোমের ঘটনার পর ইজরাইল ও জর্ডানের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। আনানি ইজরাইলি এক রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, জর্ডান সরকার মনে করে নেতানিয়াহু সম্পূর্ণ নির্দোষ। ইয়াতোমের পদত্যাগের পর ইজরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা আবারও সঠিক পথে হাঁটবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। এমনকী জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার সাথে ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতামূলক কার্যক্রম খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে তিনি আশা করেন। উল্লেখ্য, মিশালের ওপর হামলার পর জর্ডানের বাদশাহ মোসাদের সাথে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ইজরাইলি পার্লামেন্ট কমিটি খালিদ মিশালকে হত্যার বিষয়টিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনাই করেনি। কারণ, তাদের চোখে খালিদ মিশাল হলেন হামাসের শীর্ষ নেতা। আর হামাস হলো সেই সংগঠন, যারা কিনা অসংখ্য ইজরাইলি নাগরিককে হত্যা করেছে। তাই এ হত্যা প্রচেষ্টার নেপথ্যের নায়ক নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না; বরং তারা মতামত দেন– অপারেশনটির গোপনীয়তা রক্ষা করা গেলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের মন্ত্রীপরিষদ সচিব এক সাক্ষাৎকারে বলেন– খালিদ মিশালকে হত্যার প্রচেষ্টাটি ছিল পুরোপুরি ন্যায্য এবং যৌক্তিক। কারণ, সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের জান ও মালকে হেফাজত এবং সেই লক্ষ্যে আপসহীনভাবে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা। তিনি দাবি করেন, ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই এবং ৪ সেপ্টেম্বর সংঘঠিত বোমা হামলার মূল নির্দেশদাতা ছিলেন এই খালিদ মিশাল।

ইজরাইল এই হত্যা প্রচেষ্টার পুরো দায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করার পরও জর্ডান কর্তৃপক্ষ আটক হওয়া মোসাদের ওই দুই এজেন্টকে ছেড়ে দেয়। এই ব্যাপারে জর্ডান সরকার জানায়– 'এই দুই এজেন্ট যে খালিদ মিশালকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সে বিষয়ে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর সেই কারণেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই তারা জর্ডান ত্যাগ করেছে।' এর পরপরই ১৯৯৭ সালের ৬ অক্টোবর আম্মান থেকে দুটি হেলিকপ্টার উড়ে যায়। এর একটি আল হোসেন মেডিকেল সেন্টার থেকে, যাতে চড়ে শেখ ইয়াসিন গাজায় ফিরে যান। আরেকটি হেলিকপ্টার জর্ডানের গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে থেকে, যেটাতে মোসাদের দুই এজেন্ট তেলআবিবে চলে যায়। চুক্তি অনুযায়ী সেদিন ইজরাইলের বিভিন্ন কারাগার থেকে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের ৪০ জন বন্দিকেও

মুক্তি দেওয়া হয়।[৯৮] অবশ্য কয়েকজন হামাস নেতা মনে করেছিলেন– যদি জর্ডান আরেকটু তৎপর হতো, তাহলে আরও বেশি হামাস নেতা-কর্মীকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, মোসাদের দুই এজেন্টকে বিচার না করে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি, তবে অধিকাংশই মনে করেন– যে পরিমাণ সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলের মাধ্যমে বাদশাহ এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

বাস্তবতা হলো, বাদশাহ হোসেন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই এই কাজটি করেছিলেন। অবশ্য ক্ষুব্ধ হওয়ার বেশ কিছু কারণও ছিল। প্রথমত, বাদশাহ হোসেন চেয়েছিলেন সকল মহলই যেন এটা বুঝতে পারে, জর্ডান কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জর্ডানের মাটিতে এভাবে খালিদ মিশালকে হত্যার চেষ্টা ঘোরতর অন্যায়। মিশাল জর্ডানের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। তাই তার ওপর এই ধরনের হামলার মাধ্যমে জর্ডানের সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তা ছাড়া জর্ডান সরকারের সঙ্গে হামাসের যে চুক্তি হয়েছিল, মিশাল তার আলোকেই জর্ডানে বসবাস এবং কাজকর্ম করতেন। সেই চুক্তির বাইরে গিয়ে মিশাল কখনোই কিছু করেননি। আর হোসেন ঠিকই বুঝেছিলেন, তার অনুরোধেই শেখ ইয়াসিনকে ছেড়েছে, যাতে জর্ডানের সঙ্গে ইজরাইলের সম্পর্কের টানাপোড়েন কিছুটা হলেও ঘুচে। তা ছাড়া বাদশাহ মনে করতেন শেখ ইয়াসিন মুক্ত থাকলে তিনি হামাসকে নমনীয় ও শান্ত রাখতে পারবেন। কারণ, তিনি যতদিন জেলে ছিলেন, ততদিন হামাস সহিংস হয়ে উঠছিল এবং তার মুক্তিসহ নানান দাবিতে সহিংস কার্যক্রম চালিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বাদশাহ ভেবেছিলেন– যদি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা না রাখতেন, তাহলে খালিদ মিশালের হত্যা প্রচেষ্টার মতো আরও কিছু ঘটনা জর্ডানে ঘটত। আর তাতে স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে জর্ডানের ভাবমূর্তিকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করত। তার দেশ যেন কোনোভাবেই হামাস ও ইজরাইলের মধ্যে সংঘাতের বলির পাঁঠা না হয়, তিনি তা-ই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, তিনি অনুমান করেছিলেন, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে জর্ডানের সঙ্গে ফিলিস্তিনের বিদ্যমান সম্পর্ক সংকটের মুখে পড়তে পারে। আর এমনটা হলে

---

[৯৮]. ভিন্ন একটা দেশে গিয়ে এই ধরনের জঘন্য হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়ে ধরা পড়ার পরও ইজরাইল যেভাবে তার এজেন্টদের মুক্ত করে নিয়ে গেল, সেটা কূটনৈতিক ও ভিশনারি হিসেবে ইজরাইলের সক্ষমতাই প্রমাণ করে। এই ঘটনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জোনাথন পোলার্ড সে কারণেই মন্তব্য করেছিলেন, ইজরাইল দেখিয়ে দিয়েছে তার এজেন্টরা কোনো অন্যায় করে ধরা পড়লেও কীভাবে তাদের বের করে নিয়ে যেতে হয়। রেফারেন্স ৪৮-এ।

যেকোনো মুহূর্তে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭০ সালের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে জর্ডানের সাথে পিএলও একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বলিষ্ঠ এবং কৌশলী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাদশাহ হোসেন সেই যাত্রায় জর্ডানকে নানামুখী সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেইসঙ্গে আল বাত্তিখির ভূমিকার কারণে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মিশালের হত্যা প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত ছিল বলে যে গুজব ছড়িয়েছিল, বাদশাহর ভূমিকার কারণে সেগুলো ডালপালা মেলতে পারেনি। কারণ, মিশাল আক্রান্ত হওয়ার পর হামাস এটাকে পরিকল্পিত হত্যার প্রচেষ্টা হিসেবে দাবি করলেও আল বাত্তিখি কোনো ধরনের পর্যালোচনা ছাড়াই তা নাকচ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি বেশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়ার পর খালিদ মিশাল জীবন্ত শহিদ হিসেবে স্বীকৃত পান এবং তিনি অনেকটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হামাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হন। পাশাপাশি মুসা আবু মারজুকেরও একটা ভালো অবস্থানে আসার কথা ছিল। তবে এই ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে মিশালকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হামাস মানেই খালিদ মিশাল। এমনকী শেখ ইয়াসিন তখন জীবিত ও কারাবন্দি থাকলেও খালিদ মিশাল তখন আলোচনা ও আগ্রহের মূল ফোকাসে চলে আসেন।[৯৯]

খালিদ মিশালের চিকিৎসা

'৯৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের সে দিনটিতে বাদশাহ হোসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাছে কয়েকটি দাবি জানান। বাদশাহ বললেন– মিশালকে যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার প্রতিকারের ওষুধ পাঠাতে হবে এবং বিষটির ধরন সম্পর্কে জানাতে হবে। হোসেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন– মিশাল যদি মারা যায়, তাহলে একই সঙ্গে জর্ডান ও ইজরাইলের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি রয়েছে, সেটারও মৃত্যু ঘটবে।

নেতানিয়াহু গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে আম্মানে ঘাতক পাঠালেও এই মিশন ইজরাইলের জন্য রেড সিগন্যাল হিসেবে প্রমাণিত হয়। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন এতদিন ঘোর 'পাশ্চাত্যপন্থি' হিসেবে সমালোচিত হতেন। এমনকী ১৯৭০ সালে জর্ডানে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে জর্ডান সেনাবাহিনীর হামলায় বহু ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল। তখন ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) তল্পিতল্পা গুটিয়ে জর্ডান ছাড়তে বাধ্য হয়। আবার সেই বাদশাহ হোসেনই ফিলিস্তিনি নেতা

---

[৯৯]. খালিদ মিশাল এবং তার হত্যা প্রচেষ্টা নিয়ে আরও বেশ কিছু সূত্র দেওয়া আছে রেফারেন্স ৪৯, ৫০, ৫১ এবং ৫২-তে।

মিশালের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, আম্মানে ইজরাইলি দূতাবাস ঘেরাও করতে। কারণ, তার ধারণা মোসাদের কিলিং মিশনের খুনিরা সেখানে লুকিয়ে আছে।

এ দিকে খালিদ মিশাল তখন আম্মানের হোসেন মেডিকেল সিটি হসপিটালে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন। ডাক্তাররা বুঝতে পারছিল না, তাকে কী ধরনের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা এই উপসংহারে উপনীত হন, মিশালকে যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা মরফিন ও আফিমজাতীয়। এটা চেতনা নাশ করে এবং ব্যক্তিকে মন্থর গতিতে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

বাদশাহ হোসেনের মতো মিত্রের আকস্মিক ক্রুদ্ধ ও কঠোর পদক্ষেপের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তীব্র অসন্তোষ যোগ হয়ে ইজরাইলকে দারুণ বেকায়দায় ফেলে দেয়। মিশাল মারা গেলে ইজরাইলের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে ভেবে তড়িঘড়ি করে খোদ মোসাদপ্রধান ড্যানি ইয়াতোম আম্মানে ছুটে যান। তিনি বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ক্ষুব্ধ হোসেন তাকে ধমক দিয়ে দুকথা শুনিয়ে দেন। স্মরণীয় ও অভাবনীয় একটি ঘটনা হলো– যে মোসাদ খালিদ মিশালকে বিষ প্রয়োগ করেছিল, সেই মোসাদপ্রধানকেই আবার মিশালকে বাঁচানোর ওষুধ নিয়ে আম্মানে ছুটে যেতে হয়েছিল।

মোসাদের হামলার পর থেকে খালিদ মিশাল ছিলেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। যথাসময়ে প্রতিষেধক প্রয়োগ করায় দুদিন পর ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি 'কোমা' অবস্থা থেকে ফিরতে থাকেন। বাদশাহ হোসেনের দৃঢ়তা না থাকলে মিশাল তো মৃত্যবরণ করতেনই; এর সাথে আরব-ইজরাইল সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই ঘটে যেত।

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– মিশালের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে জর্ডান ও ইজরাইলের মধ্যে এত বৈঠক ও আলোচনার খবর মিডিয়া বা সাংবাদিকরা কিছুই জানতে পারেনি। বাদশাহ হোসেন ইজরাইলকে বলেছিলেন– 'বিষ দিয়েছ তোমরা, বিষয় ক্ষয়ও করতে হবে তোমাদেরই।' মিডিয়া এটাও বুঝতে পারেনি।

'মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া' ইজরাইল হামাস নেতাকে বিষ দিয়ে মারতে গিয়ে চড়া মাশুল দেয়। গোয়েন্দা ও গুপ্তঘাতক বাহিনী মোসাদ বিশ্বে সিআইএ এবং (সাবেক) সোভিয়েত কেজিবির মতোই ভয়ংকর হিসেবে পরিচিত হলেও মিশালের ঘটনায় মোসাদ সম্পর্কিত মিথ একটা বড়ো রকমের ধাক্কা খায়।

ব্যর্থ অভিযানের পর সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে ইজরাইলি মিডিয়া তীব্র সমালোচনা করে। কারণ, মিশালকে শেষ করতে গিয়ে ইজরাইলের নিজের দম্ভই শেষ হওয়া শুরু করে। কৃত্রিম, বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দেশটির অবমাননা ঘটে দুভাবে।

১. আটক না করেই হামাস নেতা হত্যার মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; অথচ এটা ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর খায়েশ।
২. সে সময়ে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় হামাসের খোদ প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

খালিদ মিশাল সুস্থ হয়ে চলে যান সিরিয়ায়। সেখানেও কয়েক বছর আগে মোসাদ তাকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। মিশাল এখন কাতারে অবস্থান করছেন। কাতার থেকে তিনি একবার নিজ জন্মভূমি গাজাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাজায় নেমেই এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন– 'আজ আমি তৃতীয়বারের মতো জীবন ফিরে পেলাম। জর্ডানে যখন মোসাদ আমাকে হত্যায় ব্যর্থ হয়, তখন একবার আমি জীবন ফিরে পেয়েছিলাম। এরপর সিরিয়ায় যখন ওরা আবার ব্যর্থ হলো, তখন আমি দ্বিতীয়বার বেঁচে গেলাম।'

এখানে উল্লেখ করার বিষয়– '৯৭ সালে হামাস নেতা মিশাল হত্যা চেষ্টায় ইজরাইল যেমন নিন্দা কুড়িয়েছিল, তেমনি হামাসের ক্রমশ উত্থান ঘটেছে। এর কয়েক বছর পর মাত্র একমাসের ব্যবধানে হামাসের দুজন শীর্ষ নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও আব্দ-আল আজিজ রানতিসি ইজরাইলি হামলায় শহিদ হন। তারপরও হামাসের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

মোসাদের গুপ্তহত্যা

ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার ইতিহাসই হলো গুপ্তহত্যার ইতিহাস। যারা মোসাদের ইতিহাস, ট্র্যাক রেকর্ড জানেন, তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন। এই গুপ্তহত্যার বিষয়টি কিছুটা আড়ালে থাকলেও মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এক ফিলিস্তিনি অধ্যাপক ফাতিহ আল বাতস এবং এক স্থানীয় ইমামকে প্রকাশ্য গুলি করে হত্যা করার মাধ্যমে বিষয়টি আবারও সামনে আসে।

ফাতিহ আল বাতস পাওয়ার সিস্টেম এবং বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলও লিখেছিলেন, যা প্রসিদ্ধ কিছু জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিষয়টা মোসাদ কোনোভাবেই সহ্য করেনি।

হামাস প্রকৌশলী ফাতিহকে নিজেদের সক্রিয় কর্মী হিসেবে দাবি করে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মোসাদকে দায়ী করেছে। মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় ফাতিহর পিতাও মোসাদের দিকে আঙুল তাক করেছেন।

ইজরাইলের অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক রনেন বার্গম্যান বলেছেন– 'ফাতিহকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার ধরনটি অতীতে মোসাদের বেশ কয়েকটি গুপ্ত হত্যার ধরনের সাথে মিলে যায়। যেমন : এ সময় খুনিরা যে ধরনের মোটর সাইকেল ব্যবহার করেছে, এর আগেও নানা হত্যাকাণ্ডে এ রকম মোটরসাইকেল ব্যবহার করেছে। আর ইজরাইলের বাইরে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড চালানো মোসাদের জন্য নতুন কিছু নয়।'

টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত

যেকোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার আগে মোসাদ তার ব্যাপারে অনেকগুলো প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনা করে। মোসাদের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে এই পর্যালোচনা করার মতো সুযোগ ও পর্যাপ্ত জনশক্তি রয়েছে। অনেক সময়ে ইজরাইল তাদের সামরিক ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে পাঠায়, যাতে তারা সঠিক ব্যক্তিকে চিনতে পারে। তা ছাড়া এই ধরনের কাজ করার জন্য গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইজরাইলের গুপ্তচরও নিয়োগ করা আছে। ফাতিহ আল বাতস যেহেতু হামাসের কর্মী, তাই হামাসের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে মোসাদ তাকে সনাক্ত করতে পারে। উল্লেখ্য গাজা, তুরস্ক বা বৈরুতে থাকা হামাস নেতারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে ক্ষেত্রে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেই মোসাদ তা সহজেই সনাক্ত করতে পারে।

হত্যার প্রক্রিয়া

যখনই আল বাতসের মতো ব্যক্তিদের টার্গেট করা হয়, তখন মোসাদ এর পরের ধাপের কাজগুলো শুরু করে। টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে নিয়ে তারা কী করবে, তা নিজেদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলোচনা করে। তাকে কি হত্যা করা হবে? করলে কীভাবে হত্যা করা হবে? হত্যা করলে কতটা ফায়দা হবে ইত্যাদি।

যখন মোসাদের বিশেষজ্ঞ টিম এই কাজটি সম্পন্ন করে, তখন তারা পুরো কাজের প্রতিবেদন মোসাদের সদর দফতরে পাঠিয়ে দেয়। মোসাদপ্রধান নিজেই সেই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত দেন। যদিও এসব সিদ্ধান্তের কোনো বৈধ বা আইনগত অনুমোদন থাকে না। শেষ পর্যন্ত ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নিজে অপারেশন পরিচালনার চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করেন।

তবে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বা আইনি জটিলতা থেকে বাঁচার জন্য ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী নিজে এককভাবে সিদ্ধান্ত না দিয়ে আরও দু-একজন সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হওয়া মাত্রই মোসাদ তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা শুরু করে। অনেক সময় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সপ্তাহ, মাস এমনকী বছরও লেগে যায়।

কায়েসারা ইউনিট

কায়েসারা হলো মোসাদের একটি গুপ্ত শাখা, যারা আরব বিশ্বসহ গোটা পৃথিবীতে গুপ্তচর নিয়োগ দেয়। এই শাখাটি ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইজরাইলের নামকরা গুপ্তচর মাইক হারারি।

আরব বিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় কায়েসারা ইউনিটের কার্যক্রম আছে। এই ইউনিটের মাধ্যমে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

হারারি কায়েসারা ইউনিটের অধীনে একটি আততায়ী শাখা চালু করে, যার নাম কিডন। হিব্রু শব্দ কিডন-এর অর্থ বেয়োনেট। কিডোন ইউনিটকে মূলত ভয়ংকর ইউনিট হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এই ইউনিটের আওতায় বেশ কিছু পেশাদার খুনি রয়েছে, যারা গুপ্তহত্যা এবং স্যাবোটেজ অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম। ইজরাইলের সামরিক বাহিনী এবং স্পেশাল ফোর্স থেকে বাছাইকৃত সদস্যদের কিডন ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মোসাদ যে শুধু ফিলিস্তিনি নেতা-কর্মীকেই হত্যা করে তা নয়; সংস্থার প্রয়োজনে তারা সিরিয়ান, লেবানিজ, ইরানি এমনকী ইউরোপীয় নাগরিককেও হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

কিলিং অপারেশন

কায়েসারা ইউনিটকে আমেরিকার সিআইএ'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। ২০০০ সালে ফিলিস্তিনে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা সংঘঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইজরাইল কায়েসারা ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৫০০টি গুপ্তহত্যার অপারেশন পরিচালনা করে, যাতে ১ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়। এর মধ্যে টার্গেটকৃত ব্যক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সাধারণ পথচারীরাও।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলার সময় ইজরাইল আরও ১ হাজারটি অপারেশন পরিচালনা করে, যার মধ্যে ১৬৮টি সফল হয়। আর এরপর থেকে আজ অবধি গাজা উপত্যাকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হামাস নেতা-কর্মীদের হত্যার জন্য ইজরাইল আরও আটশো অপারেশন পরিচালনা করেছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

আরব আর মোসাদের যোগসূত্র

মোসাদের সাথে ঐতিহাসিকভাবে বেশ কিছু আরব গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ আছে। বিশেষ করে জর্ডান এবং মরক্কোর গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তাদের কাজের অংশীদারিত্ব রয়েছে। বর্তমানে গালফ অঞ্চলের দেশ এবং মিশরের সঙ্গে মোসাদ তাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে মোসাদ যে কাজগুলো পরিচালনা করে, তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জর্ডানের রাজধানী আম্মানে দীর্ঘদিন ধরে পৃথক একটি কার্যালয়ও আছে।

১৯৯৭ সালে মোসাদ যখন হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল, তারপর কিছুদিনের জন্য তৎকালীন জর্ডান বাদশাহ মোসাদের আম্মানস্থ শাখাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে মোসাদের সাথে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার সংযোগও বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে বাদশাহ হোসেনের ইন্তেকালের কিছুদিন পর তা আবারও চালু হয়।

আর মরক্কোর সাথে মোসাদের সম্পর্ক শুরু সেই ১৯৬০ সাল থেকে। এই সম্পর্কের জেরে মরক্কো এরই মধ্যে ইজরাইল থেকে বিপুল পরিমাণ সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছে। মরক্কোর সাবেক বাদশাহ হাসান তার দেশে থাকা ইহুদিদের ইজরাইলে অভিবাসন করার সুযোগও দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মোসাদের কার্যালয় চালুর অনুমতি দিয়েছিলেন। এরই অংশ হিসেবে রাবাতে ১৯৬৫ সালে আরব লিগের যে সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলন কক্ষে এবং ব্যক্তিগত রুমগুলোতে মোসাদ আড়ি পাতা ও গুপ্তচর নিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিল।

মোসাদ : এক দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর গোয়েন্দাসংস্থা

ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। অতি দক্ষ গোয়েন্দাদের সমন্বয়ে গড়া এই সংস্থার ক্ষীপ্রতা ও দুঃসাহিকতা, শত্রু-মিত্র উভয়ের কাছেই এক মহা বিস্ময়। মোসাদের ভয়ংকর কিছু অপারেশান কল্প-কাহিনিকেও হার মানায়। ১৯৪৯ সালে মোসাদের জন্ম হলেও ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এ তথ্য কেউ-ই জানত না, এই সংস্থার প্রধান কে অথবা কারা এটি পরিচালনা করে! ১৯৯৬ সালে যখন সাবতাইকে অপসারণ করে ড্যানি ইয়াতিমকে এই সংস্থার প্রধান নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন প্রথমবারের মতো বিশ্ববাসী মোসাদ সম্পর্কে জানতে পারে। কিডন্যাপ ও গুপ্তহত্যায় মোসাদ বিশ্বে অদ্বিতীয়। ডেভিড বেনগুরিয়ান মূলত এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। মোসাদের বেশিরভাগ সদস্যই সাবেক সন্ত্রাসী সংগঠন হাগানাহ, ইরগুন, স্টানগেগ থেকে আগত।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৮তম কম্যুনিস্ট সম্মেলনে যখন নিকিটা ক্রুশ্চেভ এক গোপন মিটিংয়ে স্টালিনকে অভিযুক্ত ও অস্বীকার করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন, তখন মোসাদ ওই বক্তব্যের এক কপি সিআই-এর হাতে তুলে দেয়।

মোসাদের কার্যক্রম উপলব্ধি করতে পারে। এই ঘটনানায় সেই প্রথম সিআইএ অভিভূত হয়। কারণ, তাদের মতো সংস্থাটি এই রকম একটি স্পর্শকাতর সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারলেও মোসাদ ঠিকই পেরেছে। পৃথিবীজুড়ে মোসাদকে সাহায্য করার জন্য অগণিত ভলেন্টিয়ার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, এরা সবাই জন্মগত ইহুদি এবং জায়োনিস্টের সমর্থক।

গুপ্তহত্যায় দক্ষ মোসাদ বেশিরভাগ সময়েই হামলার জায়গায় উপস্থিত থাকে না। তারা চেষ্টা করে স্থানীয় মাফিয়া বা সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিজেদের কাজ করে নিতে। এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব না হলেই শুধু সেখানেই মোসাদের ডেথ স্কোয়াড হাজির হয়।

আটটি ডিপার্টমেন্টের ওপর মোসাদ কাজ করে; যার মধ্যে ৫-৬টি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে অনেকে জানলেও বাকি দুই ডিপার্টমেন্টের কথা কেউ-ই জানে না। এগুলো হলো–

- কালেকশন ডিপার্টমেন্ট : এটি সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেন্ট; যারা বহির্বিশ্বে কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ অন্যান্য ছদ্মবেশে কাজ করে।
- পলিটিক্যাল অ্যাকশন এবং লিয়াজো ডিপার্টমেন্ট : এই গ্রুপটা বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বয় করে।
- স্পেশাল অপারেশন ডিপার্টমেন্ট : এই গ্রুপ স্পর্শকাতর গুপ্তহত্যায় জড়িত।
- ল্যাপ ডিপার্টমেন্ট : এই গ্রুপ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জন্য দায়ী, যাদের কাজ প্রোপাগান্ডা ও প্রতারণা করা।
- রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট : যাবতীয় গোয়েন্দা গবেষণার জন্য হলো এই গ্রুপ।

জার্মান ইহুদি ওলফগ্যাং লোটজ[১০০] মোসাদের সেলিব্রেটি গোয়েন্দাদের একজন। তিনি ১৯৩৩ সালে অভিবাসী হিসেবে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমান। হিব্রু, আরবি ও ইংলিশে পারদর্শী এই মানুষটি ব্রিটিশ বাহিনীর হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ শেষে সন্ত্রাসী সংগঠন হাগানাতে যোগ দেন এবং সেখান থেকে মোসাদে। মিশরে গোয়েন্দাগিরির জন্য এই দক্ষ মানুষটাকে বাছাই করা হয়। লোটজ মিশরে এসে তার মিশন শুরু করে। সে মিশরের এলিট ঘোড়ার রেইস খেলায় যোগ দিয়ে সেখানকার বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের সঙ্গে খাতির জমায়। তাকে দেখলেই জার্মান পরিচয় বোঝা যেত। সে দাবি করত, বিশ্বযুদ্ধের সময় সে হিটলারের জেনারেল রোমেলের পক্ষে লড়াই করেছে।

এভাবে অনেকের সঙ্গে খাতির জমানোর পর সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করে। তারপর রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে সেনাদের স্পর্শকাতর তথ্য মূল কেন্দ্রে পাঠায়। কিন্তু লোটেজের ভাগ্য খারাপই বলতে হবে। একটা পর্যায়ে মিশর

১০০. https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Lotz

তার পাঠানো সিগন্যাল ট্র্যাকিং করে তাকে ধরে ফেলে। পরে '৬৭-এর যুদ্ধে বন্দি হওয়া নয়জন মিশরীয় জেনারেলের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ফগ্যাং লোটজ মোসাদের আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মিশর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের গতিবিধি নজরে রাখত। একদিন সকালে নাশতার পর শিফট চেঞ্জের সময় ইজরাইল মিশরের ওপর হামলা করে বসে। যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকা মিশরের তিন শতেরও বেশি বিমান নিমিষেই ধ্বংস হয়। ঘুড়ে যায় যুদ্ধের মোড়। ফলে আরবরা মাত্র ছয় দিন যুদ্ধ করে অবশেষে পরাজয়বরণ করে। আরবদের এই বিপর্যয়ের পুরো কৃতিত্বই গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের।

জর্ডানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের[১০১] হত্যাকাণ্ডের পর, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নামেই এক নয়া গ্রুপ গড়ে ওঠে। জার্মানির মিউনিখে অলিম্পিক গেমস চলাকালে এরা নয়জন ইজরাইলি অ্যাথলেটকে কিডনাপ করে। ২০০ ফিলিস্তিনির মুক্তি ও নিজেদের সেইফ এক্সিট নিশ্চিত করাই ছিল তাদের প্রধান দাবি। জার্মান সরকার দাবি মেনে নিয়ে চুক্তির জন্য মিলিটারি এয়ারপোর্টে আসতে বলে। সেখানে আগে থেকেই জার্মান স্পেশাল ফোর্স তৈরি ছিল। অপহরণকারীরা যখনই বুঝতে পারে ওদের ট্রাপে ফেলা হয়েছে, তখনই সব বন্দি অ্যাথলেটদের হত্যা করে। পুলিশের পালটা গুলিতে পাঁচজন অপহরণকারী নিহত ও তিনজন বন্দি হয়।

ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এর প্রতিক্রিয়ায় মোসাদ স্পেশাল টিম গঠন করে অপারেশান রথ অফ গড ঘোষণা করে। পুরো ইউরোপজুড়ে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের সদস্যদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়। ৭২ হতে ৭৩ পর্যন্ত এই গুপ্তহত্যার কাজ চলতে থাকে। পিএলও'র নেতারা প্রায় দিশা হারানোর উপক্রম। ইউরোপজুড়ে এই হান্টিং ডাউনে মোসাদ ভুলক্রমে নরওয়েতে এক নিরীহ মরোক্কান ওয়েটারকে হত্যা করে। ফলে নরওয়ের পুলিশ ছয়জন মোসাদ এজেন্টকে গ্রেফতার করে।

১৯৭৬-এর জুনে ফ্রান্স হয়ে ইজরাইলগামী এক বিমানকে ফিলিস্তিনিরা হাইজ্যাক করে উগান্ডায় নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন দাবি পেশ করতে থাকে। ইজরাইলি নাগরিক ও হোস্টেজদের উদ্ধার করতে মোসাদ ইজরাইলি কমান্ডো সাথে নিয়ে অপারেশান থান্ডারবোল্ট নামে অভিযান পরিচালনা করে। ওই অভিযানের ক্ষিপ্রতা এত বেশি ছিল যে, মাত্র ৯০ মিনিটে প্রায় সব বন্দিদের উদ্ধার করা হয়।

মোসাদ ঘনিষ্ঠ মিত্র আমেরিকাকেও ছেড়ে কথা বলেনি। একটি উদাহরণ দিই। জোনাথন পোলারড আমেরিকার নৌ-বাহিনীতে চাকরি করত। মূলত সে ছিল মোসাদের এজেন্ট।

---

[১০১]. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_September

সে আমেরিকার মিলিটারির অনেক গোপন দলিলপত্র চুরি করে ইজরাইলে পাচার করত। ইজরাইল ওইসব দলিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম হাসিল করে নিত। একদিন পোলারড ধরা পড়ে এবং আদালতের মাধ্যমে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুধু পোলারড নয়; অনেক আমেরিকানই ইজরাইলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করত।

বলা হয়, মনিকা লিউনেস্কি ও ক্লিনটনের ফোনে আড়িপাতার কাজ ওরাই করেছিল। আশির দশকে অনেক ইরাকি নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্টকে মোসাদই হত্যা করে। ইজরাইলের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিপি লিবনি ছিলেন ওই সময়কার লেডি স্পাই ফর মোসাদ।

২০০৩-এর ইরাক যুদ্ধের পর মোসাদ ইরাকের অনেক সাইন্টিস্ট ও একাডেমিয়ানকে হত্যা করেছে। ২০০৩-সালের পর থেকে মোসাদ পুরো ইরাকজুড়ে জাল বিছিয়ে রেখেছে। আবু গারিব কারাগারের ইনচার্জ বিবিসির এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'আবু গারিব কারাগারের বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের কাজটি ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা করত।'

কানাডার গেরাল্ড ভিনসেন্ট বুল[১০২] নতুন এক ধরনের অগ্নোয়াস্ত্র তৈরি করেন। নাম দেন সুপারগান। তার এই অস্ত্রের ব্যাপারে প্রথম দিকে কেউ-ই সাড়া দেয়নি। পরে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ওই প্রোজেক্টের দিকে নজর দেন, যা 'প্রোজেক্ট ব্যবিলন' নামে পরিচিত। ওই সুপারগান দিয়ে ইজরাইলে হামলা করা যাবে– সাদ্দাম হোসেন এমনই মনে করত। এই খবর জেনে যায় ইজরাইল। তারা এই অস্ত্র এবং ভিনসেন্ট বুলের ব্যাপারে পর্যালোচনা করে। তারা কানাডার এই বিজ্ঞানীকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে নেয়। কাজ শুরু করে মোসাদের ডেথ স্কোয়াড। তারা ভিনসেন্ট বুলকে হত্যা করতে কয়েকটা বুলেট খরচ করে।

২০১০-এর জানুয়ারিতে মোসাদ হামাস লিডার মাহমুদ আল মাবুহকে দুবাইয়ের রোটানা হোটেলে হত্যা করে। এই মিশন সফল করতে বিভিন্ন দেশ থেকে মোসাদের এজেন্টরা দুবাইতে আসে। দুবাইয়ের পুলিশ জানায়, এই হত্যায় ২৭ জন মোসাদ এজেন্ট অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নানা দেশ থেকে এসব এজেন্টরা এসে হত্যা অভিযান শেষ করে দুবাই থেকে বেরিয়ে যেতেও সক্ষম হয়; অথচ দুবাইয়ের গোয়েন্দারা ঘুণাক্ষরে টেরও পায়নি।

---

১০২. https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Bull

অধ্যায়-৮

জর্ডানের সাথে আর হলো না

ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া প্রায় দেড় বছর স্থগিত ছিল। এই অবস্থায় ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে ওয়াই নদীর তীরে ঐতিহাসিক 'ওয়াই রিভার সামিটে' ইয়াসির আরাফাত ও বেনজামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। নয় দিন ধরে আলোচনা চলার পর ২৩ অক্টোবর তারা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির পেছনে মূল মধ্যস্থতাকারী ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন জর্ডানের বাদশাহ হোসেন। এই বৈঠকটি ১৫ অক্টোবর শুরু হলেও ২০ অক্টোবর পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছিল না। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে দ্বিমত হচ্ছিল, যা কোনোভাবেই সমাধান করা যাচ্ছিল না। ইজরাইলের অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন ইয়াসির আরাফাতের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে, যাতে তিনি তথাকথিত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু আরাফাতকে কোনোভাবেই টলানো যাচ্ছিল না।

আলোচনাটি আবার না ভেস্তে যায়, সেই আশঙ্কায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের শরণাপন্ন হয়ে তার কাছে সাহায্য চাইলেন। বাদশাহ হোসেন অবশ্য সেই বছরের জুলাই থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার মায়ো ক্লিনিকে তার ক্যানসার চিকিৎসার জন্য কেমোথেরাপি নিচ্ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করতেন, জর্ডানের বাদশাহ চেষ্টা করলে একটা ভালো ফলাফল আসতে পারে।[১০৩] হলোও তাই।

---

১০৩. এ ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রেস স্টেটমেন্ট রয়েছে, যা এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। রেফারেন্স নং ৫৩।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও ইয়াসির আরাফাত তার দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসীদের দমনে আরও কঠোর হওয়া এবং সব ধরনের অবৈধ অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে একমত হলেন। আর অন্যদিকে ইজরাইল পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ জায়গা ছেড়ে দিতে এবং কয়েকশো বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে একমত হলো। একই সঙ্গে তারা গাজাস্থ ফিলিস্তিনি বিমানবন্দর চালু করতে এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকরা যাতে অবাধে গাজা ও পশ্চিম তীরের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে একমত হলো।[১০৪]

জর্ডান এই আলোচনার সফলতাকে নিজেদের অর্জন বলে দাবি করল। গোটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়াটিকে তারা বাদশাহ হোসেনের একক কৃতিত্ব হিসেবে উদ্‌যাপন করে, কিন্তু হামাস এই চুক্তির ব্যাপারে নেতিবাচক প্রক্রিয়া দেখাল। তারা বলল, এই চুক্তি ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ভেতর আরও সংঘাত বাড়াবে। হামাসের এই প্রতিক্রিয়া জর্ডান প্রশাসন মোটেও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেনি।

বিশেষ করে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মন্তব্যে বাদশাহ হোসেন বেশ ধাক্কা খেলেন। কারণ, বাদশাহ হোসেন আশা করেছিলেন শেখ ইয়াসিন হয়তো ততটা কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না, কিন্তু হলো উলটো। শেখ ইয়াসিন স্পষ্টভাবে ওয়াই নদীর এই আলোচনা এবং চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি এই চুক্তিকে এক ধরনের প্রতারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করলেন, এই আলোচনা থেকে ফিলিস্তিনিরা যা পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশি। এই চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হামাসের ওপর যদি কোনো নিপীড়ন চালানো হয়, তার পরিণতি খুব ভালো হবে না বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করেন।

এই প্রতিক্রিয়া জর্ডানস্থ হামাসের জন্য বেশ বাজে একটি পরিস্থিতি তৈরি করল। এমনিতেও বিগত কয়েক বছর ধরে জর্ডান প্রশাসন এবং হামাসের মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন চলছিল। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও আম্মানে বসবাসরত কিছু হামাস নেতাকে শায়েস্তা করার জন্য জর্ডানকে ওপর চাপ দিচ্ছিল। তাদের অভিযোগ, এই নেতাদের কারণেই তারা পশ্চিম তীর ও গাজা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে যখন শেখ ইয়াসিন আরব ভ্রমণ করছিলেন, তখন ইয়াসির আরাফাত জর্ডানস্থ হামাস নেতাদের বিরুদ্ধে বাদশাহ হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন। এরপর বাদশাহ হোসেন জর্ডানের প্রধানমন্ত্রীকে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। বাদশাহ অভিযোগ করেন,

১০৪. এই সমঝোতাটি ওয়াই রিভার মেমোরেন্ডাম নামে পরিচিত। এর বিস্তারিত জানতে গেলে রেফারেন্স নং ৫৪-তে দেওয়া লিংক দেখতে পারেন।

ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করে মিডিয়াগুলো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আর জর্ডানের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায়। জর্ডানের বাদশাহ ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই ধরনের চিঠি চালাচালির ঘটনায় বোঝা যায়– জর্ডান সরকার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে ফিলিস্তিনের জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়েছে।

নিজেদের আয়োজনে ইজরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার পর জর্ডান প্রশাসন আম্মানে অবস্থানরত হামাস নেতাদের ব্যাপারে নড়েচড়ে বসে। তারা ফিলিস্তিনের মাটিতে হামাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চায়, আর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই সুযোগটি বেশ ভালোই কাজে লাগায়।

জর্ডান তার আগের অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছিল। বাদশাহ হোসেন জর্ডানের প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে শুধু জর্ডানে বসবাসরত হামাস নেতাদের কণ্ঠস্বরকেই থামিয়ে দেওয়া নয়; একই সঙ্গে হামাসের নেতাদের আশ্রয় দেওয়ার পেছনে যেসব প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দায়ী ছিল, তাদেরও ভর্ৎসনা করা হয়। ফলে যেসব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জর্ডান সরকারের টানাপোড়েন সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিলেন, তারা বেকায়দায় পড়ে যান।

অন্যদিকে, জর্ডানে বসবাসরত হামাস নেতারা লক্ষ করেন, তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই জর্ডান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাচ্ছে! বিশেষ করে হামাসের ব্যাপারে এতদিন যে সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা যেন হুট করেই কমা শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিটির কারণে জর্ডানের মাটিতে হামাসের কাজ করার সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করে দেয়। এটা প্রথম বোঝা যায়, যখন জর্ডানস্থ হামাসের মুখপাত্র ইবরাহিম গোসেহকে জর্ডানের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদর দফতরে ডাকা হয়। উল্লেখ্য, জর্ডানের ইখওয়ান শাখার কার্যালয়ে একটি সেমিনারে গোসেহ বক্তব্য দিয়েছিলেন। গোয়েন্দা সংস্থার উপপ্রধান সাদ খায়ের গোসেহকে এই বক্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সাদ খায়ের আগে থেকেই গোসেহর ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। কারণ, ওই সেমিনারে গোসেহ শান্তিচুক্তির ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে গোসেহ বলেন– 'ওই সেমিনারটি রুদ্ধদ্বার বলেই আমি জানতাম, কিন্তু সেখানে যে সাংবাদিক উপস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।[১০৫]

হঠাৎ করে জর্ডান প্রশাসনের এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে খালিদ মিশাল উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও ১৯৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর দামেস্ক যাওয়ার পথে জর্ডান সীমান্তে হয়রানির শিকার হন। সেখানে তাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে রাখার পরও

১০৫. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

দামেস্ক যেতে দেওয়া হয়নি। ফলে তিনি আম্মান ফিরে আসতে বাধ্য হন। সেই এক ঘণ্টা আটক থাকার সময় তার সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করা হয়। মিশাল মূলত দামেস্কে বসবাসরত হামাস নেতাদের সাথে ওয়াই চুক্তির প্রভাব ও সম্ভাব্য কর্মকৌশল নিয়ে বৈঠক করার জন্য যেতে চেয়েছিলেন। একই সপ্তাহে, জর্ডানস্থ হামাসের মুখপাত্র মুহাম্মাদ নাজ্জালকেও দেশ ত্যাগ করার সময় বাধা দেওয়া হয়। তিনি আল জাজিরাকে একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য দোহা যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই বছরের নভেম্বরে জর্ডানের স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা *আল উরদুনে* একটি সাক্ষাৎকারে খালিদ মিশাল অভিযোগ করেন, ওয়াই নদী চুক্তি স্বাক্ষরের পর জর্ডানে বসবাসরত হামাস নেতারা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যাপক হয়রানির শিকার হচ্ছেন।[১০৬] তিনি জানান– 'হামাস নেতাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি একবার জর্ডান ত্যাগ করে, তাহলে তাদের আর জর্ডানে ফিরতে দেওয়া হবে না।'[১০৭]

সেই বছরের ডিসেম্বরে দামেস্কে হামাসের একটি আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তাতে অংশ নিতে খালিদ মিশাল, ইবরাহিমম গোসেহ এবং মুসা আবু মারজুক জর্ডান বিমানবন্দরে পৌঁছান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের যেতে দেওয়া হয়নি। এই বৈঠকটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ১৪ ডিসেম্বরে গাজায় ফিলিস্তিনি জাতীয় পরিষদের একটি নির্ধারিত সম্মেলনে বিল ক্লিনটনের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিন সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ ইজরাইলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল, সেগুলো বাতিল করতে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের আহ্বান করার জন্য ক্লিনটন ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন।

এসব ঘটনা যখন ঘটছে, ঠিক তখন একটা গুজব রটে যায়– হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো জর্ডানের আম্মান থেকে তাদের সকল কর্মকাণ্ড গুটিয়ে দামেস্কে স্থানান্তরিত করতে চায়। পশ্চিম তীর থেকে প্রকাশিত *আল কুদস* পত্রিকায় কোনো সূত্রের বরাত না দিয়ে দাবি করা হয়– ইতোমধ্যেই মুসা আবু মারজুক দামেস্কে কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সিরিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেছে। আর দামেস্কের কর্মকর্তারাও হামাসকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। তবে খালিদ মিশাল এই তথ্যকে অস্বীকার করেন। জর্ডান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *আল মাজদ* পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে[১০৮] তিনি বলেন– 'আমি একজন জর্ডানি নাগরিক, তাই নিজ ভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না।'

---

১০৬. জর্ডানের স্থানীয় পত্রিকা, *আসসাবিল*। ২ নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট
১০৭. খালিদ মিশালকে উদ্ধৃত করে *আরাবিক নিউজ* ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে এই সংবাদটি প্রকাশ করে।
১০৮. ৯ নভেম্বর প্রকাশিত রিপোর্ট। *আল মাজদ*, আম্মান থেকে প্রকাশিত জর্ডানের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা

নিজেদের মধ্য সংকট

খালিদ মিশাল ছাড়া আরও অনেকে হামাসের সঙ্গে জর্ডান প্রশাসনের সম্পর্ক নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। এতে ইখওয়ানের বেশ কিছু সিনিয়র নেতা গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে শঙ্কিত হন। মিশালকে দামেস্কে যেতে না দেওয়ার পরপরই তিনি জর্ডান ইখওয়ান নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকটি হয়েছিল জর্ডান ইখওয়ানের সিনিয়র নেতা আব্দ আল মজিদ ধুনিয়াবাতের বাড়িতে। তিনি ছাড়াও বৈঠকটিতে ইখওয়ানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হেইথাম আবু আল রাঘিব এবং ইমাদ আবু দায়াহ। আর হামাসের পক্ষ থেকে ছিলেন খালিদ মিশাল, মুহাম্মাদ নাজ্জাল এবং ইবরাহিম গোসেহ। বৈঠকে হঠাৎ করে ইমাদ আবু দায়াহ হামাস নিয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন– 'ফিলিস্তিনের বাইরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হামাসের আরেকবার ভাবার সময় এসেছে। হামাসের উচিত ফিলিস্তিনের ভেতরে থেকে কাজ করা! কারণ, এখন নির্বাসনে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। নতুন নতুন পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, তা কেউ পছন্দ করুক বা না করুক। এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ার জন্য হামাসের উচিত দেশের ভেতরে থেকে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। আর জর্ডানের নাগরিক খালিদ মিশাল ফিলিস্তিনের মতো সামান্য একটি দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা জর্ডানের মানুষও আর মানতে পারছে না। তাই তাকে এটা ফয়সালা করতে হবে, তিনি কোন দেশকে গুরুত্ব দিচ্ছেন; ফিলিস্তিন নাকি জর্ডান।'

ইমাদ আবু দায়াহ একনাগাড়ে এসব কথা বলার পর উপস্থিত ইখওয়ানের অন্য নেতারা কোনো প্রতিবাদ কিংবা ভিন্ন কোনো মত-ও দিলেন না। কারণ, হামাস নেতারা বুঝতে পারল, হামাসের ব্যাপারে জর্ডান ইখওয়ানের এটাই আনুষ্ঠানিক মতামত।[১০৯] অবশ্য হামাসের জন্য বিষয়টা বড়ো ধাক্কাই ছিল। কারণ, হামাস প্রতিষ্ঠা এবং বিকশিত হওয়ার পেছনে জর্ডান ইখওয়ানের আগাগোড়া সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। সেই ইখওয়ান হামাসের ব্যাপারে এ রকম ভিন্ন অবস্থানে চলে যাবে– এটি তারা কল্পনাও করেনি। এর আগে ১৯৯০ সালে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তবে সে সময় সফল না হলেও এবার তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দেখা দিলো। কারণ, এবার ইখওয়ানের অনেকেই তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

মূলত ১৯৯৯ সালের শুরু থেকে হামাস জর্ডানস্থ ইখওয়ানের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে শুরু করে। জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক বাত্তিখি জর্ডান ইখওয়ান ও হামাসের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সফলতার মুখ দেখে।

---

[১০৯]. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

ইবরাহিম গোসেহ হামাস নেতাদের কাছে অভিযোগ করলেন, তিনি ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্টের (আইএএফ) কর্মকর্তাদের কাছে গেলে তারা অস্বস্তিতে পড়ে যায় এবং আগের মতো ভালো ব্যবহার করে না। উল্লেখ্য, আইএএফ হলো জর্ডান ইখওয়ানেরই একটি অঙ্গ সংগঠন।

অন্যদিকে আইএএফ-এর একজন কর্মকর্তা খালিদ মিশালের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন। এরই মধ্যে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক বাত্তিখি আইএএফ কর্মকর্তাদের কানপড়া দিলে– মিশাল আম্মানস্থ হামাসের অফিস থেকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। আইএএফ কর্মকর্তাদের আচরণে মনে হলো, তারা মিশালের বিরুদ্ধে বাত্তিখির অভিযোগ বিশ্বাস করা শুরু করেছে। বাদশাহ হোসেন তখন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অনেকটাই অক্ষম। আর সেই সুযোগে বাত্তিখি জর্ডানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। গুজব শোনা যায়, বাদশাহ হোসেনের পর তার ভাই যুবরাজ হাসান ক্ষমতার দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও বাত্তিখি চালে বাদশাহ হোসেনের বড়ো ছেলে যুবরাজ আব্দুল্লাহকে (বর্তমানে এই আব্দুল্লাহই জর্ডানের রাজা) ক্ষমতার চেয়ার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রগামী অবস্থানে নিয়ে আসেন। এসব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র যখন চলছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৯৯৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাদশাহ হোসেন ইন্তেকাল করেন। বাত্তিখি হয়ে যান ক্ষমতার পেছনের মূল খেলোয়াড়।

সামিহ আল বাত্তিখি ৯ নভেম্বর ২০০০ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহর আদেশে অবসরে চলে যান। তার অবসরে যাওয়ার মূল কারণ প্রধানমন্ত্রী আলি আবু আল রাঘিব। ১৯ জুন ২০০০ আলি আবু আল রাঘিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। রাঘিব অনেক আগে থেকেই বাত্তিখিকে পছন্দ করতেন না। তাদের দুজনের মধ্যে অনেক ইস্যুতে মতবিরোধও ছিল। রাঘিব ভয়ে ছিলেন, বাত্তিখি বাদশাহকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে। তাই তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই বাত্তিখিকে সরানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেন এবং সফল হন। ২০০২ সালের মার্চে বাত্তিখির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়– বাত্তিখি গোয়েন্দাপ্রধান থাকা অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে 'গ্লোবাল বিজিনেস' নামক একটি কোম্পানিকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছেন। সুবিধা পেয়ে এই কোম্পানির ম্যানেজার জর্ডানের কয়েকটি ব্যাংক থেকে ১৩০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ নিতে সক্ষম হন। বিচারে বাত্তিখির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

যাহোক, ১৯৯৯ সালের ১৭ মে অনুষ্ঠেয় ইজরাইলের জাতীয় নির্বাচনে বেনজামিন নেতানিয়াহু আবারও ইয়াহুদ বারাকের কাছে পরাজিত হন। বারাকের এই বিজয় ফিলিস্তিনি কিছু মানুষের মনে সমঝোতার ব্যাপারে নতুন আশার সৃষ্টি করে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও চাইছিল যাতে বারাকই জয়লাভ করে। কারণ, তারা মনে করত– বারাক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় খুবই আন্তরিক। সেই অবস্থাতে মার্কিন চাপ এবং ইজরাইলের কাছ থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাশা নিয়ে ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৯ সালের ৪ মে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। একদিকে ইজরাইলে বারাকের নির্বাচনে জয়লাভ, অন্যদিকে আরাফাতের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা– এই দুটি ঘটনা জর্ডানে হামাসের কার্যক্রম পরিচালনার সকল সম্ভাবনাই ধুলিসাৎ করে দেয়।

বেশ কয়েক বছর ধরে ইজরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জর্ডানের সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিল, যাতে হামাসকে জর্ডানের ভূখণ্ড ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া না হয়। তবে জর্ডান প্রশাসন এই কাজটির জন্য জর্ডানস্থ ইখওয়ানকে ব্যবহার করতে চাইছিল। সেই মোতাবেক ১৯৯৯ সালের বেশ কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে। জর্ডানের বিভিন্ন জায়গায় 'হামাস সমর্থক' নামক একটি গ্রুপের ব্যানারে পোস্টার ও প্রচারণা দেখা যায়, যেখানে জর্ডানস্থ হামাস নেতাদের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। হামাস নেতারা এই অপপ্রচারের পেছনে ইসাম আল নাজ্জারকে দায়ী করেন, যাকে ইতঃপূর্বে ইখওয়ানের সাথে দূরত্ব সৃষ্টির অপচেষ্টার অভিযোগে হামাস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে এই মিথ্যা প্রচারণার সাথে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততাও আছে বলে হামাস ধারণা করে। অপপ্রচারের মূল বক্তব্য ছিল– জর্ডানস্থ হামাসের নেতারা স্বৈরাচারী এবং ভীষণ দুর্নীতিগ্রস্ত। আরও দাবি করা হয়, হামাসের বর্তমান নেতারা তাদের অনুগামীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসছেন। তাদের অপছন্দের কাউকে কাউকে সামনে আনা হচ্ছে না। হামাস ধারণা করে– এই অপপ্রচারের সাথে যারা জড়িত, তারা একটা সময়ে ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

এই বাস্তবতা হামাস নেতাদের সাথে ইখওয়ানের আরও বেশি দূরত্বের সৃষ্টি করে। অবশেষে জুলাই মাসে, জর্ডানের সান্ধ্যকালীন পত্রিকা *আল মাসাভিয়াতে* একটি কলাম প্রকাশিত হয়।[১১০] এই কলামে দাবি করা হয়– হামাস তার কৌশল পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেছে, তাই জর্ডান থেকে তাদের খুব শীঘ্রই বের করে দেওয়া হবে।

চূড়ান্ত আঘাত

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের শেষে ইবরাহিম গোসেহকে জর্ডানের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে ডেকে নেওয়া হয়। তিনি পৌঁছার পর খুবই বিস্মিত হন! কারণ,

---

১১০. অনেকেই মনে করে, ইবরাহিম গোসেহ নিজের পরিচয় আড়াল করে এই কলামটি লিখেছেন।

গোয়েন্দা অফিসে তার সাথে অনেক বেশি বন্ধুসুলভ আচরণ করা হয়। আন্তরিক পরিবেশে জিজ্ঞাসাবাদের এক জায়গায় রীতিমতো বিস্মিত করে দিয়ে গোয়েন্দারা তাকে প্রশ্ন করে, হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতারা কেন ইরানে সফর করে না? ইরানের সাথে কি হামাসের কোনো দূরত্ব কিংবা দ্বন্দ্ব আছে?

ইরান নিয়ে কেন এত প্রশ্ন করা হলো, গোসেহ তখন তা বুঝতে পারেননি। প্রায় মাসখানেক পর বিষয়টা সবার কাছে পরিষ্কার হয়। আসলে ইরান সফরের একটি চিন্তা হামাস নেতাদের মধ্যে ছিল। আর জর্ডানের গোয়েন্দারা চাইছিল সফরটা যেন দ্রুতই হয়। কারণ, সেই সফরের সময়কে কেন্দ্র করে তাদের ভয়ানক দুরভিসন্ধি ছিল; ঘটলও তাই।

১৯৯৯ সালের ২৮ আগস্ট হামাসের তিন শীর্ষ নেতা খালিদ মিশাল, মুসা আবু মারজুক এবং ইবরাহিম গোসেহ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ইরানে যাওয়ার দুদিনের মাথায় ৩০ আগস্ট জর্ডানের নিরাপত্তা সংস্থা তাদের পূর্ব নির্ধারিত খেলা বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নামে। ওই দিন বিকেল ৩টার দিকে তারা হামাসের আম্মানস্থ বেশ কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে সেগুলো বন্ধ করে দেয়। এই অফিসগুলোতে তখন যে ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছিল, তাদের গ্রেফতার করে অফিসগুলো সিলগালা করে দেওয়া হয়।

মূলত সেদিন হামাসের ৫টি কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এর মধ্যে একটি ছিল একটি জনসংযোগ অফিস, যার নাম ছিল– কনটেমপোরারি সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কনসালটেন্সি। এই অফিসটি জর্ডান হামাসের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ নাজ্জাল ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয় কার্যালয়টি ছিল মুসা আবু মারজুকের। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের মে মাসে মার্কিন কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর মারজুক হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তৃতীয় অফিসটি জর্ডান হামাসের মুখপাত্র ইবরাহিম গোসেহ ব্যবহার করতেন। চতুর্থ অফিসটি ছিল খালিদ মিশালের, একই সঙ্গে তিনি সেখানে বসবাসও করতেন। ১৯৯৭ সালে মোসাদের হত্যা প্রচেষ্টার পর থেকে এই অফিসটিকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতেই রাখা হয়েছিল। আর পঞ্চম অফিসটি ছিল 'ফিলাসতিন আল মুসলিমাহ' নামক একটি ম্যাগাজিন পত্রিকার, যা হামাসের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছিল। এই অফিসটি হামাসের প্রচার বিভাগের মূল দফতর হিসেবে কাজ করছিল। আর এটা দেখভাল করতেন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ইজ্জাত আল রিসিক। এই ৫টি অফিসে কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র, কম্পিউটার, ডিস্ক এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলো জব্দ করা হয়। এই তল্লাশি অভিযান প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ নাজ্জাল বলেন–

'সেদিন যখন আমাদের অফিসগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়, তখন আমি বাসায়। বাসাটি নতুন নিয়েছি, তাই গোছগাছ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ইজ্জাত আল রিসিকও অফিসে ছিলেন না। দুপুরের খাবার খাচ্ছি, ঠিক এমন সময় আমার সেক্রেটারি ফোন দেয়। যেহেতু নতুন বাসা, তাই ল্যান্ডফোনের সংযোগ তখনও হয়নি। তখন সঙ্গে ছিল এমন একজনের মোবাইলে ফোন দিয়ে সেক্রেটারি আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে জানায়, জর্ডানের স্টেট সিকিউরিটি ট্রাইব্যুনালের জেনারেল প্রসিকিউটর তল্লাশি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং আমাকে সেখানে যেতে বলা হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন কেন? সেক্রেটারি জানাল, প্রসিকিউটর এবং তার দল ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে। যেহেতু অফিসটি আমার নামে, তাই আমাকে সেখানে থাকতে হবে।

সেক্রেটারির কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি যাওয়ার জন্য রেডি হয়েও একটু পিছিয়ে গেলাম। ভাবলাম, যাওয়া ঠিক হবে কি না! এরপর না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম– এটা নিছক কোনো তল্লাশি নয়; এর উদ্দেশ্য আরও মারাত্মক কিছু। তারা আমাকে দেখতে পেলেই গ্রেফতার করবে। এরপর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা একই নম্বরে ফোন দিয়ে আমার সঙ্গে বেশ খারাপ ব্যবহার করল। সে আমাকে হুমকি দিয়ে বলল– আমি না গেলে নিরাপত্তা কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অফিসটি দখলে রেখে দেবে। আমি তার কথায় ঘাবড়াইনি। কারণ, ততক্ষণে খবর পেয়েছি, আম্মানে আমাদের অন্যান্য অফিসগুলোতেও তল্লাশি চলছে। আসলে তারা আমাকে গ্রেফতার করার জন্যই বারবার যেতে বলছে। তখন না বুঝলেও পরে ঠিকই বুঝেছি। ওইদিন তাদের পরিকল্পনা ছিল হামাসের শীর্ষ ৩ নেতা (যারা ইরান সফরে ছিলেন) ছাড়া রাজনৈতিক ব্যুরোর সকল সদস্যকে গ্রেফতার এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সবাইকে জর্ডান থেকে বের করে দেওয়া। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক তারা আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিম্মি হিসেবে নিয়ে যায়। আর জর্ডানের বাইরে যারা ছিলেন, তাদের জর্ডানে না ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়।'[১১১]

৩১ আগস্ট জর্ডান কর্তৃপক্ষ হামাসের ৬ শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন ইরান সফরে আর বাকি তিনজন আম্মানে। আম্মানে থাকা তিন শীর্ষ নেতা হলেন মুহাম্মাদ নাজ্জাল, সামি খাতির এবং ইজ্জাত আল রিসিক।

১১১. তথ্যসূত্র : হামাস এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

তল্লাশির দিনই সামি খাতির গ্রেফতার হন। আর নাজ্জাল এবং ইজ্জাত আল রিসিক চলে যান আত্মগোপনে। জর্ডান প্রশাসন ঘোষণা করে, এই ছয় ব্যক্তির অপরাধ– তারা একটি অবৈধ সংগঠন পরিচালনা করছেন। সরকারের এইসব কার্যক্রমে হামাস এবং জর্ডান ইখওয়ান উভয়ই ক্রুদ্ধ হয়। গাজায় থাকা হামাসের প্রধান নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন জর্ডান সরকারের এরূপ কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা জানান।

ঘটনাগুলো ঘটল তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটের মধ্যপ্রাচ্য সফরের কয়েকদিন আগে। শেখ ইয়াসিন জর্ডান প্রশাসনের এই দমন অভিযানকে হামাসের ওপর চাপ সৃষ্টির পাঁয়তারা হিসেবে অভিহিত করেন, যাতে হামাস ফিলিস্তিনের স্বার্থরক্ষা ছেড়ে এমন সমঝোতায় আসে এবং ইজরাইল লাভবান হয়। শেখ ইয়াসিন এই অভিযান বন্ধ করার জন্য জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাদশাকে ফিলিস্তিনি জনগণ ও হামাসের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার অনুরোধ করেন।

অন্যদিকে, জর্ডান ইখওয়ান এক বিবৃতিতে হামাসের বিরুদ্ধে চলমান দমন-অভিযানের তীব্র নিন্দা জানায়। তারা এসব তল্লাশি ও নিপীড়নমূলক কার্যক্রমকে জর্ডানের জনগণের অনুভূতির সাথে তামাসা হিসেবে অভিহিত করে। বিবৃতিতে আরও জানায়, আরব নাগরিকরা এবং মুসলিমরা অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে কেবল হামাসকেই বিবেচনা করে। তাই হামাসের বিরুদ্ধে অবস্থান মূলত এই মানুষগুলোর আবেগ ও অনুভূতির বিরুদ্ধেই অবস্থান নেওয়ার সামিল।

ইমাদ আল আলামি নামে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর আরেকজন সদস্য (বর্তমানে তিনি দামেস্কে অবস্থান করছেন) ইরানে আটকা পড়া হামাসের অপর তিন শীর্ষ নেতার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কথা বলার জন্য তেহরানে রওয়ানা দেন। তারা তিনজনই একমত হলেন, যত সমস্যাই থাকুক না কেন আম্মানে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল অভিযোগ থেকে নিজেদের অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করা। কারণ, জর্ডান প্রশাসন অভিযোগ করেছিল, তারা অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের জিম্মায় অবৈধ অস্ত্রও মজুদ ছিল। হামাস নেতাদের যুক্তি ছিল– যতদিন না তারা আম্মানে গিয়ে এই অভিযোগগুলো মোকাবিলা করবেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের গায়ে এসব অভিযোগের স্থায়ী তকমা লেগে থাকবে। সেইসঙ্গে আইনি দৃষ্টিতে তাদের পলাতক বা ফেরারি আসামি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তারপরও আম্মানে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তারা আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ করলেন। হামাসের অন্যান্য নেতাদের সাথেও পরামর্শ করতে তারা তিনজন তেহরান থেকে দামেস্কে গেলেন। গোসেহ তেহরানে থেকে গেলেন।

এদিকে মুহাম্মাদ নাজ্জাল তেহরান সফরে থাকা অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। নাজ্জাল এবং ইজ্জাত আল রিসিককে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো; যদিও তারা আত্মসমর্পণের বিরোধী ছিলেন। সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে তিনি এবং ইজ্জাত আল রিসিক আম্মানে ইখওয়ানের সদর দফতরে দেখা করলেন। ইখওয়ান হামাসের সমর্থনে বিরাট বড়ো র‍্যালির আয়োজন করছিল। নাজ্জালের চিন্তা ছিল, মিছিলপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য দিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন। এ ব্যাপারে তিনি কয়েকজন ইখওয়ান নেতার সঙ্গে পরামর্শও করেন।

নাজ্জাল ও রিসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন মিছিলের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছান, তখন ইখওয়ানের অন্যান্য নেতারা বিশেষ করে ইমাদ আবু দায়াহ এবং সেলিম আল ফালাহাত ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন! তাদের মতে– এই মুহূর্তে কোনো ভাষণ দিলে তা হবে আইনের খেলাফ। এতে সরকারকে উত্তেজিত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই বিষয়টি জর্ডান ইখওয়ানের মধ্যে বিভাজনকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। ইখওয়ানের ওপর সেই সময়ে আবু দায়াহ এবং আল ফালাহাতের তীব্র প্রভাব ছিল। তাই তারা তাদের সিদ্ধান্ত মানতে ইখওয়ানের অন্য সদস্যদেরও রাজি করায়। এরপর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়– নাজ্জাল এবং রিসিকরা র‍্যালি করতে পারবে, কিন্তু কোনো ভাষণ দিতে পারবে না। দুই নেতা প্রচুর মনঃকষ্টে ভোগেন। তারা ইখওয়ানের এই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করেন। তাই তারা যেভাবে গোপনে সেখানে এসেছিলেন, ঠিক সেভাবেই গোয়েন্দাদের নজর ফাঁকি দিয়ে নীরবে স্থান ত্যাগ করেন। দুই নেতা আলাদা হয়ে নিজেদের মতো করে থাকেন। নাজ্জাল মিশালকে ফোন দিয়ে জানান, তারা আত্মসমর্পণ করতে অপারগ এবং পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ডেই লুকিয়ে থাকতে আগ্রহী।[১১২]

অন্যদিকে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে দামেস্কে ইখওয়ানের মজলিসে শুরায় ব্যাপক আলোচনা হয়। যেখানে জর্ডান হামাসের বেশ কিছু প্রতিনিধিও যোগ দেয়। এদের কেউ সরাসরি, আবার কেউ কেউ ফোনে। হামাসের ওপর জর্ডান প্রশাসনের ক্র্যাক ডাউন নিয়ে জর্ডান ইখওয়ান একটি বিবৃতি দিলেও তারা কোনোভাবেই সরকারের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়াতে চাইছিল না। শুরা পরিষদ প্রথম দিকে তেহরানে আটকে পড়া তিন নেতাকে তাদের বিবেচনামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু যখন সবাই বুঝল– এই তিন নেতা জর্ডানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেছেন,

[১১২]. মিডিয়া ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো অধীর হয়ে নাজ্জালের বাইরে আসা বা আত্মসমর্পণের জন্য অপেক্ষা করছিল। এটা খুব বড়ো একটা সংবাদের শিরোনাম হতে পারত, কিন্তু হয়নি। যদিও পরের দিন অনেক মিডিয়াতে দাবি করা হয়, নাজ্জাল ছদ্মবেশে হামাসের সভায় যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু নাজ্জাল তা অস্বীকার করেন।

তখন ইখওয়ান নেতারা তাদের ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করার পরামর্শ দিলেন। জর্ডান ইখওয়ানের একটি প্রতিনিধি দল এই সম্মেলনে যোগ দেন। তারা হামাসের তিন নেতাকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ এবং তাদের সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সচেতন করেন। ইখওয়ান আরও জানায়, তারা জর্ডান সরকারকে ম্যানেজ করে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এখনও আশাবাদী।

এদিকে নাজ্জাল ও আল রিসিক তেহরানে আটকে পড়া হামাসের তিন শীর্ষ নেতার আম্মানে ফিরে আসার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে চলা সেই বৈঠকে ইখওয়ানের নির্বাহী পরিষদ সর্বসম্মতভাবে জানায়, জর্ডান সরকারের সঙ্গে হামাস ইস্যুটা সুরাহা না করা পর্যন্ত তাদের জর্ডানে ফিরে আসা যাবে না। নাজ্জাল এবং আল রিসিক ইখওয়ানের এই চিন্তাধারার সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত ছিলেন, তবে তারা একটা নিদিষ্ট সময় নির্ধারণের পক্ষপাতী। ইখওয়ানের প্রভাবশালী নেতা ইমাদ আবু দায়াহ কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। হামাস নেতারা ইমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলেন। কারণ, অনির্দিষ্ট সময়ের কথা বলে বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখলে প্রকারান্তরে হামাসের ভাগ্যকে ঝুলিয়ে রাখা হবে, আর ওই তিন নেতাকেও দেশের বাইরে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকতে হবে।

ইখওয়ানের ভেতরে অনেকেই ইমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তারা তখনও হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই নেতারা মনে করেছিলেন, তিন নেতার জর্ডানেই ফিরে আসা উচিত। এটা শুধু ভালো অপশনই নয়; বরং এটাই একমাত্র অপশন। কিছুদিন যাওয়ার পর এটাও বোঝা গেল, জর্ডান ওই তিন নেতাকে গ্রেফতার কিংবা তাদের আম্মানে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে খুব একটা সিরিয়াস নয়। গ্রেফতারি পরোয়ানার ভয়ে তিন নেতা আম্মান থেকে দূরে থাকবেন- জর্ডান এটাই চেয়েছিল। তারপরও তিন নেতাকে আম্মানে আসার পথ রুদ্ধ করতে ইখওয়ানের নির্বাহী পরিষদ শুরা কাউন্সিলের একটি জরুরি বৈঠকের আয়োজন করে। শুরায় ভোটাভুটি হয় এবং খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে ওই তিন হামাস নেতার আম্মানে ফেরত আসার প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে নাকচ হয়।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছিল। কারণ, হামাস একটি স্বতন্ত্র সংগঠন। তাদের যে নিজস্ব চিন্তা থাকতে পারে এবং তারা ইখওয়ানের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়- এই চিন্তাটা ইখওয়ান নেতারা বুঝতে পারেনি। তাই যখন ভোটাভুটি চলে, ঠিক সেই মুহূর্তে হামাসের তিন শীর্ষ নেতা আরও চার সঙ্গীসহ জর্ডানের কুইন আলিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এদিকে গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের আসার খবর পেয়ে আটঘাঁট বেধেই বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল।

কাঙ্ক্ষিত ঘটানাই ঘটল। গ্রেফতার হলো হামাস নেতারা। তাদের গ্রেফতার করে একটি ডিটেনশন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের বিচ্ছিন্ন করে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। হাতকড়া পড়ানোয় তারা তাজ্জব হয়ে যান। জর্ডান সরকারের কাছ থেকে তারা হয়তো এতটা আশা করেননি। বিশেষ করে গোশেহ কোনোভাবেই এইটা মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাধা দিতে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। গোসেহও দমে যাওয়ার পাত্র নন। তাদের যখন আদালতে নেওয়ার জন্য ভ্যানে তোলা হয়, তখন তিনি চিৎকার করে বলছিলেন– 'তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। তোমরা আজ জর্ডানের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মান করছ। যারা জায়োনবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তোমরা তাদেরই অপমান করছ। তোমরা কি জানো, আজ এই দৃশ্য দেখে কে সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছে? সে হলো আম্মানে কর্মরত ইজরাইলের দূত। কারণ, তার স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলছে।'

সেদিন গোটা বিমানবন্দরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। সাধারণ কোনো মানুষকে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। শত শত হামাস নেতা-কর্মী বিমানবন্দরে হামাস নেতাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গিয়েছিল, কিন্তু তাদের কাউকেই বিমানবন্দরের ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি।

তাৎক্ষণিকভাবে মুসা আবু মারজুককে জর্ডান থেকে বের করে দেওয়া হয়! কারণ, তিনি জর্ডানের নাগরিক ছিলেন না। তাকে নিয়ে ফ্লাইটটি চলে যায় দুবাই। সেখানে তিনি সপ্তাহখানেক থেকে চলে যান দামেস্কে। আর অবশিষ্ট দুজনকে হাত পিঠের সঙ্গে আড়মোড়া করে বেঁধে আম্মানের মার্কা নামক জেলায় অবস্থিত সামরিক আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাস্তার দুধারে জনতার স্রোত। তাদের প্রিয় বিপ্লবী নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরাধ একটাই– জায়োনবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তাদের যে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে গাড়িগুলো জনসমাগম পরিহার করার জন্য বাধ্য হয়ে ভিন্ন রোড ব্যবহার করে।

সামরিক আদালতে তাদের সামনে হাজির হয় সামরিক প্রসিকিউটর মাহমুদ উবায়দাত। তিনি হামাস নেতাদের কাছে জানতে চান, তারা কোনো আইনজীবী নিয়োগ করতে ইচ্ছুক কি না? উত্তরে হামাস নেতারা সালিহ আল আরমুতির নাম প্রস্তাব করেন। সেই রাতটি তাদের জর্ডানের কেন্দ্রীয় পুলিশ দফতরের কারা কক্ষে রেখে পরের দিন আবারও আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। উবায়দাত হামাস নেতাদের জানায়, তাদের বিরুদ্ধে মূলত দুটি অভিযোগ। এক, তারা একটি অবৈধ সংগঠন পরিচালনা করছেন! দুই, তাদের কাছে অবৈধ অস্ত্রের মজুদ রয়েছে!

হামাস নেতাদের পক্ষে আইনজীবী আরমুতি ছাড়াও আরও বেশ কিছু আইনজীবী দাঁড়িয়ে যান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হানি আল খাসাওনাহ, জুহাইর আবু আল রাঘিব এবং আহমাদ বিসাত। কোর্টের শুনানির সময়টা ছিল ঝড়ের মতো, তা ছাড়া সেখানে কাজের কাজ তেমন একটা হয়নি। যেহেতু বন্দিদের কেউ-ই কোনো অপরাধ করেননি, তাই তাদের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাতে প্রসিকিউশনের বেশ কষ্টই হচ্ছিল।

আদালতে গোসেহ তার বিরুদ্ধে অফিসে বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন– গোয়েন্দা সংস্থা তার অফিস থেকে যেসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার কথা বলেছে, সেগুলো পুরোটাই বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। শুধু মামলা সাজানোর জন্যই এই ভুতুড়ে গল্প তৈরি করা হয়েছে। এর আগে ১৯৯৭ সালে যখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখনও এমন মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয় বলে তিনি আদালতকে জানান।

গোসেহর এ রকম বচনে সামরিক আইনি কর্মকর্তা রাগে, ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অনেক আজেবাজে কথা বলে চিৎকার-চেঁচামেচিও করেন। তখন গোশেহর আইনজীবী সালিহ আল আরমুতি আর সহ্য করতে পারলেন না। প্রসিকউটরকে পালটা জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন– 'হে সরকারি প্রসিকিউটর, আপনি গলার আওয়াজ কমিয়ে কথা বলুন। আপনি কি জানেন, যার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তিনি একজন সংগ্রামী মুজাহিদ, তাকে গোটা জর্ডানের মানুষ সম্মান করে। সুতরাং তার ব্যাপারে কথা বলার আগে সাবধান হোন।'

এই গোটা মামলা এবং আটকের ঘটনা ছিল জর্ডানের জন্য বিব্রতকর এবং উভয় সংকটের মতো। সরকার চাইছিল এক ধরনের সমাধান, কিন্তু জনগণের চাওয়া ছিল পুরোই বিপরীত। বাস্তবতা হলো, জর্ডান সরকারের ইচ্ছাও যে এমন ছিল তাও কিন্তু নয়। মূলত পুরো ব্যাপারটি ছিল গোয়েন্দা সংস্থার সাজানো একটি পরিকল্পনা! তাদের উদ্দেশ্য ছিল– যেকোনোভাবেই হামাস নেতাদের জর্ডানের বাইরে রেখে গোটা বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা। কিন্তু হামাস নেতারা ফিরে আসায় গোয়েন্দাদের জন্যও বিষয়টা কঠিন হয়ে যায়! তারা বুঝতেও পারছিলেন না, কীভাবে এর সমাধান হবে! ফলে পরো বিষয়টা একটু গোলমেলেই ছিল। এবার জর্ডান প্রশাসন বেকায়দায় পড়ে গেল। হামাস নেতাদের ফিরে আসার যুক্তি ছিল, তারা জর্ডান প্রশাসনকে বিচার করার সুযোগ দিতে চায়, যাতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো মিথ্যা প্রমাণিত এবং গোটা বিষয়টার একটা স্থায়ী সমাধান হয়।

এদিকে মুসা আবু মারজুক হামাসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানালেন, যাতে তারা জর্ডান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। হামাসের নীতি-নির্ধারকদের ভেতরে তখনও কিছুটা প্রত্যাশা ছিল, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। কারণ, তারা বিশ্বাস করতেন– তাদের ওপর যে দমন-পীড়ন হচ্ছে, মূলত তা হচ্ছে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনা মোতাবেক। জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ এই ব্যাপারে সক্রিয় নন। হামাস আশা করছিল, বাদশাহ আব্দুল্লাহ একটা পর্যায়ে গিয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই প্রত্যাশা থেকে হামাস বাদশাহ আব্দুল্লাহর কাছে চিঠিও লিখল। সেই চিঠিতে তারা জর্ডানে হামাসের রাজনৈতিক শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা এবং এই ব্যাপারে তার পরলোকগত পিতা বাদশাহ হোসেনের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সমঝোতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য জানাল। হামাস এই চিঠিতে আরও দাবি করল– আজ অবধি তারা এমন কোনো কাজ করেনি, যাতে জর্ডানের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রায় দুই মাস খালিদ মিশাল, ইবরাহিম গোসেহ এবং হামাসের আরও চার কর্মকর্তাকে দক্ষিণ আম্মানের আল জুয়ায়দাহ নামক এলাকার একটি স্থানে আটক রাখা হয়। অবশ্য তাদের একই কম্পাউন্ডের মধ্যে আলাদা করে রাখা হয়। হামাস নেতারা প্রতিদিন সকালে আধা-সরকারি দুটি পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেতেন। এর ফলে তারা সরকারের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারতেন। এই দুই পত্রিকা ছাড়া তাদের বহু পুরোনো কিছু বই পড়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এর বাইরে আর কোনো কিছু পড়ার সুযোগ তাদের ছিল না। হামাসের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা রাখে– এমন কোনো পত্রিকা বা পুস্তক দেওয়া হতো না। তাদের কাছে কোনো রেডিও ছিল না, তবে একটি টিভি ছিল; যেখানে শুধু জর্ডান চ্যানেল দেখানো হতো, আর টিভির রিমোটটাও থাকত কারারক্ষীদের হাতে।

হামাস নেতারা তাদের কারাকক্ষটিকে রীতিমতো একটি ধর্মীয় স্থাপনা বানিয়ে ফেলেছিলেন। তারা ফজরের আগে উঠতেন আর এশার নামাজ আদায় করে ঘুমাতেন। মাঝের এই সময়টিতে তারা নিজেদের মতো করে একটি প্রাত্যহিক রুটিনও বানিয়ে নিয়েছিলেন। রুটিন অনুযায়ী তারা নিয়মিত শরীরচর্চা, কুরআন তিলাওয়াত, পড়াশোনা করতেন এবং হালকা বিনোদনের ব্যবস্থাও রাখতেন। প্রতিদিন এশার নামাজ আদায়ের পর হামাস নেতারা বিছানায় গিয়ে প্রতিদিনের প্রশ্ন তৈরি করতেন। তারা নিজেরাই নিজেদের ভেতর দুটো পৃথক দল তৈরি করেন এবং সাধারণ জ্ঞান ও কবিতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। তারা সপ্তাহে দুদিন দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ পেতেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর হামাস নেতারা তাদের মুক্তির দাবিতে জেলখানার ভেতরে অনশন কর্মসূচি পালন শুরু করেন। এরপর যখন তাদের সামরিক আদালতে নেওয়া হয়, তখনও তারা অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে হামাস নেতাদের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও দুটি অভিযোগ আনা হয়, যেগুলোতে তাদের মৃত্যুদণ্ডও প্রদান করা সম্ভব। সাক্ষাৎ করতে আসা দর্শনার্থীদের মাধ্যমে হামাস নেতাদের অনশন পালনের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অনশনরতদের মধ্যে তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের আল হোসেন মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

১৫ অক্টোবর, শুক্রবার। আম্মানের নিকটবর্তী আল উইহদাত নামক শরণার্থী শিবিরে হাজারো ফিলিস্তিনি সমবেত হয়ে হামাস নেতাদের অনশন কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। বিক্ষোভ থেকে জনগণকে দূরে রাখার জন্য এবং তারা যেন কোনোভাবেই শরণার্থী শিবিরের গেটের বাইরে আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন প্রবেশমুখে ব্যারিকেড দেয়। দাঙ্গা পুলিশ এবং অন্যান্য সাঁজোয়া যানবাহনও মোতায়েন করা হয়। ইখওয়ানের কিছু নেতা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর পুলিশ জমায়েতকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পাঁচ দিন পর জর্ডান প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হামাস নেতারা তাদের অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেন। এই সময়ে বেশ কিছু পরিচিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও বন্দি হামাস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জর্ডানের প্রখ্যাত আইনজীবী জুহাইর আবু আল রাঘিব, ড. ইসাক আল ফারহান এবং জর্ডান ইখওয়ানের শীর্ষ নেতা আব্দ-আল মজিদ ধুনিয়াবাত ও হায়তাল আবু আল রাঘিব এবং জর্ডান সরকারের বিচারবিষয়ক মন্ত্রী হামজাহ হাদ্দাদ। জর্ডান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একদল চিকিৎসকও হামাস নেতাদের প্রতি সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করেন। তারা অসুস্থ হামাস নেতাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করেন।

এর মধ্যে দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর ৭ নভেম্বর ইজ্জাত আল রিসিকও ধরা পড়েন। আসলে জর্ডান কর্তৃপক্ষ তাকে ধরার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে তার ঘনিষ্ঠজনদের ওপর নজর রাখছিল। তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে রিসিকসহ দুই সাংবাদিককে আটক করেন। এই দুইজন সাংবাদিক ছিলেন তার খুবই ঘনিষ্ঠ। তাদের প্রথমে জারকাস্থ গোয়েন্দা কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এরপর নাজ্জালের অবস্থান জানার জন্য রিসিককে ৬ ঘণ্টা প্রচণ্ড মারধর ও নির্যাতন করা হয়। রিসিক গোয়েন্দাদের জানান, নাজ্জালের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে তার ঘনিষ্ঠজনদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। তারা সরাসরি কখনোই দেখা করতেন না। এরপর তার দুজন সাংবাদিক মিত্রকে আল জুয়ায়দাহ কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রিসিকও সেখানে গিয়ে হামাসের অন্যান্য নেতাদের দেখা পান। পরবর্তী সময়ে নাজ্জালের খোঁজে গোয়েন্দা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের তল্লাশি জোরদার করে। গোয়েন্দাদের দুটো গাড়ি সব সময় নাজ্জালের বাসার সামনে অবস্থান করে নজরদারি চালাত। একটি গাড়ি নাজ্জালের স্ত্রীর গতিবিধি নজরে রাখত। শুধু তাই নয়; তারা আলাদা করে নাজ্জালের পরিবারের সদস্যদেরও বারবার গোয়েন্দা কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, কিন্তু এত কিছুর পরও নাজ্জাল গ্রেফতার এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এদিকে জর্ডানের মাটিতে হামাসের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে জর্ডান সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা হামাসের নেতাদের দুটি অপশন দিলো– হয় তাদের হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জর্ডানে থাকতে হবে, নতুবা জর্ডান ছাড়তে হবে। তবে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন খুব একটা সহজ ছিল না। তাই জর্ডান সরকার ইখওয়ানের কাছে সহযোগিতা চাইল। জর্ডান আশা করেছিল, এ প্রক্রিয়ায় ইখওয়ান সম্পৃক্ত হলে হামাস নেতারা জর্ডান ত্যাগ করতে রাজি হবে। জর্ডান সরকার বিষয়টা নিয়ে জোরাজুরিও করতে চাইছিল না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল– হামাস নেতারা যদি স্বেচ্ছায় চলে যায়, তাহলে হামাসের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক খারাপ হবে না। ফলে ভবিষ্যতে হামাসের সঙ্গে জর্ডানের সম্পর্ক জোরদার করার দরজা খোলা থাকবে।

এদিকে হামাসের ব্যাপারে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হবে, তা নিয়ে ইখওয়ানের মধ্যেও বিভাজন ছিল। তবে যত বিভাজনই থাকুক না কেন, ইখওয়ান একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সমাধান চাইছিল।

এমন এক পরিস্থিতিতে জর্ডানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আব্দ-আল রউফ ইখওয়ানের স্থানীয় একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ইখওয়ানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আব্দ-আল মজিদ ধুনিয়াবাত, আব্দ-আল লতিফ আরাবিয়াত, জামিল আবু বকর এবং সালিম আল ফালাহাত। মূলত সেই বৈঠকেই জর্ডানে হামাসের কার্যক্রমের ব্যাপারে সরকারের অনীহার বিষয়টি খোলাসা করা হয়। ইতোমধ্যে জর্ডান সরকার দামেস্কে অবস্থানরত হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর দুজন সদস্যের সঙ্গে একটি সমঝোতামূলক আলোচনা চালিয়ে আসছিল। কারাবন্দি হামাস নেতাদের সঙ্গে তারা কোনো আলোচনা করেনি। কারণ, বন্দি অবস্থায় তারা কোনো ধরনের আলোচনা করতে রাজি ছিলেন না। জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থা খালিদ মিশালের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়– আটক হামাস নেতারা জর্ডানের নাগরিক হিসেবে জর্ডানেই থাকার সুযোগ পাবে, যদি হামাসের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ প্রস্তাবের জবাবে মিশাল বলেন– 'আমরা কখনোই আমাদের নীতিমালা এবং ন্যায্য আন্দোলন থেকে পিছু হটব না।'

মিশালের এই স্পষ্ট জবাবে জর্ডান কর্তৃপক্ষ কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়; যদিও জর্ডানের সাধারণ মানুষ সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার এসব কার্যক্রমে সন্তুষ্ট ছিল না। তা ছাড়া হামাস নেতারা দীর্ঘদিন জেলে থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছিল।

১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর, বন্দি হামাস নেতাদের সঙ্গে তাদের আইনজীবী সালিহ আল আরমুতি এবং জর্ডান বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফ আল শরিফ সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে সাইফ আল শরিফ তাদের জানান, তিনি জর্ডানের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন। বার্তাটি হলো– যদি হামাস নেতারা স্বেচ্ছায় জর্ডান ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তাদের যেতে দেওয়া হবে। বিনিময়ে তারা প্রতি দুই-তিন মাস পরপর একবার জর্ডানে ফেরার সুযোগ পাবেন। যদি তারা এই প্রস্তাবে রাজি হয়, তাহলে জর্ডান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের হাতকড়া পরানো হবে না। খালিদ মিশাল ও ইবরাহিম গোসেহ এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তারা জানান– যদি তাদের বাধ্য করা হয়, তাহলে তারা হাতকড়া পরেই দেশ ছাড়বেন, তবুও স্বেচ্ছায় জর্ডান ত্যাগ করবে না।

সাক্ষাৎ শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবীরা জানান, হামাস নেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জর্ডান সরকার তাদের বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইনজীবীর এই বক্তব্যে জর্ডান প্রধানমন্ত্রী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। কারণ, তারা পুরো প্রক্রিয়াটি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তাই পরবর্তী সময়ে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী মিডিয়াকে জানান, তারা হামাস নেতাদের বের করে দেওয়ার মতো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রধানমন্ত্রী যখন মিডিয়াকে এসব কথা বলছিলেন, তখন তার পাশে জর্ডান ইখওয়ানের একজন সিনিয়র দায়িত্বশীলও ছিলেন। তিনিও মিডিয়াকে নিশ্চিত করেন, জর্ডান সরকার হামাস নেতাদের দেশ থেকে বিতাড়নের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা আসার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই বন্দি হামাস নেতাদের একটি প্লেনে তুলে কাতারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর পলাতক হামাস নেতা মোহাম্মাদ নাজ্জালকে খুঁজে না পাওয়ায় জর্ডান কর্তৃপক্ষ তার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় অবস্থানে চলে যায়।

কাতার যাত্রা

এর আগে হামাস নেতাদের কাতারে পাঠানোর ব্যাপারে জর্ডান সরকার যখন কাতার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে, তখন জর্ডান প্রশাসন জানিয়েছিল– হামাস নেতারা স্বেচ্ছায় জর্ডান ত্যাগ করতে চাচ্ছে এবং তারা কতারকেই পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এর আলোকে কাতার সরকার হামাস নেতাদের নেওয়ার জন্য একটি প্রাইভেট বিমান পাঠিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তী সময়ে ইবরাহিম গোসেহ বর্ণনা করেন এভাবে–

'১৯৯৯ সালের ২১ নভেম্বর। আমরা মাত্রই মাগরিবের নামাজ সম্পন্ন করেছি। ঠিক সেই সময় পুলিশ আমাদের কামরায় আসে এবং আমাকে, খালিদ মিশাল ও আল রিসিককে নিয়ে যায়। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেয়। আমাদের সঙ্গে থাকা বাকি বন্দিরা সেখানেই থেকে যায়। আমরা বুঝতে পারি, আমাদের যাওয়ার পরপরই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

বন্দিশালার বাইরে এসে আমরা ভিন্ন পোশাক পরিহিত বেশ কিছু নিরাপত্তাকর্মীকে দেখতে পাই। তারা আমাদের হাতে হাতকড়া পড়ায়, চোখ বাঁধে এবং ধাক্কা দিয়ে একটি প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয়। আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা কেউ জানায়নি। আমি ঠাট্টা করে বলছিলাম– আমাদের হয় আল জাফর, নাহয় ইয়াসির আরাফাতের কাছে তুলে দেওয়া হবে। প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি চলার পর ভ্যানের ভেতরে কফির তীব্র ঘ্রাণ পাই। ধারণা করি, সম্ভবত মারকা নামক এলাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, সেই এলাকায় অনেকগুলো প্রসিদ্ধ কফিশপ আছে বলে জানতাম। আরও প্রায় ৪৫ মিনিট গাড়ি চলার পর একটা জায়গায় গিয়ে গাড়িটি থামল।

আমরা ভেতর থেকেই অনেকগুলো বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তারা আমাদের গাড়িতে রেখে আগে জিনিসপত্রগুলো নামাল। তারপর চোখ খুলে দিলো। আমরা দেখলাম, কয়েক ফুট দূরেই কাতারের একটি ছোটো বিমান দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাদের ওই প্লেনে উঠার নির্দেশ দিলো। আমরা যেতে চাইলাম না। এরপর একজন ব্যক্তি আমাদের কাছে এলো। তিনি জানালেন, কাতারে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। আমরা বললাম– "আমরা কাতারে যেতে চাই না।" জবাবে তিনি বললেন– "আগে প্লেনে উঠে বসুন! কোথায় যাবেন সেটা নিয়ে আমরা ভেতরে বসে কথা বলব।" এমন পরিস্থিতিতে একটু পর কাফাফা কারাগার থেকে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সামি খাতির। তাকে কয়েদির পোশাকেই আনা হয়। তা ছাড়া তাকে তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপর আমরা প্লেনের ভেতরে গিয়ে বসলাম।

কিছু সময় পর এলেন কাতারের পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী। তিনি খুব আন্তরিকভাবে ঘোষণা দিলেন– "আপনারা কাতারকে নিজেদের জন্য বাছাই করে আমাদের সম্মানিত করেছেন। কাতারকে আপনারা নিজেদের দেশ হিসেবেই বিবেচনা করতে পারেন।" উত্তরে খালিদ মিশাল জানালেন– "কিন্তু আমরা তো জর্ডান থেকে বেরিয়ে কাতারে যেতে চাইনি।" কাতারের মন্ত্রী বেশ অবাক হয়ে বললেন– "কী বলছেন আপনি! আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা করুন।" এই কথা বলেই তিনি পাইলটকে প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বললেন। তিনি সেখান থেকেই জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডাক দিলেন। পরারাষ্ট্রমন্ত্রী কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদায় দেওয়ার জন্য তখন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। জর্ডানের মন্ত্রী আসার পর খালিদ মিশাল জানালেন– "আমরা তো জর্ডান ত্যাগ করে কাতারে যেতে চাই না।" জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে বললেন– "কিন্তু আপনারাই তো কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন!'

মিশাল বললেন– "যখন আমি তেহরান সফরে গিয়েছিলাম, তখন কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন দিয়েছিলাম, এটা সঠিক তথ্য। এটা করেছিলাম যাতে আমাদের জর্ডানে ফেরার বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে পারেন, কিন্তু তাকে কখনো বলিনি– আমরা কাতারে যেতে চাই।"

সব শুনে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন– "সে আপনি যাই বলেন না কেন, কাতারে যাওয়া ছাড়া আপনাদের সামনে ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই।" এ কথা বলেই তিনি বন্দি হামাস নেতাদের হাতে তাদের পাসপোর্ট তুলে দিলেন।

মিশাল জানতে চাইলেন– "আপনারা কি আমাদের জর্ডান থেকে বের করে দিচ্ছেন?"

মন্ত্রী বললেন– "আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যাখ্যা করে নেন। আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই।"

মিশাল তখন কাতারের মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন– "আপনি সাক্ষী থাকলেন, আমাদের বের করে দেওয়া হলো। একদিন বিচার হবে, তখন এই নির্মম ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আপনাকে আদালতে ডাকা হবে।"

গোটা ঘটনাটি দেখে কাতারের মন্ত্রী বেশ ধাক্কা খেয়েছিলেন। তিনি মিশালকে আশ্বস্ত করে বলেন– "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি কোনো দিন সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আমি অবশ্যই দেবো।"'[১১৩]

---

১১৩. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

হামাস নেতারা কাতারে পৌঁছালে তাদের রাজকীয় অতিথি হিসেবে বরণ করা হয়। কাতারের তৎকালীন আমির শেখ হামাদ নিজে তাদের স্বাগত জানান। তাদের ভিআইপি মর্যাদা দেওয়া হলো। বলা হলো– আপনারা যেখানে ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবেন; যেকোনো সময় কাতার ত্যাগ করতে পারবেন, আবার প্রবেশও করতে পারবেন।

প্রথমদিকে তাদের কিছুদিন শেরাটন হোটেলে রাখা হয়। এরপর তাদের কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত ভিলায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আম্মানে জর্ডান প্রশাসন প্রচার করছিল– হামাস নেতারা স্বেচ্ছায় এবং কাতার সরকারের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চলে গেছে, তবে হামাস ও কাতার জর্ডান সরকারের সেই দাবিকে বারবার অস্বীকার করে বিবৃতি দেয়। আরাবিক প্রেসের একটি খবরে দাবি করা হয়– ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে মিলেনিয়াম সামিটে যোগ দেওয়ার সময় ইজরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইয়াহুদ বারাক ও কাতারের আমিরের মধ্যে একটি বৈঠক হয়। ইজরাইল কাতার আমিরকে অনুরোধ জানায়, তারা যাতে হামাস নেতাদের চলাচল ও কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কাতার সেই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানায়– হামাসের নেতারা কাতারে অতিথি হিসেবে আছেন এবং কোনো অবস্থাতেই তাদের ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না।

অবশ্য কেউ কেউ ধারণা করে আমেরিকার পরামর্শে কাতার এই ভূমিকা পালন করে। তবে এমন দাবির পক্ষেও সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। এদিকে জর্ডানও হামাসকে নিয়ে উভয় সংকটে পড়ে। একদিকে তাদের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ আর অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বন্দি হামাস নেতাদের ব্যাপারে জনগণের সহানুভূতি। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ঘরোয়া আলোচনায় জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ স্বীকার করেছেন– ওই সময়গুলোতে হামাস ইস্যুটি নিয়ে যেসব কর্মকর্তারা কাজ করেছিলেন, তাদের কৌশল অনেকটাই ভুল ছিল। কারণ, হামাস নেতাদের বিতাড়নের এক বছরের মধ্যে বাদশাহ আল বাত্তিখিকে গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বোঝা যায়, হামাস নেতাদের বিতাড়নের এই গেমপ্ল্যানে বাদশাহ আব্দুল্লাহ কোনো পক্ষেই ভূমিকা পালন করেননি। আর তার এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে আল বাত্তিখি নিজের মনের ঝাল মিটিয়ে হামাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিলেন।

জর্ডানের সাধারণ মানুষ এমনও মন্তব্য করত– যদি বাদশাহ হোসেন জীবিত থাকতেন, তাহলে হামাসকে নিয়ে কেউ-ই এই নোংরা ষড়যন্ত্র করার সাহস পেত না। কারণ, বাদশাহ হোসেনের আগাগোড়াই সুনাম ছিল। তিনি এ ধরনের সংকটকালীন মুহূর্তে অন্য অনেকের চেয়ে বরং বেশি জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা

এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারতেন। তাই হামাসের বিতাড়নের ঘটনায় জনগণ বাদশাহ আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার প্রয়াত পিতা বাদশাহ হোসেনের তুলনা করতে শুরু করে দেয়। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য– মোসাদ যখন খালিদ মিশালকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে, তখন বাদশাহ হোসেন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে মিশালকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বাদশাহ হোসেনের আন্তরিক উদ্যোগের কারণেই ইজরাইলের কারাগার থেকে শেখ ইয়াসিন মুক্তি পেয়েছিলেন। আবার আরেকজন শীর্ষ হামাস নেতা মুসা আবু মারজুককে যখন আমেরিকা বের করে দিয়েছিল, তখন বাদশাহ হোসেনই তাকে জর্ডানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আব্দুল্লাহ ক্ষমতায় বসে হামাস নেতাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করলেন। মূলত এই ঘটনাটি আল বাত্তিখির নোংরা ষড়যন্ত্রের কারণে ঘটেছিল। আর বাত্তিখি পেশাগতভাবে অসৎ ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাকে দুর্নীতির দায়ে কারাবরণ করতে হয়। বাদশাহ আব্দুল্লাহ সেই সময় মাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে কিছুটা সময় নিচ্ছিলেন, হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও ছিলেন। আর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাত্তিখি এই অপকর্মটি করে।

প্রকৃত বাস্তবতা ছিল, আল বাত্তিখি আসলে জর্ডানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে নিজের খায়েশ পূরণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তার দাম্ভিক কর্মকাণ্ড তাকে অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। তিনি মনে করেছিলেন, তার ক্ষমতা অসীম এবং নিজের কোনো কাজের জন্য তাকে কখনো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হামাসকে জর্ডানের মাটি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন; অথচ কাজটা সহনীয়ভাবেও করা যেত। কারণ, হামাসের নেতারাও জানতেন, জর্ডানে হামাসের কর্মকাণ্ড নিয়ে ইজরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও জর্ডানের ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিল।

মূলত জর্ডান প্রশাসন হামাসের ব্যাপারে ভুল হিসাব করেছে। জর্ডান সরকার ধারণা করেছিল– ইজরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সমঝোতা হলে হামাস স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হবে। তাই তারা হামাসকে জর্ডানের মাটি থেকে উৎখাতের বিষয়ে মোটেও অনুতপ্ত ছিল না।

এদিকে কাতারের রাজধানী দোহায় পৌঁছে হামাস নেতারা জর্ডানে ফিরে নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা হামাস নেতাদের জর্ডানে ফেরার ব্যাপারে কাতারকে অনুরোধ করেন। কাতার প্রশাসন তাদের সহায়তার আশ্বাস দেয়। এরপরও হামাস নেতাদের চাপে কাতার জর্ডান সরকারের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে। কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামাদ বিন জসিম হামাস নেতাদের ফিরে যাওয়ার বিষয়টি জর্ডান প্রশাসনকে অবহিত করেন। তাদের পক্ষ থেকে জর্ডানের বাদশাহ

আব্দুল্লাহকে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানে জানানো হয়, বিতাড়িত হামাস নেতারা জর্ডানের নাগরিক। তাই জর্ডানের সংবিধান অনুসারে তাদের জর্ডানে প্রত্যাবর্তনে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু জর্ডান কর্তৃপক্ষ কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। তারা জানায়– খালিদ মিশালকে জর্ডানের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব, যদি তিনি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধানের পদটি ছেড়ে দেন।

এমতাবস্থায় জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক বাত্তিখি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দাল্লাহ আল খাতিব ২০০০ সালের মাঝামাঝি দুই দিনের জন্য কাতার সফর করেন। এর কয়েকমাস পরই বাত্তিখিকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। জর্ডানের এই প্রতিনিধি দল কাতারের আমিরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন, যা টেলিভিশনের কল্যাণে গোটা কাতারের মানুষ প্রত্যক্ষ করে। এই সময় দেখা যায়– বাত্তিখি জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর লেখা একটা চিঠি কাতারের আমিরের কাছে হস্তান্তর করেন। এই দুই শীর্ষ কর্মকতার উদ্দেশ্য ছিল– কাতার যেন হামাস নেতাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জর্ডান সরকারকে অনুরোধ না করেন, সেটা বোঝানো।

আল বাত্তিখি পরিষ্কারভাবে কাতারের শীর্ষ নেতাদের জানিয়ে দেন– 'আমরা তাদের আর ফেরত নিতে চাই না। আমরা আশা করেছিলাম তারা যেহেতু তেহরান গিয়েছেন, সেখানেই থাকবেন। তাই দয়া করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অনুরোধ করবেন না।'

বৈঠকের সময় বাদশাহ আব্দুল্লাহর লেখা চিঠির উত্তর কাতার সরকারের পক্ষ থেকে বাত্তিখির হাতে দেওয়া হয়। বাত্তিখি শিষ্ঠাচার ভঙ্গ করে কাতারের আমিরের সামনেই সেই চিঠিটি খুলে পড়তে শুরু করেন। চিঠিটি পড়ে কাতারের আমিরকে জানান, চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি একমত নন। কাতার আমির তার আচরণে বিরক্ত হয়ে বলেন– 'আমি চিঠি দিয়েছি জর্ডানের বাদশাকে; আপনাকে নয়। আপনি চিঠি পড়ে মোটেও ভালো কাজ করেননি।' এরপর বাত্তিখির আচারণে বিরক্ত হয়ে কাতারের আমির অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন।

সেই বছরেরই শেষের দিকে, ২০০০ সালের নভেম্বরে দোহাতে ওআইসির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে খালিদ মিশাল হঠাৎ জর্ডানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আলি আবু আল রাঘিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। তবে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হলেও জর্ডানের অবস্থান ও নীতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। নতুন প্রধানমন্ত্রী মিশালকে পরিষ্কারভাবে জানান– 'আপনি এবং আপনার সহকর্মীদের হাতে

দুটি রাস্তা খোলা আছে। প্রথমটি, হামাসের সঙ্গ ত্যাগ– এটা করলেই আপনারা জর্ডানের নাগরিক হিসেবে জর্ডানে ফেরত যেতে পারবেন। সেখানে তারা যেকোনো রাজনৈতিক দলে যোগ অথবা নিজেরাই নতুন কোনো দল গঠন করতে পারবে। আর দ্বিতীয়টি, যদি হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, তাহলে নাগরিক হিসেবে দেওয়া পাসপোর্ট জর্ডান প্রশাসনের কাছে সারেন্ডার করবেন। এরপর আপনাদের দুই বছরের সাময়িক ভিসা দেওয়া হবে, যা জর্ডানে বসবাসরত ফিলিস্তিনের সব নাগরিককেই দেওয়া হয়। সেই ভিসা পেলে মাঝে মাঝে নিরাপত্তা সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে জর্ডানে যেতে পারবেন।' এই বৈঠক খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

পরবর্তী সময়ে জর্ডানের সরকারে পরিবর্তন, গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকের পদ থেকে সামিহ আল বাত্তিখিকে অপসারণ এবং ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইন্তেফাদা– সবকিছু মিলিয়ে জর্ডানে পলাতক হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর অন্যতম সদস্য মুহাম্মাদ নাজ্জালের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি হয়। মুহাম্মাদ নাজ্জাল নিজেই ঘটনাটা এভাবে ব্যাখ্যা করেন–

> '১৯৯৯ সালের ৩০ আগস্ট আমি আত্মগোপনে চলে যাই এবং ২০০০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই থাকি। এই পুরো সময় জর্ডান কর্তৃপক্ষ আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন দ্বিতীয় ইন্তিফাদা সংঘঠিত হয়, তখন অবস্থা ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে। তখন একই সঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। প্রথমত, জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকের পদ থেকে বাত্তিখিকে অপসারণ করা হয়। দায়িত্বে আসেন বাত্তিখির এক সময়ের সহকারী সাদ খায়ের। তবে এটা ঠিক, বাত্তিখি পরিচালকের পদে বহাল থাকলে আমার স্বাভাবিক জীবনে ফেরা কখনোই সম্ভব হতো না।
>
> দ্বিতীয়ত, জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী আব্দ-আল রউফ; যিনি হামাসকে বিতাড়নের পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনিও পদ হারান। নতুন প্রধানমন্ত্রী হন আলি আবু আল রাঘিব। তৃতীয়ত, নতুন প্রধানমন্ত্রী যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, সেখানে আমার এক বন্ধু ঠাঁই পান। তিনি হলেন নয়া মন্ত্রিসভার উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী ফারিস আল নাবুলসি। আর চতুর্থ কারণ হলো ইন্তিফাদা, যার জন্য গোটা অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূল পালটে যায়।
>
> এ রকম পরিস্থিতিতে আমার এবং নাবুলসি– উভয়ের বন্ধু ছিল এমন একজন ব্যক্তি জানায়, নাবুলসি আমার সমস্যাটির সমাধান করতে চায়।

আমিও সম্মতি দিই। তা ছাড়া আমাকে কখনোই জর্ডানের নাগরিকত্ব বা হামাসের পদ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। মূলত সেই বন্ধুর মাধ্যমে জর্ডান প্রশাসনের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছিল। আমাকে বলা হলো, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইলে গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমি প্রথমে এই সাক্ষাতে রাজি হইনি। আমার আশঙ্কা ছিল এটা ফাঁদ কি না! তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কিছুদিন পর সেই কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি জানান– যদি আমি জর্ডানে হামাসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড না চালাই এবং মিডিয়ার সঙ্গে কথা না বলি, তাহলে আমার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।'[১১৪]

অন্যদিকে জর্ডানের নতুন সরকারকে পূর্ব সরকারের নীতি বদল করার আহ্বান জানিয়ে কাতারও বেশ জোরেশোরে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে, কিন্তু তেমন একটা লাভ হয়নি। ২০০১ সালের মার্চ মাসে আম্মানে আরব লিগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের জানান, হামাসের নেতারা এখনও জর্ডানে ফেরার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর আপনারা যদি বিষয়টার কোনো সুরাহা না করেন, তাহলে হয়তো তারা নিজেদের মতো করেই এগোবে।

কিন্তু এরপরও জর্ডান সরকারের তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। হামাসের নীতি-নির্ধারণী মহল অনুধাবন করল, সমস্যাটির সুন্দর সমাধানে জর্ডান সরকার আগ্রহী নয়। সেই কারণে তারা হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর দুই সদস্য ও জর্ডানের নাগরিক ইবরাহিম গোসেহ এবং সামিহ খাতিরকে আম্মানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের আম্মানে ফেরার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিবারের চাপে সামিহ খাতির এই সফরে যেতে পারেননি। ফলে ইবরাহিম গোসেহ একাই আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কাতার সরকার আম্মান প্রশাসনকে জানিয়ে দেয়, গোসেহ 'ওয়ান ওয়ে' টিকেটে আম্মান যাচ্ছেন, অর্থাৎ আপাতত তিনি আম্মানে থাকবেন। কাতার সরকার গোসেহকে সহযোগিতা করতে আম্মান প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে কাতার কর্তৃপক্ষ বিমানের পাইলটকে নির্দেশ দেয়, যেন কোনো অবস্থাতেই গোসেহকে কাতারে ফিরিয়ে আনা না হয়। কাতার অবশ্য আগে থেকেই জর্ডানের আচরণ ও কার্যক্রমে বিরক্ত ছিল। তাই গোসেহকে ফিরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটিতে তারা ছিল বেশ আক্রমণাত্মক।

১১৪. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

গোসেহর অভিজ্ঞতা

গোসেহকে বহনকারী কাতারের সেই বিমানটি ২০০১ সালের ১৪ জুন মঙ্গলবার বিকালে আম্মানে অবতরণ করে। ইমিগ্রেশনে তাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে বলা হয়। একটু পরে একজন কর্মকর্তা এসে তার পিছু পিছু যেতে বলে। এরপর গোসেহকে এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন বিভাগের একটি ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি বিছানা ও ম্যাট্রেসসহ তাকে আরও কিছু জিনিস দেওয়া হয়। সেখানে গোসেহ দুই সপ্তাহ আটক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জর্ডান প্রশাসনের পরিকল্পনা ছিল- গোসেহ যে প্লেনে আম্মানে এসেছিলেন, সেই প্লেনেই তাকে কাতারে ফেরত পাঠানো, কিন্তু পাইলট গোসেহকে কোনোভাবেই প্লেনে তুলতে চায়নি। তিনি জানান- কাতারের কর্তৃপক্ষ তাকে বলে দিয়েছে, কোনো অবস্থাতেই গোসেহকে ফেরত নেওয়া যাবে না। মজার ব্যাপার হলো, পাইলটের এই ভূমিকার কারণে প্লেনসহ ক্রুদের দুই সপ্তাহ কুইন আইলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আটক রাখা হয়।

এখানে গোসেহর সঙ্গে খুবই অমানবিক আচরণ করা হয়। প্রথম এক সপ্তাহ তাকে একটিবারের জন্যও পোশাক পালটানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। তার লাগেজ এয়ারপোর্টের এক কোনায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এয়ারপোর্টে প্রথম দিনটির ব্যাপারে গোসেহ বলেন–

> 'আম্মানে পৌঁছানোর খবর পেয়ে আমার পরিবার এয়ারপোর্টে আসে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমাকে দেখতে না পেয়ে তারা বাড়ি ফিরে যায়। আমি এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করেছিলাম, যাতে আমাকে বাড়িতে ফোন করার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তারা রাজি হয়নি। আমাকে কোনো সংবাদপত্র পড়তে দেওয়া হতো না। যে ঘরে ছিলাম, সেখানে কোনো টেলিভিশনও ছিল না। আমার কাছে একটা ছোটো রেডিও ছিল, কিন্তু তারা ব্যাটারি খুলে নিয়েছিল।
>
> তবে আমার কাছে একটা মোবাইল ছিল। সেটা গোপনে পকেটে নিয়ে টয়লেটে গেলাম। একজন নিরাপত্তারক্ষী আমার পিছু পিছু গেল এবং বলল, টয়লেটের দরজা খোলা রাখতে। সে আমার থেকে মাত্র দুই মিটার দূরে ছিল। তবুও পরিবারের সদস্যদের উদ্‌বেগ কমাতে ঝুঁকি নিয়েই বাসায় ফোন দিলাম। আমার মেয়ে ফোন ধরল। তাকে জানালাম, আমি ভালো আছি এবং আমাকে নিয়ে কোনো টেনশন করো না। এতটুকু কথা বলেই মোবাইলটি সুইচ অফ করে আবারও পকেটে রেখে দিলাম। এটাই ছিল পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। পরদিন ভোরবেলায় আমি আরও দুবার বাসায় ফোন দিয়েছিলাম।

নিরাপত্তারক্ষী তখন ঘুমে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। একজন নিরাপত্তারক্ষী আমার সামনেই চেয়ারে বসা থাকত। তারপরও আমি কম্বলের ভেতরে শুয়ে এই যোগাযোগটি করেছিলাম। পরিবাররে সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমি মানসিক তৃপ্তিও পেলাম।'[১১৫]

যাহোক, ইমিগ্রেশন সেন্টারে বন্দি থাকা অবস্থায় গোসেহর জন্য অনেকগুলো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। গোসেহ জানতে পারেন, তার জর্ডানের নাগরিকত্ব ইতোমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। জর্ডানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী সালি সাংবাদিকদের জানান, তারা গোসেহকে জর্ডানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। কারণ, তিনি আর জর্ডানের নাগরিক নন। হামাস নেতাদের জর্ডান থেকে বিতাড়িত করার পরপরই তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে; এমনকী তাদের পরিবারের জর্ডানে বসবাস করার অধিকারও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জর্ডান প্রশাসন চাইছিল গোসেহ যেন স্বেচ্ছায় জর্ডান ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু গোসেহ জর্ডানে থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেন– দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই, যে তাকে জর্ডান থেকে বের করে দিতে পারবে। আবু থামির (ছদ্মনাম) নামে গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এর আগে ১৯৯৭ সালে যখন গোসেহকে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে আটক করা হয়েছিল, তখনও এই আবু থামির তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। গোসেহ আটক থাকা অবস্থায় এই আবু থামির বিভিন্ন সময়ে তার কাছে আসত এবং জিজ্ঞাসাবাদ করত। কখনো সে মধ্যরাতে, কখনো-বা ভোরবেলায় কিংবা কখনো দুপুরে। মূলত গোসেহ যাতে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে না পারেন, সে জন্যই তাকে এমন হয়রানি করা হতো। সে গোসেহকে হুমকি দিত– যদি গোসেহ স্বেচ্ছায় জর্ডান ত্যাগ না করে, তাহলে জর্ডান প্রশাসন তার এবং তার পরিবারের সবার নাগরিকত্ব স্থায়ীভাবে বাতিল করে দেবে।

এভাবে সপ্তাহ চলে যায়। একটা পর্যায়ে আবু থামির যেন কিছুটা ক্ষান্ত দেয়। গোসেহকে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ফেরত দেওয়া হয়, কিন্তু গোসেহর গোপন মোবাইলটি খুঁজে পাওয়ায় তারা সেটি নিয়ে যায়। ২০ জুন, বুধবার বিকালে আবু থামির আবারও গোসেহর কাছে আসে। গোসেহকে জানায়, ইয়েমেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ফোন করতে পারেন। গোসেহ নতুন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান এবং সিদ্ধান্ত নেন, তিনি কোনো ফোনই রিসিভ করবেন না।

---

১১৫. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

গোসেহকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। ফলে তাকে নিয়ে চারপাশে কী ঘটছে বা কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেই সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি নিজে নিজেই পর্যালোচনা করেন। ইয়েমেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ফোন দিয়ে যদি ইয়েমেনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আর যদি তিনি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে তা মোটেই ভালো দেখাবে না। কারণ, ইয়েমেনের সঙ্গে হামাসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ ভালো। অন্যদিকে, তিনি যদি ইয়েমেনে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এবং হামাসের অন্য নেতারা এতদিন ধরে জর্ডানে ফেরার ব্যাপারে যে ন্যায্য আন্দোলনটি করে আসছেন, তা ভন্ডুল হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায়ই আবু থামির পরের দিন আরও একজন সিনিয়র কর্মকর্তাসহ গোসেহর কাছে আসে। তারা গোসেহকে আবারও হুমকি দেয়– সে স্বেচ্ছায় জর্ডান ত্যাগ না করলে তাকে পৃথিবীর দুরবর্তীতম স্থানে নির্বাসনে পাঠাবে। গোসেহ আবারও বলেন– 'আমার এই দেশে থাকার অধিকার রয়েছে। আপনারা আমাকে এখানে থাকতে দিন। যদি আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে আইন অনুসারে আপনারা আমার বিচার করুন। তবুও আমাকে এখানে প্রবেশ করার এবং বসবাস করার অনুমতি দিন।'

গোসেহ যে কদিন ইমিগ্রেশনে আটক ছিলেন, গোটা আরববিশ্বই প্রতিটি দিনের ঘটনা খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল। গোসেহর সর্বশেষ অবস্থান নিয়ে প্রতিদিনই আরব বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ হতো। পাঠকরা এমনকী নীতি-নির্ধারকরাও সেই সংবাদগুলো আগ্রহভরে পড়ত। ফলে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র সংকটটি সমাধানের উদ্যোগ নেয়। কায়রোস্থ আরব লিগ জানায়, তারা সমস্যা সমাধানের জন্য জর্ডান ও কাতার উভয়ের সাথেই কথা বলছে। আরব লিগের তৎকালীন মহাসচিব ড. আমর মুসা জর্ডানের কাছে প্রস্তাব দেন, যাতে গোসেহকে লিবিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে গাজা থেকে শেখ ইয়াসিন জর্ডানের বাদশাহকে ফোন দিয়ে অনুরোধ করেন, তাকে যেন জর্ডানে থাকতে দেওয়া হয়।

জর্ডান তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তাদের বক্তব্য হলো হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে তারা গোসেহকে জর্ডানে প্রবেশ করতে দেবে না। গোটা পরিস্থিতিতে হামাসের ব্যাপারে জনগণের সহানুভূতি ও আবেগ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে। হামাসের প্রচার বিভাগ গোসেহর প্রতি জর্ডানের সরকারের অন্যায় আচরণ এবং নাগরিকদের দেশে থাকতে না দেওয়ার ব্যাপারে অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এই অবস্থায় গোসেহর করণীয় ছিল একটাই– নিজের মতের ওপর অবিচল থাকা। আর গোসেহ ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। যারা গোসেহকে চেনেন, তারা জানেন তিনি এমনই একগুঁয়ে লোক। ফলে যতই সময় গড়াচ্ছিল, গোসেহ যেন তার অবস্থানের ওপর আরও বেশি অটল ও অবিচল হচ্ছিলেন।

২৮ জুন, অর্থাৎ আম্মানে গোসেহর অবতরণের ঠিক ১৪ দিন পরের ঘটনা। গোসেহকে জানানো হলো– তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বিশেষ একজন অতিথি এসেছেন। এরপরই গোসেহকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই রুমে, যেখানে তাকে প্রথম সপ্তাহটি রাখা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখেন, তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা মুহাম্মাদ নাজ্জাল বসে আছেন। নাজ্জালের সঙ্গে প্রায় দুই বছর পর গোসেহর দেখা হলো। এই সাক্ষাতের প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে নাজ্জাল বলেন–

'ইবরাহিম গোসেহ এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে ১০ দিন আটক থাকার পর গোয়েন্দা সংস্থার এক লোক হঠাৎ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। মূলত এই লোকটির কারণেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। আমি গোয়েন্দা অফিসে গেলাম। তারা সবাই সেখানে খুবই উদ্‌বেগের মধ্যে আছে। এরপর আমাকে জানায়, তারা যেকোনো মূল্যে গোসেহসংক্রান্ত সংকটের সমাধান দেখতে চায়। আমাকে প্রশ্ন করে– কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? আমি সাথে সাথেই উত্তর দিলাম– "তাকে জর্ডানে প্রবেশ করতে দিন।" তারা জানাল, গোসেহকে এই মুহূর্তে জর্ডানে প্রবেশ করতে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এতদিন ধরে জর্ডানের কঠোর অবস্থান পালটালে দেশের ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে।

তখন তারা বিকল্প পরামর্শ দেয়। বলে– "এবার অন্তত সে যদি জর্ডান থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে পরেরবার এলে আমরা তাকে প্রবেশ করতে দেবো।"

আমি বললাম– "এতদিন হামাসের সাথে যে আচরণ করেছেন, তাতে হামাস আপনাদের কথার ওপর আস্থা রাখবে কীভাবে? আপনারা যে তাকে প্রবেশ করতে দেবেন, তারই-বা গ্যারান্টি কী?"

তারা জানাল, কোনো আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে জর্ডান সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না। ইতোমধ্যে হামাস ইস্যু কেন্দ্র করে কাতারের সাথে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি হয়েছে।

আমি এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কাতারে অবস্থানরত হামাসের নীতি-নির্ধারকদের ফোন করলাম। তাদের জর্ডান প্রশাসনের প্রস্তাব সম্বন্ধে জানালাম। আর খুব স্বাভাবিকভাবে অনীহা দেখালেন। তাদের ধারণা, গোসেহ একবার জর্ডান থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে আর কখনোই ফিরতে দেবে না।

জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থা জানাল– হামাস কোনো একটা দেশের নাম প্রস্তাব করুক, যেখানে গোসেহ যাবে আবার সেখান থেকে জর্ডানে ফেরত আসবে।

উভয়ের এই টানাপোড়েনের মধ্যে কাতারস্থ দায়িত্বশীলদের আমার ব্যক্তিগত মতামত জানালাম– "আমার মনে হয়, জর্ডান এবার অনেকটাই আন্তরিক! কারণ, তারা কোনোভাবেই আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার ঝুঁকি নেবে না।" আমার এই মতামতে হামাসের দায়িত্বশীলরা একমত হলেন। আমরা কয়েক দফা আলোচনা করে ইয়েমেনকে বাছাই করলাম। হামাস নেতারা জানালেন, জর্ডান কর্তৃপক্ষের উচিত ইয়েমেনের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা। ইয়েমেন যদি পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে একমত, হয় তাহলে কোনো আপত্তি থাকবে না। হামাস এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত ও ঝুঁকিমুক্ত হতে একটি লিখিত দলিলও দাবি করল। আমি জানালাম, সাধারণত এই ধরনের কাজগুলো গোপন যোগাযোগ বা সমঝোতার ভিত্তিতে হয় এবং কোনো লিখিত দলিল দেওয়ার সুযোগ নেই, কিন্তু হামাসকে আমি রাজি করাতে পারলাম না। ফলে বাধ্য হয়ে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার কাছে গ্যারান্টিপত্র চাইলাম।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম– জর্ডান কোনো লিখিত ডকুমেন্ট দিতে রাজি হবে না, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তারা রাজি হয়। গোয়েন্দা সংস্থার উপপরিচালক আমাকে জানালেন, লিখিত গ্যারান্টি দিতে তাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। এমনকী তিনি আমাকেই লিখিত গ্যারান্টিপত্র লিখে দিতে বললেন। আমি লিখলাম– "হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আমার মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমরা আমাদের ভাই ইবরাহিম গোসেহকে জর্ডান থেকে সাময়িকভাবে চলে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিচ্ছি। শর্ত থাকবে, তিনি যদি মিডিয়ার সঙ্গে কথা না বলেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ না নেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে জর্ডান কর্তৃপক্ষ তাকে জর্ডানে প্রবেশ করার অনুমোদন দেবে।" এই গ্যারান্টিপত্রে গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার ঊর্ধ্বতন এক কর্মকতা আর হামাসের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর প্রদান করি।'[১১৬]

আসলে গোসেহর এই সমস্যাটি এভাবে তড়িঘড়ি করে সমাধান করা হয়েছিল। কারণ, জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ যেকোনো মূল্যে এই সমস্যার সমাধান চাইছিলেন। সে সময় বাদশাহ আব্দুল্লাহ তখন যুক্তরাজ্য সফরে ছিলেন। অনেকে মনে করেন, বাদশাহ আব্দুল্লাহ দেশের বাইরে থাকায় বুঝতে পারছিলেন, গোসেহর ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিকভাবে জর্ডানের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

---

[১১৬]. হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

যাক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমঝোতার পর সেখান থেকে নাজ্জাল এবং গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবু হাশিম সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে যান এবং ইবরাহিম গোসেহকে পুরো প্রক্রিয়াটি অবহিত করেন। এরপর তিনি ইয়েমেনে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হন।

কিন্তু এর পরপরই সমস্যা শুরু হয়। হঠাৎ করে ইয়েমেন বেঁকে বসে! এই বিষয়টি নিয়ে ইয়েমেন সরকার জর্ডানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল খতিবের ভূমিকায় মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ, জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টা নিয়ে কেবল ইয়েমেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, আর কারও সাথে নয়। ইয়েমেন জানায়, বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে হলে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহকে ব্যক্তিগতভাবে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টকে ফোন দিয়ে অনুরোধ করতে হবে। ইয়েমেনের ভয় ছিল, গোসেহকে নিয়ে যদি তারাও কাতারের মতো বেকায়দা অবস্থায় পড়ে যায়!

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা নাজ্জালকে জানান, তারা খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে! কারণ, তারা বুঝতেই পারছেন না, গোসেহকে কোন দেশে পাঠাতে পারবে। নাজ্জাল সিরিয়ার নাম প্রস্তাব করেন। তবে গোয়েন্দারাও বিকল্প চিন্তা করছিল। পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে নাজ্জাল কিছুই জানতে পারছিলেন না। তিনি গোয়েন্দাদের তৎপরতা জানার জন্য দুই ঘণ্টা বসে থাকলেন, কিন্তু কোনো সংবাদ পেলেন না। বাড়ি ফিরেই তিনি দোহায় অবস্থানরত হামাসের দায়িত্বশীলদের জানালেন, গোসেহকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই।

হামাস ইয়েমেনি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। কিন্তু ইয়েমেন জানাল, গোসেহকে ইয়েমেনে পাঠানো হচ্ছে– এই ধরনের কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা গোটা পৃথিবী বাকযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করল। হামাস অভিযোগ করল, জর্ডান গোয়েন্দাসংস্থা গোসেহকে গুম করে ফেলেছে! অন্যদিকে এই অভিযোগের জবাবে জর্ডান সরকারও তেমন কিছু বলছিল না। কারণ, তারাও জানতেন না গোসেহ কোথায়। কয়েক ঘণ্টা পর গোয়েন্দা সংস্থার উপপরিচালক প্রধানমন্ত্রী রাঘিবকে ফোন দিয়ে জানান– তিনি আর গোসেহ এই মুহূর্তে ব্যাংককে অবস্থান করছেন। বিষয়টি এত দেরিতে জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট ও ক্ষীপ্ত হন। তারপরও তিনি সাথে সাথেই নাজ্জালকে ফোন করে জানান, তারা গোসেহকে নিয়ে কোনো খেলা খেলছে না! গোসেহ ভালো আছে এবং খুব শীঘ্রই তিনি আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন।

এই সময়গুলো গোসেহ কীভাবে পার করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান–

'নাজ্জাল এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করার পর আমি রুমে ফিরে আসি। দুই ঘণ্টা পর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আমাকে জর্ডান ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। আমি নিজেকে সেভাবেই তৈরি করি। আমরা পাঁচজন ছিলাম। প্লেনে আমার দুই পাশে দুজন নিরাপত্তাকর্মী বসেছিলেন। প্লেনে আমি পাইলটের ঘোষণার মাধ্যমে জানতে পারলাম, ইয়েমেন নয়, আমরা আসলে ব্যাংকক যাচ্ছি। ঘোষণা শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সেদিনের বিমানযাত্রাটি ছিল বেশ দীর্ঘ এবং বেশ ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যখন আমাদের বিমানটি কলকাতায় অবতরণ করে এবং সেখানে কিছু যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাংককে অবতরণ করার পর আমরা এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি হোটেলে অবস্থান করি। আমরা আসলে থাইল্যান্ডে প্রবেশই করিনি।

প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য লিখিত আবেদন করতে বলা হয়, যার ভিত্তিতে বাদশাহ আমাকে জর্ডানে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। আমি তাদের কথামতো আবেদন করি। এরপর সেই চিঠি তাৎক্ষণিক সংস্থার পরিচালক সাদ খায়েরের কাছে ফ্যাক্স করেন। সাদ খায়ের সেই সময় বাদশাহ আব্দুল্লাহর সঙ্গে যুক্তরাজ্য সফরে ছিলেন। আমার আবেদনপত্রে তারা খুশি হতে পারেননি। ফলে তারা নিজেরা একটি আবেদনপত্রের নমুনা লিখে পাঠায়। নমুনায় ছিল, আমাকে বাদশাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং হামাসের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আমি সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে ব্যাংককের নির্জন কোনো স্থানে ফেলে রেখে যান, তারপরও আমি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করব না। এ নিয়ে পরবর্তী ছয় ঘণ্টা তাদের সঙ্গে আমার আলোচনা চলে। এক পর্যায়ে তারা আমাকে জর্ডানে অবস্থানরত আমার স্ত্রীকে ফোন করার অনুমতি দেয়। আমি তাদের জানাই– আমি ভালো আছি, ব্যাংককে আছি এবং খুব শীঘ্রই আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো ইনশাআল্লাহ।'[১১৭]

সেদিন মধ্যরাতে জর্ডান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হঠাৎ করে ব্যাংকক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের এমন সিদ্ধান্তের কারণ হলো, ইতোমধ্যে থাই সরকার মিডিয়ার কল্যাণে হামাসের এক উর্ধ্বতন নেতাকে ব্যাংকক বিমানবন্দরে আটকে রাখার খবর জেনে গেছে।

---

[১১৭]. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার আগেই তারা কুয়ালালামপুর পাড়ি জমায়। অবশ্য, তার আগে কুয়ালালামপুর থেকে আম্মানে যাওয়ার জন্য একটি ফ্লাইট প্রস্তুত করা হয়। সেই বিমানে করে অবশেষে তারা জর্ডানের মাটিতে অবতরণ করে।

তারপর একরকম মুখ রক্ষার জন্য জর্ডানের তথ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, জর্ডানের বাদশাহ ইবরাহিম গোসেহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন! কারণ, গোসেহ একটি লিখিত চিঠির মাধ্যমে হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার করেছেন। একই সঙ্গে জর্ডানের তথ্যমন্ত্রী হামাসের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতার সংবাদ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন– 'হামাসের সাথে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।'

মূলত গোসেহ চিঠিতে লিখেছিলেন– 'আমি হামাসের সঙ্গে রাজনৈতিক, মিডিয়া এবং সাংঘঠনিক সব সম্পর্ক অব্যাহত রাখব। আর আমি কখনোই হামাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলিনি।' এর পরিপ্রেক্ষিতে খালিদ মিশাল জানান, হামাসের সঙ্গে জর্ডান সরকারের চুক্তি হয়েছে এবং সেই চুক্তি মোতাবেক গোসেহ জর্ডানের মাটিতে কাজ স্থগিত রাখবেন, কিন্তু হামাসের দায়িত্বে থেকে তিনি আগের মতোই কাজ করে যাবেন।[১১৮]

এভাবেই হামাসের সঙ্গে জর্ডানের টানাপোড়েনের অবসান হয়। হামাস সাংগঠনিকভাবে দোহা, দামেস্ক, বৈরুত ও জর্ডান থেকে কাজ করছিল ঠিকই, কিন্তু বাদশাহ হোসেনের সময় হামাসের যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ছিল, তা অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায়। তবে সার্বিকভাবে জর্ডানও পরাজিত হয়। কারণ, হামাসের সঙ্গে এমন আচরণের কারণে আঞ্চলিক গেমমেকার হিসেবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে জর্ডানের যে ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল, তা হাতছাড়া হয়। ফলে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সব ধরনের সংলাপ, বৈঠক এবং পরবর্তী কৌশলের ক্ষেত্রে মিশরই একক খেলোয়াড় বনে যায়; অথচ এই জায়গায় জর্ডানও থাকতে পারত।

অবশ্য ইবরাহিম গোসেহ জর্ডানে থাকতে পেরেছিলেন, তবে খুবই লো-প্রোফাইলে। জর্ডান কর্তৃপক্ষ তার বিদেশ যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে; এমনকী তিনি হজ বা উমরাতেও যেতে পারেননি। দীর্ঘ বিরতি শেষে ২০০৫ সালে তিনি প্রথম জর্ডানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান।

---

১১৮. কেউ কেউ গোসেহর এই কাজগুলোকে সমঝোতা হিসেবে দেখেন এবং সে কারণে গোসেহর সমালোচনা করেন। তবে গোসেহ তা অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন, তিনি যা করেছেন তা হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছেন।

অন্যদিকে হামাসের সাথে জর্ডান ইখওয়ানের সম্পর্ক এমন একটি জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে উভয় পক্ষই অনুভব করে তারা একক কোনো সংগঠন নয়; তাদের দুই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও এক নয়। ফলে তারা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে একমত হয়। জর্ডানের ইখওয়ান হামাসকে জর্ডানের মাটিতে একটি অবৈধ সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। হামাস কখনোই চায়নি এই দুই সংগঠনের পরিণতি এমন হোক, কিন্তু তাদের সামনে বিকল্পও ছিল না। বাস্তবতা হলো, এত কিছুর পর জর্ডানের তৃণমূল পর্যায়ে হামাসের জনপ্রিয়তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে।

অধ্যায়-৯

হামাস ও পিএলও'র টানাপোড়েন

ইয়াসির আরাফাত ও তার দল ফাতাহ চেষ্টা করেছিল, যেন গোটা পৃথিবী পিএলও-কেই ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে তারা সেই স্বীকৃতি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, অধিকাংশ ফিলিস্তিনিই পিএলও-কে আপন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ইসলামিক জনগোষ্ঠী; যারা ইতঃপূর্বে ইখওয়ান এবং পরে হামাসের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা পিএলও-কে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি। তারা দাবি করত– পিএলও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়, তাই ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব দাবি করার কোনো অধিকার তাদের নেই।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)

এ প্রসঙ্গে পিএলও'র ইতিহাস জানা দরকার। ১৯৬৩ সালে কায়রোতে প্রথম আরব সামিট কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই পিএলও প্রতিষ্ঠা করা হয়। আরব লিগে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মিশরীয়রা আহমাদ আল শুয়াকারিকে নিয়োগ দেয়। তিনি ১৯৬৪ সালের ২৮ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত জেরুজালেমে জেনারেল প্যালেস্টাইন কনফারেন্স আহ্বান করেন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন জর্ডানের বাদশাহ হোসেন। তখন তিনি প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে এই কাউন্সিল ডিক্রি জারি করে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানেইজেশন বা পিএলও প্রতিষ্ঠা করে। শুয়াকারি পিএলও'র প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালে কায়রোতে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইয়াসির আরাফাত পিএলও'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে মরক্কোর রাবাতে আরব লিগের যে সম্মেলন হয়, সেখানে পিএলও-কে ফিলিস্তিনের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার একমাস পর পিএলও-কে পরিদর্শক হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। পরিদর্শক হওয়ায় পিএলও চেয়ারম্যান জাতিসংঘে শুধু বক্তব্য রাখতে পারত, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৮৮ সালে ১২০টি দেশ পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয়।

ইজরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংঘাত চলছে। বর্তমান বিশ্বে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সহযোগিতায় ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইজরাইল জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভূখণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি জায়গা দখল করে। ফলে জেরুজালেম পরিণত হয় একটি বিভক্ত নগরীতে। প্রাচীন জেরুজালেম এবং খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলিমদের পবিত্র স্থানসহ পূর্বদিকের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ নেয় জর্ডান। আর ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণে থাকে পশ্চিম জেরুজালেম। পশ্চিম তীরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা হয়ে পড়ে জর্ডানের অংশ। এতে ৭ লাখ ৮০ হাজার ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু হয়। বস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকে। তারা আশা করে, আবারও একদিন স্বদেশে ফিরতে পারবে।

পিএলও প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনি গেরিলা দল ফেদাইনদের চেয়ে অধিক বৈধ ও সংগঠিত সমর্থন জোগানো। রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি মূলত ফিলিস্তিনের সরকারের দায়িত্ব পালন করেছে। পিএলও প্রতিষ্ঠায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের এবং জর্ডানের বাদশাহ হোসেন।

ফিলিস্তিনিদের ইজরাইলবিরোধী সংগ্রামের পরিপূরক দুটি নাম ইয়াসির আরাফাত এবং পিএলও। ১৯৬৯ সালে এ দুই চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটে। আরাফাত পিএলও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সেই থেকে ২০০৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পিএলও'র নেতৃত্ব দিয়েছেন। অব্যাহত বাধা, হুমকি ও হামলা উপেক্ষা করে পিএলও-কে টিকিয়ে রেখে ফিলিস্তিনের মুক্তি-আন্দোলনকে উজ্জীবিত রাখেন আরাফাত। দখলদার ইজরাইলকে হটিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে অনেক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। এগুলোর একটি ছিল ফাতাহ। ইয়াসির আরাফাত মিশরে জন্ম নিলেও মা-বাবার আদি নিবাস ফিলিস্তিনের টানে ফাতাহ সংগঠনে যোগ দেন। পিতা-মাতা তার নাম দিয়েছিলেন আবু আমর।

নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালে পিএলও-তে প্রাধান্য পায় ফাতাহ। আর ফাতাহর নেতা হিসেবে পিএলও'র চেয়ারম্যান হন ইয়াসির আরাফাত।

এরপর থেকে তিনি পিএলও'র অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। শুরুর দিকে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষপাতী হলেও আশির দশকের শেষদিকে সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন। আরাফাতের প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আরাফাত এই কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মনোনীত এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বর্তমানে পিএলও ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দলগুলোর জোট হিসেবে কাজ করছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস পিএলও'র চেয়ারম্যান।

তবে স্বাধীন ফিলিস্তিন আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন হামাসকে পিএলও'র সদস্য করা হয়নি। এ কারণে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে পিএলও'র জনপ্রিয়তা ও প্রভাব কম। জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ, ইজরাইল পিএলও'র সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখে অন্যান্য দলগুলোর নেতাদের বেছে বেছে হত্যা করেছে; যা পিএলও ও ইজরাইলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির লঙ্ঘন, কিন্তু এসব হত্যা বন্ধে পিএলও কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এমনও হয়েছে– ইজরাইল ফাতাহর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হত্যা করেছে, কিন্তু পিএলও চুপ থেকেছে। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, কিছু পিএলও নেতা (মূলত ফাতাহ) অন্য নেতাকে হত্যার জন্য ইজরাইলকে তথ্য দিয়েও সাহায্য করেছে। ইজরাইলি গুপ্তহত্যার ফলেই পিএলও'র অন্যতম শরিক দল পপুলার লিবারেশন ফ্রন্ট ফর দ্য প্যালেস্টাইন (পিএলএফপি) নেতৃত্বশূন্য হয়েছে। অথচ পিএলএফপি ফাতাহর চেয়ে ছোটো হলেও বেশি সক্রিয় ও নিবেদিত ছিল। ইজরাইল বরং তাদেরই বেশি ভয় পেত। তাদের নেতা ছিলেন জর্জ হাবাশ।

পিএলও'র আর একটি সমালোচনা হলো– তারা ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিষয়ে যতটা ভূমিকা রাখার কথা ছিল, ততটা পারেনি; বরং তারা পশ্চিমাভক্ত আরব শাসক এবং পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলোকে তুষ্ট করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা মনে করেছিল– কেবল এই পরাশক্তি দেশগুলোর কৃপা লাভের মাধ্যমেই ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায় করা সম্ভব, কিন্তু এতে ইজরাইলিদেরই লাভ হয়েছে। তারা পিএলও'র এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেআইনি অনেক কিছু করেছে, যা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিএলও ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে এতটাই উদাসীন ছিল যে, তাদের অবহেলার কারণে পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তাসহ নাগরিক সুবিধাগুলো একেবারে ভেঙে পড়ে। এ সময় নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে হামাস তৃণমূল পর্যায়ে কাজ শুরু করে। ইজরাইলিদের কঠিন দখলদারির মধ্যেও মৌলিক নাগরিক সেবাগুলো সচল করার মাধ্যমে হামাস ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ কারণেই ইজরাইল হামাসকে পিএলও'র সদস্যপদ দেওয়ার বিরোধী। সম্প্রতি ইজরাইলি বিরোধিতা সত্ত্বেও পিএলও হামাসের সঙ্গে ঐক্যমতের সরকার গঠনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজিয়ার্স শহরে পিএলও ও ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ (পিএনসি) এককভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কেবল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম ছিল না; ছিল ফিলিস্তিন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম। ১৯৮৮ সালে ঘোষণার সময়ে কোনো অঞ্চলেই পিএলও'র নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা যে অঞ্চলগুলো দাবি করেছিল, বাস্তবে সেগুলো ইজরাইলের দখলে ছিল। আরবরা দাবি করেছিল– ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে গাজা ও পশ্চিম তীর ছাড়াও বর্তমান ইজরাইলের বেশ কিছু এলাকা ফিলিস্তিনের আওতাধীন। আর এর রাজধানী ছিল জেরুজালেম। বর্তমান বাস্তবতা সেই প্রস্তাবনা থেকে বহু দূরে।

১৯৮৭ সালে সময় একের পর এক ইজরাইলি সহিংসতার বিরুদ্ধে তৎকালীন ফাতাহ সরকারের মনোভাব ছিল রক্ষণশীল। অস্ত্রের জবাব অস্ত্রের মাধ্যমে না দিয়ে তারা ইজরাইলের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল। ফাতাহ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইজরাইলকে সশস্ত্র জবাব দিতে হামাস গঠন করা হয়। হামাস প্রাথমিকভাবে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। প্রথমত, ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ফিলিস্তিনে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

২০০৪ সালে আরাফাতের মৃত্যুর পর হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সাম্প্রতিক সময় আবার যখন এই দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখনই যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ইজরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে চাপ তৈরি করে। তারই অংশ হিসেবে প্রথম জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি এবং পরে গোলান হাইটসকেও ইজরাইলের হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ট্রাম্প প্রশাসন।

১৯৭৪ সালের আরব সম্মেলনের পর পিএলও'র ঘাড়ে অনেক বড়ো একটি দায়িত্ব চলে আসে, যা অধিকাংশ ফিলিস্তিনিই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ, পিএলও'র ওপর ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব চলে আসায় ফিলিস্তিনের বাইরে আরব দেশগুলোর নাগরিকরা দায়িত্ব পালনের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। অন্যভাবে, গোটা আরব অঞ্চলকে ঘিরে জায়োনবাদীদের যে মহাপরিকল্পনা ছিল, তা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে এটাকে কেবল ফিলিস্তিনের ঘরোয়া ইস্যুর রূপ দেওয়া হয়। বিষয়টা এমন দাঁড়ায়– ইহুদিদের আগ্রাসী কার্যক্রম নিয়ে ফিলিস্তিনিদের ছাড়া অন্য কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। পরিস্থিতি এমন, পিএলও যা মেনে নেবে তা গোটা আরবকে মেনে নিতে হবে।

মিশর সব সময়ই ফিলিস্তিনের মুক্তি-সংগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাইত। একই সঙ্গে তারা এই ইস্যুতে নিজেদের প্রভাবও বহাল রাখতে চাইত। তারা নিজেদের মতো করে অন্য আরব দেশগুলোকে এই ইস্যুতে ঐকমত্যে আনার চেষ্টা করত।

১৯৭৩ সালে ইজরাইলের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিশর ইজরাইলের সঙ্গে বিবাদ মেটানোর জন্য একটি শান্তিচুক্তির ব্যাপারে কাজ করছিল। তারই অংশ হিসেবে পিএলও'র ১০ দফা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মিশর ছিল কৌশলী ভূমিকায়। তারা ইজরাইলের সাথে আপসের মাধ্যমে দু-একটা এলাকা যা হাতে পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে যেনতেনভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ৭০'র দশকের মাঝামাঝিতে ফাতাহর অনেকেই বুঝতে পারে, পিএলও'র ১০ দফা তাদের ক্রমশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চেতনা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে; যদিও পিএলও'র কট্টরপন্থি সমর্থকরা কখনোই এই বিচ্যুত হওয়ার অভিযোগ মানতে চায়নি।

১৯৭০ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত পিএলও বেশ কয়েকটি বিপর্যয় মোকাবিলা করে। তার মধ্যে লেবানন ও জর্ডানের বিপর্যয়টি উল্লেখযোগ্য। পিএলও'র সমালোচকরা মনে করত, তারা নিজেদের ভুলের কারণেই এই বিপর্যয়ে পড়েছে। পিএলও নেতাদের সাথে আরবের অন্যান্য নেতাদের ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। সেইসঙ্গে স্বচ্ছতা ও কার্যকর কৌশলের অভাবে পিএলও'র গোটা শাসনব্যবস্থা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ছেয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পিএলও'র বিকল্প শক্তি হিসেবে ইসলামপন্থিরা আবির্ভূত হতে ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে ইসলামপন্থিরা মূলত সমাজসেবার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিল।

এরই মধ্যে আবার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ইসলামপন্থিরাও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তাই জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ইসলামপন্থিদের ক্ষমতার লড়াই দৃশ্যমান হয়। তারপরও ইন্তিফাদার আগ পর্যন্ত পিএলও কখনোই কোনো শক্তিকে নিজের জন্য হুমকি হিসেবে নেয়নি। প্রথমদিকে হামাসকে তারা ইখওয়ানের একটি শাখা মনে করত। তাদের মতে– হামাসের জন্মই হয়েছে ফিলিস্তিনের একক প্রতিনিধি হিসেবে পিএলও'র দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য। হামাসের কর্মকাণ্ড এবং সাহিত্যগুলোতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল। হামাসের প্রথম গঠনতন্ত্রে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ব্যর্থতার জন্য সরাসরি পিএলও-কেই দায়ী করা হয়।

ইয়াসির আরাফাত মনে করতেন, হামাস প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো পিএলও'র সমান্তরাল আরেকটি আন্দোলন, যা তাদের স্বাধীকার আন্দোলনকে ব্যহত এবং শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করবে। যখন আরাফাত মিশরে ইখওয়ানের মুর্শিদে আমের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান, তখন তাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ফিলিস্তিনের ইখওয়ানকে ফাতাহ আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত হওয়ার নির্দেশ দেন। হামাস প্রতিষ্ঠার দিনকয়েক পরেই এক জনসভায় ইয়াসির আরাফাত কট্টর ভাষায় হামাসের সমালোচনা করেন।

আরাফাত হামাস নেতাদের পিএলও'র অংশীদার হওয়ারও আহ্বান জানান। ১৯৯০ সালের এপ্রিলে, হামাসের মুখপাত্র ইবরাহিম গোসেহ আম্মানে ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় গোসেহ স্পিকারকে ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের ব্যাপারে হামাসের ভবিষ্যৎ কিছু পরিকল্পনার একটি কপি তুলে দেন। হামাস সেই প্রতিবেদনে জানায়, তারা ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তবে কাউন্সিলের সদস্যদের অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। যদি কোনো কারণে নির্বাচন করা না যায়, তাহলে হামাসকে অন্তত ৪০ শতাংশ আসন দিতে হবে। কারণ, হামাসের দাবি অনুযায়ী– ফিলিস্তিনের ৪০ শতাংশ মানুষই তাদের সমর্থন করে। স্পিকার জানান, তিনি খুব শীঘ্রই প্রস্তাবের জবাব দেবেন। এরপর পিএলও প্রাথমিকভাবে হামাসকে ১৮টি আসন দিতে রাজি হয়, যা কাউন্সিলের ৪ শতাংশের বেশি নয়। হামাস সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আরাফাত ছিলেন ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের আসন বরাদ্দের মূল নিয়ন্ত্রক। তিনি হামাসকে আরও ৬টি আসন বাড়িয়ে মোট ২৪টি আসন দেওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু এটাও ছিল হামাসের প্রত্যাশার তুলনায় কম।

এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিল বা পিএনসি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই কাউন্সিলটি ফিলিস্তিনের পার্লামেন্টের মতো মর্যাদা পায়, কিন্তু এর সব অধিবেশন হয়েছে ফিলিস্তিনের বাইরে অন্য কোনো দেশে। প্রথম অধিবেশনে যখন কাউন্সিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৪২২। সেই অধিবেশনেই ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল চার্টার প্রণীত হয়। এই কাউন্সিল পরবর্তী সময়ে পিএলও'র নির্বাহী কমিটি গঠন করে। ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে এই কাউন্সিলের ১৯তম অধিবেশন বসে। আর সেখান থেকেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সালে অসলো-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে গাজায় এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কাউন্সিলের যেসব অনুচ্ছেদ ইজরাইলের প্রতিষ্ঠার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছিল, সেগুলো বাতিল করা হয়।

১৯৯৮ সালের অক্টোবরে ওয়াই নদী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে গাজায় আরেকদফা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; সেখানে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও অংশ নেন! সেই সম্মেলন থেকেই সনদে থাকা ওই অনুচ্ছেদগুলো মুছে দেওয়া হয়, যেগুলোতে ইজরাইলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল।

১৯৯০ সালের শেষে এসে ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ৬৬৯-তে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ৮৮ জন সদস্য ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে সরাসরি নির্বাচিত হয়।

৯৮জন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের ভেতর থেকে, যা ১৯৬৭ সাল থেকে ইজরাইলের দখলে আছে; আর ৪৮৩ জন নির্বাচিত হয় ফিলিস্তিনি ডায়াসপোরা থেকে। প্রতি দুই বছর পর পর এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ১৯৯৮ সালের পর থেকে আর কোনো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি।

৯০'র দশকের শুরুর দিকে হামাসের প্রতিনিধিরা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ইস্যুর সমাধান করার চেষ্টা করেন। এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়, যার মধ্যে একটি অনুষ্ঠিত হয় ইয়েমেনে। তারা কাউন্সিলের আসন সংখ্যা, পাশাপাশি ইজরাইলের কারাগারে বন্দি ফাতাহ এবং হামাস নেতা কর্মীদের মুক্তি প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন। যখন ইজরাইল জোরপূর্বক হামাস ও ইসলামিক জিহাদের বেশ কিছু কর্মীকে লেবাননে পাঠিয়ে দেয়, তখন এই দুই দল একত্রিত হয়। সেই সময় আবু মারজুকের নেতৃত্বে হামাসের একটি প্রতিনিধি দল তিউনিশিয়া গমন করে এবং ইয়াসির আরাফাতের সহযোগিতায় তাদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়।

হামাস ও পিএলও'র এই বৈঠকগুলো সাধারণত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৯৩ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুমে, সুদানের ইসলামিক নেতা হাসান আল তুরাবির মধ্যস্থতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধারণা কারা হয়েছিল– এই বৈঠকের মাধ্যমে হয়তো উভয় পক্ষের উত্তেজনা কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে। কিন্তু তা হলো না; বরং সম্পর্ক আরও খারাপ হলো যখন জানা গেল, অসলোতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পিএলও ইজরাইলের সঙ্গে একটি গোপন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসের বারান্দায় পিএলও 'ডিক্লেরেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামক আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। হামাস এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা এবং একে ফিলিস্তিনের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে।

অসলো-চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে ইয়াসির আরাফাত যখন গাজায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সেখানকার মানুষের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভীষণ সন্দিহান ছিলেন। কারণ, গাজাতে হামাসের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব দুটোই বেশি ছিল। আরাফাতের আশঙ্কা ছিল, হামাস হয়তো তার গাজা প্রত্যাবর্তনের আয়োজনে বাধা দেবে। তিনি একজন মধ্যস্থতাকারীকে হামাসের কাছে পাঠান, যাতে তারা কোনো রকমের সমস্যা সৃষ্টি না করে। কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, হামাসের এ ধরনের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না; বরং যখন সদ্য গঠিত প্যালেস্টিনিয়ান সিকিউরিটি ফোর্স জর্ডান থেকে এসে গাজায় নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে, হামাস তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকী তাদের খাবার ও আশ্রয় দিয়েও সাহায্য করেছিল।

শুধু ইয়াসির আরাফাতই নন; যেকোনো ফিলিস্তিনি নাগরিকই তার জন্মভূমিতে ফিরতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়াকে হামাস অনৈতিক বলে মনে করত। আর ইজরাইলি সেনাদের পরিবর্তে ফিলিস্তিনিদের দিয়ে তৈরি করা নিরাপত্তা বাহিনী নিয়েও তারা উচ্ছ্বসিত ছিল।

অসলো-চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ছিল ফিলিস্তিনে বিদ্যমান সংগঠনগুলোকে নিরস্ত্র এবং ইজরাইলের সঙ্গে সব ধরনের শত্রুতাপূর্ণ আচরণ রহিত করা, তবে এই চুক্তি বাস্তবায়ন কখনোই সহজ ছিল না। যেমন : ১৯৯৪ সালের ১৮ নভেম্বর গাজার ফিলাসতিন মসজিদে একদল ফিলিস্তিনি ইজরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছিল, কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বাহিনী খুবই অমানবিকভাবে সেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ চালায়। এতে ১৪ জন হামাস সমর্থক শহিদ হন এবং আরও অসংখ্য মুসল্লি আহত হন। এই ঘটনায় সংক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ জনগণ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সদর দফতরের দিকে অগ্রসর হয়। উত্তেজিত জনতা সেই ভবনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে হামাস নেতারা তাদের শান্ত করে এবং জনতা বাড়ি ফিরে যায়। হামাস এই ঘটনায় আইনসম্মত আচরণ করায় বিভিন্ন মহলের প্রশংসা অর্জন করে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতারা হামাস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সংকট অনুভব করতেন। হামাসের অনেক নেতা তখনও কারাগারে বন্দি। অন্যদিকে দলের নীতি-নির্ধারণী মহলের একটি বড়ো অংশ ফিলিস্তিনের বাইরে অবস্থান করছিল। মূলত সেই সময় পর্যন্ত হামাসের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতেন জর্ডানভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান আবু মারজুক।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ইয়াসির আরাফাত এক ব্যক্তিকে আম্মানে হামাস নেতাদের কাছে পাঠান। আরাফাতের এই দূত হামাস নেতাদের সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানান, কিন্তু হামাস নেতারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করেননি আবার গ্রহণও করেননি। বাধ্য হয়েই আরাফাত গাজায় অবস্থানরত হামাস নেতাদের শরণাপন্ন হন। আরাফাত চাইছিলেন, যাতে হামাস ফিলিস্তিনের আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেয়, যা ১৯৯৬ সালের ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আরাফাতের আহ্বানে গাজা ও পশ্চিম তীরের হামাস নেতারা ইতিবাচক সাড়া দেয়। তবে তারা জানান, সংগঠনের অন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ইজরাইল সরকারের প্রতি অনুরোধ করে, যাতে তারা ফিলিস্তিনে কর্মরত একটি প্রতিনিধি দলকে খার্তুমে যেতে দেয়।

খার্তুমে হামাসের অন্য শাখার নেতাদের সঙ্গে তাদের বৈঠক করার প্রয়োজন ছিল। সেই বৈঠকের পরই মিশরের কায়রোতে আরেকটি বৈঠকও নির্ধারিত ছিল। এই বৈঠকে প্রথমবারের মতো দলের নীতি-নির্ধারণী মহল একসঙ্গে বসার সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য কারাবন্দি থাকার কারণে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা যোগ দিতে পারেননি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ আহমাদ ইয়াসিন, আব্দ-আল আজিজ রানতিসি এবং মুসা আবু মারজুক।

গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন এবং পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ইজরাইল উভয়ই আশা করেছিল, এই বৈঠকে যেহেতু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শাখা একত্রে বসতে পারবে, তাহলে তারা সব দিক বিবেচনা করে সহিংস আন্দোলনের পথ পরিহার করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে।

এই বৈঠকে নিজেদের মধ্যে খুবই খোলামেলা আলোচনা হয়। এরপরও মাঝে মাঝে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনের ভেতরে থাকা হামাস নেতারা শক্তভাবে সামরিক কার্যক্রম বন্ধ এবং নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। কারণ, তাদের মতে এমনটি হলে বিদ্যমান সংকটগুলো কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।

চারদিন ধরে আলোচনার পর হামাস নেতারা দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছিল তা নয়, তবে অধিকাংশই এই দুই সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি হলো– প্রতিরোধ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, তা কোনোভাবেই রহিত করা যাবে না। তবে প্রতিরোধ আন্দোলন কতটা তীব্র হবে, মাঝামাঝি নাকি প্রকট– তা নির্ধারণ করার অধিকার দলের হাতে থাকবে। দল পরিস্থিতির আলোকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। দ্বিতীয়ত, তারা ফিলিস্তিনের আইনসভার নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো– এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অসলো-চুক্তির ভিত্তিতে, আর অসলো-চুক্তি জায়োনবাদী প্রকল্পের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তা ছাড়া তাদের আরও যুক্তি ছিল, অসলো-চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিনের আইনসভার কতটা বহাল থাকবে আর কতটা বিলুপ্ত হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ইজরাইল। প্রথম দিকে যারা প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ করে নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন, তাদের বেশিরভাগ আলোচনার শেষ এসে অবস্থান পরিবর্তন করেন। অবশ্য কয়েকজন এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তবে সবাই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। কারণ, বৈঠকটি ছিল গণতান্ত্রিক এবং নিয়মসম্মতভাবেই এই প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

আম্মান থেকে যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেবল ইবরাহিম গোসেহ ফিরে যান। বাকিরা চলে যান কায়রোতে এবং সেখানে তারা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের তৎকালীন স্পিকার সেলিম আল জানুন। আরও ছিলেন হামাসবিরোধী কট্টরপন্থি কিছু নেতা, যার মধ্যে অন্যতম আবু আল শাহিন, আলি তৈয়ব, হাসান উসফুর, আবু মাদায়িন এবং নাবিল উমার। এই ব্যক্তিরা হামাসকে সহ্যই করতে পারতেন না। তারপরও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের হামাসের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য পাঠিয়েছিল। এর দ্বারা তাদের দুরভিসন্ধি ও আন্তরিকতার অভাব প্রকটভাবে ধরা পড়ে। একরোখা ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনার ফল যা হওয়ার কথা তাই হলো। বৈঠকটি শেষ পর্যন্ত কোনো ফলাফল ছাড়াই ভেস্তে গেল।

বৈঠকে অপ্রত্যাশিতভাবেই একটি ইস্যু আলোচনায় উঠে আসে, যা উভয় পক্ষের তিক্ততাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সেটা হলো– ১৯৮৭ সালের ইন্তিফাদা মূলত কারা শুরু করেছিল? ফাতাহর কিছু নেতা দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করেন, ইন্তিফাদার পেছনে হামাসের কোনো ভূমিকাই ছিল না। হামাস নেতা আব্দ-আল ফাত্তাহ এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন– যখন গাড়ি চালিয়ে অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়, তখন তিনি ইখওয়ানের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তারা জরুরি বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠক থেকেই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়, যার পরিণতি ইন্তিফাদা। তিনি ইন্তিফাদায় ফাতাহর ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি। তবে তিনি বলেন– ওই হত্যাকাণ্ড কেন্দ্র করে যে ইন্তিফাদা শুরু হয়, তা আর কিছু নয়; একটি দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনারই ফসল।

ইয়াসির আরাফাত সেই সময়ে কায়রোতে ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল, হামাস ও ফাতাহর বৈঠকের এক পর্যায়ে তিনি যোগ দেবেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন হামাস প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন তিনি না যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।[১১৯] ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ হামাসকে এই দুটো সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে খুব সামান্য ভূমিকাই পালন করেছিল। হামাস নেতারা আশঙ্কা করছিলেন– তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তাহলে এর মাধ্যমে অসলো-চুক্তিকেই বৈধতা দেওয়া হবে।

আলোচনার মাধ্যমে হামাসের সাথে সমঝোতা করতে না পারলেও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ নানাভাবে হামাসের ওপর দমন-নিপীড়ন অব্যাহত রাখে। মানবাধিকার সংস্থা

---

১১৯. ইয়াসির আরাফাত নিজেকে ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ও অভিভাবক মনে করতেন। এ কারণে তিনি ফিলিস্তিনের কর্তৃপক্ষের একটি দল নিয়ে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসাটিকে জরুরি মনে করেননি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৬ সালে ফিলিস্তিন বিষয়ে একটি মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে; যেখানে তারা ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়ের মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা খতিয়ান তুলে ধরে। এতে দেখা যায়, এই এক বছরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণে ১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। এর মধ্যে ৪০ জনকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালতে বিশেষ মামলায় জড়ানো হয় এবং বিচার শেষে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ২৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সেইসঙ্গে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বন্দিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানোরও অভিযোগ আনে এবং দাবি করে, আটক অবস্থায় নির্যাতনের শিকার হয়ে পাঁচজন বন্দি মৃত্যুবরণ করেছে।

উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালে ইয়াসির আরাফাতের এক ডিক্রির মাধ্যমে এই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কোর্টে মামলাগুলো গোপনে চালানো হতো। অধিকাংশ সময় মাঝরাতে বিচারকার্য চলত। সামরিক ব্যক্তিরা বিচারক এবং প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করত; এমনকী কোর্ট যেসব অভিযুক্তদের ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ করত, তারাও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যই ছিল। অভিযুক্তের পরিবার-পরিজনরা শুনানির পরই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে পারত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্য আরও বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এই আদালতের কার্যক্রমকে অস্বচ্ছ, অন্যায্য এবং মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করে।[১২০] *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* এক প্রতিবেদনে জানায়, ইজরাইল ও আমেরিকান প্রশাসন এই আদালতের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়– যতদিন ফিলিস্তিনিরা সহিংসতা বন্ধ না করবে, ততদিন শান্তিচুক্তি বহাল রাখার স্বার্থে মাঝরাতের এই বিচারিক আদালত অব্যাহত রাখতে হবে।

হামাসের সামরিক শাখার কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশের হত্যার ৫০ দিন পর হামাসের সামরিক শাখা পালটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে শহিদি অপারেশন চালু করে। প্রথম তিন অপারেশনেই ৫০ জন ইজরাইলি সেনা নিহত এবং আরও শতাধিক আহত হয়। এই ৩টি অপারেশন পরিচালিত হয় জেরুজালেম এবং আসকেলন এলাকায়। ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চ, শারম আল শেখে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পরপরই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ হামাস ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে মারাত্মক দমন অভিযান শুরু করে। সেই অভিযানে হামাসের এক হাজারেরও বেশি নেতা-কর্মী আটক হয়। একই সঙ্গে হামাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরের মাসে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অভিযানে আরও ২৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

১২০. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এই প্রতিবেদনের লিংক দেওয়া আছে রেফারেন্স নং ৫৫-তে।

হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক চূড়ান্ত রকমের অবনতি ঘটে, যখন হামাসের বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। বিশেষ করে শীর্ষ কমান্ডার মুহিউদ্দিনকে হত্যার জন্য হামাস ফিলিস্তিনি গোয়েন্দা সংস্থাকে সরাসরি অভিযুক্ত করে। মুহিউদ্দিনকে ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ হত্যা করা হয়। একই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর দুই সহদরকে হত্যা করা হয়। এসবের পাশাপাশি আটক করা হয় হামাসের কয়েকজন নেতাকে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের এমন অন্যায়-অত্যাচার সদ্য কারামুক্ত হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিনকেও ক্ষীপ্ত করে তোলে। তিনি ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, হামাসকে নির্মূলের চেষ্টা না করে তারা যেন ইজরাইল ও আমেরিকার যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।[১২১] শেখ ইয়াসিন বিশ্বাস করতেন, ফিলিস্তিনি প্রশাসন ইজরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মদদেই এই দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন– হামাসের কেউ যদি আইনবিরোধী কাজ করে, তাহলে তাদের আইনানুগভাবে গ্রেফতার করে বিচার করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তা না করে তাদের অবৈধভাবে হত্যা এবং বন্দি করে রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ হামাস পরিচালিত এমন কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, যা ইজরাইলও কখনো বন্ধ করার সাহস পায়নি। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য শেখ ইয়াসিন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আর ইজরাইলের মধ্যে সম্পাদিত কথিত শান্তিচুক্তিকেই দায়ী করে বলেন, এই চুক্তি অনতিবিলম্বে বাতিল করা উচিত। তিনি ইজরাইলের সমালোচনা করে বলেন, গাজা দখলে করার সময় তারা যে কাজগুলো করতে পারেনি, এখন সেগুলোই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।

ইয়াসির আরাফাত অবশ্য সরাসরি শেখ ইয়াসিনের সঙ্গে কখনোই বাদানুবাদে জড়াতে সাহস পাননি, তবে তিনি দূর থেকেই শেখ ইয়াসিন ও তার সংগঠনের কট্টর সমালোচনা করতেন। আরাফাত আম্মান বৈঠকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে না গিয়ে উলটো হামাসের সমালোচনা করেন। হামাসের আত্মঘাতী বোমা হামলারও তীব্র নিন্দা করেন তিনি। আরাফাত দাবি করেন, হামাসের এমন কর্মকাণ্ডের জন্যই ইজরাইল প্রতিশ্রুত বেশ কিছু ভূমি ফিলিস্তিনিদের দিতে অনীহা প্রকাশ করছে। তিনি দাবি করেন, অসলো-চুক্তি করে তারা সঠিক কাজ করেছে এবং হামাসের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনী যা করার তাই করবে।[১২২]

এসব তর্ক-বিতর্কের এক বছর পর ১৯৯৯ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে গাজায় পিএলও'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকার জন্য

---

[১২১]. বিবিসি নিউজে ১৯৯৮ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রচারিত।

[১২২]. বিবিসি নিউজ, ১৯৯৮ সালের ১৯ এপ্রিল প্রচারিত সংবাদ।

ইয়াসির আরাফাত শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে আমন্ত্রণ জানান। এই বৈঠকে পূর্ব ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ মে তারিখে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। জর্ডানস্থ হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেখ ইয়াসিন পিএলও'র বৈঠকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতারা শেখ ইয়াসিনের এই সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা মনে করছিল– এর পেছনে আরাফাতের অন্য কোনো চাল থাকতে পারে। রাজনৈতিক শাখা শুধু আপত্তি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা একটি বিবৃতি দেয়। সেখানে বলে– পিএলও'র বৈঠকে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত শেখ ইয়াসিনের একান্ত ব্যক্তিগত; দলের নয়। হামাসের রাজনৈতিক শাখার এই বিবৃতি সত্ত্বেও শেখ ইয়াসিন তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি নিশ্চিত করেন, ব্যক্তিগতভাবেই তিনি বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন, যাতে অসলো-চুক্তির ব্যাপারে তাদের আপত্তি সকলের সামনে গ্রহণযোগ্য আকারে উপস্থাপন করা যায়। এ ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে শেখ ইয়াসিন বলেন–

> 'আমি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বৈঠকে গিয়েছিলাম, যাতে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মতামত দিতে পারি। আমরা চিঠি পাঠিয়ে কিংবা সংবাদ সম্মেলন করেও নিজেদের মতামত জানাতে পারতাম, কিন্তু আমি জনসম্মুখে কথা বলার সুযোগটা নিতে চেয়েছি। কারণ, কেউ যেন বলতে না পারে, নিজেদের জাতীয় স্বার্থে কোনো ভূমিকা পালন করা থেকে আমরা পিছিয়ে এসেছি। আমি সেই বৈঠকে বলেছি– "ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যে অসলো-চুক্তি করেছে এবং তার ধারাবাহিকতায় আরও যেসব চুক্তি করেছে, তা সবই অবৈধ। সবগুলো চুক্তিই ব্যর্থ হবে। কারণ, আমাদের শত্রুপক্ষ শান্তিতে বিশ্বাস করে না। আমাদের শত্রুরা সবকিছুই চুরি করে নিয়ে নিতে চায়। তাদের চুরি করার শক্তি আছে, অথচ আমাদের তা প্রতিহত করার শক্তি নেই।
>
> আজ ফিলিস্তিনের জনগণ শত্রুকে মোকাবিলা করার সকল সুযোগ ও শক্তি হারিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করে না; বরং অস্ত্র ধারণ করে কৌশল প্রণয়ন করে। অথচ আমরা লড়াইয়ের শুরুতে কোনো প্রাপ্তি ছাড়াই অস্ত্র বিসর্জন দিয়েছি এবং আশা করে বসে আছি, শত্রুরা নিজ থেকেই আমাদের পুরস্কার দিয়ে যাবে। এটা প্রমাণ করে, আমরা লড়াইয়ের প্রথম রাউন্ডেই পরাজিত হয়েছি। এই পরিস্থিতিতে আমি আমার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভাইদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি,

দয়া করে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন। কারণ, আমাদের বর্তমান সকল ভোগান্তির কারণ এই চুক্তি। আমরা অর্থাৎ হামাস সব সময় আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রবাসে থাকা আমাদের অন্য ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু মাত্র দুদিন আগে বৈঠকের দাওয়াত পাওয়ায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'"

শেখ ইয়াসিন এ সময় দাবি করেন, হামাসের অভ্যন্তরীণ ও প্রবাসী শাখার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই, তবে যোগাযোগের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তিনি জানান- যেহেতু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পর্যবেক্ষক হিসেবে বৈঠকে যোগ দিয়েছি, তাই হামাস পিএলও'র নীতি-নির্ধারণী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছে- এটা বলার কোনো সুযোগ নেই।

এই ঘটনায় জর্ডানে থাকা হামাসের রাজনৈতিক শাখা এবং ফিলিস্তিনে বসবাসরত হামাসের দলীয় শাখার মধ্যে দ্বন্দ স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা একমত হতে পারল না, প্রকৃত অর্থে হামাসের দায়িত্বে কে আছেন! তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল- শেখ ইয়াসিন বা গাজায় থাকা হামাসের নেতারা এই বৈঠকে যাওয়ার ব্যাপারে জর্ডানের রাজনৈতিক শাখার মতামত নিতে প্রয়োজন বোধ করেনি; যদিও ১৯৮৯ সাল থেকে রাজনৈতিক শাখাই হামাসের মূল নীতি-নির্ধারণী হিসেবে পরিচিত ছিল।

গাজার হামাস নেতারা পিএলও'র বৈঠকে শেখ ইয়াসিনের যোগ দেওয়াকে তেমন কিছু মনে না করলেও এটি সংগঠনের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের বিভাজন প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। হামাসের অনেক নেতাই মনে করতেন, এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে পিএলও-কে ফিলিস্তিনের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেল। সেইসঙ্গে হামাসের সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার কার- সেই ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে এলো।

হামাস ও ফাতাহর সম্পর্কের সর্বশেষ আপডেট

২০০৪ সালে আরাফাতের মৃত্যুর পর হামাস ও ফাতাহর সম্পর্ক অবনতি হয়। আর তা চরম আকার ধারণ করে ২০০৬-এর নির্বাচনের পর। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ফিলিস্তিনের দুই অংশ, পশ্চিম তীর ও গাজা দুই দলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সেই থেকে ফাতাহ পশ্চিম তীর এবং হামাস গাজা শাসন করছিল।

কিন্তু ইজরাইল হামাসকে কখনোই ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাদের মতে, হামাস একটি জঙ্গি সংগঠন। হামাস গাজা থেকে রকেট হামলা চালাচ্ছে– এমন দাবি তুলে ইজরাইল প্রায়ই গাজাতে হামলা চালায়। এ ব্যাপারে হামাসও ইজরাইলকে চড়া মূল্য দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

২০১৭ সালের অক্টোবরে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে মতৈক্যের সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা হলে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। বৈঠকের পর যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তার ভাষা ইতিবাচক হলেও কিছু বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, যেগুলো সমঝোতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন : গাজার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এবং হামাসের সামরিক শাখার কী হবে, আর গাজার সরকারি কর্মকর্তাদের কী হবে ইত্যাদি।

ফাতাহর সঙ্গে লড়াইয়ের পর ২০০৭ সালে হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়। ২০০৬ সালের নির্বাচনে হামাস জেতার পরও ফাতাহ তা মেনে নেয়নি। সে কারণে গাজা উপত্যকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য হামাসকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা তৈরি করতে হয়েছিল। বর্তমানে গাজার জনজীবনের সবকিছুই হামাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

অন্যকথায়, গত ১০ বছরে সেখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হামাস পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করেছে। তাহলে সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কী হবে?

এটা পরিষ্কার, একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া কেমন হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। উভয় পক্ষের শীর্ষ নেতৃত্ব কোনো কাঠামোর ব্যাপারে একমত না হলে এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হতে পারে। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস একাধিকবার এ কথা বলেছেন– এই সমঝোতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে গাজার ওপর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে হামাস ঘোষণা দিয়েছে– তার সশস্ত্র শাখা ভবিষ্যৎ সমঝোতা-প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে না, তাই গাজার মতৈক্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সামরিক শাখা বিলুপ্ত করবে না।

বাস্তবতার হলো– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যদি গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব বুঝে নেয়, তাহলে গাজা সীমান্তে ইজরাইলিদের অনুপ্রবেশ, বিমান হামলা ও নৌ-সেনাদের হাত থেকে গাজার জেলেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে। দীর্ঘকাল এসব হামাসের জন্য অস্বস্তিকর ছিল! কারণ, তাদের পক্ষে এসব সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণে গাজাবাসীও হামাসের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। তাই নতুন কোনো ব্যবস্থা চালু হলে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই এসব পুরোনো সমস্যার কার্যকর সমাধান দেখতে চাইবে।

শেষ যে বিষয়টি এই শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়াকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে তা হলো-গাজায় হামাস নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত ৫০ হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ। তাদের ওপর প্রায় আড়াই লাখ মানুষ নির্ভরশীল। তারা প্রায় ১০ বছর ধরে গাজার প্রশাসনের ভার বহন করে আসছে। ফলে তাদের অধিকার লঙ্ঘন কিংবা বেতন-ভাতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা কাটছাঁট করা হলে তারা বেঁকে বসবেন। আলোচনার সময় হামাস খুব একরোখা ছিল। তাদের দাবি, এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কর্মীদের সমমর্যাদা দিতে হবে।

তবে আগ্রাসী ইজরাইলকে মার্কিন প্রশাসন যেভাবে সাহায্য করছে, তাতে যেকোনোভাবেই ফিলিস্তিনিদের একতা অপরিহার্য। ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই বিভাজিত হয়ে থাকলে আগামীতে তারা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

অধ্যায়-১০

আবারও ইন্তিফাদা এবং দুই কিংবদন্তির প্রস্থান

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা

১৯৯৯ সালের ১৭ মে, ইয়াহুদ বারাক ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ১৯৯৬ সালে বেনজামিন নেতানিয়াহু ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ফিলিস্তিনি প্রশাসকদের ভেতরে যে হতাশা কাজ করছিল, তা যেন কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। এদিকে ইয়াহুদ বারাক আরব গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতের অবসানকল্পে দৃঢ় অঙ্গিকার করেন। তিনি সিরিয়ার সাথেও সমঝোতায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই মোতাবেক ২০০০ সালের মার্চে তিনি বিল ক্লিনটনকে প্রভাবিত করে জেনেভায় সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন।

২০০০ সালের মে মাসে তিনি লেবানন থেকে ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। সেইসঙ্গে জানান– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি কার্যকর চুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত, উদ্বাস্তু, ইহুদি বসতি নির্মাণ এবং জেরুজালেম নিয়ে বিদ্যমান সংকটগুলোর একটি সমাধান হবে।

কিন্তু জেনেভা সম্মেলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বারাকের আদেশে সেনা প্রত্যাহারের ঘটনাকে মুসলিমরা হিজবুল্লাহর কাছে ইজরাইলের পরাজয় হিসেবে চিত্রায়িত করে। ফিলিস্তিনি ইস্যুতেও আরও একটি বৈঠক করার জন্য বারাক ক্লিনটনকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইয়াসির আরাফাত সম্ভাব্য এই বৈঠক নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। কারণ, বারাক কয়েক দফা প্রতিশ্রুতি দিলেও ফিলিস্তিনিদের সাথে স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তিরই

পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। কথা ছিল বারাক ৩৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি এবং জেরুজালেমের ৩টি গ্রাম ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন, কিন্তু তা না করে তিনি জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে নতুন করে আরও ইহুদি বসতি স্থাপন করেন। নেতিবাচক আশঙ্কা থাকার পরও আরাফাত সেই বৈঠকে যোগ দেন। ২০০০ সালের ১১ জুলাই ক্যাম্প ডেভিডে বৈঠকটি শুরু হয়ে কোনো ইতিবাচক ফলাফল ছাড়াই ২৫ জুলাই শেষ হয়।[১২৩]

ক্যাম্প ডেভিড বৈঠকের ব্যর্থতাকে পশ্চিম তীর ও গাজার মানুষ প্রচণ্ড আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। কারণ, তারা মনে করেছিল বৈঠকটি সফল হলে ফিলিস্তিনিদের আরও ছাড় দিতে হতো। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই ফিলিস্তিনে ফিরেই ইয়াসির আরাফাত বিরোচিত সংবর্ধনা পান। এতদিনে যারা তার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত ছিল, তারা পুনরায় তাকে দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

অন্যদিকে ইজরাইল ও আমেরিকা ব্যর্থতার জন্য এককভাবে ইয়াসির আরাফাতকেই দায়ী করেন। আরাফাত এই বৈঠকে অবশ্য দুটো ইস্যুতে ছাড় দিতে রাজি হননি, যা ফিলিস্তিনিরা অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে নিয়েছিল। একটি হলো, জেরুজালেমের মর্যাদা। তিনি দাবি করেছিলেন– যেসব ফিলিস্তিনিকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের দ্রুততার সাথে আদি জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। আরাফাতের এই বলিষ্ঠ ভূমিকা কেবল তার ইমেজই বৃদ্ধি নয়; বরং তাকে হামাসের কাছাকাছিও নিয়ে আসে। ফলে হামাসের পাশাপাশি আরাফাত ও তার সংগঠনকে ইজরাইল এবং সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দমননীতির শিকারে পরিণত হয়। একই সঙ্গে নতুন আরেকটি সংকটও দেখা দেয়। আরাফাতের সাথে থাকা ফাতাহ এবং পিএলও'র অনেকের তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এরিয়েল শ্যারন ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীসহ বাইতুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে ইহুদি প্রধানমন্ত্রীর প্রবেশকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় দ্বিতীয় ইন্তিফাদা। আর এই ইন্তিফাদা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ফিলিস্তিনি জাতিকে অনেক বেশি একতাবদ্ধ করে।

২০০০ সালের ৮ অক্টোবর, ইয়াসির আরাফাত পিএলও'র সকল অঙ্গ-সংগঠনকে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। এই মিটিংয়ে গাজা ও পশ্চিম তীরের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইতঃপূর্বে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সকল বৈঠকে হামাসের

---

১২৩. ক্যাম্প ডেভিড-এর ব্যর্থতা নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে রেফারেন্স ৫৬-তে।

প্রতিনিধিদের নিষিদ্ধ রাখা হলেও এবারই প্রথম তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়। হামাস প্রতিনিধিও সসম্মানে এই বৈঠকে যোগদান করেন। ইজরাইলের ভেতর-বাহির সবাই এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। ইজরাইলি পত্রিকা *মারিভ* গাজা বৈঠককে ফিলিস্তিনি জাতির একতার নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়– 'ফিলিস্তিনি জনগণের সাম্প্রতিক এই গতিবিধির প্রতিক্রিয়ায় হামাস ও ইসলামিক জিহাদ ইজরাইলের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা চালাতে উৎসাহিত হবে। হামাসকে বুকে টেনে নেওয়ার মাধ্যমে আরাফাত একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আপন করে নিয়েছে। ফলে তারা উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি অন্যায় করতে অনুপ্রাণিত হবে।'[১২৪]

গাজার সেই বৈঠকে হামাসের গাজা শাখার নেতা ইসমাইল আবু শানাব হামাসের প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠক শেষে[১২৫] তিনি জানান, ইজরাইলি দখলদারিত্বের প্রতিরোধে এই বৈঠক প্রথম পদক্ষেপ। তিনি আরও জানান, বৈঠকে তিনি ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জেলখানায় যত বন্দি ছিল, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অন্যদিকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইল পশ্চিম তীর ও গাজায় বোমাবর্ষণ শুরু করে। অনেকেই মনে করে আরাফাতের সর্বদলীয় বৈঠকে ক্ষুব্ধ হয়ে ইজরাইল এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুক্তি পাওয়াদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন হামাসের নেতা ও কর্মী। তাই ইয়াহুদ বারাক অভিযোগ করেন, হামাসের এই নেতা-কর্মীরা যদি আবারও ইজরাইলের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করে, তাহলে এর জন্য ইয়াসির আরাফাতই দায়ী থাকবেন! কারণ, তিনিই তাদের মুক্তি দিয়েছেন। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ দাবি করে, তারা কাউকেই ছেড়ে দেয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জেল কর্তৃপক্ষ তাদের মুক্তি দেয়। অন্যদিকে বার্তাসংস্থা *এপিকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া জানান, ৩৫০ জন কারাবন্দি মুক্তি পেয়েছেন। কারণ, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জেলে তাদের নিরাপত্তা দিতে পারছিল না। তবে ইজরাইলিরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না; যদিও তারা নিজেরাও এর আগে অনেক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারেনি বা করেনি।

এরপরে আরও বেশ কয়েকবার সমঝোতা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনোটাই সফল হয়নি।

---

[১২৪]. বিবিসি নিউজ, ২০০০ সালের ১১ অক্টোবর এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়।
[১২৫]. কুদস প্রেস, ২০০০ সালের ৯ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদন।

অবশেষে ২০০১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ইজরাইলের জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এরিয়েল শ্যারন। তিনি ইয়াসির আরাফাতকে একদমই পছন্দ করতেন না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে বোঝাতে সক্ষম হন, আরাফাত শান্তিকামী নন! কারণ, হামাস বা ইসলামিক জিহাদের মতো সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ইতঃপূর্বে আরাফাত যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করেননি।

আরাফাত মূলত দ্বিধায় ছিলেন। একদিকে ফিলিস্তিনিদের কাছে নিজেকে তাদেরই লোক হিসেবে প্রমাণ দেওয়া এবং ইজরাইলের আক্রমণের বিপরীতে সবাইকে নিয়ে মোকাবিলা করা, অন্যদিকে ইজরাইল ও পশ্চিমা মহল তাকে যেভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করতে চাইছিল, সেখান থেকেও তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হামাসের সঙ্গে আবারও সম্পর্ক খারাপ হওয়া শুরু করে।

২০০১ সালের ৯ আগস্ট। জেরুজালেমে এক আত্মঘাতী বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরাফাত দুই হামাস কর্মীকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। সেই বোমা হামলায় বেশ কিছু ইজরাইলি নিহত হয়েছিল। যদিও হামাস বলেছিল, নাবলুসে তাদের দুই নেতাকে ইজরাইলিরা হত্যা করেছিল বিধায় এই হামলা চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ইজরাইলিরা প্লেন থেকে বোমা ফেলে সেই দুই নেতাকে হত্যা করে। ওই হামলায় দুই নেতা ছাড়াও হামাসের মিডিয়া দফতরের আরও চার কর্মকর্তা এবং দুই শিশু নিহত হয়।

যাহোক, আরাফাতের গণগ্রেফতারের আদেশে হামাস তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বলে– 'এভাবে চলতে থাকলে আবারও ইন্তিফাদার ডাক দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না।'[১২৬]

২০০১ সালের ২৩ নভেম্বর, ইজরাইল এক গুপ্ত হামলা চালিয়ে হামাসের সামরিক শাখার অন্যতম শীর্ষ নেতা আবু হানুদ এবং তার দুই সহযোগীকে হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ২০০১ সালের ১ এবং ২ ডিসেম্বর হামাস বেশ কিছু বোমা হামলা চালালে ২৫ জন ইজরাইলি নিহত এবং আরও শতাধিক আহত হয়। এই হামলার পরপরই ইয়াসির আরাফাত হামাসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গ্রেফতার অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। এই অভিযানে দুই শতাধিক হামাস নেতা গ্রেফতার হয়।

হামাস প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিনকে গৃহবন্দি করার জন্য নিরাপত্তা কর্মীরা অগ্রসর হলে তাদের সঙ্গে হামাস কর্মীদের বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এই ধরপাকড় এবং নিপীড়নের ঘটনায়

---

[১২৬]. ২০০১ সালের ১১ অক্টোবর বিবিসি নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

গোটা গাজা উপত্যকায় হামাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। শেখ ইয়াসিন গৃহবন্দি হয়েছেন এই গুজব ছড়িয়ে পড়লে গাজার বাড়িঘর থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসে এবং জীবনের বিনিময়ে শেখ ইয়াসিনকে রক্ষা করার ঘোষণা দেয়।

১৯ ডিসেম্বর ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনী হামাসের আরেক সিনিয়র নেতা আব্দ-আল আজিজ রানতিসিকে গ্রেফতারের জন্য তার বাড়িতে অভিযান চালাতে গেলে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানে হামাস সমর্থক এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়। ঘটনায় বাড়াবাড়ি করার দায়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর ১৫ সদস্যকে আটক এবং একই সঙ্গে হামাসের ৩২টি দফতর বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যাই করুক না কেন, তা কোনোভাবেই ইজরাইলকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এরিয়েল শ্যারন তক্কে তক্কে আছেন কখন তিনি আরাফাতকে বিপর্যস্ত করার একটা চূড়ান্ত সুযোগ পাবেন। ২০০২ সালের জানুয়ারির শুরুতে যখন মার্কিন দূত জেনারেল জিন্নি রামাল্লাহ সদর দফতরে আরাফাতের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন, তখনই ইজরাইল 'কারিন' নামক একটি জাহাজ আটক করার ঘোষণা দেয়। তারা বলে, জাহাজটি অবৈধ অস্ত্র নিয়ে গাজার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এবং আরাফাতের আদেশেই অস্ত্রগুলো আমদানি করা হয়েছে বলে তারা জানায়।

এই ঘটনা ছিল ইজরাইলের সেই চূড়ান্ত আঘাত। এরপর তারা ঘোষণা দেয়– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আরাফাতের স্থলে নতুন কোনো নেতাকে সামনে নিয়ে না আসা পর্যন্ত নতুন কোনো আলোচনা কিংবা চুক্তি নয়! তারা মূলত যেকোনো মূল্যে আরাফাত যুগের অবসান চাইছিল। আরাফাতের পথ তখনই রুদ্ধ হয়, যখন বুশ বলেন– 'ফিলিস্তিনিদের এখন নতুন নেতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

তবে আরাফাতের বিকল্প খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ছিল না। তার কোনো ডেপুটি বা উপপ্রধান কখনোই ছিল না। সাধারণ ফিলিস্তিনিরা তাকে 'ইখতিয়ার' বা মুরব্বি বলে ডাকত। জনগণের সামনে আর কেউ ছিলও না, যাকে তারা সেই মুরব্বির আসনে বসাতে পারে।

বিষয়টি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বেশ জটিলতার মধ্যে ফেলে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছিল– তারা কোনো অবস্থাতেই নতুন নেতা ছাড়া রোডম্যাপের বাস্তবায়নে এগোবে না। মূলত এই রোডম্যাপটি দিয়েছিল জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ। তিনি ২০০২ সালের ১ আগস্ট প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে সাক্ষাৎকালে এই রোডম্যাপটির প্রস্তাব করেন।

যুক্তরাষ্ট্র একটাই শর্ত ছিল, আরাফাতকে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে তার হাতে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে! তাহলেই যুক্তরাষ্ট্র এই কাজে সহায়তা করবে। ফলে এই চিন্তার সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া আরাফাতের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তিনি মাহমুদ আব্বাসকে ফিলিস্তিনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

২০০৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে দ্বিজাতি রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের একটি পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভার পড়ে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঘাড়ে।

২০০৩ সালের ১ মে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে মার্কিন অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং পরের এসাইনমেন্ট হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব দেন। ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাহমুদ আব্বাসও এই প্রক্রিয়া মেনে নেন। অবশ্য আরাফাত ও হামাস এই রোডম্যাপকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ, তারা বুঝতে পারছিলেন– এই রোডম্যাপের মাধ্যমে তারা আবারও বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন।

বিস্ময়কর বাস্তবতা হলো, মাহমুদ আব্বাস আগাগোড়াই ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু যেদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসলেন, সেদিন থেকে আরাফাতের সাথে তার সম্পর্ক দা-কুমড়োতে পরিণত হলো। মাহমুদ আব্বাস যেন আরাফাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। আব্বাস অনুভব করলেন– যতক্ষণ তার হাতে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা না আসবে, ততক্ষণ তিনি কার্যকর কিছুই করতে পারবেন না। তাই তিনি তার চারপাশে আরাফাতের কিছু সমালোচককে নিয়ে চলতে শুরু করলেন, যারা আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের ব্যাপারে নমনীয় ছিল। কিন্তু তারাও আব্বাসকে কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা পাওয়ার পথে খুব একটা সহযোগিতা করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় আব্বাস ফিলিস্তিনের প্রধান তিন নিরাপত্তা সংস্থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ থাকারও প্রস্তাব করলেন, কিন্তু আরাফাত তাতে সায় দেননি।

আব্বাস ও আরাফাতের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হামাসের অবস্থান ছিল ইয়াসির আরাফাতের পক্ষে। হামাস জানত, মাহমুদ আব্বাস পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা পেলে হামাস এবং অন্যান্য মুক্তিকামী দলগুলোকে দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

এরই মধ্যে মাহমুদ আব্বাস প্রকাশ্যে ইন্তিফাদাকে সহিংস ও জঙ্গি আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দিলে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা তার ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। যদিও আব্বাস পরবর্তী সময়ে মন্তব্য থেকে সরে আসেন এবং ক্ষমা চান, কিন্তু সাধারণ ফিলিস্তিনিরা তাতে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ, তারা অনুভব করছিল, আব্বাস ফিলিস্তিনের চেয়ে ইজরাইলের স্বার্থ রক্ষাতেই বেশি আগ্রহী।

তার বিপর্যয় চূড়ান্ত হয়, যখন ২০০৩ সালের ৪ জুন জর্ডানে অনুষ্ঠিত আকাবা সম্মেলনে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন– 'আমি ফিলিস্তিনিদের সহিংস আচরণ বন্ধ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করছি।' এই বক্তব্যের পর তার জনপ্রিয়তায় ধস নামে এবং তার পতন নিশ্চিত হয়। এতদিন ইজরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র তাকে যে সমর্থন দিয়ে এসেছে, তা তার জন্য লোকসানের কারণ হয়। জনগণ বুঝতে পারে, আরাফাতকে শায়েস্তা করার জন্যই আমেরিকা এই পুতুলকে নিয়োগ দিয়েছে।

ইজরাইলের দ্বারা অবরুদ্ধ এবং নিজের ঘনিষ্ঠজনদের বেইমানি ও ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ে আরাফাত ক্রমশ হামাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। খালিদ মিশাল সেই সময়ে দামেস্কে ছিলেন। সেখান থেকে প্রায়ই তিনি আরাফাতকে ফোন দিয়ে তার প্রতি সমবেদনা ও সমর্থন জানাতেন। এই ঘনিষ্ঠতা ফাতাহর অভ্যন্তরে অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি। তারা হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে বরং হামাসের ওপর দমন অভিযান চালানোর জন্য আরাফাতকে চাপ দেয়। আরাফাত বুঝে গিয়েছিলেন, হামাসকে দমন করার প্রচেষ্টায় খুব একটা ফায়দা হবে না। কারণ, ফিলিস্তিনিরা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ছাড়া ইজরাইলকে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি মানতে রাজি ছিল না। আর ইজরাইল তখন এতটাই বেপরোয়া ছিল যে কোনো কিছুতেই তাদের সন্তুষ্ট করা যাচ্ছিল না।

ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে ইজরাইলকে দফায় দফায় শান্তি প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু ইজরাইল তাতে পা না দিয়ে একের পর এক গুপ্তহত্যা চালাতে থাকে। বিশেষ করে হামাসকে নির্মূলের জন্য তারা নানা ধরনের অভিযান পরিচালনা করছিল। শ্যারনের আমলে হামাসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে হত্যা করা হয়। ২০০১ সালের ৩১ জুলাই হত্যা করা হয় জামাল সেলিম এবং জামাল মনসুরকে। ২৩ নভেম্বর শহিদ হন মাহমুদ আবু হানুদ। ২০০২ সালের ২২ জুলাই হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সালাহ শিহাদাহ শাহাদাতবরণ করেন। ২০০৩ সালের ৮ মার্চ হত্যা করা হয় ইবরাহিম আল মাকদামাহকে। একই বছরের ২১ আগস্ট হত্যা করা হয় হামাস নেতা ইসমাইল আবু শানাবকে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হত্যা করা হয় ২০০৪ সালের ২১ মার্চ। আর এর মাসখানেক পর ১৭ এপ্রিল হত্যা করা হয় দলটির আরেক প্রভাবশালী শীর্ষনেতা আব্দ-আল আজিজ রানতিসিকে।

আরাফাত অবশ্য অনুভব করছিলেন, দমন-পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের পরও হামাস ক্রমশই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তিনি যদি হামাসের ওপর চড়াও হন, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আকাবা সম্মেলনে মাহমুদ আব্বাস ইজরাইল ও আমেরিকার ফাঁদে পড়ে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে আরাফাত তার নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্ষমতা হ্রাস করতে রাজি হলেন না। বেইমান হয়ে মরার চেয়ে তিনি ইজরাইলের অবরোধে শহিদ হওয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করলেন।

আরাফাতের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি ব্যক্তিগতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইজরাইল তাকে কখনোই বিশ্বাস করতে পারেননি। অন্যদিকে আরাফাতও বুঝে গিয়েছিলেন, ইজরাইল তাকে প্রতিপক্ষের অংশীদার হিসেবে নয়; বরং তাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চেয়েছে। ইজরাইল সব সময়ই চেয়েছে– তারা যা চাইবে, আরাফাত জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে হলেও তা-ই যেন বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেটা করতে গেলে ফিলিস্তিনিদের কাছে আরাফাত বেইমান হিসেবে চিত্রায়িত হতেন এবং কখনোই জাতীয়তাবাদী বা বিপ্লবী নেতা হিসেবে সম্মান অর্জন করতে পারতেন না।

২০০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন নতুন করে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেন। তিনি এক ঘোষণায় ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে বলেন– 'আমরা কখনোই তোমাদের শাসন করতে চাই না। তোমরা যেসব জায়গায় আছ, সেখানে আমরাও থাকতে চাই– তেমনটাও নয়।' একই সঙ্গে তিনি ফিলিস্তিনিদের গাজা উপত্যকা ফিরিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে ইহুদি বসতিগুলো সরিয়ে নেওয়ারও ঘোষণা দেন।[১২৭] কিন্তু তার বিনিময়ে বৃহত্তর ইজরাইলের যে পরিকল্পনা, তা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন হলো– শ্যারন কেন এই শান্তি প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করতে চাইলেন?

প্রথমত, গাজা নিয়ন্ত্রণ করা ইজরাইলের জন্য কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছিল। তা ছাড়া গাজা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় প্রায়ই ইজরাইলি অবস্থানে হামলা এবং হতাহতের ঘটনা ঘটত। তাই গাজার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইজরাইলিদের একটি চাপ ছিল।

---

[১২৭]. এই বিষয়টি বিবিসির একটি ডকুমেন্টারিতে উঠে আসে, যা ২০০৫ সালে প্রচারিত হয়। ডকুমেন্টারিটার নাম Israel & the Arabs, Elusive Peace

দ্বিতীয়ত, ইজরাইলের অধীনে এসব এলাকা থাকলে ইজরাইলের মূল ভূখণ্ডের ভেতরে ফিলিস্তিনি ও মুসলিমদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়তে থাকবে, যা ইহুদিদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই মুসলিম ও ইহুদিদের পৃথক ভূখণ্ড থাকাকেই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন।

তৃতীয়ত, শ্যারন এই সামান্য ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থন পেতে চাইছিলেন, যা পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল।

২০০৪ সালের ১৪ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে এরিয়েল শ্যারনের সঙ্গে এক বৈঠক করার সময় জর্জ বুশ একটি ভয়ানক ঘোষণা দেন। তিনি বলেন– 'বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যেভাবে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থানে ইজরাইলের বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠেছে, তাতে আর কোনোভাবেই ১৯৪৯ সালের মানচিত্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ইজরাইল থেকে যেসব ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু উচ্ছেদ হয়েছে, তারা আর কখনো ইজরাইলে ফিরতে পারবে না। আর ইজরাইল নতুন করে যেসব স্থাপনা নির্মাণ করেছে, সেটিও ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়।'

মূলত এই ঘোষণার মাধ্যমে বুশ নগ্নভাবে শ্যারনের বৃহত্তর ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে সমর্থন জানান। সেইসঙ্গে গাজা ও পশ্চিম তীরে হামাসসহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলগুলোর ওপর ইজরাইলি নিপীড়নের প্রতি সমর্থন জানান।

২০০৪ সালের ২২ মার্চ শ্যারনের আদেশে শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হত্যা করা হয়। এর কয়েকদিন পর হামাসের শীর্ষ নেতা আব্দ-আল আজিজ রানতিসিকে হত্যা করা হয়। শ্যারন মূলত হামাসের এমন অবস্থা করতে চেয়েছিলেন, যাতে ইজরাইলিরা গাজার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলেও হামাস যেন কখনো এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে।

শুধু এই দুটি হত্যাকাণ্ড নয়; একই বছরের ১১ নভেম্বর ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইজরাইল আরও অনেকগুলো অমানবিক কাজ করে। তবে এতে হামাসের তেমন একটা ক্ষতি না হলেও ফাতাহ ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফাতাহ গাজায় কর্মরত বেশ কিছু ফিল্ড কমান্ডারের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়। আরও যারা ছিলেন তাদের গ্রেফতার করা হয়। সেইসঙ্গে ফাতাহর দায়িত্বশীলদের ভয়াবহ দুর্নীতির প্রমাণ জনগণের সামনে চলে আসে।

২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট ইজরাইলিরা গাজা থেকে প্রত্যাহার কার্যক্রম শুরু করে এবং কয়েক ধাপে এই কার্যক্রম চলে। অবশেষে ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, এই এলাকায় ইজরাইলিদের ৩৮ বছরের দখলদারিত্বের অবসান হয়। গাজার জনগণ এই প্রত্যাহারকে ইজরাইলের বিরাট পরাজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে উৎসব উদ্‌যাপন করে।

তবে ফাতাহর অনেক নেতাই এই উৎসবে সঙ্গে একমত ছিলেন না। তারা দাবি করছিলেন, পশ্চিম তীরে আরও বেশি জমি পাওয়ার জন্য শ্যারন এই জায়গা ছেড়েছে। তা ছাড়া ইজরাইল এই এলাকা ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হামাস আরও শক্তিশালী হওয়া, আর ফাতাহ দুর্বল থেকে দুর্বলতর। যাহোক, লেবানন থেকে ইজরাইলের যে প্রত্যাহার শুরু হয়েছিল, গাজা থেকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে নতুন একটি ইতিহাসের সূচনা হলো। আর এই পুরো ঘটনার কৃতিত্ব গেল হামাসের পকেটেই।

এক নজরে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা, আল-আকসা ইন্তিফাদা নামেও পরিচিত। ইজরাইলি দখলনীতির প্রতিবাদে ২০০০ সালের শুরুতে এই ইন্তিফাদার সূচনা হয়। ইজরাইল তাদের দখলনীতির মাধ্যমে শুধু যে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করেছিল তাই নয়; বরং ফিলিস্তিনিদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।

২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন প্রায় এক হাজারেরও বেশি পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেন। তিনি মুলত ফিলিস্তিনিদের উত্তেজিত করার হীন উদ্দেশ্যেই এই কাজটি করেন। তারপর তিনি ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্য করে উত্তেজক একটি মন্তব্য করেন, যা তার পূর্বসূরি জায়োনবাদীরা ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলের যুদ্ধের সময় ঘোষণা করেছিল। তিনি বলেন– 'টেম্পল মাউন্ট এখন আমাদের হাতেই।' ফিলিস্তিনিরা তার ঘোষণাকে মসজিদুল আকসার প্রতি হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করে।

কেননা, টেম্পল মাউন্ট হলো মুসলমানদের হারাম আল শরিফ। এটি জেরুজালেমের পুরোনো শহরের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলোর অন্যতম। কয়েক হাজার বছর ধরে এটি ধর্মীয় স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা এটা ব্যবহার করেছে। স্থানটিতে আল আকসা মসজিদ, কুব্বাত আস-সাখরা, কুব্বাত আস সিলসিলা ও কুব্বাত আন-নবি নামের স্থাপনাগুলো অবস্থিত। চারটি ফটকের সাহায্যে এখানে প্রবেশ করা যায়। বতর্মানে এগুলো ইজরাইলি পুলিশের পাহারাধীন।

আল আকসা প্রাঙ্গন থেকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয়। ফিলিস্তিনিরা পাথর দিয়ে সৈন্যদের অবরোধ আর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইজরাইলি সৈন্যরা গ্যাস, রাবার বুলেট ও জলকামান ব্যবহার করে। একসময় ফিলিস্তিনিরা আত্মঘাতী বোমা ও বন্দুক হামলা চালায়। ইজরাইলিরা চালায় ট্যাংক ও বিমান হামলা। উভয় পক্ষে হতাহত বেড়ে যায়। এতে ৬৪ জন বিদেশিসহ তিন হাজার ফিলিস্তিনি এবং এক হাজার ইজরাইলি মারা যায়।

ইজরাইলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ব্যাপক সামরিক অভিযান এবং প্রশাসনিক সেন্সরশিপ আরোপ করার নীতি চালু করে। জাতিসংঘ তার ১৩২২ নং প্রস্তাবনায় ইজরাইলের এহেন আচরণের নিন্দা করে। ইজরাইলিরা সহিংসতা শুরু করার ৩ সপ্তাহের মধ্যেই এই প্রস্তাবনা পাশ হয়। তবে এরই মধ্যে ইজরাইলিরা শত শত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে ফেলেছিল।

ফিলিস্তিনি সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটসের মতে– অন্তত ৪,৯৭৩ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলাকালে হত্যা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ১,২৬২ শিশু, ২৭২ জন নারী এবং ৩২ জন মেডিকেল কর্মী। শিশু অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে– এ ধরনের একটি সুইসভিত্তিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঁচ বছরের সহিংসতায় ১০,০০০-এর-ও বেশি শিশু আহত হয়।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় ইজরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনের ওপর নিপীড়নমূলক অবরোধ আরোপ করে। ইজরাইলি মানবাধিকার গ্রুপ বি'সলেমের রিপোর্ট অনুযায়ী– ইজরাইল ফিলিস্তিনের শহর ও গ্রামগুলোতে কংক্রিট ব্লক, গভীর খাদ বা চেকপয়েন্ট ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের যাতায়াত রুদ্ধ করে দেয়।

যদিও দ্বিতীয় ইন্তিফাদাটির শেষ হওয়ার তারিখ সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি, তবে অনেকেই দাবি করেন– ২০০৫ সালে এসে এর অবসান ঘটে। প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটসের মতে– হাজারো লোকের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ছাড়াও ইজরাইলি পেশাজীবী বাহিনী ৫,০০০ ফিলিস্তিনি নাগরিকের বাড়ি ধ্বংস করে দেয় এবং আরও ৬৫০০ বাড়ি ইজরাইলি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইন্তিফাদার টাইমলাইন

২০০০ সাল

২৮ সেপ্টেম্বর : চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এরিয়েল শ্যারনের হারাম আল-শরিফ/টেম্পল মাউন্ট-এর পরিদর্শন। তার এই অন্যায় কর্মকাণ্ডটি সহিংসতার জন্ম দেয় এবং সামগ্রিকভাবে গোটা পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে।

৩০ সেপ্টেম্বর : গাজা উপত্যকায় ইজরাইলি সেনা ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের সময় ১২ বছর বয়সি মুহাম্মদ দুররাহ নিহত হওয়ার পর ফিলিস্তিনজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ইজরাইলিরা একের পর এক শিশু হত্যা করায় আন্তর্জাতিকভাবেও তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার শিকার হয়। ইজরাইল প্রাথমিক অবস্থায় এই শিশু হত্যার জন্য ক্ষমা চায়, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সংশয় প্রকাশ করে যে আদৌ ইজরাইলি সেনাবাহিনী এই হত্যাকাণ্ডটি করেছে কি না!

১৭ অক্টোবর : ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সংঘাত নিরসনের উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন শারম আল শেখে দুই পক্ষের মাঝে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন; যদিও ইজরাইলের অসহযোগিতার কারণে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যেই চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

২০০১ সাল

৬ ফেব্রুয়ারি : এরিয়েল শ্যারন ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৮ মে : গাজায় ফিলিস্তিনি লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে ইজরাইলি এফ-১৬ বিমান প্রথমবারের মতো অভিযান পরিচালনা করে।

১ জুন : তেলআবিবের একটি ডিস্কোতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২১ জন নিহত এবং ৬০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়। এই আক্রমণের জন্য ইজরাইল ইসলামিক জিহাদকে দায়ী করে।

৯ আগস্ট : জেরুজালেমের কেন্দ্রস্থলে একটি ব্যস্ততম রেস্তোরাঁয় আত্মঘাতী হামলায় ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ৯০ জন আহত হন।

২৭ আগস্ট : ইজরাইলিরা মিসাইল আক্রমণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট সংগঠনের নেতা আবু আলি মুস্তাফাকে হত্যা করে।

১৭ অক্টোবর : পিএফএলপি তাদের শীর্ষ নেতাকে হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইলের পর্যটনমন্ত্রী রেহযাম জীভিকে হত্যা করে।

২ ডিসেম্বর : উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর হাইফাতে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৫ জনকে হত্যা এবং ১০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়।

২০০২ সাল

৮ মার্চ : ইন্তিফাদার সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন। এই একটি দিনেই ইজরাইলিরা ৪৫ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে।

২৭ মার্চ : ইজরাইলের নেতায়নায় একটি বিলাসকেন্দ্রে বোমা হামলায় ২৮ ইজরাইলি নিহত হন। এটা ছিল ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার পর হামাসের সামরিক শাখার সবচেয়ে আগ্রাসী আক্রমণ। ৮ মার্চ ৪৫ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যার প্রতিক্রিয়ায় এই অপারেশনটি পরিচালনা করা হয়।

২৯ মার্চ : ইজরাইল পশ্চিম তীরে একটি বিশাল সামরিক হামলা শুরু করে। ইয়াসির আরাফাতের রামাল্লাহ সদর দপ্তর লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়। অসংখ্য ফিলিস্তিনি জীবন বাঁচাতে বেথলেহেমের চার্চে আশ্রয় নেয়।

৭ মে : আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৬ জন নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি আহত হয়। রিশনের লেটজিয়ন শহরে এই বোমা হামলাটি চালানো হয়।

১৬ জুন : আত্মঘাতী বোমারুদের সরিয়ে রাখার জন্য ইজরাইল পশ্চিম তীরে ৬৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ শুরু করে।

১৮ জুন : দক্ষিণ জেরুজালেমের একটি বাসে আক্রমণে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৯ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত।

২২ জুলাই : ইজরাইল গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা সালেহ শিহাদাকে হত্যা করে। একই সঙ্গে এই হামলায় আরও ১৮ জন ফিলিস্তিনি নাগরিক শহিদ হন।

২০০৩ সাল

৫ জানুয়ারি : তেলআবিবের জনাকীর্ণ রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেই দুই আত্মঘাতী হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হন।

১৯ মার্চ : মাহমুদ আব্বাস প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

৩০ এপ্রিল : ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলে শান্তির জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করেন। এখানে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংঘাতের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়। তবে ফিলিস্তিন বা ইজরাইল কেউ-ই এই চুক্তির অনুসরণ করেনি।

১১ জুন : জেরুজালেমে একটি বাসে বোমা হামলায় ১৬ জন নিহত হয়। এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় হামাসের আরেক শীর্ষ নেতা আব্দ-আল আজিজ রানতিসিকে টার্গেট করে ইজরাইলিরা বিমান হামলা চালায়।

২৭ জুন : প্যালেস্টাইনের মুজাহিদরা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে সাময়িকভাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইজরাইলিদের ওপর হামলা বন্ধ করা। এটাকে হুদনা বলা হয়, যা সাত সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল।

২০ আগস্ট : জেরুজালেমে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তা সংস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের সাথে মত-পার্থক্যের জের ধরে মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

৪ অক্টোবর : হাইফার এক রেস্টুরেন্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১৯ জন নিহত হয়।

১৩ অক্টোবর : শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বসে জেনেভা চুক্তি নামক নতুন আরেকটি শান্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু উভয় দেশের চরমপন্থিরা এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে।

২০০৪ সাল

২৯ জানুয়ারি : পশ্চিম জেরুজালেমে বাসে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত ১০।

২ ফেব্রুয়ারি : গাজা স্ট্রিপ থেকে ইজরাইলি বসতি স্থাপনের জন্য এরিয়েল শ্যারন তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

২২ মার্চ : হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে বিমান হামলায় হত্যা করা হয়।

১৭ মে : ইজরাইল হামাস নেতা আব্দ-আল আজিজ আল রানতিসিকে মিসাইল হামলা করে হত্যা করে।

১৩ মে : গাজার স্বাধীনতাকামীরা ১৩ জন ইজরাইলি সেনাকে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইল রাফা শরণার্থী ক্যাম্পে নয় দিনের আগ্রাসন শুরু করে, এতে কমপক্ষে ৪০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

৯ জুলাই : আন্তর্জাতিক আদালত পশ্চিম তীরে ইজরাইলের নির্মাণাধীন নিরাপত্তা দেয়ালকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করে এর নির্মাণকাজ বন্ধ করার আদেশ দেয়।

৩১ আগস্ট : ইজরাইলের শহর বেরশেবাতে দুটি বাসে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৬ জন নিহত হয়।

২৭ অক্টোবর : গাজার ইহুদি অধিবাসীদের প্রত্যাহারের পরিকল্পনার পক্ষে ইজরাইলি আইন পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দেয়।

২৯ অক্টোবর : ইয়াসির আরাফাতকে তার রামাল্লাস্থ সদর দফতর থেকে বিমানপথে প্যারিসে সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

১১ নভেম্বর : ৭৫ বছর বয়সে ফ্রান্সে ইয়াসির আরাফাত ইন্তেকাল করেন। ইজরাইল জানায়– আরাফাতের মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। অন্যদিকে, মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর প্রধান নির্বাচিত হন।

২০০৫ সাল

৯ জানুয়ারি : মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে ইয়াসির আরাফাতের স্থলাভিষিক্ত হন।

১০ জানুয়ারি : ইজরাইলের সংসদ একটি নতুন জোট সরকারকে সমর্থন করে। ফলে এরিয়েল শ্যারনের গাজা থেকে ইহুদি বসতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আর কোনো সংকট থাকল না।

১৪ জানুয়ারি : ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের হামলায় একটি বড়ো ক্রসিং পয়েন্টে ছয় ইজরাইলি নিহত হন।

১৫ জানুয়ারি : মাহমুদ আব্বাস পশ্চিম তীরের রামাল্লায় প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে ইজরাইল ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র কর্মীদের যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার আহ্বান জানান।

২১ জানুয়ারি : ইজরাইলে রকেট হামলা বন্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত শত শত পুলিশ গাজা উপত্যকায় অবস্থান নেয়।

২৪ জানুয়ারি : আব্বাস ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী বেশ কয়েকটি সংগঠনের সাথে বৈঠক করেন এবং তারা আপাতত আর ইজরাইলের ওপর হামলা চালাবে না মর্মে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি : ইজরাইল তার জেলে বন্দি কয়েকশো ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে এবং পশ্চিম তীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করার বিষয়টি অনুমোদন করে।

৮ ফেব্রুয়ারি : শারম আল শেখের শীর্ষ সম্মেলনের পর মাহমুদ আব্বাস ও এরিয়েল শ্যারন একটি সমঝোতা ঘোষণা করেন। উভয়ই আশা প্রকাশ করেন, আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি গোটা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নতুন আলোর সূচনা করবে।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার অবসান

২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মিশরের শারম আল শেখে মাহমুদ আব্বাস ও অ্যারিয়েল শ্যারনের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে এই ইন্তিফাদার অবসান ঘটে। ইজরাইলিরা এই ইন্তিফাদাকে অসলো–যুদ্ধ বা আরাফাতের যুদ্ধ বলে অভিহিত করে।

অসলো-চুক্তি ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫-তে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিতে গাজার কিছু অংশ এবং পশ্চিম তীর থেকে বিভিন্ন ধাপে সেনা প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই দুই স্থানে স্বাধীনভাবে প্রশাসন পরিচালনা করার কথা ছিল। চুক্তি অনুসারে ফিলিস্তিনিরা পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছর এলাকা শাসন করবে এবং এই সময়ের মধ্যে স্থায়ী চুক্তি করা হবে। এই চুক্তি সফল হয়নি, তবে চুক্তির কার্যকারিতা বিনষ্ট করার জন্য ফিলিস্তিনি ও ইজরাইলিরা পরস্পরকে দোষারোপ করে। কারণ, এই চুক্তির পরেই ৪০৫ ফিলিস্তিনি ও ২৫৬ ইজরাইলি নিহত হয়।

তবে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা কোন তারিখে শেষ হয় তা নির্ধারণ করা কষ্টকর। অসুস্থ ইয়াসির আরাফাত ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিন দশক ধরে তিনি ফিলিস্তিনিদের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তার মৃত্যুতে ফিলিস্তিনিরা গতি হারিয়ে ফেলে। এরপর ফাতাহ-হামাস সংঘর্ষ বিস্তার লাভ করে। ২০০৫ সালের শারম আল শেখের বৈঠকে আব্বাস ইন্তিফাদার ইতি টানেন। অ্যারিয়েল শ্যারন ৯০০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেন এবং পশ্চিম তীর থেকেও ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

ইয়াসির আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা

ইয়াসির আরাফাত চরম সংকটময় অবস্থায় ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। চেষ্টা করেন দেশটিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার। ১৯৬৪ সালে দখলদারী ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্যে পিএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৬৮ সালে আরাফাত পিএলও'র চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান। তারপর ২০০৪ পর্যন্ত টানা ৩৬ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফিলিস্তিনের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দল ফাতাহর-ও নেতা ছিলেন। ১৯৯১, ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে আরাফাত ইজরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে কয়েক দশকের সংঘাতের অবসান ঘটানোর চেষ্টা চালান। ২০০৪ সালে ইজরাইলি সেনাবাহিনীর দ্বারা গৃহবন্দি অবস্থায় তার রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। বলা হয়, তাকে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার পুনঃতদন্ত শুরু হলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ফ্রান্স মাঝপথে তদন্ত বন্ধ ঘোষণা করে।

ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করতে ইজরাইল বিকিরণ বিষক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিল। একটি বইতে এই তথ্য উঠে আসে। ইজরাইলের তেলআবিবে প্রকাশিত দৈনিক *ইদিয়ত আহারোনত*-এর গোয়েন্দাবিষয়ক প্রতিনিধি রনেন বার্গম্যান *রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট* নামে বইটি রচনা করেছেন। বইটির জন্য তিনি তার দেশের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ, নিরাপত্তা সংস্থা শিনবেত এবং সেনাসদস্যদের পিছু ছুটেছেন, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকার দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ও ইহুদ ওলমার্টও রয়েছেন। এক হাজার সাক্ষাৎকার এবং হাজারো নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে রনেন রচনা করেছেন– ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার *রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট* বইটি।

ইরানের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধের অংশ হিসেবে ইজরাইল দেশটির সাতজন পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে বলে বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়; শত্রুকে ঘায়েল করতে ইজরাইলের গুপ্তচরেরা কখনো টুথপেস্টে বিষপ্রয়োগ করেছে। আবার কখনো সেনারা ড্রোন হামলা চালিয়েছেন। মুঠোফোন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিংবা দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় যানবাহনের টায়ার ফুটো করেও দেশটি নিজেদের ছায়াযুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করেছে। প্রতিপক্ষ নেতাকে ঘায়েল করতে তার গোপন প্রণয়ের খবরও বের করতে কার্পণ্য করেননি ইজরাইলের গুপ্তচররা।

রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট বইয়ে দাবি করা হয়েছে– ইজরাইল সৃষ্টির পর গত ৭০ বছরে দেশটি অন্তত ২ হাজার ৭০০টি অভিযান চালিয়েছে, যার অনেকগুলোই ব্যর্থ হয়েছে।

২০০৪ সালে ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন বার্গম্যান। তার ভাষ্য– ইজরাইলি সেনাবাহিনীর তৎপরতার কারণে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারছেন না।

রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট বইটির শিরোনাম বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাচীন ইহুদি সাহিত্যের প্রবাদ থেকে। প্রবাদটি হলো– 'যদি কেউ তোমাকে হত্যা করতে আসে, তাহলে রুখে দাঁড়াও এবং তাকেই প্রথম হত্যা করো।' বার্গম্যান বলেন– তিনি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তারা নিজেদের কাজের বৈধতার জন্য এই প্রবাদটিই আওড়েছেন।

বইতে বলা হয়েছে– ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর বুশ ইজরাইলের বহু কৌশল অবলম্বন করেন। এ ছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও তথাকথিত সন্ত্রাসীদের হত্যা করার জন্য ইজরাইলের অনুরূপ কৌশলে বহু অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিটিও ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পেছনে ইজরাইলের হাত ছিল বলে সন্দেহ করছে। তার মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির প্রধান তাওফিক তিরাবি বলেছেন, বার্ধক্য বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য যে তার মৃত্যু হয়নি– এটা পরিষ্কার। এর আগে সুইজারল্যান্ডের এক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, কবর থেকে তোলার পর আরাফাতের দেহে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া যায়; তবে ইজরাইল এ ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করেছে।

তিরাবি ২০১৩ সালের ৭ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন– 'আরাফাতকে হত্যার জন্য পোলোনিয়াম না অন্য কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল, তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সিকিউরিটি এবং মেডিকেল কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে আমার কাছে যে তথ্য আছে তার ভিত্তিতে বলছি, ইজরাইলই তাকে হত্যা করেছে।'

তিনি আরও বলেন– 'আমি বানিয়ে বলছি না; এটা শ্যারন এবং শাওল মোফাজের মতো ইজরাইলি নেতাদের টেলিফোন আলাপেও শোনা গেছে। সে সময় তারা বলেছে, আরাফাতকে যেতে হবে। এগুলো আমার কথা নয়। আমি আবারও বলছি, আরাফাতের মৃত্যুর জন্য ইজরাইলই দায়ী।'

আল-জাজিরা টিভির একটি প্রতিবেদনে আরাফাতের শরীরে পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব থাকার তথ্য প্রকাশের পর ২০১২ সালের নভেম্বরে তার দেহাবশেষ উত্তোলন করে নমুনা সংগ্রহ করে সুইস, ফরাসি ও রুশ বিশেষজ্ঞরা। সুইজারল্যান্ডের লাওসেনের 'ইনস্টিটিউট ডি রেডিওফিজিক্স' নিশ্চিত করে– পোলোনিয়াম-২১০ নামের একটি বিরল এবং উঁচু মাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগে আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে।

শেখ ইয়াসিনের নির্মম হত্যাকাণ্ড

গাজাভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান 'প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস'-এর তথ্যমতে– ২০০৪ সালের ২২ মার্চ স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টায় হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হত্যা করা হয়। তিনি যখন গাজার মধ্যস্থলে আল সাবরা এলাকাস্থ ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ আদায় করে বের হচ্ছিলেন, তখনই ইজরাইলি হেলিকপ্টার থেকে তিনটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়। এতে শেখ আহমাদ ইয়াসিন ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেন।

শেখ আহমাদ ইয়াসিনের বয়স তখন ৬৬ বছর। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইজরাইলিরা তার ওপর হামলা চালায়। প্রথমবার তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার ঠিকই সফল হয়। পরবর্তী সময়ে আল জাজিরায় ঘটনাস্থলের যে ছবি প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়– রকেটগুলো যেখানে আঘাত হেনেছিল, সেখানকার গোটা জায়গাটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং হামলার কয়েক ঘণ্টা পরও সেখান থেকে আগুন নির্গত হচ্ছিল।

ইজরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র ঘটনার পরপরই বিবৃতিতে জানান, শেখ ইয়াসিন ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী! আজ এক সামরিক আক্রমণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এই আক্রমণের পরপরই ইজরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ইজরাইলের বিভিন্ন লবিস্ট গ্রুপ, ইজরাইলিপন্থি মিডিয়াকর্মী এবং ইজরাইলের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে শেখ ইয়াসিনের অতীতে দেওয়া বিভিন্ন ভাষণ প্রচার শুরু করে। সেইসঙ্গে সেগুলোকে নেতিবাচকভাবে বিশ্লেষণ এবং তার বিরুদ্ধে সুসংগঠিত প্রচারণা শুরু করে। ইজরাইলের এই ধরনের কার্যক্রমে প্রমাণিত হয়, তারা দীর্ঘদিন ধরেই হত্যার পরিকল্পনা করেছে।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, শেখ ইয়াসিন অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনকারী! তাহলেও তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যেত, কিন্তু তা না করে ইজরাইলিরা তাকে বিনা বিচারে হত্যা করেছে। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডকে 'টার্গেট কিলিং' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। 'প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস'-এর তথ্যমতে– ২০০০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৪ সালের ৩ মার্চ পর্যন্ত ইজরাইল এ ধরনের টার্গেট কিলিং করে ৩৩৭ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, এর মধ্যে ১৩৪ জনই মহিলা ও শিশু।

ইজরাইল শেখ ইয়াসিনকে বরাবর সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত করলেও শেখ ইয়াসিন সব সময়ই তা অস্বীকার করেছেন। তিনি নিজের ওপর সংগঠিত প্রথম হামলা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন– 'ওরা আমাদের হত্যা করতে চায়। ওরা আমাদের মৃত্যুর ভয় দেখায়। কিন্তু ওরা জানে না, আমরা সব সময়ই শাহাদাত কামনা করি।'

জানা যায়, ঘটনার দিন শেখ ইয়াসিন তার তিন দেহরক্ষী নিয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। ইজরাইলি হেলিকপ্টার থেকে যে ৩টি মিসাইল ছোড়া হয়, তার একটি সরাসরি শেখ ইয়াসিন ও তার দেহরক্ষীদের আঘাত করে। বাকি দুটি মিসাইল আশেপাশে গিয়ে পড়ে এবং তাতে চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এ ছাড়া শেখ ইয়াসিনের দুই ছেলে আব্দুল হামিদ ও আব্দুল গনিসহ আরও ১৭ জন এই ঘটনায় আহত হয়। আহত ও নিহতরা সবাই ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন।

শেখ ইয়াসিন ফিলিস্তিনিদের জন্য ছিলেন স্বাধীনতা আর প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতীক। আর ইজরাইলিরা সব সময়ই তাকে সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসেবে বিবেচনা করত। ঘটনার পরপরই হাজারো ফিলিস্তিনি রাস্তায় নেমে আসে এবং রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। রাফা এবং খান ইউনিসের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতেও ব্যাপক প্রতিরোধ শুরু হয়। উপস্থিত জনতাকে সামনে রেখে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া বলেন– 'আপনারা কেউ কাঁদবেন না, কাঁদার প্রয়োজনও নেই। আপনাদের দৃঢ় হতে হবে। প্রতিশোধ আদায়ে বলিষ্ঠ হতে হবে। কেননা, শেখ ইয়াসিন আমাদের সকলের মনে শাহাদাতের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। শেখ ইয়াসিনের রক্ত প্রতিটি ফিলিস্তিনির শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হবে।'

পরবর্তী সময়ে হামাস জানায়– আক্রমণে শেখ ইয়াসিনের শরীর এতটাই পুড়ে গেছে যে, তাকে সনাক্ত করাও কঠিন।

ফিলিস্তিনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আহমেদ কুরেই এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন– 'এই হামলা আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। শেখ ইয়াসিন একজন উদারমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন হামাসের মূল নিয়ন্ত্রক। এই আক্রমণ ভয়ংকর ও কাপুরোষোচিত ঘটনা।'

শেখ আহমাদ ইয়াসিন

শেখ আহমাদ ইয়াসিনের জন্ম ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ গাজার আলজাওরা গ্রামে। ১৯৪৮-এর যুদ্ধের পর পরিবারসহ গাজা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যৌবনে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা করার সময় এক দুর্ঘটনায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। লেখাপড়া শেষে গাজার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও বিভিন্ন মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। গাজা এলাকার ইসলামিক কমপ্লেক্সের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় অধিকৃত গাজা এলাকায় নির্ভিকতার কারণে তিনি খতিব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অস্ত্র রাখা, সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা ও ইজরাইলরাষ্ট্র উৎখাতে

উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে ১৯৮৩ সালে গ্রেফতার হয়ে ইজরাইলি আদালত কর্তৃক ১৩ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৮৫ সালে পপুলার ফ্রন্ট অব ফিলিস্তিন লিবারেশনের সঙ্গে ইজরাইলের বন্দি বিনিময়ের সময় শেখ আহমাদ ইয়াসিনও মুক্তি পান।

এরপর ১৯৮৭ সালে গাজা অঞ্চলে হারাকাতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়াহ ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন সংক্ষেপে হামাস নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮-এর আগস্টের শেষের দিকে ইজরাইল তাকে লেবাননে নির্বাসিত করার হুমকি দেয়। ইহুদি ও তাদের চরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করার কিছুদিন পর, ১৯৮৯-এর ১৮ মে শেখ আহমাদ ইয়াসিন ইজরাইলি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। হামাস প্রতিষ্ঠা, ইহুদিদের অপহরণ ও হত্যায় উৎসাহ প্রদানের অভিযোগে ১৯৯১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ইজরাইলি আদালত তাকে যাবজ্জীবন এবং অতিরিক্ত আরও ১৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। রিমান্ডে আঘাত করার ফলে তার ডান চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ এবং বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

জর্দানে হামাস নেতা খালিদ মিশালকে গুপ্ত হত্যার প্রক্রিয়াকালে ধরা পড়া দুই ইজরাইলি গুপ্তচরকে মুক্তিদানের বিনিময়ে ১৯৯৭-এর ১ সেপ্টেম্বর বুধবার ইজরাইল সরকার শেখ আহমদ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২০০৩ সালের শেষ দিকে ইজরাইল শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হত্যার জন্য হামলা চালায়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

শহিদ হওয়ার একদিন পূর্বে

শহিদ আহমাদ ইয়াসিনের স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদ বলেন, শেখ ইয়াসিন শহিদ হওয়ার আগের দিন সন্তানদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই আমি শহিদ হব এবং শাহাদাতই হচ্ছে আমার কাম্য। আমি আখিরাত কামনা করি; দুনিয়া নয়।'

উম্মে মুহাম্মদ আরও বলেন– 'শেখ আহমাদ ইয়াসিন ইজরাইলের অব্যাহত হুমকির কারণে গত দুই বছর নিজ ঘরে রাতযাপন করতেন না, কিন্তু শহিদ হওয়ার রাত্রে তিনি মসজিদেই অবস্থান করেন এবং রোজা রাখেন। হাদিসের আমল অনুযায়ী– তিনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত রোজা রাখতেন।'

শহিদ আহমাদ ইয়াসিনের ছেলে মোহাম্মদ জানান– 'বিমান হামলার তিন ঘণ্টা পূর্বে আমি আব্বাকে জানাই, ইজরাইলি গোয়েন্দা বিমান ফিলিস্তিনের আকাশে চক্কর দিচ্ছে।' উত্তরে তিনি বললেন– 'আমরা শাহাদাত লাভের চেষ্টা করছি। আমরা সবাই আল্লাহর এবং সবাই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।'

তিউনিসিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আরব শীর্ষ সম্মেলনের শেখ ইয়াসিনের প্রস্তুতকৃত ভাষণ

ফিলিস্তিনি তাওহিদি জনতার অবিসংবাদিত নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন শাহাদাতের পূর্বে ২০০৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিতব্য আরব শীর্ষ সম্মেলনের জন্য তার ভাষণ প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরব নেতাদের দুর্বলতার কারণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি।

তিনি ভাষণে ফিলিস্তিন সমস্যাকেই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করার ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবগুলো হলো–

১. ফিলিস্তিন একটি আরব ও ইসলামিক ভূখণ্ড। ইহুদিরা এই ভূখণ্ডটি অস্ত্রের জোরে দখল করে রেখেছে, তাই অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া এ ভূমি জায়োনবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া জায়েজ হবে না। বর্তমানে যদিও আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অধিকারী নই, তারপরও হাল ছাড়ব না।

২. ফিলিস্তিনি জনগণের জায়োনবাদবিরোধী জিহাদ তাদের অধিকার, যা বর্তমানে সকল মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজও বটে। একে সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত করা মারাত্মক অন্যায়। এ অপবাদ মুসলিমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে।

৩. আমাদের শান্তিকামী জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ তারা কঠিনভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। এ যুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা বিশেষ করে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জায়োনবাদীরা এরই মধ্যে ফিলিস্তিনের জনগণের জীবনযাত্রার সকল উপায়-উপকরণ ধ্বংস করে দিয়েছে।

৪. জায়োনবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সকল আয়োজন বন্ধ এবং তাদের দূতাবাস, ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠনসহ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে সকলের প্রতি অনুরোধ করছি। সেইসঙ্গে তাদের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ না রাখারও আহ্বান জানাচ্ছি।

৫. উম্মাহ বিভিন্ন দিক দিয়ে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী, এটা দিয়েই তারা নিজেদের জাতীয় সমস্যার সামাধান করতে সক্ষম। উম্মাহর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সকল সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

৬. আজ মসজিদুল আকসা নিজেকে ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপনাদের জিহাদে আহ্বান জানাচ্ছে। ইহুদিরা একে ধ্বংসের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আপনারা যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে একে রক্ষা করবে কে?

আপনাদের প্রতি আমার এটুকুই নসিহত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন– 'দ্বীন মানেই নসিহত (নিজের ও অপরের কল্যাণ কামনা)।'

সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে শেখ আহমাদ ইয়াসিন

শেখ আহমদ ইয়াসিন জর্দানের সাপ্তাহিক *আসসাবিল*-কে দেওয়া সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'ইজরাইল প্রতিনিয়ত হামাসের নেতাদের হত্যা করার যে হুমকি দিচ্ছে, তা তাদের অক্ষমতা ও কাপুরুষতার প্রমাণ।'

গাজা থেকে ইজরাইলি সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্ত্বেও হামাস কেন সামরিক অভিযান বন্ধ করছে না– এমন প্রশ্ন করা হলে শেখ ইয়াসিন বলেন– 'সামরিক অপারেশনের ফলেই ইজরাইল ফিলিস্তিনের অন্যান্য এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে।'

শেখ ইয়াসিন আরও বলেন– 'ইজরাইল ফিলিস্তিনিদের হত্যার জন্য কোনো ধরনের কারণ বা অজুহাত দর্শানোর প্রয়োজন বোধ করে না। কারণ, তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ হচ্ছে হত্যা ও লুণ্ঠন। ইজরাইল আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ স্থগিত করতে বলে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, গোটা পৃথিবী কেন ইজরাইলকে ফিলিস্তিনের ভূমি জবরদখল থেকে বিরত থাকতে বলে না? কাকে বিরত থাকতে হবে? আত্মরক্ষাকারী নাকি জবরদখলকারীকে?'

হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাঝে বিরোধের ব্যাপারে শেখ ইয়াসিন বলেন–

> 'আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, আমরা সর্বপ্রকার গৃহদ্বন্দ্বের বিরোধী। যা ঘটেছে তা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের দোষেই ঘটছে।'

তিনি আরও বলেন– 'আমি একজন যোদ্ধা এবং ইহুদিদের টার্গেট ও লক্ষ্যবস্তু। তাই ইজরাইলি বিমান ও গুপ্তচরদের থেকে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু অনেকেই আমাদের নিরাপদে থাকা পছন্দ করে না।'

দুনিয়াবিমুখ ও শাহাদাত পিয়াসি আপসহীন মুজাহিদ শহিদ ইয়াসিনের ঘরে *আল জাজিরা* টিভি প্রতিনিধি গিয়ে দেখতে পান, তার ঘরে মাত্র দুটি কক্ষ, একটি মেহমানখানা ও একটি থাকার ঘর। দুনিয়া কাঁপানো এ মুজাহিদ নেতা খুবই সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন।

দুনিয়া কাঁপানো এ অসীম সাহসী মুজাহিদ নেতাকে আল্লাহ জান্নাত দান করুন। তার প্রতি ফোঁটা রক্ত বিন্দু থেকে সৃষ্টি করুক অজস্র আহমাদ ইয়াসিন–এ দুআই করছি।

মুসলিম উম্মাহর জন্য শেখ ইয়াসিনের অসিয়ত[১২৮]

'হে আল্লাহ! উম্মাহর নীরবতার জন্য আমি তোমার নিকটেই অভিযোগ করছি।

---

[১২৮]. এই অসিয়তের ভিডিও লিংক রেফারেন্স নং ৫৭-তে দেওয়া আছে।

হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহ আজ নীরব! এ জন্য আমি তোমার কাছেই সকল অভিযোগ পেশ করছি। আমি একজন বৃদ্ধ, অচল মানুষ। আমার দুটি হাতই অবশ। এই দুই হাতে আমি না পারি কলম ধরতে, আর না পারি অস্ত্র।

আমার বক্তব্য শুনে মানুষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে– এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠও আমার আর নেই। তা ছাড়া আমি এমন এক বয়সে উপনীত হয়েছি, যখন আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জরাগ্রস্ত করে ফেলেছে।

হে মুসলমানগণ! হে নীরব-নিথর পড়ে থাকা জীবন্মৃতরা!

এখনও কি জেগে উঠার সময় হয়নি? যে বিপদ-মুসিবত তোমাদের সামনে এসেছে, এতেও কি তোমরা জাগবে না?

এমন একটি গোষ্ঠীও কি নেই, কেউ কি নেই, যারা আল্লাহ এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মান রক্ষার জন্য ফের জেগে উঠবে? এমন কেউ কি নেই, যারা আমাদের সংগ্রামকে সংগ্রাম বলে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে? যারা আমাদের সংগ্রামকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে দমিয়ে রাখবে না কিংবা যারা দমিয়ে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে?

হে উম্মাহর একজন সদস্য! উম্মাহর এই অপমান কি আপনাকে একটুও লজ্জিত করে না? সন্ত্রাসী জায়োনবাদী ইজরাইল এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যখন এইভাবে আপনারই ভাইদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তখনও আপনি নীরব কেন!

আপনার কি ইচ্ছা হয় না সেই নির্যাতিত ভাইদের পাশে গিয়ে তাদের পিঠে একটু হাত রেখে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে?

এই উম্মাহর মধ্যে এমন কোনো সংগঠন, দল কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি কি নেই, যে তার মহান রবের জন্য জেগে উঠবে? এমন কি হতে পারে না, সকলেই অন্তত রাজপথে নেমে আমাদের জন্য মহান রবের দরবারে হাত তুলে দুআ করবে– "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তওফিক দান করো। আমাদের সকল প্রকার দুর্বলতাকে দূর করে দিয়ে তোমার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করো?"

আপনাদের কি এতটুকু করার শক্তিও নেই? নির্যাতিত মানুষগুলোর জন্য আপনারা এতটুকুও করতে পারবেন না?

অধ্যায়-১১

ফিলিস্তিনে প্রথম জাতীয় নির্বাচন

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ চলে যাওয়ার পর মাহমুদ আব্বাস রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে কিছুটা আড়ালে চলে যান। ২০০৪ সালের অক্টোবরের শুরুর দিকে তার কিছু ঘনিষ্ঠজন তাকে আবারও রামাল্লায় নিয়ে আসে। এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর ইয়াসির আরাফাত প্যারিসে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এর পরপরই যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে ফাতাহ নেতাদের একটি অংশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যারা আরাফাতের ইন্তেকালে খুশিই হয়েছিলেন। ফাতাহর বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা অনুধাবন করলেন, বর্তমান সময়ে ফাতাহর জনশক্তিকে ধরে রাখতে কেবল একজনই আছেন, তিনি মাহমুদ আব্বাস। তখনও পর্যন্ত ফাতাহর যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জীবিত ছিলেন, মাহমুদ আব্বাস তাদের অন্যতম।

আরাফাতের ইন্তেকালের দিনেই তিনি পিএলও'র নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। তার সহকর্মীরা চেয়েছিল, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস যাতে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে টিকে থাকেন। উল্লেখ্য, আরাফাতের মৃত্যুর ৬১ দিন পরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন নির্ধারিত ছিল। ইজরাইল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের চোখেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

ফাতাহর মধ্যে যারা একটু নবীন, তারা অবশ্য এই পদে মারওয়ান বারঘোতিকে চাইছিল। বারঘোতি ছিলেন দ্বিতীয় ইন্তিফাদার একজন সক্রিয় কর্মী। বারঘোতি ইন্তিফাদা আন্দোলনে নায়কোচিত ভূমিকা পালন করার জন্য ইজরাইল কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেন

এবং তখন পর্যন্ত কারাগারে বন্দি ছিলেন। তবে বারঘোতির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে তিনি কোনোভাবেই মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার দুঃসাহস না দেখান।

প্রথমদিকে ফাতাহর অনেকেই এমনকী মাহমুদ আব্বাসও বারঘোতির ব্যাপারে নমনীয় ছিলেন। তবে ইজরাইল কখনোই চায়নি সে নির্বাচন করুক। ইজরাইল বারঘোতিকে কখনোই মুক্তি না দেওয়ার হুমকি দেয়। পরবর্তী সময়ে বারঘোতির সমর্থকরাও দলের মধ্যে নতুন বিভাজনের আশঙ্কায় চুপসে যায়। কারণ, তাদের ভয় ছিল মাহমুদ আব্বাস ও বারঘোতির এই দ্বন্দ্বে হামাস সুবিধা পাবে। ফলে তারা একক প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারেই মনস্থির করে, আর বারঘোতিও নিজের নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করেন। কারণ, কারাগারে গিয়ে তার সহকর্মী এবং পরিবারের সবাই বোঝায়– মাহমুদ আব্বাস ছাড়া অন্য কেউ নির্বাচনে জিতে এলে আমেরিকা, ইউরোপসহ সকল দাতাগোষ্ঠী ফাতাহর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। এতে বরং সবাই বিপদে পড়ে যাবে।

অস্বস্তিকর গণতন্ত্র

অবশেষে ২০০৫ সালের ৯ জানুয়ারি ফিলিস্তিনিরা তাদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার জন্য নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মতো প্রার্থী একজনই ছিলেন। আর তিনি হলেন মাহমুদ আব্বাস। তার বিজয়ী হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।[১২৯] হামাস এই নির্বাচনকে ফাতাহর নিজস্ব পরিকল্পনাধীন বিষয় মনে করে এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও কিছু ছোটোখাটো দল এই নির্বাচন বয়কট করে।

২০০৫ সালের ১৫ জানুয়ারি মাহমুদ আব্বাস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম দিকেই তিনি দুর্নীতি দমন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেন। এই দুটি সমস্যাই ফাতাহর অভ্যন্তরে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া আরাফাতপরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিন কোন পথে অগ্রসর হবে, তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলগুলো; বিশেষ করে হামাসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার জন্যও চাপে ছিল।

২০০৫ সালের ১৭ জুলাই একটি স্থানীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এখন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি আদৌ সেই নির্বাচন করবেন কি না বা করলেও ফাতাহ সেখানে অংশ নেবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল।

---

১২৯. ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী– এই নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোটার (১১ লাখ ভোটারের মধ্যে ৭ লাখ ৭৫ হাজার) ভোট প্রদান করেছিল। এই নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস পান ৬২.৩২ শতাংশ ভোট। মুস্তাফা বারঘোতি পান ১৮ আর ডিইএলপির তায়সির খালিদ পান ৩.৫ শতাংশ ভোট।

হামাস অবশ্য এর আগে বেশ কিছু নির্বাচন বিশেষ করে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এক বছরের মধ্যে ৩টি মেয়াদে পৌরসভা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই নির্বাচনে ফাতাহ ১৭টি পৌর কাউন্সিলে এবং হামাস ৯টি কাউন্সিলে বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন হয় ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি গাজাতে। এই নির্বাচন হামাসকে খুশি করলেও ফাতাহকে করে উদ্‌বিগ্ন। কারণ, এই নির্বাচনে ১০টির মধ্যে ৭টি পৌর কাউন্সিলে (১১৮ টি আসনের মধ্যে ৭৮টি আসনে) হামাস বিজয় লাভ করে। ফাতাহ জয় পায় মাত্র ৩০টি আসনে, আর ৯টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয় পায়।

নির্বাচনে এই ফলাফল আসার পর স্বাভাবিকভাবেই গাজাস্থ হামাস নেতারা পরবর্তী লেজিস্লেটিভ (আইনসভার নির্বাচন, যাকে ফিলিস্তিনের জাতীয় নির্বাচন হিসেবেই বিবেচনা করা হয়) নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সাহস পায়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ব্যাপারেও আশাবাদী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হামাসের পশ্চিম তীর শাখা অবশ্য ততটা উৎসাহী ছিল না। আর হামাসের হেবরন শাখার এই নির্বাচন নিয়ে কোনো আগ্রহই ছিল না। হামাসের যে নেতারা জেলে ছিলেন, তারা ভেতর থেকে মিশ্র সিদ্ধান্ত জানান। তবে প্রবাসে থাকা হামাস নেতারা নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেন, খুবই সতর্কতার সঙ্গে। এই সকল শাখার মতামত এবং সার্বিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে হামাসের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি 'ইসতিশারি কাউন্সিল' নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

হামাসের রাজনৈতিক শাখার অন্যতম নেতা এবং নির্বাচনী কমিটির প্রধান ইজ্জাত আল রিসিক নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন–

> 'হামাস কয়েক দফা আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে থাকা সকল শাখা এবং কারাগারে থাকা আমাদের অন্য দায়িত্বশীলদের সাথেও এই ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়েছে। এই কথাটি সবারই মনে রাখা উচিত, আমাদের এই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার রক্ষা এবং অন্যায় দখলদারিত্বের অবসান হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আগের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। যেকোনো মূল্যে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই আমরা এই দুই কার্যক্রম অব্যাহত রাখব। তারপরও আমরা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তা ছাড়া ইন্তিফাদাসহ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বছরগুলোতে আমাদের আন্দোলন এবং সংগঠনে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, সেগুলোকেও আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

> আমরা জানি, এই লেজিস্লেটিভ নির্বাচনটি অসলো-চুক্তির আওতায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনটি হওয়ার কথা ছিল ২০০৫ সালের জুলাইতে, কিন্তু এখন তা ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে হতে যাচ্ছে। আমরা এই নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের জালিয়াতি ও অনিয়ম সহ্য করব না। মূলত অনিয়ম হয় বলেই আমরা ১৯৯৬ সালের নির্বাচন বয়কট করেছিলাম। আমাদের সেই বয়কট আদর্শিক কারণে ছিল না। নির্বাচনে যাওয়া হালাল নাকি হারাম– আমরা সেই বিতর্কেও যেতে চাই না। আমরা কেবল তাই করছি, যা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সহযোগিতা করছে এবং জনগণ যা আমাদের কাছে চাইছে। আমরা জানি, অসলো-চুক্তিটি একটি ব্যর্থ চুক্তি এবং এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যহত হতে যাচ্ছে। আমরা এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে ছিলাম। কারণ, আমরা কোনো অবস্থাতেই ইহুদি বসতি স্থাপনকে মেনে নিতে পারি না। আমরা যদি ৯৬ সালে নির্বাচনে যেতাম, তাহলে ইহুদি বসতি স্থাপনকে স্বীকৃতি দিতে হতো, যা আমরা সঠিক মনে করিনি।'[১৩০]

মূল ধারার ইসলামিক দলগুলো গণতন্ত্র এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রক্রিয়াকে যে চোখে দেখে, হামাসের দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক একই রকম। ইখওয়ান বিশ্বজুড়ে যে চেতনাকে ধারণ করে, হামাসও ঠিক একই চেতনা লালন করে। ইখওয়ানের মতো হামাসও বিশ্বাস করে, মানুষের অধিকারের সুরক্ষা কেবল ইসলাম দিয়েই করা সম্ভব। আর সেই কারণে, ১৯৯৬ সালের স্থানীয় নির্বাচন এবং ২০০৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কটে হামাসের সিদ্ধান্তটি আদর্শিক নয়। কারণ, গোটা প্রক্রিয়াটি একটি অন্যায় পরিকল্পনার অংশ এবং এই প্রক্রিয়ায় কখনোই ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে না। তবে বর্তমান পরিস্থিতি যে অনেকটাই আলাদা, এটা হামাস ঠিকই অনুভব করছিল। বিশেষ করে অসলো শান্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়া, আরাফাতের মৃত্যু ও রাজনৈতিক শূন্যতা এবং গাজা থেকে ইজরাইলের সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত– সবগুলোই হামাস বিবেচনায় নিয়েছিল। যাহোক, ২০০৫ সালের ১২ মার্চ হামাসের মুখপাত্র হামাসের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

মিশর বৈঠক

অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য ফাতাহর ওপর যে চাপ ছিল, তা নিরসনে কায়রোতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই সংক্রান্ত বৈঠক করার ঘোষণা দিয়েছিল।

---

১৩০. তথ্যসূত্র : হামাস : এ হিস্টোরি ফ্রম উইথিন।

এর আগেও মিশর সরকার, ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকে মধ্যস্থতা করেছিল। যাহোক, এবার ১৫ থেকে ১৭ মার্চের মধ্যে মিশর কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের মিশরে আমন্ত্রণ জানায়। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন মিশরের গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন প্রধান ওমর সুলায়মান এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

ফিলিস্তিনের ১২টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন এবং বৈঠক থেকে ১২ দফা ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেন; যার মধ্যে অন্যতম ছিল, ইজরাইলি দখলদারিত্ব প্রতিরোধ ও উদ্বাস্তু নাগরিকদের নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই বৈঠক থেকে তাহদিয়ার সময়কে আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। এর অর্থ হলো, এই সময়ের মধ্যে ইজরাইল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আগ্রাসী তৎপরতা বন্ধ করবে। বৈঠকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাঠামোতেও সংশোধনী আনার প্রস্তাব অনুমোদন হয়, যাতে হামাস ও ইসলামিক জিহাদ যোগদান করতে পারে।

কায়রোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকটি হামাস ও ইসলামিক জিহাদের জন্য শাপে বর হয়েছিল। কারণ, বৈঠকের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মিশর ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ উভয়েই হামাস বা ইসলামিক জিহাদের মতো প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া এই বৈঠকের কল্যাণেই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাঠামোতে সংস্কার করার প্রস্তাব পাশ হয়, যা ছিল সময়ের দাবি। মূলত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও মিশর উভয়ই চেয়েছিল, ২০০২ সাল থেকে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনিদের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি আরও কিছুদিন বহাল থাকুক। অন্যদিকে আমেরিকা এবং ইজরাইলও এই যুদ্ধবিরতিটি চাচ্ছিল! কারণ, শ্যারনের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গাজা থেকে সৈন্য ও অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনা সরিয়ে নিতে যুদ্ধবিরতির কোনো বিকল্প ছিল না। হামাস এই বাস্তবতাটি বুঝলেও নীরব ছিল! কারণ, তারাও একেবারে খালি হাতে ফেরেনি। একই সঙ্গে তারা অনুধাবন করছিল, গাজা ও পশ্চিম তীরের অধিকাংশ মানুষ সহিংসতা নয়; বরং যুদ্ধবিরতিই কামনা করে। কারণ, দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে দিনের পর দিন ইজরাইলিদের চলা বর্বরতার দরুন সাধারণ মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

কায়রোতে হামাসের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খালিদ মিশাল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে ঢেলে সাজানোর বিষয়ে সবাইকে একমত করতে পারাটাকে তিনি বড়ো সফলতা হিসেবেই বিবেচনা করছিলেন। কায়রোতে বৈঠকপরবর্তী এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দিতে গিয়ে খালিদ মিশাল বলেন– 'পিএলও তিনটি কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটি হলো মৌলিক কাঠামো, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে।

দ্বিতীয়টি হয় ১৯৬৮ সালে। তখন থেকেই পিএলও-তে ফাতাহর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কায়রো বৈঠকের পর পিএলও-তে তৃতীয়বারের মতো বড়ো পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। কারণ, এই বৈঠকের ঘোষণাপত্রের আলোকে পিএলও-তে ফাতাহর আধিপত্য করার দিন ফুরিয়ে এসেছে।[১৩১] আর যদি সত্যই ফিলিস্তিনের জনগণের আশা-আকাজ্ক্ষা ও ইচ্ছার আলোকে পিএলও-কে গড়ে তোলা হয়, তাহলে হামাস সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। সেইসঙ্গে পিএলও'র মোড়কে সংঘঠিত নোংরা দুর্নীতিরও অবসান ঘটবে। আর এ বৈঠক থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হামাস তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। কারণ, হামাস মনে করে– এই সময়ের মধ্যে তারাও নিজেদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরেকটু গুছিয়ে নিতে পারবে।'

কিন্তু পৌরসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে আবারও টানাপোড়েন শুরু হয়। ২০০৫ সালের ৫ মে, পশ্চিম তীরের ৭৬টি এলাকায় এবং গাজার ৮টি এলাকায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসব এলাকার ৯০৬টি আসনের জন্য ২৫০০জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই নির্বাচনে ৫০টি পৌরসভায় নির্বাচিত হয়ে ফাতাহ চালকের আসনে বসে।

হামাস জয়ী হয় ২৮টি পৌরসভায়। বাকি ৫টি অন্যান্য ছোটোখাটো দল জিতে নেয়। এই নির্বাচনে ফাতাহ গ্রামীণ জনপদগুলোতে ভালো করে, আর হামাস জয়ী হয় শহুরে এলাকায়। বিশেষ করে রাফাহ, বেইত লাহিয়া এবং আল বুরাজির অধিকাংশ এলাকাতে হামাস প্রার্থীরা জয়ী হয়। আর ফাতাহও সুযোগ বুঝে এই এলাকাগুলোর নির্বাচন ও ফলাফলে পুনঃতদন্ত এবং পুনঃনির্বাচন দাবি করে। ২০০৫ সালের ২১ মে ফিলিস্তিনের আদালত এই তিন এলাকায় আবারও নির্বাচন করার আদেশ দেয়।

হামাস আদালতের এই আদেশ মেনে নেওয়ার শর্ত হিসেবে দাবি করে– পুনঃনির্বাচনে যা ফল হবে, ফাতাহকে তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই দলই সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হয়।

৩০ মে হামাস ঘোষণা দেয়– যদি কোনো গ্যারান্টি না দেওয়া হয়, তাহলে তারা নির্বাচন বয়কট করবে। মূলত এই নির্বাচন নিয়ে ফাতাহও বেশ একগুঁয়েমি প্রদর্শন করে! কারণ, তারা জানত নির্বাচন হলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাঠামোতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হবে।

---

[১৩১]. তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক *আল আহরাম*। ৭৩৫ নং সংস্করণ (২৪-৩০ মার্চ, ২০০৫)

২০০৫ সালের ৪ জুন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট আব্বাস একটি ডিক্রি জারি করে, জুলাইতে অনুষ্ঠিতব্য আইনসভার নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। হামাস ও অন্যান্য দলগুলো আব্বাসের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি ব্যক্ত করে।

লন্ডনের *আল হায়াত* পত্রিকা একটি প্রতিবেদনে জানায়, গাজায় কর্মরত ফাতাহর বেশ কিছু নেতা এই নির্বাচন স্থগিত করানোর চেষ্টা করেছিল! কারণ, তাদের আশঙ্কা ছিল ফাতাহ নির্বাচনে ভালো করবে না। হামাসও এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ ভালো প্রচারণার পরিকল্পনা করেছিল। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, ফাতাহ প্রার্থী চূড়ান্ত করা নিয়ে বেশ দোটানায় থাকায় কৌশল হিসেবেই নির্বাচন স্থগিত করেছিল। প্রার্থী নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস একটি গোপন জরিপও চালিয়েছিলেন! তবে এর সবটাই ফাতাহর অভ্যন্তরে বিভেদ ও বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে এর আগের পৌর নির্বাচনে হামাস ভালো করায় আইনসভার নির্বাচন নিয়ে ইজরাইলের মধ্যেও নানা আশঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত ইজরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন এবং তার সহকর্মীরা হুমকি দেয়– যদি হামাস আইনসভার নির্বাচনে জিতে যায়, তাহলে তারা গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে।

অন্যদিকে, ২০০৫ সালের ২৬ মে, ওয়াশিংটনে মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা দেন, হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। আর যদি নির্বাচনে তারা জয়লাভও করে, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেবে না। হামাস বিজয়ী হলে তাদের নেতাদের সাথে কীভাবে আলোচনা এগোবে, তা নিয়ে ইজরাইল এবং আমেরিকা উভয়ই শঙ্কিত ছিল। একই ধরনের আতঙ্ক ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেও। তারা অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার দুই বছর আগে অর্থাৎ, ২০০৩ সালেই হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেয়।

সামগ্রিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো বেশ দোটানায় পড়ে যায়। তারা মধ্যপ্রাচ্যে কিছু ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন বা তার নেতৃবৃন্দের সাথে কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়েও তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে একটি গরম খবর ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র ২০০৫ সালের ৮ জুন জেরুজালেমে সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় স্বীকার করেন– ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু কর্মকর্তা এরই মধ্যে হামাসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন;

নিয়মিত যোগাযোগও রাখছেন। জানা যায়, ২০০৫ সালের মার্চে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা গাজার দেইর আল বালার মেয়র আহমাদ আল কুর্দের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। ২০০৫ সালের মে মাসে তারা পশ্চিম তীরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র হাশেম আল মাসরির সঙ্গেও বৈঠক করেছে। এই দুজন ব্যক্তিই হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। হামাস যদিও ইজরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, কিন্তু পশ্চিম তীরের ভারপ্রাপ্ত মেয়রকে তার পৌরসভার নিত্যদিনকার সমস্যা সমাধানের জন্য, ইজরাইলের সেই কর্মকর্তাদের সাথেই কথা বলতে হয়, কাজ করতে হয়। সেভাবেই তার সাথে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের যোগাযোগ হয়েছিল।

এই যোগাযোগের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তারা ভীষণ বিব্রত হয়। হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করার পুরোনো সিদ্ধান্তে তারা এখনও অবিচল রয়েছে– জেরুজালেম সফরকালে তৎকালীন ইজরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভান শ্যালমকে এ কথা বোঝাতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্রর খুব বেগ পেতে হয়। তিনি বলেন– 'এই ধরনের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে অবরোধ আরোপ করতে চাইছে, সেই পদক্ষেপে ব্রিটেন অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে।'

হামাস নিজেও বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছে, তারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এই কারণে, যাতে আন্তর্জাতিক মহল তাদের ওপর থেকে বয়কট, অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নেয়। হামাস আরও চায়, পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে তাদের যেসব নেতাকর্মীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, তারা যেন সকলেই প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়। তারা যদি গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে, তাহলেই সকল আন্তর্জাতিক পক্ষ তাদের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য হবে। আর এভাবেই হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।

২০০৫ সালের ১৮ জুলাই, আইনসভার নির্বাচনের কোনো তারিখ নির্ধারণ ছাড়াই পুরনো আইনসভার একটি বৈঠক ডাকা হয়। উদ্দেশ্য, নির্বাচনী আইনগুলোতে সংশোধনী আনা। নতুন সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ছিল কাউন্সিলের আসনকে ৮৮ থেকে বাড়িয়ে ১৩২-তে উন্নীত করা। সেইসঙ্গে সমান্তরাল ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে সকল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। নতুন আইন অনুযায়ী– একজন ভোটার দুই ধরনের ভোট প্রদান করতে পারবে। এর মধ্যে একটি হলো, জাতীয় দলগুলোর তালিকা থেকে যেকোনো একটি দলের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করার জন্য প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটি ভোট থাকবে। আর আইনসভার মোট আসনের অর্ধেক অর্থাৎ ৬৬টি আসন আনুপাতিক হারে তালিকায় থাকা দলগুলোর মাঝে বণ্টন করা হবে। তালিকায় থাকা কোনো দল দুই শতাংশের কম ভোট পেলে তারা কোনো আসন পাবে না।

আর দ্বিতীয় যে ভোটটি জনগণের হাতে দেওয়া ছিল, তা হলো স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য। তা ছাড়া নতুন আইন প্রস্তাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় ৬টি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। মাহমুদ আব্বাস এবং তার সহকর্মীরা হামাসকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এই পন্থায় যেতে চেয়েছিলেন। তবে হামাস তাতে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল ভোট যে পন্থাতেই হোক না কেন নির্বাচন হলে তারা ভালো করবে।

আইনসভার নির্বাচন নিয়ে ফাতাহ ও হামাসের নেতাদের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনার পর অবশেষে মাহমুদ আব্বাস ঘোষণা করেন– ২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এর পরের ইতিহাস একেবারেই ভিন্ন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে এলো, ফাতাহ নেতারা যেন তত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ল। অন্যদিকে হামাসকে সবচেয়ে বেশি গোছানো ও তৎপর মনে হলো।

২০০৫ সালের ২১ ডিসেম্বর ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিলো, তারা পূর্ব জেরুজালেমে ভোট গ্রহণ করতে দেবে না। বাতাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, এই ঘোষণা ফাতাহ ও ইজরাইলের যৌথ ষড়যন্ত্র, যাতে আসন্ন আইনসভার নির্বাচন স্থগিত করা হয়। ইজরাইল কেন এ রকম ঘোষণা দিয়েছিল, তা অবশ্য তারা গোপনও রাখেনি। এর আগে ফিলিস্তিনে যতবার নির্বাচন হয়েছে, তাতে পূর্ব জেরুজালেমের ভোটাররা অংশ নিতে পেরেছিল, কিন্তু ইজরাইলিরা এবার বাধ সাধার কারণ হলো– তারা জানত, নির্বাচনে হামাসের ভালো করার সম্ভাবনাই বেশি। গুজব যখন ডালপালা মেলে আরও বিস্তৃত হলো, তখন পিএলও ঘোষণা দিলো– পূর্ব জেরুজালেমের ভোটাররা ভোট দিতে না পারলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। অন্যদিকে হামাস চাচ্ছিল যেন নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হয়।

হামাসের বলিষ্ঠতায় ইজরাইল পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি তারা ঘোষণা দেয়, পূর্ব জেরুজালেমের সীমিতসংখ্যক বাসিন্দা পোস্ট অফিসে গিয়ে ভোট দিতে পারবে। আর বাকিদের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় গিয়ে ভোট প্রদান করতে হবে। ফাতাহর প্রার্থীকে পূর্ব জেরুজালেমে প্রচারণা চালাতে দিলেও হামাস প্রার্থীকে ইজরাইলি পুলিশ কখনোই সেই এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। শুধু তাই নয়; সেখানে কর্মরত হামাসের ৩টি নির্বাচনী ক্যাম্পও ইজরাইলি পুলিশ বন্ধ করে দেয়।

শেষমেষ প্রচণ্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা ছিলেন ভীষণ রকম উদ্‌বিগ্ন। ফাতাহ্ নেতারা ছিলেন খুবই অসহায়, যদিও নির্বাচনী প্রচারণায় তারা অতীতের ভুলের জন্য জনগণের কাছে বারবার ক্ষমা চায়। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডোনাল্ড ম্যাকিনটায়ার জানান– 'ফাতাহ নেতারা মাহমুদ আব্বাসের কথা বলে সাড়া না পাওয়ায় এখন ইয়াসির আরাফাতের স্মৃতির ওপর ভর করে বাঁচতে চাইছে। তারা জনগণের কাছে অতীতের ভূমিকার জন্য মাফ চাইছে আর বলছে, তারাও প্রতিরোধ আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং হামাসের সঙ্গে তারাও এই আন্দোলনটি শুরু করেছিল।' গাজা ও পশ্চিম তীর ঘুরে সাংবাদিক ম্যাকিনটায়ার আরও লিখেছিলেন– 'আমার মনে হলো, এই জায়গাগুলো থেকে ফাতাহর বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।'[১৩২]

---

[১৩২]. সাংবাদিক ডোনাল্ড ম্যাকিনটেয়ারের এই মন্তব্যগুলোর তথ্যসূত্র দেওয়া আছে রেফারেন্স নং ৫৮-তে।

অধ্যায়-১২

হামাসের সরকার গঠন

দেশি-বিদেশি সব মহলই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, হামাস নির্বাচনে ভালো করবে। নির্বাচনের কিছুদিন আগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়– ফাতাহ প্রথম আসনে থাকবে, আর হামাস অল্প ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ফিলিস্তিনের আইনসভায় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত 'প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চ' নামক প্রতিষ্ঠান ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আরেকটি জরিপ চালায়, যাতে দেখা যায়– ৫০ শতাংশ মানুষ ফাতাহকে সমর্থন করছে। আর হামাসের পক্ষে ৩২ শতাংশ। ডিসেম্বর মাসের ২৯-৩১ তারিখের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় দফা জরিপ চালায়, যাতে হামাসের পক্ষে ২৫ আর ফাতাহর পক্ষে ৪৩ শতাংশ জনগণ আছে বলে দেখানো হয়। অন্যদিকে প্যালেস্টিনিয়ান পাবলিক পোল একটি জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, ফাতাহ আর হামাসের মধ্যকার ব্যবধান অনেকটাই কমে এসেছে। ফাতাহ ৩৯.৩ শতাংশ আর হামাসের হাতে রয়েছে ৩১.৩ শতাংশ জনগণ।

নির্বাচনের দিনের এক্সিট পোলেও দেখা যাচ্ছিল, ফাতাহ হামাসের তুলনায় বেশি সংখ্যক আসনে জয়লাভ করবে। 'প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চ' তাদের চূড়ান্ত জরিপে জানায়– ফাতাহ ৪২ শতাংশ আর হামাস ৩৫ শতাংশ ভোট পেতে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে ফাতাহ ৪৬.৪ এবং হামাস ৩৯.৫ শতাংশ ভোট পাবে বলে জানানো হয়।

এই জরিপে সংসদীয় আসনের বিচারে বলা হয়, আসন্ন নির্বাচনে ফাতাহ ৬৩টি আর হামাস ৫৮টি আসনে জয়ী হতে যাচ্ছে।[১৩৩] বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও একই ধরনের ফলাফল ধারণা করছিলেন।

নির্বাচনের ঠিক আগের দিন ব্রিটেনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় হোসেন আঘা এবং রবার্ট মেলে যৌথভাবে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। তারা বলেন, 'আগামীকালের ফিলিস্তিনের নির্বাচন নিয়ে সর্বত্র উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। যদিও এটা পুরোপুরি নিশ্চিত, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই ইজরাইল ও আমেরিকার ঘোষিত দুশমন হামাস ফিলিস্তিনের আইনসভায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। জনগণের ভেতরে রয়েছে হামাসের বিপুল জনপ্রিয়তা। তা ছাড়া সর্বশেষ পৌর নির্বাচনেও তারা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে। এই অবস্থায় বলা যায়, হামাস বেশ বড়ো সংখ্যক ভোট পেতে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, হামাসের দু-একজন হয়তো মন্ত্রিসভাতেও জায়গা পেয়ে যেতে পারে।'[১৩৪]

তবে বাস্তব চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। পূর্বের সকল জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল গুঁড়িয়ে দিয়ে হামাস ৭৪টি আর ফাতাহ মাত্র ৪৫টি আসনে জয়লাভ করে। এমনকী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগে হামাস ও ফাতাহ উভয় দলের নেতৃবৃন্দ মিলে একটি বিবৃতি দেন। এতে স্বীকার করা হয়, হামাস আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ঘোষণা দেন, তার দল গাজা ও পশ্চিম তীরের ৭০টিরও বেশি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে হামাসের মুখপাত্র মুশির আল মাসরি জানান, তারা আশা করছেন হামাস ৭৭টি আসনে জয় পাবে।

পরাজয় মেনে নিয়ে ফাতাহর প্রধানমন্ত্রী আহমেদ কুরেয়ি পদত্যাগ করেন এবং ঘোষণা দেন, এখন হামাসের সময়। তারাই এখন মন্ত্রিসভা গঠন করবে।

এর আগে মিডিয়া এবং বিশ্লেষকরা বলেছিল, নির্বাচনে হামাসের বিজয় হলে তা তাদের জন্যও বিস্ময়ের কারণ হবে। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকই ধারণা করেছিলেন, হামাস হয়তো আইনসভায় বিরোধী দলের আসনে বসবে। তবে যারা নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তারা এই ফলাফলে মোটেও অবাক হয়নি। ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস ম্যাকগ্রিল খান ইউনুস উপত্যকা ঘুরে *গার্ডিয়ানে* একটি কলাম লিখেন।

---

[১৩৩]. ফিলিস্তিনের নির্বাচন কমিশন এক প্রতিবেদনে জানায়, গাজা উপত্যকায় এই নির্বাচনে ৭৪.৬-৭৬ শতাংশ ভোট পড়ে আর পশ্চিম তীরে মোট ৭৩.১ শতাংশ ভোট প্রদান করা হয়।

[১৩৪]. www.guardian.co.uk/israel/story/0,,1693354,00.html ২৪ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে *গার্ডিয়ানে* প্রকাশিত হয়।

এখানে তিনি বলেন– 'ফাতাহর অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অযোগ্যতা হামাসকে এই বড়ো বিজয় পেতে সাহায্য করেছে।'[১৩৫]

হামাস নেতারাও এই বিস্ময়কর ফলাফলে অবাক হয়েছে মর্মে পশ্চিমারা দাবি করলে হামাস তা বরাবর অস্বীকার করেছে। প্রকৃত সত্য হলো– হামাসের অভ্যন্তরে এই নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে দুটি ধারণা প্রকট ছিল। নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্বাচন প্রচারণার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের ধারণা ছিল, হামাস ৭০ থেকে ৭৫টি আসনে জয়লাভ করবে।

হামাসের নির্বাচনী জনশক্তি নির্বাচনের সময় অসংখ্য বাড়ি ঘুরেছেন, অসংখ্য পারিবারিক মুরব্বিদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন, গোত্রপ্রধানদের সাথে বৈঠক এবং সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে মত-বিনিময় করেছেন।

হামাস কেন এ রকম বিস্ময়কর বিজয় লাভ করল? এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি শোনা যেত তা হলো– ফাতাহকে শায়েস্তা করার জন্যই জনগণ হামাসকে বেছে নিয়েছে। আদৌত বাস্তব চিত্র তেমনটা ছিল না। খুব কম সংখ্যক ভোটারই হামাসকে ফাতাহর ওপর রাগ করে ভোট দিয়েছে। কারণ, অতীতের এক দশকের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হামাস সব সময়ই নির্বাচনে ভালো করেছে। সকল ছাত্র সংসদে, ট্রেড ইউনিয়নে বিজয়ী হয়েছে। সর্বশেষ পৌর নির্বাচনেও হামাস ৪০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছে। ভোটের হিসেবে আইনসভার নির্বাচনে হামাস পেয়েছে ৪৪.৪৫ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ ফাতাহকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জনগণ যদি হামাসকে বেছে নিয়েও থাকে, তাহলেও তা ৪ শতাংশের বেশি নয়। কারণ, ৪০ শতাংশ ভোট আগে থেকেই হামাসের নির্ধারিত। অন্যদিকে, এই নির্বাচনে ফাতাহ পেয়েছিল ৪১.৪৩ শতাংশ।

আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে হামাসের জয়ের নেপথ্যে বেশ কিছু কারণ বেরিয়ে আসবে। যেমন :

- সাধারণ মানুষ মনে করে, হামাস ফিলিস্তিনিদের বুকের মধ্যে লুকায়িত স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধারণ করতে পারে। আজও অনেক ফিলিস্তিনিরা বেঁচে আছে শুধু এই স্বপ্ন নিয়েই, ১৯৪৮ সালে তাদের যে মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, একদিন তারা সেখানে ফিরে যাবে।

---

[১৩৫]. ক্রিস ম্যাকগ্রিল ২৪ জানুয়ারি, ২০০৬-এ *গার্ডিয়ানে* এই 'Fatah Struggles with Tainted Image at polls' প্রতিবেদনটি রচনা করেন। www.guardian.co.uk/israel/story/0,, 1693433,00.html

- দ্বিতীয়ত, হামাস একমাত্র সংগঠন, যারা ইজরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বে স্বীকার করে না এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ইজরাইল বলে কোনো রাষ্ট্র টিকবে না। যেমনটি ১১ শতকে ক্রুসেডারদের ফিলিস্তিন জয়ের পর সিরিয়া নামক দেশটি মানচিত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছিল! ঠিক অনরূপভাবে ইজরাইলও একদিন বিলীন হয়ে যাবে।
- তৃতীয়ত, ১৯৮৮ সালে ফাতাহর নেতৃত্বাধীন পিএলও ইজরাইল রাষ্ট্রের টিকে থাকার অধিকার ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দিয়েছিল! কিন্তু ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ এই ধারণা লালন করে না। এ নিয়ে ফাতাহর ওপর তাদের আক্রোশ দীর্ঘদিনের। সে কারণেই ফিলিস্তিনের জনগণের বড়ো অংশ ফাতাহর বিকল্প শক্তি হিসেবে হামাসকেই বিবেচনা করতে শুরু করে।
- চতুর্থত, হামাস ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ধারাবাহিকতা লালন করছে। অনেক মানুষ আজও ইখওয়ানকে তাদের প্রাণের সংগঠন হিসেবে মনে করে। কারণ, ইখওয়ানের মানবসেবা ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড অনেককেই উপকৃত করেছে।
- পঞ্চমত জাতিসংঘ, সেনাবাহিনী বা বিভিন্ন এনজিও ফিলিস্তিনের মানুষের সেবায় নানা ধরনের সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলেও সেগুলোর প্রকৃত সেবা খুব কমসংখ্যক ফিলিস্তিনি নাগরিকই পায়। তার তুলনায় জনগণ হামাস এবং হামাসের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সহজে যাদের সেবা পায়। ইজরাইলিরা যখন ফিলিস্তিনিদের দমন করার জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছিল, তখন সেই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিল কেবল হামাস।
- তা ছাড়া জনগণ ফাতাহ আর হামাস নেতাদের তুলনা করারও সুযোগ পেয়েছিল। যেখানে ফাতাহর নেতারা আকুণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, সেখানে হামাসের নেতারা ছিলেন একেবারেই স্বচ্ছ ইমেজের অধিকারী। বিভিন্ন মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডে হামাস যেভাবে শালীনতা, সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেছিল, তার প্রশংসায় জনগণের অধিকাংশই ছিল পঞ্চমুখ।
- হামাস নেতারা জনগণের কল্যাণে বাইরের দাতাসংস্থা থেকে মিলিয়ন ডলার সাহায্য নিয়ে এলেও সেই টাকায় নিজেদের ভাগ্য বদলানোর চেষ্টা করেননি। ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণই এর সাক্ষী।
- হামাস নেতারা একেবারেই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। কোনো আয়েশি জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিলেন না। বহু হামাস নেতাকে পাওয়া যেত, যারা সাধারণ জনগণের সাথে উদ্বাস্তু শিবিরেই বাস করতেন।
- হামাস নেতা-কর্মীরা ছিলেন জনগণের আত্মার পরম আত্মীয়।

- হামাস প্রতিষ্ঠাতা শেখ ইয়াসিন তার গোটা জীবনটাই পার করেছেন উদ্বাস্তু শিবিরে। তার জীবনযাত্রাও সাধারণ ফিলিস্তিনিদের চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না। অন্যদিকে ফাতাহর নেতারা বিলাসী জীবনযাপন করতেন। অনেকেরই প্রাসাদ আকৃতির বাসা ছিল। ফিলিস্তিনিদের অধিকাংশই মনে করত, তারা ইজরাইলের সঙ্গে যোগসাজশে অবৈধ সুবিধা নিয়ে এত বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণ করেছেন।
- হামাসের সফলতার আরেকটি বড়ো কারণ ছিল ইসলামের অনুপম আদর্শ, যা তারা খুব শক্তভাবে ধারণ করতেন। ফাতাহর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আদর্শের তুলনায় ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ ইসলাম ও ইসলামি আদর্শের প্রতি অনেক বেশি দুর্বল ছিল। ১৯৭০-এর দশকে আরব জাতীয়তাবাদের পতনের পর থেকেই ফিলিস্তিনের মানুষ আরও বেশি ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কারণ, অধিকাংশ ফিলিস্তিনি নাগরিকই বিশ্বাস করত, এই আরব জাতীয়তাবাদী দর্শনের কারণেই ১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিনিরা ইজরাইলের কাছে পরাজিত হয়।
- ফাতাহ লিবারেল অ্যাজেন্ডাকে বেশি উপস্থাপন করলেও হামাসের ইসলামিক এজেন্ডাগুলোই জনগণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। এমনকী ফাতাহর অনেক নেতা-কর্মী ফাতাহর ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে হতাশ হয়ে ধীরে ধীরে হামাসের সান্নিধ্যে চলে আসে।
- ফাতাহর মধ্যস্থতায় ইজরাইলের সঙ্গে তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা হামাসের বিজয়ে আরেকটি বড়ো কারণ। কারণ, ইজরাইলের সঙ্গে এসব কূটনৈতিক তৎপরতায় তেমন কোনো লাভ হচ্ছিল না; বরং ফিলিস্তিনের মানুষের দুর্ভোগ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। হামাস শুরু থেকেই এই শান্তি প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিল না। কারণ, তারা জানত– ইজরাইল কৌশলে আরও ফিলিস্তিনের ভূমিকে দখলে নেওয়ার জন্য এমন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
- হামাস আগাগোড়াই বিশ্বাস করত, কেবল জিহাদের মাধ্যমেই ইজরাইলের দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। দূতিয়ালি বা কূটনৈতিক আলোচনায় এটা সম্ভব না। শুরুতে অনেকেই হামাসের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেকেই হামাসের পক্ষে চলে আসেন।
- গাজা থেকে ইজরাইল যখন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, তখন ফিলিস্তিনিদের কাছে হামাসের সশস্ত্র আন্দোলনকেই বেশি কার্যকর মনে হলো। কারণ, এটা পরিষ্কার– হামাসকে বাগে আনতে না পারার কারণেই ইজরাইল বাধ্য হয়ে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ইজরাইলের অভ্যন্তরীণ সংকট

হামাসের এই বিজয় ইঙ্গিত করে, ফিলিস্তিনে ইজরাইলিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ফিলিস্তিনিরা কখনোই মেনে নেবে না। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল, ইজরাইলিদের ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে নমনীয় হতে হবে। হয় শান্তি আলোচনা বহাল রাখতে হবে অথবা অন্য কোনো কৌশলে যেতে হবে। তবে আগের মতো করে কখনোই হয়তো ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ইজরাইলের এই বেকায়দা অবস্থান নিয়ে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরাও উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রকৃত সত্য হলো, কোনো চুক্তি বা শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইজরাইলিরা গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়নি; তারা গাজা থেকে সরে গিয়েছিল বিপদ থেকে বাঁচার জন্য।

ফিলিস্তিনের মানুষ খুব ভালো করেই জানত, এই সৈন্য প্রত্যাহারের কারণেই পুরোপুরি শান্তি আসবে না, সংঘাতও বন্ধ হবে না। কারণ, গাজার অধিকাংশ মানুষই উদ্বাস্তু, যারা ১৯৪৮ সালেই নিজ গৃহ থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং তখন থেকেই নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। এই সংগ্রাম তারা সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখবে। তা ছাড়া সকলেই জানত, গাজা থেকে ইজরাইলিরা সেনা এবং ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করে নিলেও গাজা সীমান্তে ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই বলবৎ থাকবে। তাই এই সীমান্ত দিয়ে একটি মানুষের বের হওয়া বা ঢোকা কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রবেশের জন্য তাদের ইজরাইলের ওপরই নির্ভর করতে হবে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের প্রতিটি কৃষকই ইজরাইলের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাদের প্রতিটি উৎপাদিত পণ্য বাইরে পাঠাতে বা কিছু নিয়ে আসতে ইজরাইলের অনুমোদনের কোনো বিকল্প ছিল না। একই সঙ্গে গাজার সকল ওষুধপণ্য, শিক্ষা উপকরণ, জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানির ওপরও ছিল ইজরাইলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। মূলত ইজরাইলের সেনা প্রত্যাহার হলেও গাজার ১২ লাখ বাসিন্দা ছিল ইজরাইলের বৃহৎ কারাগারে বন্দি।

অধিকন্তু গাজায় ইজরাইল যাদের হুমকি বলে মনে করত, তাদের ওপরও নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। এই ধরনের ব্যক্তিবর্গের বাসায় বা অফিসে ইজরাইলি বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালাত। গাড়িতে করে কোথাও গেলে, এমনকী পায়ে হেঁটে গেলেও তাদের নানাভাবে হয়রানি করত। আর গাজা উপত্যকার আকাশে সব সময়ই বিকট শব্দ করে ইজরাইলি বিমান বা হেলিকপ্টার টহল দিত, যা জনমনে বাড়তি ভয় ও উদ্‌বেগের কারণ ছিল।

তা ছাড়া গাজাতে ইজরাইলের অনেক প্রক্সি সেবক ছিল, যারা সাদা পোশাকে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন থেকে সম্ভাব্য হুমকিদের ব্যাপারে ইজরাইলকে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করত। তাদের অনেকেই ছিল ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

এই নিরাপত্তা বাহিনীটি সৃষ্টি করা হয়েছিল ৯০'র দশকে ইজরাইল ও পিএলও'র মধ্যেকার শান্তিচুক্তির আলোকে। এ ছাড়া ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন বাড়ানোর জন্যও ইজরাইল নানা ধরনের কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিল! যদিও সেই কৌশলের কারণে হামাসের চেয়ে ফাতাহরই ক্ষতি হয়েছিল বেশি।

অন্যদিকে ইজরাইল গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিলেও ইজরাইলের বিভিন্ন কারাগারে তখনও প্রায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনি আটক ছিল, যার মধ্যে অসংখ্য নারীও ছিল। আটককৃত এই বন্দিদের বেশিরভাগ ছিলেন গাজার স্থায়ী অধিবাসী। এই বন্দিদের মুক্তি না দেওয়ায় সাধারণ ফিলিস্তিনিরা ভালোভাবেই বুঝেছিল, ইজরাইলের সঙ্গে সংঘাত আদৌ বন্ধ হবে না।

ইজরাইলিরা এই বন্দিদের মুক্তি দিতে অনিচ্ছুক ছিল! কারণ, তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকেন্দ্র মনে করত। অতীতের নানা কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে প্রায়শই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোও জানার চেষ্টা করত। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, ইজরাইলই হলো জাতিসংঘের একমাত্র সদস্যরাষ্ট্র, যাকে বন্দিদের নির্যাতন করে তথ্য সংগ্রহ করার মতো অমানবিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা বোঝা আসলেই কঠিন। ইজরাইল যেসব কারণে এই বন্দিদের আটক রেখেছিল, তার কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি; বরং এই দীর্ঘ আটকাদেশের পরিণতি ইজরাইলের জন্য হিতে বিপরীত হয়েছিল। যারা বন্দি ছিলেন, তাদের পরিবার-পরিজন বা সহকর্মীরা এই আটকাদেশে হতাশ না হয়ে বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে ইজরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল।

ফাতাহর ওপর নির্বাচনে পরাজয়ের প্রভাব

হামাসের বিজয়ে যে ভূমিকম্পের জন্ম হলো, তা পরাজিত দলগুলোর ওপর মারাত্মক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ফাতাহর পক্ষ থেকে দলটির সিনিয়র নেতা জিবরিল আল রাজুব কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব নিয়ে হামাস নেতা মুশির আল মাসরির সঙ্গে দেখা করেন; যদিও হামাস এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে ফাতাহকে বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়।

বিজয়ের পরপরই খালিদ মিশাল ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ এবং গোটা আরব জাহানকে জানিয়ে দেন, 'হামাসের বিজয়ে তাদের কারোরই উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। হামাস যদি সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে তারা সর্বাগ্রে জনগণের সেবা করবে।'

২০০৬ সালের ২৮ জানুয়ারি দামেস্কে এক সংবাদ সম্মেলনে খালিদ মিশাল ফাতাহসহ অন্য সকল দলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যেখানে আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হামাসের বিজয়ের খেসারত হিসেবে ফিলিস্তিনে খাদ্য সহযোগিতা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল, সেখানে খালিদ মিশাল সকলকে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডার ভিত্তিতে কাজ করার ইচ্ছা জানান দেন। তিনি জানান, হামাস কখনোই স্বৈরাচারী মানসিকতায় দেশ পরিচালনা করবে না। হামাস কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে না। এমনকী হামাস দলীয়ভাবে অসলো-চুক্তির তীব্র বিরোধী হলেও এ ব্যাপারেও হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।

খালিদ মিশাল আরও বলেন– 'আমাদের পূর্বের নেতারা যেসব চুক্তি করে গেছেন আমরা তা মেনে চলব ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তা ফিলিস্তিনিদের স্বার্থহানি করে।' তিনি আল কাসাম ব্রিগেডসহ অন্য সকল সামরিক সংগঠনগুলোকেও সামরিক বাহিনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে জর্ডান থেকে হামাসের কিছু শীর্ষ নেতা বেরিয়ে আসার পর তাদের দামেস্কে আশ্রয় দেওয়া হয়। তবে সিরিয়ান সরকার কখনোই তাদের জনসম্মুখে কোনো কথা বা অনুষ্ঠান করতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাসের বিপুল জয়ের পর হঠাৎ করেই যেন গোটা পরিস্থিতি পালটে যায়। সিরিয়ান সরকার অনুভব করে, তারা এতদিন যে শক্তিটাকে দমিয়ে রেখেছে, আসলে তারাই ফিলিস্তিনের জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি।

যাই হোক, খালিদ মিশাল সেই সংবাদ সম্মেলনে যতই ভালো আর সুন্দর কথা বলুন না কেন, তা ফাতাহসহ অন্যান্য প্রতিপক্ষকে স্বস্তি দিতে পারছিল না। বিশেষ করে অন্য কোনো সংগঠন ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, ফাতাহ যেন তা ভাবতেই পারছিল না।

মিশালের ইতিবাচক বক্তব্য আমেরিকাসহ ইজরাইলের অন্য মিত্ররাষ্ট্রসমূহ এবং পশ্চিমামহলকেও স্বস্তি দিতে পারেনি। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বেশ কয়েক দফা তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করে মধ্যপ্রাচ্য নীতিমালা এবং সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইসও জানান, তার দফতরের কর্মকর্তারা কেন নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে ভুল বার্তা দিলো– এ নিয়েও তারা পর্যালোচনা করবেন।

এক পর্যায়ে বুশ প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, হামাসকে তারা কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেবে না। হামাসের সঙ্গে কোনো সংলাপে যাবে না। এমনকী ফিলিস্তিনেও কোনো সাহায্য পাঠাবে না, যতক্ষণ না হামাস তিনটি মৌলিক শর্ত পূরণ করে। এই তিনটি শর্ত হলো–

১. ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
২. সহিংসতা পরিহার করে নিরস্ত্র হতে হবে এবং
৩. পূর্বে ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তিকে মেনে নিতে হবে।

মার্কিন প্রশাসন জানায়– তিনটি শর্ত পূরণ করলেই কেবল হামাসকে মেনে নেওয়া যেতে পারে! কারণ, তারা গণতান্ত্রিকভাবে এবং জনগণের রায় নিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

হামাসের তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যুরোপ্রধান খালিদ মিশাল সেই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিটিশ পত্রিকা *গার্ডিয়ানে* একটি কলাম লিখেছিলেন। ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ কলামটি *গার্ডিয়ানে* প্রকাশিত হয়। সেই কলামটি নিম্নরূপ–

'আমরা কখনোই বিদেশি শক্তির কাছে নিজেদের জনগণ ও নৈতিকতাকে বিক্রি করব না।'[১৩৬]

> 'এ কথা সত্য, ফিলিস্তিনের জনগণই বিশ্বের মাঝে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন ও শিক্ষিত। এই সচেতন জনগোষ্ঠী যখন আইনসভার নির্বাচনে অংশ নেয়, তখন তারা জানত তাদের সামনে কোন কোন পথ খোলা রয়েছে। আর যারা হামাসকে ভোট দিয়েছে, তারাও খুব ভালোভাবে জানত, হামাস কী চায়। তারা হামাসকে বেছে নিয়েছিল কারণ, হামাস কখনোই জনগণের অধিকার ও তাদের যুক্তিসংগত লড়াইকে বিসর্জন দেয়নি। সেইসঙ্গে হামাস সব সময়ই সংস্কারের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছে। জনগণ এটাও জানত, আমেরিকা কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এরই মধ্যে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে এবং হামাসকে ভোট দিলে ফিলিস্তিনকে দেওয়া অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা স্থগিত হয়ে যেতে পারে।
>
> কিন্তু এত কিছুর পরও জনগণ যখন গণতান্ত্রিক সেই নির্বাচনে হামাসের পক্ষে ম্যান্ডেট দিলো, তখন বিশ্বের বড়ো বড়ো গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলো গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিতে ব্যর্থ হলো। হামাসকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ফিলিস্তিনে একটি সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির পরিবর্তে তারা ফিলিস্তিনের জনগণকে শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করল।
>
> আমাদের এখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কারণ, আমরা জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি। যারা আমাদের ওপর

---

১৩৬. www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1698420,00.html

অবরোধ আরোপ করে শাস্তি দিতে চাইছে, মূলত তারাই দখলদারদের নিঃশর্তভাবে সহযোগিতা করছে। আমরা যারা জুলুমের শিকার তারাই বরং শাস্তি পাচ্ছি; আর জালিমরা পাচ্ছে আনুকূল্য। হামাসের বিজয়কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিলিস্তিনের সাথে সম্পর্কটাকে নতুন করে ঝালাই করতে পারত, কিন্তু তারা সে পথে অগ্রসর হয়নি।

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে জানিয়ে দিতে চাই- যদি আপনারা মনে করেন, চাপ দিয়ে আমাদের সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে দেবেন বা নীতিচ্যুত করবেন, তাহলে আপনারা ভুলের মধ্যে আছেন। আপনাদের এরূপ কৌশল কোনো কাজেই আসবে না। আমাদের হাজারো ভাই-বোন এরই মধ্যে শাহাদাতবরণ করেছেন। লাখো ফিলিস্তিনি নাগরিক আজ উদ্বাস্তু হয়ে জীবনযাপন করছে। তারা ৬০ বছর ধরে নিজ ভূমে ফেরত যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই মুহূর্তেও ৯ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি ইজরাইলের কারাগারগুলোতে বন্দি রয়েছে। তাদের এসব ত্যাগকে আমরা বিফলে যেতে দিতে পারি না।

হামাস নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। কারণ, তারা বিজয়ের চেতনায় বিশ্বাস করে। হামাস ঘুষ, দমন-পীড়ন এবং ব্ল্যাকমেইলের তীব্র বিরোধী। আমরা সকল জাতির সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। তবে তা আমাদের ন্যায্য অধিকার বিসর্জন দিয়ে নয়। এর আগে আমরা ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস দেখেছি, যারা নিজেদের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছে এবং একটা সময়ে বিজয় তাদেরই হাতে ধরা দিয়েছে। আমরা তাদের সেই চেতনার থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা নই। আমরাও সত্যের জন্যই লড়াই করছি, আমাদের দৃঢ়তার কোনো অভাব নেই।

সকল আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই- যেহেতু ফিলিস্তিনের ভাই ও বোনরা আপনাদের পক্ষ হয়েই সংগ্রাম করছে, জীবন দিচ্ছে, তাই তাদের পাশে দাঁড়ানো সকলের দায়িত্ব। ফিলিস্তিনের মানুষ এমন কারও কাছ থেকে ডলার বা ইউরো পেতে চায় না, যারা এই সামান্য সাহায্য দেওয়ার অজুহাতে আমাদের অপমান ও অপদস্থ করবে। আমরা চাই, আপনারা আর্থিক সাহায্য নিয়ে এই মজলুম মানুষগুলোর প্রতি এগিয়ে আসুন। আপনাদের দেশে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের সাহায্য করতে চায়, তাদের সেই সুযোগ করে দিন এবং সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন।

ফিলিস্তিনের সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই– কেবল গাজা বা পশ্চিম তীরে যে মানুষগুলো অবরুদ্ধ হয়ে আছে, শুধু তারাই আমাদের জনগণ নয়; বরং এর পাশাপাশি লেবানন, জর্ডান এবং সিরিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে যে হাজারো মানুষ বছরের পর বছর মানবেতর জীবনযাপন করছে, তারাও আমাদেরই ভাই-বোন। আমরা আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই, কোনো প্রলোভনেই আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন ও দখলমুক্ত করার সংগ্রাম থেকে পিছু হটব না। আমাদের প্রাণপ্রিয় ফিলিস্তিন যেন ভালো থাকে, এখানে যাতে আইন-শৃঙ্খালা রক্ষা হয়, এ জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমরা করব। নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং এখন অন্যতম কাজ হলো পিএলও-তে সংস্কার করা, যাতে এই সংস্থাকে সত্যিকারভাবেই ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত করা যায়।

আমরা ইজরাইলিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই– আপনারা ইহুদি বা ভিন্নধর্মে বিশ্বাসী মানুষ, এ জন্য আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি না। এর আগে বিগত ১৩ শতাব্দী ধরে ইহুদিরা মুসলিম খিলাফতের অধীনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহাবস্থান করেছে। আপনারা আহলে কিতাব সম্প্রদায়। আপনাদের কিতাবকে সম্মান ও হেফাজত করাও আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। আপনাদের সাথে আমাদের এ সংঘাত ধর্মীয় কারণে নয়; বরং রাজনৈতিক কারণে। যে ইহুদিরা আমাদের ওপর হামলা চালায়নি, তাদের ওপর আমাদের কোনো রাগ বা আক্রোশ নেই। আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা অন্যায্যভাবে আমাদের জমিতে এসে আমাদেরই ওপর চেপে বসেছে, আমাদের সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে এবং জনপদগুলো নিশ্চিহ্ন করেছে।

আমরা কাউকেই আমাদের জমিগুলো অন্যায়ভাবে দখল করতে দেবো না। আমরা কখনোই আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেবো না। আমাদের দেশের মাটিতে জায়োনবাদী কোনো রাষ্ট্রকে কখনোই মেনে নেব না। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষরা যদি আমাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি কোনো যুদ্ধবিরতিতে যেতে চায়, তাহলে আমরা যেকোনো আলোচনার জন্যই প্রস্তুত। যারা সত্যিকারভাবেই ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, হামাস সব সময়ই তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।'

যাই হোক, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরপরই হামাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ একপক্ষীয়ভাবেই আরও বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। হামাস আশা করেছিল, ইজরাইলের নয়া নেতৃত্বও

ফিলিস্তিনের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতা এবং সংলাপের ব্যাপারে আগ্রহী হবে। একই সঙ্গে ইজরাইলের দখলদারিত্বের অবসানে হামাস যেহেতু সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে কখনোই প্রতারণা করেনি, সেই কারণে তারা সুশাসন দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। পশ্চিম তীর ও গাজায় কর্মরত কয়েকজন দায়িত্বশীল এরূপ পরিস্থিতিতে বেশ আশাবাদী ছিলেন। তারা যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, তাই তা নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে তারা যে পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলেছিলেন, তার বাস্তবায়নে সফলভাবেই কাজ করতে পারবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে তিনটি শর্ত দিয়েছিল, তা মেনে নেওয়া হামাসের জন্য অসম্ভব ছিল। হামাস নেতারা বুঝতে পারছিলেন, এগুলো হলো ফিলিস্তিনকে পূর্বের মতোই দমিয়ে রাখা এবং হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করার জন্য আমেরিকার মিছে বাহানা। আমেরিকাও জানত, যতদিন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ইজরাইলিরা দখল করে রাখবে, ততদিন হামাস এসব শর্ত মানবে না। হামাস বরাবর মনে করে, ফিলিস্তিন সমস্যার জন্য ফিলিস্তিনিরা নয়; বরং ইজরাইলিরাই দায়ী। আর আমেরিকা যদি সত্যিই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, তাহলে তারা দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর জন্য ইজরাইলের ওপর চাপ প্রয়োগ করত। কারণ, ফিলিস্তিনিরা তো জুলুমের শিকার; তারা জুলুমবাজ নয়।

আমেরিকার জন্য পুরো পরিস্থিতি কিছুটা বিব্রতকরও ছিল। কারণ, তারাই ফিলিস্তিনে নির্বাচন করার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, নির্বাচন হলে ফিলিস্তিনে কিছু ইতিবাচক সংস্কার হবে। তবে ফাতাহ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে– এই বিষয়টি আমেরিকার ভাবা দরকার ছিল। তেমনটা না ভাবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক ভুল।

হামাস যখন শর্ত মানতে অনীহা জানাল তখন আমেরিকা, ইজরাইল ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে হামাসকে এবং ফিলিস্তিনকে সকল তৎপরতার বাইরে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করল। বিশ্বের অনেক দেশই হামাসকে স্বীকৃতি এবং তাদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলে অবশ্য একটু কাজ হলো। আরব দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ডাকে খুব একটা সাড়া দেয়নি। বেশ কিছু আরব দেশ হামাস নেতাদের নিমন্ত্রণ এবং একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছিল। এমনকী তুরস্ক হামাসের একটি শীর্ষ প্রতিনিধি দলকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানাল। তুরস্কের এই আচরণে ইজরাইল ও আমেরিকা খুবই বিরক্ত হওয়ায় তারা ন্যাটোভুক্ত তুরস্কের ওপর চাপ দিলো, যাতে হামাস নেতারা কোনোভাবেই তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ না পান। তুরস্ক জানাল, তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে– যাতে এই অনুরোধ রাখা যায়। একই সঙ্গে তারা ইজরাইল ও হামাসের মধ্যে দূতিয়ালি করারও প্রস্তাব দেয়।

এরই অংশ হিসেবে ২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খালিদ মিশালের নেতৃত্বে হামাসের একটি প্রতিনিধি দল তুরস্কের আঙ্কারায় গমন করেন। তারা তুরস্কের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

হামাসবিরোধী মার্কিন প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র বড়ো ধরনের ধাক্কা খায়, যখন রাশিয়া মস্কোতে হামাস নেতাদের নিমন্ত্রণ করে। খালিদ মিশালের নেতৃত্বাধীন হামাস প্রতিনিধি দল ২০০৬ সালের ৩ মার্চ মস্কোতে স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেয়। যদিও রাশিয়া জানিয়েছিল, হামাসকে নমনীয় করতেই তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে! তবে মূল বৈঠকে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সেভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল। তাই হামাসের বিজয়কে তারা এই অঞ্চলে নতুন করে প্রভাব সৃষ্টির একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

রাশিয়া ও তুরস্কের এই কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও হামাস নেতাদের আমন্ত্রণ জানায়। এর আগেও তারা হামাসের শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। নিজেদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও মার্কিন চাপে বারবার তারা সেই তারিখ পরিবর্তন করেছে।

যাই হোক, রাশিয়া ও তুরস্কের পাশাপাশি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতারা এই সময়ে ইরান, সিরিয়া, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, সুদান, ওমান, আলজেরিয়া, লিবিয়া সফর এবং এসব দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। মালয়েশিয়াও হামাস নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটি মাহমুদ আব্বাসের চালাকিতে স্থগিত হয়ে যায়। তিনি মালয়েশিয়ার সরকারকে জানান, তিনি নিজেই মালয়েশিয়া সফরে যাবেন। সেইসঙ্গে তিনি চান, তার আগে যেন ফিলিস্তিন থেকে অন্য কেউ মালয়েশিয়া যাওয়ার সুযোগ না পায়। তার সফরের পরে হামাস নেতারা গেলে কোনো আপত্তি থাকবে না।

নির্বাচনের আগে ফাতাহর প্রভাবাধীন যে আইনসভা ছিল, তারা হামাসকে সব সময়ই দমন করতে চেয়েছে। যারা সেই আইনসভায় ফাতাহর সদস্য ছিলেন, তাদের অনেকেই এই নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি। তা ছাড়া নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় হামাসের ওপর চড়াও হওয়ার সুযোগও কমে গিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও হামাস দায়িত্ব নেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ১৩ নভেম্বর বিদায়ি আইনসভার সদস্যরা একটি বিদায়ি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং সেই বৈঠক থেকে তারা মাহমুদ আব্বাসকে কিছু বাড়তি ক্ষমতা প্রদান করে।

আব্বাসকে একটি সংবিধানিক আদালত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা প্রেসিডেন্টের সাথে হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন বা বিতর্ক অবসানের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবে। এই সংবিধানিক আদালতে নয়জন বিচারক থাকবেন, যারা যেকোনো বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। সেইসঙ্গে সরকার যদি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মূল নীতিমালা বা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করে, তাহলেও তারা ভেটো দিতে পারবেন।

এই নতুন ক্ষমতা পাওয়ার কারণে নবনির্বাচিত সংসদের যেকোনো অনুমোদিত আইনকে মাহমুদ আব্বাস চাইলে সাংবিধানিক আদালতের মাধ্যমে বাতিলও করে দিতে পারবেন। সেইসঙ্গে বিদায়ি আইনসভা ফাতাহর ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন চার ব্যক্তিকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে বসিয়ে দেন। এর মধ্যে একজন হলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান। বোঝাই যাচ্ছিল, ফাতাহর এত বছরের করা দুর্নীতি তদন্তে হামাসের নির্বাচনী অঙ্গিকারকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্যই এই পদে ফাতাহর পছন্দের লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাকি যে তিনটি পদে ফাতাহর লোককে বসানো হয় সেগুলো হলো– ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মকর্তা, সংসদের প্রধান প্রশাসক এবং সরকারের বেতন ও পেনশন বিভাগের পরিচালক।

হামাস ফাতাহর এরূপ কর্মকাণ্ডকে অবৈধ বলে আখ্যা দেয়। তারা বলে– এই রদবদলটি একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের সমতুল্য, সময়মতো এই সকল সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে। সেই মোতাবেক নবনির্বাচিত সংসদ ৬ মার্চের প্রথম অধিবেশনেই হামাসের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে বিদায়ি আইনসভার শেষ মুহূর্তে প্রণীত সব আইনকে বাতিল করে দেয়। প্রতিবাদে ফাতাহর সদস্যরা ওয়াক আউট করে।

হামাস যদিও শুরু থেকেই জাতীয় ঐক্যমত্যের একটি সরকার গঠন করতে চাইছিল, কিন্তু মাহমুদ আব্বাস হামাসকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে ফাতাহকে সেই সরকারে যোগ না দিতে চাপ সৃষ্টি করেন।

যদিও ফাতাহর কিছু নেতা এই সরকারে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল, তবে তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়। তাদের জানানো হয়, সরকারে না থাকলেও প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে তাদের পূর্ণ বেতনভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে তাদের প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়– যেহেতু হামাস ইজরাইলের ব্যাপারে মানসিকতা পালটায়নি, তাই হামাসের সাথে গেলে তাদেরও সন্ত্রাসী তালিকায় ফেলে দেওয়া হতে পারে।

এর বেশ কয়েক বছর পরে জানা যায়, সেই সময় ফাতাহর বেশ কিছু নেতা হামাসের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করছিল, তবে ফাতাহর মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি

'ফাতাহ রিভোলিশনারি কাউন্সিল' প্রথম থেকেই এই সরকারকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফাতাহর সিদ্ধান্ত ছিল হামাসকে যতটা পারা যায় বিব্রত করা এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারের পতন ঘটানো।

পরিতাপের বিষয়, একটা পর্যায়ে ফাতাহ হামাসকে শর্ত দেয়– যদি হামাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ৩টি শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়, তবে তারাও সরকারে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে। যদিও ফাতাহর অন্য নেতারা– যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সায়িব উরায়কাত, জিবরিল আল রাজুব এবং মোহাম্মাদ দাহলান– ঘোষণা দিয়েছিলেন, ফাতাহ বিরোধী দল হিসেবেই কাজ করতে চায়। তাদের যুক্তি ছিল, ফাতাহ বিরোধী দলে থাকলেই বেশি সুবিধা! কারণ, এই সুযোগে তারা দলের কিছু সংস্কার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান এবং সর্বোপরি হামাস সরকার কীভাবে সমস্যাসংকুল ফিলিস্তিনকে সামাল দেয়, এটাও পর্যালোচনা করার সুযোগ পাবে।

এরপরও ফাতাহ সরকারে যাওয়ার জন্য আরও দুটি শর্ত আরোপ করেছিল। একটি হলো ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং অন্যটি হলো, পিএলও-কে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া। বাস্তবিক কারণে এর একটিও হামাসের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৬ সালের ২৯ মার্চ হামাস ফিলিস্তিনের সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিকভাবে চাহিদা ছিল, হামাসকে দিয়ে একটি ঐকমত্যের সরকার গঠনের। তা যখন সম্ভব হলো না, তখন মাহমুদ আব্বাস নতুন কৌশল প্রণয়ন করলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেশ কিছু ডিক্রি জারি করেন, যার মাধ্যমে হামাস সরকারের বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব করা হয়। মাহমুদ আব্বাস নিজেই ফিলিস্তিনি ডেলিগেশনের প্রধান হিসেবে নিজেকে জারি রাখেন। সেইসঙ্গে পুলিশের ওপরও নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে টিভি, রেডিও, ফিলিস্তিনের সংবাদ সংস্থা ওয়াফা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা এবং ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার ক্রসিং পয়েন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে রেখে দেন। এমনকী ইসলামিক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হজ ও উমরাসংক্রান্ত দফতরটিও নিজের অফিসে সংযুক্ত করেন।

নয়া সরকারের সংস্কার পরিকল্পনাকে পালটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্ব দেন রাশিদ আবু শাবেককে। অথচ এই বিষয়টা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকার কথা। একই সঙ্গে মন্ত্রীদের ক্ষমতাহীন করার জন্য তিনি ফাতাহর নয়জন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেন।

তারা সবাই প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল; অন্য কারও কাছে নয়। এ রকম সব কৌশলের কারণে হামাস এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করল, যার পুলিশের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এমনকী তারা সরকারি কোনো মিডিয়াকেও পরিচালনা করতে পারছিল না। ক্রসিং পয়েন্টগুলোতেও তারা কোনো কাজ করতে পারছিল না।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাসকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন ফাতাহর সাবেক অর্থমন্ত্রী সালাম ফাইয়াদকে অর্থ পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন, যিনি বিদেশ থেকে আসা অর্থ সাহায্যের বিষয়টি তদারকি করবেন।

বাস্তবতা এমন দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক মহলের পূর্ণ আশীর্বাদ এবং অর্থ-সাহায্যের ওপর ভর করে মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনে নির্বাচিত সরকারের সমান্তরালে আরেকটি সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার একমাত্র কাজ ছিল নির্বাচিত সরকারের সব কাজের বিরোধিতা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাহীন করা।

২০০৬ সালের মে মাসের মধ্যে মাহমুদ আব্বাস ১০ হাজার সদস্যের বিশাল একটি প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড গঠন করেন। এই বাহিনীর সদস্যদের সরাসরি ইজরাইল, আমেরিকা এবং প্রতিবেশী জর্ডান প্রশিক্ষণ প্রদান করত।

এমতাবস্থায় হামাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একদিন গাজার বৃহত্তম মসজিদে এক জনসমাবেশে ঘোষণা দিলেন, তার কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাহায্য প্রয়োজন! কারণ, তাদের সহযোগিতা ছাড়া তিনি জনগণকে কোনোভাবেই নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবেন না। কারণ, সেই সময় ফিলিস্তিন খুব কঠিন সময় পার করছিল।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রায়শই মহড়া দিত, জনগণকে ভয় দেখাত, কিন্তু মাহমুদ আব্বাসের অধীনস্থ পুলিশ কেবল হামাস সরকারকে বিব্রত করার জন্য কিছু না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত। এক পর্যায়ে জনগণের সম্মতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদ সিয়াম, মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেন, যারা কিনা আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে কাজ করবে। প্রত্যাশিতভাবেই ফাতাহ এই কাজটি ভালোভাবে গ্রহণ করল না। মাহমুদ আব্বাস টাস্কফোর্সের বিরুদ্ধে ভেটো দেওয়ার হুমকি দেন। শেষমেষ কয়েকদিনের মাথায় একটি ডিক্রি জারি করে এই টাস্কফোর্সকে অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা দিলেন। তবে এত কিছুর পরও হামাস হাল ছাড়ল না।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সবচেয়ে খারাপ যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা হলো অর্থনৈতিক অবরোধ। আগের ফাতাহ সরকারের কাছ থেকে হামাস সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে ১ লাখ ৬০ হাজারজনের বিশাল একটি আমলা সম্প্রদায় পেয়েছিল।

এমনকী ইজরাইলের সাথে শান্তিরক্ষার নামে বিগত ফাতাহ সরকার কয়েক হাজার লোককে পুলিশ বিভাগেও নিয়োগ দিয়েছিল। অথচ রাজকোষে সে রকম কোনো অর্থ হামাস পায়নি; বরং ছিল বিশাল পরিমাণ ঋণের বোঝা।

স্থানীয় ব্যাংকগুলো সরকারকে আর কোনো ঋণ দিতে চাইছিল না! কারণ, ফাতাহ সরকার ঋণের সর্বোচ্চ সীমাটাও নিয়ে ফেলেছিল। এর ওপর আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করার বিষয়টা ছিল মরার ওপর খাড়ার ঘা। তারপরও পশ্চিমা আর্থিক সাহায্য ছাড়া হামাস প্রশাসন চালাতে পারত। কেননা, রাশিয়াসহ আরব বিশ্বের বেশ কিছু দেশ হামাস সরকারকে অর্থ-সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সংকটটা ছিল অন্যখানে।

বস্তুত হামাসের কাছে টাকা পৌছানোর কোনো সুযোগ ছিল না। সকল পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হামাস যাতে টাকা না পায়, তা নিশ্চিত করতে ইজরাইল ও আমেরিকা সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। আমেরিকা ব্যাংকগুলোকে হুমকি দিয়েছিল, যাতে তারা হামাসকে টাকা না পাঠায়। কোনো ব্যাংকের বিরুদ্ধে যদি হামাসকে টাকা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সন্ত্রাসীদের মদদদাতা হিসেবে তালিকাভুক্তির হুমকি দেওয়া হয়। মূলত এ রকম পরিস্থিতি তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ফিলিস্তিনের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন না পেয়ে হামাস সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই সরকারি চাকরিজীবীদের এবং তাদের পরিবারগুলোকে হামাসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা হয়, যাতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

কিছুদিন পরই পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে। সরকারি অফিসগুলোকে ঘিরে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। নানা ধরনের স্যাবোটেজ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। বিক্ষোভটি বেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সশস্ত্র সহিংসতায় রূপ নেয়। যারা বিক্ষোভকে উসকানি দিচ্ছিল, তারা চাইছিল যাতে ফাতাহ ও হামাসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘাত। তবে ফিলিস্তিনিরা জাতি হিসেবে বেশ ঠান্ডা মাথার এবং উদারমনস্ক। তাই সে ধরনের সংঘাতের দিকে ঠেলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে এরপরও সহিংসতার কিছু ঝুঁকি তো ছিলই।

হামাসের সরকারকে যেকোনোভাবে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও বিদ্যমান ছিল। ইজরাইলের সাথে শান্তি প্রক্রিয়া চলমান থাকলে এবং বিদেশি সাহায্য আসা অব্যাহত থাকলে কিছু মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হয়, কিন্তু তারা হামাসের সরকারের আমলে বেশ বেকায়দায় পড়ে। হামাস বরাবর একটি শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা এবং সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। এই সব ঘোষণায় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং অর্থলোভী ব্যক্তিরা ঘাবড়ে যায়! ফলে তারাও নানা কৌশলে গোপনে জনগণকে হামাস সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলার জন্য খেপিয়ে তুলছিল।

তবে অর্থনৈতিকভাবে এত অবরোধের পরও হামাস সমর্থক জনগোষ্ঠীকে কাবু করা যাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়; সাধারণ জনগণ যাদের হামাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হচ্ছিল, তারাও হামাসকে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে বরং পক্ষে চলে আসছিল।

'আল মুসতাকবাল' রিসার্চ সেন্টার গাজার অধিবাসীদের ওপর ১ মে থেকে ৪ মে সময়ের মধ্যে একটি জরিপ চালায়। এতে দেখা যায়– ৮৪.৬ শতাংশ জনগণই চায় না, হামাস সরকার অর্থনৈতিক চাপের মুখে আমেরিকা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কিংবা ইজরাইলের কাছে নতি স্বীকার করুক। মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ হামাসের আপসের পক্ষে মত দেয়। অন্যদিকে ৬০ শতাংশ মানুষ বলে, তারা চায় হামাস শত চাপের মুখেও চেষ্টা করুক, যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সময় তারা সরকারে টিকে থাকতে পারে। আর এর বিপরীতে মাত্র ১২ শতাংশ মানুষ মনে করে, হামাস ছয় মাসের বেশি এই চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে না।[১৩৭]

আবারও জর্ডানে

হামাস এবং হামাস সরকারের জন্য মুসলিম দেশগুলো যে অর্থ সাহায্যগুলো প্রেরণ করছিল, তার সিংহভাগ জমা হচ্ছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। হামাস আশঙ্কা করছিল, আমেরিকার সাথে সমঝোতা থাকায় জর্ডান সরকার এই অর্থ ছাড় দিতে হয়তো ঝামেলা করবে।

সেই সময়ের দিনপঞ্জি থেকে জানা যায়, হামাসের বিজয়ের পরপরই জর্ডানের সরকারি কর্মকর্তারা দামেস্কে অবস্থানরত হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মাদ নাজ্জালের সাথে আম্মানে একটি বৈঠক করার প্রস্তাব দেয়। মূলত এই বিজয়ের ফলে জর্ডান হামাসের সাথে সম্পর্ক আবারও উন্নত করতে চাইছিল। ২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি জর্ডানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মারুফ আল বাখিত পার্লামেন্টে দেওয়া এক ভাষণে জানান, তারা হামাস নেতাদের জর্ডানে আমন্ত্রণ জানাতে প্রস্তুত। তবে জর্ডান প্রশাসন ফিলিস্তিনের বাইরে থাকা হামাস নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল না। কারণ, তাদের মতে এই ধরনের প্রবাসী শাখার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে আইনগত কিছু বাধা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, ভৌগোলিকভাবে জর্ডানই হলো ফিলিস্তিনের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। তবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও জর্ডানে হামাস নেতাদের

---

[১৩৭]. এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে 'আল মুসতাকবাল' গবেষণা কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে। www.mustaqbal.net

সেই কাঙ্ক্ষিত সফরটি বাস্তবায়ন হয়নি! কারণ, হামাসের কাকে দাওয়াত দেবে তা নিয়ে জর্ডান কর্তৃপক্ষ নিজেরাও বেশ সংশয়ে ছিল। জর্ডানের পাসপোর্টধারী এমন কাউকে তারা হামাসের প্রতিনিধি দলে মেনে নিতে পারছিল না।

এর আগে ১৯৯৯ সালে খালিদ মিশালসহ যাদের জর্ডান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে জর্ডান রাজি না থাকায় তারা চাইছিল, হামাসের প্রতিনিধি দলটি যেন গাজায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের নিয়েই তৈরি হয়। বলাই বাহুল্য, হামাস এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি।

২০০৬ সালের এপ্রিলে আবারও জর্ডানের সাথে হামাসের সম্পর্ক ভালো হওয়ার একটি লক্ষণ দেখা দেয়, যখন জর্ডান সরকার ফিলিস্তিনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আল জাহহারকে জর্ডানে আমন্ত্রণ জানায়। মাহমুদ সেই সময়ে বেশ কিছু আরব ও অনারব মুসলিম দেশ সফর করছিলেন। জর্ডানে মাহমুদের যাওয়ার কথা ছিল ১৯ এপ্রিল। নির্দিষ্ট দিনের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে জর্ডান জানায়, হামাস সংশ্লিষ্ট কিছু লোক অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে জর্ডানে প্রবেশের সময় ধরা পড়ার ফলে তারা মাহমুদের নির্ধারিত সফরটি স্থগিত করছে। হামাস জর্ডান সরকারের এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তারা জানায়– জর্ডান মূলত সফরটি বাতিল করার বাহানা খুঁজছিল, আর তাই তারা এই মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অবশ্য জর্ডানের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং বলেন, জর্ডান ঠিক কাজটাই করেছে।

শুধু তাই নয়, ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আব্বাস হামাস সরকারের নিয়োগকৃত উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে বাতিল করে দেন। উল্লেখ্য গাজার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে মাত্র একদিন আগে অর্থাৎ ২০ এপ্রিল হামাস সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদ সিয়াম এই পদে জামাল আবু সামহাদানাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। জামাল আবু সামহাদানা যদিও ফাতাহ দলের লোক ছিলেন, তারপরও প্রেসিডেন্ট আব্বাস তার নিয়োগ মেনে নিতে পারেননি।

মূলত পৃথক একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করার জন্যই জামাল আবু সামহাদানাকে এই পদে আনা হয়েছিল। তার নিয়োগ বাতিল করতে প্রেসিডেন্ট আব্বাস একটি ডিক্রি জারি করেন; যার ভাষা ছিল অনেকটা এ রকম– 'নিরাপত্তা প্রধান, কর্মকর্তা এবং সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যকে জামাল আবু সামহাদানার নিয়োগকে প্রত্যাখ্যান করতে আহ্বান করছি। এখন থেকে আপনারা মনে করবেন, জামালকে নিয়োগ করার মতো কোনো ঘটনা আদৌও ঘটেনি।'

এই ডিক্রি জারির পরও হামাস পিছু না হটে নতুন পুলিশ বাহিনী গঠনের কাজ অব্যাহত রাখে।

মাহমুদ আব্বাসের এই ডিক্রি যেন হামাসকে আরও খেপিয়ে তোলে। এই ডিক্রি জারির পর সেই সপ্তাহেই সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে এক অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে খালিদ মিশাল ফাতাহর নেতৃত্ব বিশেষ করে মাহমুদ আব্বাসের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ফাতাহকে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল আখ্যায়িত করে, হামাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য দায়ী করেন। শুধু প্রেসিডেন্টের ডিক্রি নয়; খালিদ মিশালের এই উত্তেজনার পেছনে আরও কিছু কারণও ছিল।

হামাস ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেখতে পায়– পূর্ববর্তী সরকার যে শুধু রাজকোষ শূন্য করেই গেছে তা নয়; বরং সরকারি অফিসগুলোর আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আসলে ফাতাহ নেতারা কোনোদিন ভাবতেই পারেনি, তারা কখনো সরকারের বাইরে আসতে পারে। তাই সরকারি সকল সম্পত্তি তারা ব্যক্তিগত সম্পদের মতোই ব্যবহার করেছে।

এত অনিয়ম করার পরও ফাতাহ নেতারা সামান্য পরিমাণ অনুতপ্ত ছিলনি; বরং চোরের মায়ের বড়ো গলা স্টাইলে তারা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠল এবং খালিদ মিশালের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করল। ফাতাহ অভিযোগ করল, মিশাল ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করতে চাইছে। তার ভাষণের ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমস্ত আরব টিভি চ্যানেল ও রেডিও স্টেশনগুলো এই বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করল! যাতে ফাতাহ এবং হামাস উভয় পক্ষের নেতারা অংশ নিয়ে উত্তেজক সব মন্তব্য করে আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো। এই দুই দলের মধ্যে দূরত্ব ও সংঘাতময় পরিস্থিতি পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় তীব্র হয়ে উঠল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ফাতাহর অন্যতম নীতি-নির্ধারণী কাঠামো, ফাতাহ রিভোলিশনারি কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা খালিদ মিশালের সাম্প্রতিক ভাষণে উদ্‌বিগ্ন। আমরা এই ভাষণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মনে করি! যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও ক্ষোভ বৃদ্ধি করা।'

এই বিবৃতির পাশাপাশি ফাতাহ পশ্চিম তীরে একই সময়ে বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো সভা-সমাবেশের আয়োজন করে। এইসব সমাবেশ থেকে মিশালকে সিরিয়া ও ইরানের মতো দেশগুলোর দালাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। একই সঙ্গে অভিযোগ তোলা হয়, মিশাল ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে।

ফাতাহর এই হামাসবিরোধী প্রচারণা এবং অবস্থানের ব্যাপারে দলের সকল নেতাই যে একমত ছিলেন তা নয়; অনেকেই এই পরিস্থিতিতে আফসোস করছিলেন। তাদের মনে দুঃখও ছিল বেশ। কারণ, তারা অনুভব করছিলেন– ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিক অবরোধের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এখন জনগণের মধ্যে

একতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু ফাতাহর সাম্প্রতিক ভূমিকার কারণে সেই একতার পরিবর্তে স্থায়ী বিভাজন তৈরি হয়ে গেল।

আরও কিছু নেতারা অনুভব করছিলেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ফাতাহর জন্ম হলেও কালক্রমে এই দলটি ইজরাইল ও আমেরিকার পুতুল সংস্থাতে পরিণত হয়েছে। সেই কারণেই হামাসের মতো স্বাধীনতাকামী এবং জনগণের আস্থা অর্জনকারী একটা দলকে তারা দমিয়ে রাখতে চাইছে। তারা হামাসের বিরুদ্ধে ফাতাহর কিছু নেতার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। ফাতাহর এই হামাসবিরোধী গ্রুপটি মূলত জর্ডান, ইজরাইল, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যোগসাজশেই কাজ করে যাচ্ছিল।

এ রকম একটি ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়, যখন সাংবাদিক শাকির আল জাওয়াহিরি জর্ডানের একটি গোপন বৈঠকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হন। জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ২০০৬ সালের ১৬ মে তারিখে একটি প্রতিবেদনে তিনি লিখেন—

> 'গত শুক্রবার অর্থাৎ ১২ মে ২০০৬ তারিখে আম্মানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; যাতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট, জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী, জর্ডান প্রশাসনের সাবেক একজন কর্মকর্তা এবং জর্ডান পার্লামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্য অংশ নেন। এই বৈঠক দুটোতে জর্ডান সরকারের সাথে ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন হামাস সরকারের টানাপোড়েন এবং হামাস সরকারের পতন ঘটানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। মূলত সৌদি, মিশর এবং গালফ অঞ্চলের আরও বেশ কয়েকটি দেশের মদদেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
>
> প্রথম বৈঠকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবারই সন্ধ্যার পর। ফিলিস্তিনের পক্ষে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমাদ কুরি। জর্ডানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ড. মারুফ আল বাখিত ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দাল্লাহ আল খাতিব। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় আম্মানের বিলাসবহুল রিজেন্সি প্যালেস হোটেলের ২১ তলায়। বৈঠকটি তিন থেকে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই বৈঠকের সম্পর্কেও বিস্তারিত কোনো খবর জানা যায়নি।
>
> প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল জর্ডানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আব্দ-আল আল রউফ আল রাওয়াবিদার মধ্যস্থতায়। এই রাওয়াবিদা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই জর্ডানে হামাসের কার্যালয়গুলো বন্ধ এবং পরবর্তী সময়ে হামাস নেতাদের

জর্ডান থেকে মিথ্যা অভিযোগে বের করে দেওয়া হয়। বৈঠকে একটা পর্যায়ে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর কার্যালয়ের অন্যতম পরিচালক বাসিম আওয়াদাল্লাও যোগ দেন। তিনি এসেছিলেন রাওয়াবিদার অনুরোধে। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারেন এখানে বড়ো আকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছে, তখন তিনি ২০ মিনিটের মধ্যেই বৈঠকস্থল ত্যাগ করেন।

তিনি চাচ্ছিলেন না, তার মতো উচ্চ পর্যায়ের এবং বাদশাহর ঘনিষ্ঠ কেউ এই ধরনের পরিকল্পনায় জড়িত আছে– এমন কথা কোথাও জানাজানি হোক। এই বৈঠকে জর্ডানের বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যও যোগ দেন, যার মধ্যে ছিলেন ঘালিব আল জুবি এবং মাজিন আল মালকাভি। আরও ছিলেন পূর্ববর্তী রাওয়াবিদা সরকারের তথ্যমন্ত্রী সালিহ আল কালিব।

সালিহ আল কালিব আগাগোড়াই হামাসের তীব্র বিরোধী এবং ফাতাহর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ছিল। রাওয়াবিদা আরও বেশ কয়েকজন এমপিকে বৈঠকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে তারা আগ্রহী হয়নি। কারণ, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে জর্ডান আবারও হস্তক্ষেপ করুক– এটা তারা চাচ্ছিল না।

পরবর্তী সময়ে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা জানান– আহমাদ কুরি বৈঠকে তেমন একটা কথা বলেননি। তবে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মাহমুদ আব্বাস একটি বক্তব্য প্রদান করেন। যেখানে তিনি বলেন– "হামাস নামক সংগঠন এবং হামাসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দুর্বল করার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েও তেমন একটা সফল হতে পারেনি। উলটো ফিলিস্তিনের জনগণের কাছে হামাসের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে এখন কিছু করারও নেই। তারা হামাস সরকারকে ফেলে দিতে পারলেও ফিলিস্তিনের নির্বাচিত আইনসভাকে কোনোভাবেই বাতিল করতে পারবে না। একই সঙ্গে ইসমাইল হানিয়ার সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলে তা ফাতাহর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল হতে পারে। কারণ, এ রকম কোনো তৎপরতা চালালে জনগণ বুঝে ফেলবে, সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনের ওপর সকল ধরনের অবরোধ আরোপের পেছনে ফাতাহরই হাত ছিল।

তাই এখন যা করার তা আরব দেশগুলোকেই করতে হবে। আর এটা করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো হামাসের সঙ্গে দামেস্কের বিদ্যমান সুসম্পর্ক। আর ফিলিস্তিনের ভেতরে হামাসের যে নেতারা আছেন, তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে হামাসের ব্যাপারে জনসমর্থন ও

সহানুভূতি আরও বেড়ে যাবে। তাই ক্ষতি যা করার তা করতে হবে বাইরে থেকে। আর এ ক্ষেত্রে হামাসের প্রবাসী শাখার নেতাদেরই টার্গেট করার মধ্যে কল্যাণ।'''[১৩৮]

এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, ক্ষমতাসীন হামাস সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সেই সময়গুলোতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে কী মারাত্মক পর্যায়ের ষড়যন্ত্র চলছিল! তবে হামাস মাহমুদ আব্বাসের এইসব কর্মকাণ্ডে কখনোই ঘাবড়ায়নি। মাহমুদ আব্বাস নিজেও ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রয়োগ করেছিলেন। তার সমমনা অপর শক্তিগুলোর সাহায্য ছাড়া কিছু করারও ছিল না। তাই তিনি অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা এটাই, তাকে খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি।

প্রিজনার্স ডকুমেন্ট

এ রকমই এক জটিল পরিস্থিতিতে ফাতাহ নের্তৃত্বাধীন রাজনৈতিক কমিটির পরামর্শে ফিলিস্তিনের আইনসভার তৎকালীন স্পিকার আজিজ দুয়াইক একটি জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ফাতাহ ও হামাসসহ ফিলিস্তিনে বিদ্যমান সকল সংস্থা এবং সংগঠনের মধ্যে খোলামেলা সংলাপের আয়োজন করা। প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান এবং সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। মূলত হামাস এবং দুয়াইককে না জানিয়ে ফাতাহ নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। তারই অংশ হিসেবে এই সম্মেলনটি নস্যাৎ করার সকল চেষ্টাই গোপনে গোপনে চালিয়ে যাচ্ছিল।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালের ২৫ মে তারিখে। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট আব্বাস হামাসকে একটি আলটিমেটাম প্রদান করেন। তিনি জানান– হয় হামাসকে ১০ দিনের মধ্যে 'প্রিজনার্স ডকুমেন্টের' আলোকে ফাতাহর সাথে সমঝোতা করতে হবে; নতুবা তিনি ৪০ দিনের মধ্যে নতুন করে গণভোটের ঘোষণা দেবেন।

মূলত প্রিজনার্স ডকুমেন্টের প্রকৃত নাম 'ন্যাশনাল কনসিলিয়েশন ডকুমেন্টস অব দ্য প্রিজনার্স'। ১৮ দফার এই ইশতেহারটি জাতীয় সংলাপের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

---

[১৩৮]. শাকির আল জাওয়াহিরির এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'আব্বাস ইন আম্মান', যা ১৬ মে, ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। ওয়েবসাইটের লিংক www.palestine-info.info/palestoday/press/2006_2/21_5_06_11.htm

এই ইশতেহারের নিচে ফাতাহ সংগঠনের মারওয়ান বারঘুতি, হামাসের আব্দুল খালিক আল নাকশাহ, ইসলামিক জিহাদের বাসসাল আল সাদি, পিইএলপি'র আব্দুল রাহিম এবং ডিইএলপি'র মুসতাফা বাদারনাহর স্বাক্ষর ছিল। এই ডকুমেন্টকে প্রিজনার্স ডকুমেন্ট বলা হয়। কারণ, এতে স্বাক্ষরকারী সবাই তখন ইজরাইলি কারাগারে প্রিজনার্স বা বন্দি হিসেবে আটক ছিলেন।

জাতীয় সংলাপে হামাস বেশ উদার মানসিকতা নিয়েই অংশ নিয়েছিল। আলোচিত এই প্রিজনার্স ডকুমেন্টস নিয়েও তাদের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল না। তা ছাড়া সম্মেলনে সকল পক্ষ এ রকম নানা ধরনের প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। কিন্তু অন্য কোনো প্রস্তাব নয়, ফাতাহ নেতাদের আগ্রহ ছিল কেবল এই প্রস্তাবনা নিয়েই। কারণ, এই প্রস্তাবনায় পিএলও-কে ফিলিস্তিনের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া এই প্রস্তাবনায় আরব পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টিও উল্লেখ ছিল। মূলত এই তিনটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাই লুকায়িত ছিল।

মাহমুদ আব্বাস পিএলও-তে যোগ দেওয়ার জন্য হামাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল– হামাস অবশ্য সেই দাবিও প্রত্যাখ্যান করে। হামাস জানায়– কায়রোতে ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনের সব পক্ষের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তার আলোকে পিএলও-তে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করা হলেই কেবল তারা পিএলও-তে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে। মাহমুদ আব্বাস এরপরও হামাসকে নানাভাবে হুমকি দেন।

তার প্রতিক্রিয়ায় হামাসের তৎকালীন মুখপাত্র সামি আবু জুহরি বলেন– 'এই হুমকি হলো হামাসের ওপর চাপ সৃষ্টির একটি পাঁয়তারা। হামাসকে তার প্রতিষ্ঠাকালীন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই এইসব হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মাহমুদ আব্বাস গণভোট নেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা জনগণ কর্তৃক হামাসকে নির্বাচনে বিজয়ী করার বাস্তবতাকে অন্য খাতে নিয়ে যাওয়ারই একটি অপপ্রয়াস। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, ফিলিস্তিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হামাসকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছে।'

এরপর প্রিজনার্স ডকুমেন্ট নিয়ে বিতর্ক যে জায়গায় এসে শেষ পর্যন্ত ভিন্নদিকে মোড় নিল, যখন দেখা গেল কারাবন্দি হামাস নেতা আব্দুল খালিক আল নাকশাহ এতে স্বাক্ষর করেছেন। হামাস এতে কিছুটা বিব্রত হলেও তারা দলীয়ভাবে ঘোষণা দিলো, হামাস কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপায়ে কাজ করে না। কিছুদিন পর জেলে থাকা অন্য হামাস নেতাদের প্রতিনিধিরাও একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে এই বিতর্কিত ডকুমেন্টকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা জানান, প্রিজনার্স ডকুমেন্ট কোনোভাবেই

জেলে আটক সকল হামাস নেতার মতামত বা অবস্থানের প্রতিফলন নয়। যারা এতে স্বাক্ষর করেছেন, দায় শুধু তাদের। অন্য বন্দিরাও এই প্রস্তাবনার সঙ্গে একমত– এটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া বাকি বন্দি হামাস নেতারা এই সম্পর্কে কিছু জানতেনই না। তারা মিডিয়ার খবর পড়ে বিষয়টা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

যাহোক, মাহমুদ আব্বাসের নিরবচ্ছিন্ন চাপ ও জিদ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার গোটা প্রক্রিয়াকেই বিনষ্ট করে দিলো। আর তাই স্পিকারের আহ্বানে জাতীয় সম্মেলনটি কোনো ধরনের ঐকমত্য ছাড়াই শেষ হলো। আগে যে বিভাজন ছিল তা আরও ব্যাপক হলো।

বিশেষত ২০০৬ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে এসে সংকটটি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ৩ জুন তারিখে ফাতাহ পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে নতুন একটি আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করল। কালো রঙের টি-শার্ট আর মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা এই নতুন মিলিশিয়াদের মূল কাজই ছিল হামাসকে প্রতিরোধ করা। এই আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেশ কিছু তথ্য জানিয়ে হামাসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, হামাস ভিন্নদেশি শক্তির (সিরিয়া ও ইরান) কাছে বিক্রি হয়েছে এবং তাদের পক্ষে কাজ করছে। আরও বলা হয়েছিল– মাহমুদ আব্বাস ইজরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর হামাস তাতে বাগড়া দিচ্ছে।

এই নয়া আধা-সামরিক বাহিনী প্রসঙ্গে ফাতাহ নেতারা জানান, গাজাতে প্রেসিডেন্ট আব্বাসের আপত্তি সত্ত্বেও হামাস ৩ হাজার সদস্যের একটি আধা-সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিল। মূলত তারই প্রতিক্রিয়া তারা আড়াই হাজার সদস্যের নতুন এই আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছে। আরও ৩ হাজার ফাতাহ কর্মী মুহূর্তে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, যাদের পর্যায়ক্রমে গাজায় মোতায়েন করা হবে। মূলত ফাতাহর মধ্যে যারা প্রচণ্ড একরোখা, তারা হামাসের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

কিন্তু এটাও সত্য যে ফাতাহর মধ্যেও এমন কিছু মানুষ ছিলেন, যারা হামাস সরকারকে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে। তাদের মতে– হামাস ফাতাহর প্রতিপক্ষ, আর সেভাবেই তাদের দেখা উচিত। কিন্তু তাই বলে হামাসের বিরুদ্ধে কোনোভাবেই সামরিক কৌশলে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তা ছাড়া ফাতাহর নিজেদেরই অনেক সমস্যা ছিল।

ততদিনে ফাতাহ অনেকটাই দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সহানুভূতি দুটোই কমে আসছিল। বলাই বাহুল্য ইজরাইল ফিলিস্তিনের বিভিন্ন দলের মধ্যকার এই টানাপোড়েন বেশ ভালোই উপভোগ করছিল।

যুদ্ধবিরতির অবসান

ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে যখন এইসব বাদানুবাদ বা সংঘাত চলছে, তখন ইজরাইল নীরবে গাজায় শেল নিক্ষেপ করছিল। তাদের অভিযোগ ছিল, গাজা থেকে ইজরাইলের দিকে রকেট ছোড়া হচ্ছে। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারাও শেল নিক্ষেপ করছে। পাশাপাশি তারা টার্গেট করে করে হামাস ও ফাতাহসহ বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সদস্যদের হত্যা করছিল।

২০০৬ সালের ৮ জুন, এক বিমান হামলায় পপুলার রেসিস্টেন্স কমিটি নামক একটি সংগঠনের চেয়ারম্যান জামাল আবু সামহাদানাকে হত্যা করা হয়। তিনি সে সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর মূল সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পরের দিন গাজা সমুদ্র তীরে পিকনিককারীদের ওপর ইজরাইলিরা কয়েক দফা শেল নিক্ষেপ করলে একই পরিবারের সাতজন নিহত হয়। বোস্টন গ্লোবের সাংবাদিক অ্যানি বার্নার্ড এই ঘটনার সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেন– 'আলি ঘালিয়া হলেন এই পরিবারটির কর্তা। ৫৫ বছরের এই মানুষটি কৃষিকাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী ও ১০ সন্তান– যাদের বয়স ছয় মাস থেকে শুরু করে ২৫ বছর পর্যন্ত– সবাইকে নিয়ে বাড়ির পাশে একটি সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যায়। বিকাল ৪ টার দিকে তাদের ওপর বিকট শব্দে শেল নিক্ষেপ করা হয়। সেই শেলের শব্দ দূরবর্তী গাজা শহর থেকেও শোনা গিয়েছিল। একটু পর আরেকটি শেল পাশের একটি হাসপাতালে নিক্ষিপ্ত হয়। শিশুবাচ্চা হাইতামসহ পরিবারের সাতজন সদস্য এই হামলায় নিহত হয়।'

এভাবে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে হামাস ১৬ মাস ধরে চলা যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। বাস্তবিক অর্থে যুদ্ধবিরতিটা একপক্ষীয়ভাবে শুধু হামাস পালন করছিল। এই যুদ্ধবিরতির সময় ইজরাইল আগের মতোই হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল। তা ছাড়া হামাস জনরোষকেও উপেক্ষা করতে পারেনি। এভাবে একটি বেসামরিক পরিবারকে হত্যা করার পর, বিশেষ করে নিহত পরিবারের ইয়াতিম সন্তান ১০ বছরের হুদা ঘালিয়ার করুণ চিৎকার, হাজারো মানুষকে ক্ষোভে রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। তাদের চাপেই হামাস আবারও সামরিক শাখা আল কাসেম ব্রিগেডের কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়।

এর আগে বেশ কিছুদিন ধরেই হামাস নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছিল, অকার্যকর যুদ্ধবিরতিটি একপক্ষীয়ভাবে না মানার জন্য। বিশেষ করে সামরিক শাখার সদস্যরা মনে করছিল, হামাসের কৌশলে পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত। কারণ, ইজরাইল একের পর এক অন্যায় আক্রমণ চালালেও তাদের কোনো জবাব বা প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে না।

সামরিক শাখার কেউ কেউ হামাসের রাজনৈতিক শাখা এবং তাদের কৌশলের ওপর আস্থাও রাখতে পারছিল না। এরপরও হামাসের মূল সারির নেতৃবৃন্দ সামরিক শাখার সদস্যদের সংযত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং কষ্ট করে হলেও যুদ্ধবিরতিটি মেনে চলার জন্য বলছিলেন। মূল ধারার এই নেতারা চাইছিলেন, যেকোনোভাবেই হোক হামাসের সরকারটা যেন টিকে থাকে। কিন্তু ঘালিয়ার বেসামরিক পরিবারটি নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি এতটাই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল যে, হামাসের নেতারাও আর সামাল দিতে পারল না; বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করতে হলো।

ঘালিয়া পরিবারের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে আরেকটি ইতিবাচক ফলও দেখা গেল। ফিলিস্তিনের বিভিন্ন দল একমত হলো– নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনই বন্ধ করে সকলে মিলে ইজরাইলের অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া উচিত। মাহমুদ আব্বাসও তার গণভোটের প্রক্রিয়াকে স্থগিত রেখে প্রধানমন্ত্রী হানিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে আবারও ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে আলোচনা শুরু করতে রাজি হলেন।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহে এসে ফাতাহর নেতারা মিডিয়াকে জানায়– দুই পক্ষের মধ্যে একটি ঐকমত্য হতে যাচ্ছে; যদিও হামাস নেতারা এই আলোচনা প্রসঙ্গে কিছুই বলছিল না। ফাতাহর এক মুখপাত্র এ-ও জানালেন, প্রিজনার্স ডকুমেন্টের আলোকে হামাস ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতেও রাজি হয়েছে।

২১ জুন পিএলও নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ইয়াসের আবেদ রাব্বো *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানান– হামাস প্রিজনার্স ডকুমেন্টের কয়েকটি ধারা মানতে একমত হয়েছে, যার মাধ্যমে ইজরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৭ সালের মানচিত্রের আলোকে পূর্ব জেরুজালেমসহ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

ঠিক একই সময় মার্কিন সিনেটে একটি বিল অনুমোদন হয়, যেখানে হামাস সরকারকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এবং তাদের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিলটি সিনেটে কণ্ঠভোটে পাশ হয়। মজার ব্যাপার হলো, ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর জো বাইডেন, যিনি পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এই বিলের উগ্র সমর্থক। বিলটি পাশ হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন– 'আমরা কেউ-ই চাই না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কষ্টার্জিত উপার্জনের একটা টাকাও হামাস সরকারের কাছে যাক। কারণ, হামাস আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। তবে মাহমুদ আব্বাসকে আমরা বিপদে ফেলব না। তাই তার সম্মানে আমরা খাদ্য, পানি, ওষুধ প্রভৃতি ফিলিস্তিনে পাঠানো অব্যাহত রাখব।'

এর দুদিন পর জর্ডানে নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্তদের এক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জানান, হামাস দুই রাষ্ট্র সমাধানে এবং ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারে। তবে বৈরুতের ইউপিআই এজেন্সিতে পাঠানো এক বিবৃতিতে হামাস এসব দাবি অস্বীকার করে। মাহমুদ আব্বাসের দাবিকে মিথ্যা ও অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে হামাস জানায়, প্রেসিডেন্ট আব্বাস যা বলেছেন এটা তার ব্যক্তিগত মত; হামাসের নয়।

তবে হামাস যে শুধু মাহমুদ আব্বাসের কথাতেই ক্ষেপেছিল তা কিন্তু নয়, তারা আব্বাসের কাজগুলোকেও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে জর্ডানের সেই সম্মেলনে যেভাবে আব্বাস ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, সেটাকে তারা মোটেও ইতিবাচকভাবে নিতে পারেননি। হামাস জানায়– 'আমরা আশা করেছিলাম, ফিলিস্তিনের সাধারণ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা এবং ফিলিস্তিনের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলিদের অবৈধ অবরোধ আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আব্বাস এই খুনির (এহুদ ওলমার্ট) সঙ্গে বৈঠক করতে অস্বীকৃতি জানাবেন। সেইসঙ্গে তিনি ততক্ষণ ইজরাইলিদের সঙ্গে কোনো বৈঠকে বসবেন না, যতক্ষণ না তারা নিরীহ মানুষ হত্যা বন্ধ করবে এবং অবরোধটি প্রত্যাহার করবে।'

এরপরও বাতাসে এমন কথাই ঘুরে বেড়ায়, হামাস ফাতাহর শর্তসমূহ মেনে নিতে রাজি হয়েছে। বেশ কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তির মন্তব্যের কারণে এই গুজব যেন আরও বেশি করে ডালপালা ছড়ায়। যেমন ২৪ জুন ফাতাহর মুখপাত্র ড. জামাল নাজাল ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থাকে জানায়– প্রিজনার্স ডকুমেন্টের ব্যাপারে হামাসের যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল, হামাস এখন তার বেশিরভাগ প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত।

এই কথাটি মানুষ আরও বিশ্বাস করতে শুরু করে, যখন হামাস ঘোষণা করে তারা একটি চুক্তিতে একমত হতে যাচ্ছেন, তবে তা করার জন্য প্রিজনার্স ডকুমেন্ট ঢেলে সাজাতে হবে। অনেক কিছুই আবার নতুন করে ঢোকাতে হবে, যাতে ফিলিস্তিনের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

হামাস আসলে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি। তবে তারা এমন একটি চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল, যাতে উভয়পক্ষ তা অনুমোদন করতে পারে। এতে ফাতাহ মনে করবে তারাই জয়ী হয়েছে, আবার হামাসের দিক থেকেও কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এই সমঝোতার প্রথম ফলাফল হিসেবে গণভোটের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এই সমঝোতা নিয়ে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশের আগেই তা স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ, ইজরাইল এটাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে হামাসের সঙ্গে সংঘাত নতুন করে শুরু করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করে।

২৪ জুন ইজরাইলি সেনারা গাজায় প্রবেশ করে হামাসের দুই কর্মীকে অপহরণ করে। এই অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আল কাসেম ব্রিগেড, রেসিস্টেন্স কমিটি এবং ইসলামিক আর্মি নামক ৩টি সংগঠনের কর্মীরা মিলে গাজা ও ইজরাইলের সীমান্তবর্তী কেরেম শ্যালম এলাকায় একটি ইজরাইলি নিরাপত্তা পোস্টে অভিযান চালায়। রাফাহ্ এলাকার নিচ দিয়ে তারা একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে ইজরাইলের ১০০ মিটার ভেতরে ঢুকে দুজন ইজরাইলি সেনাকে হত্যা এবং গিলাদ শালিত নামক এক ইজরাইলি সেনাকে জিম্মি করে। ইজরাইল সাথে সাথেই এই ঘটনার জন্য ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে।

এই ঘটনার পরপরই হামাস তাদের দাবি পেশ করে। তারা জানায়– ইজরাইলি সেনাকে সম্মানের সাথে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি ইজরাইলের কারাগারে আটক সকল ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এবার মনে হলো নিজেদের সৈন্যের জীবন বাঁচানোর চেয়ে ইজরাইল আরও বড়ো কোনো গেম খেলতেই বেশি আগ্রহী। ইজরাইল এই অপহরণের জন্য হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মিশাল ও সিরিয়াকে দায়ী করে। ফাতাহও একই সুরে কথা বলা শুরু করে।

২৫ জুন জেরুজালেম পোস্টে ফাতাহ নেতা সুফিয়ান আবু জায়দার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি অপহরণের অনুমোদন দেওয়া এবং ফাতাহ ও হামাসের মধ্যকার সমঝোতাটি বিনষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়ায় খালিদ মিশালকে অভিযুক্ত করেন। ধারণা করা হয়, খালিদ মিশালের সাথে হামাসের ভুল বোঝাবোঝি বাড়ানোর জন্যই ইজরাইল ও ফাতাহ এই কৌশল নিয়েছিল; যদিও অতীতের সব প্রচেষ্টার মতো এটাও সফল হতে পারেনি।

কাজেই যুদ্ধবিরতি আদৌ চালিয়ে যাওয়া হবে কি না এবং আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পড়ল হামাসের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী দায়িত্বশীলদের ওপর। পশ্চিম তীর, গাজা এবং প্রবাসে থাকা নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো।

মূলত অপহরণ করা হয়েছিল ইজরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য, যাতে তারা ফিলিস্তিনি বন্দিদের ছেড়ে দেয় এবং দখলকৃত জমি থেকেও ইজরাইলি সেনাদের প্রত্যাহার করে নেয়। বাস্তবতা হলো, প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া এবং তার সহকর্মীরা কেউ-ই এই অপহরণের বিষয়ে আগে থেকে জানত না। তাদের অনুমতি নিয়েও এটা করা হয়নি। এর কারণ হলো– আইনসভার নির্বাচনের আগে হামাসের দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যারা এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে তারা সাথে সাথেই হামাসের দলীয় পদটি ছেড়ে দেবেন। তারা দলের সদস্য হিসেবে ঠিকই থাকবেন, তবে দলের নির্বাহী কোনো পদে বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় থাকবেন না।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের মূল কারণ ছিল ফাতাহ সরকারের সংকট। কারণ, ফাতাহ সরকারে থাকা মন্ত্রীরা একই সঙ্গে দল এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় অনেক সময় একটি দায়িত্বের কারণে অন্যটি সঠিকভাবে পালন করতে পারতেন না। ফলে একদিকে তারা যেমন ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে জনগণের কাছেও তাদের অবস্থান ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ছিল।

ইসমাইল হানিয়া বা তার মন্ত্রিসভা ইজরাইলি সেনার অপহরণের বিষয়ে কিছুই জানত না। এটি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়, যখন হামাস সরকারের মুখপাত্র ঘাজি হামাদ সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই অপহরণের বিষয়ে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অপহরণপরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন– 'দখলদার ইজরাইলি সেনাবাহিনী অভিযোগ করছে– তাদের একজন সেনা সদস্যকে অপহরণ করা হয়েছে, তবে আমরা এখনও প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাইনি। যদি এই অপহরণ হয়েই থাকে, তাহলে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যাতে এই সৈন্যকে নিরাপদে রাখেন। তার সাথে যেন ভালো ব্যবহার করা হয় এবং কোনোভাবেই ক্ষতি করা না হয়। অন্যদিকে আমরা ইজরাইলি কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই, ফিলিস্তিনের সরকার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করছে এবং আমরা প্রেসিডেন্ট আব্বাস, মিশরীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলে জরুরি একটি কার্যকর সমাধান বের করার জন্য চেষ্টা করছি।'

এখানে আরেকটি বিষয়ও সামনে আসে, যা ছিল হামাসের জন্য বেশ বিব্রতকর। অনেকেই খালিদ মিশাল ও ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বের মধ্যে তুলনা করা শুরু করেছিল। কে বেশি যোগ্য, তা নিয়ে বেশ বিচার-বিশ্লেষণও শোনা যাচ্ছিল।

অনেকেই মনে করছিলেন, খালিদ মিশাল একজন রক্ষণশীল এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতার মানুষ। অন্যদিকে ইসমাইল হানিয়া ঠান্ডা মাথার এবং উদার মানসিকতার। তবে এই তুলনামূলক বিশ্লেষণগুলো আসলে সঠিক নয়। তারা দুজনই ভালো নেতা এবং একই মানসিকতা নিয়ে হামাসে কাজ করেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু দুজন ভিন্ন মানুষ বা ব্যক্তি, তাই তাদের প্রকাশভঙ্গি এবং আচরণে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তবে তারা দুজনই হামাসের পরীক্ষিত নেতা। দুজনের কেউ-ই নিজেদের সিদ্ধান্ত দলের ওপর চাপিয়ে দেন না; বরং দল পরামর্শের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা তারা আন্তরিকতার সাথেই মেনে নেন এবং পালন করার চেষ্টা করেন।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– হামাসের নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড়ো যে ইস্যুটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, তা হলো জনগণের চাহিদা; সহজ কথায় পাবলিক সেন্টিমেন্ট। এই অপহরণের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরপরই গাজা ও পশ্চিম তীরে হাজারো ফিলিস্তিনি রাস্তায় নেমে আসে। তারা এই ইজরাইলি সেনা অপহরণের ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করছিল এবং কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছিল, যাতে কিছু ফায়দা আদায় না করে তা ছেড়ে দেওয়া না হয়।

এই মিছিল-সমাবেশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কারাবন্দি ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর সদস্যবৃন্দ, কিন্তু ইজরাইল কোনোভাবেই এই সেনার মুক্তির বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিদের ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। এমনকী তৃতীয়পক্ষ থেকে যারা এই সমস্যা সমাধানের সহযোগিতা করছিল, ইজরাইল তাদেরও সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেয়।

ইজরাইলি পার্লামেন্ট নেসেট-এর সদস্য এবং ইসলামিক মুভমেন্টের প্রধান শেখ ইবরাহিম সারসুর অভিযোগ করেন, ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা শিন বেইত পশ্চিম তীরের ইহুদি রাব্বিদের সাথে হামাস নেতাদের একটি নির্ধারিত বৈঠকও করতে দেননি। এই বৈঠকে যাওয়ার জন্য হামাস সরকারের জেরুজালেমবিষয়ক মন্ত্রী খালিদ আবু আরাফাহ এবং জেরুজালেমস্থ হামাস প্রতিনিধি, শেখ মুহাম্মাদ আবু তির বের হলেও শিন বেইত তাদের বাধা দেয় এবং হুমকি দিয়ে বৈঠকের সকল প্রক্রিয়া স্থগিত করে।

সারসুর জেরুজালেমে বসে যখন ইজরাইলের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন, তখন তার সাথে একাত্ম হয়ে সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইহুদি রাব্বি আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা, মুসলিম-ইহুদি সংলাপের পৃষ্ঠপোষক মেনাচেম ফ্রম্যান। আরও উপস্থিত ছিলেন, ইহুদি কিবুজ আন্দোলনের অন্যতম নেতা রাব্বি ডেভিড বিগম্যান।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন এএফপি ইজরাইলের অবকাঠামোবিষয়ক মন্ত্রী বিন ইয়ামিন বিন এলিজারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে; যেখানে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ইজরাইল চাইলেই ফিলিস্তিন সরকারের মন্ত্রিসভার অর্ধেক সদস্যকেই অপহরণ করে নিয়ে আসতে পারে। আরেক ইজরাইলি মন্ত্রী হেইম র‍্যামন জানান, এর আগে গাজাতে এক ইজরাইলি সেনাকে অপহরণের আদেশ দেওয়ার কারণেই খালিদ মিশালকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছিল।[১৩৯]

---

[১৩৯]. খালিদ মিশালের এই হত্যা অপচেষ্টা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি মন্ত্রীদের অপহরণ করার হুমকিটি যে একেবারে অমূলক নয়, তা খুব শীঘ্রই বোঝা গেল ।

২৯ জুন ভোর বেলায় ইজরাইলি সেনারা মন্ত্রী এবং আইনসভার সদস্যসহ ৬৪ জন হামাস কর্মকর্তাকে অপহরণ ও বন্দি করে। সে সময় এই নেতাদের অধিকাংশই প্রশাসনিক কাজে রামাল্লার এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইজরাইল একটি বার্তা খুব পরিষ্কারভাবেই দেয় তা হলো– তারা হামাসের রাজনৈতিক ও সামরিক শাখাকে ভিন্ন চোখে দেখে না। তাদের কাছে হামাসের সব শাখাই নেতিবাচক ও প্রত্যাখ্যান করার উপযোগী। একই দিন আরও বেশ কিছু স্থান থেকে হামাসের আরও ২৩ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

৩০ জুন হামাস নেতারা তাদের চূড়ান্ত অবস্থান নিতে সক্ষম হন। জুমাবারের খুতবায় দেওয়া এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া বলেন– 'হামাস কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। ইজরাইল যদি তার সৈন্যকে মুক্ত করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই গাজায় আক্রমণ চালানো বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। ইজরাইল হামাস সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্যই এইসব কাজ করছে। কিন্তু হামাস পিছু হটবে না, অবস্থানও পরিবর্তন করবে না। ইজরাইল চাইছে মন্ত্রিসভার ও আইনসভার সদস্যদের আটক করে নিজেদের সেনাকে ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু আমি আমার ভাইদের নিয়ে কোনো ব্যাবসা করব না।' এরপর তিনি মাহমুদ আব্বাসের পৃষ্টপোষকতায় কোনো ধরনের গণভোটের প্রক্রিয়াকেও পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

যাই হোক, এত কিছুর পরও হামাসকে কাবু করতে না পারলেও ইজরাইল গাজায় তাদের আটক অভিযান এবং সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখে। ইজরাইলি সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় হামলা চালায়। আর বিমান থেকে হামলা চালানো হয় প্রধানমন্ত্রীর দফতর, অর্থমন্ত্রীর দফতর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দফতর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। বিমান থেকে গাজার মূল সড়ক ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অবকাঠামোগুলোর ওপরও বোমা হামলা চালানো হয়। মূলত হামাস সরকারকে বিপর্যস্ত করে দেওয়াই ছিল এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল একজন অপহৃত সেনাকে উদ্ধার করতে এত কিছু করতে হয় না। বোঝাই যাচ্ছিল– হামাস যাতে আর গাজা শাসন করতে না পারে, সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্যই এই বিমান হামলা। ফাতাহ ইজরাইলের এই অভিযান নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে সাধারণ মানুষ ঠিকই তাদের প্রতিক্রিয়া জানাল। তারা ইজরাইলি বর্বরতায় বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে বরং গাজার ১২ লাখ বাসিন্দা প্রতিরোধ আন্দোলনে এবং নিজেদের বন্দি ভাই-বোনদের মুক্ত করার সংগ্রামে আরও বেশি ব্রত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

তবে এরই মধ্যে সবার নজর গাজা থেকে সরে যায় দক্ষিণ লেবাননে। যখন হিজবুল্লাহ গাজাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেবানন-ইজরাইলি সীমান্তে থাকা একটি ইজরাইলি চেকপোস্টে হামলা চালায় এবং দুজন ইজরাইলি সেনাকে অপহরণ করে ও বাকি আট সেনাকে হত্যা করে। এর আগে বেশ কয়েকবার ইজরাইল এই হিজবুল্লাহর সাথে বন্দি বিনিময় করেছে।

হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহ কয়েকমাস আগে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, তার দল অবশিষ্ট বন্দি লেবাননি নাগরিকদের ইজরাইলের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবে। হিজবুল্লাহর এই আক্রমণে ফিলিস্তিন ও লেবাননের সাধারণ মানুষরা খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং তারা আশা করেছিলেন, এবার হয়তো ইজরাইল বন্দি বিনিময়ে রাজি হবে, কিন্তু ইজরাইল সমঝোতায় না এসে বরং লেবাননে বোমা ও শেল নিক্ষেপ শুরু করে। তারা লেবানন সীমান্তে সেনা প্রেরণ করে, ফলে নতুন করে আরেকটি আন্তর্জাতিক সংকটের সূত্রপাত হয়। হিজবুল্লাহ এসবে ঘাবড়ে না গিয়ে বরং নতুন উদ্যমে উত্তর ইজরাইলের বিভিন্ন শহরে রকেট ও মর্টার হামলা চালানো অব্যাহত রাখে এবং প্রথমবারের মতো ইজরাইলের হাইফা শহরে মাঝারি দূরত্বের মিসাইল নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। এরপর শুধু হাইফা নয়; বরং গোটা তেলআবিবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, অনেকেই ধারণা করছিল, হিজবুল্লাহ হয়তো তেলআবিবের ওপরও হামলা চালাবে।

মোড় ঘুরে যায় যুদ্ধ পরিস্থিতির।

অধ্যায়-১৩

হামাস সরকারের যত চ্যালেঞ্জ

হামাস ফিলিস্তিনের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর থেকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ তাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে ফাতাহ আন্দোলনই পিএলও-কে নিয়ন্ত্রণ এবং ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সেই সুযোগ হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ফাতাহ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাই তারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন আরব সরকার, ইজরাইল, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা নিয়ে হামাসের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা করছিল, যাতে হামাস ও ইসলামিক আন্দোলনকে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক হিসাব-নিকাষের বাইরে ফেলে দেওয়া যায়।

ফাতাহ হামাসের সাথে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনে কোনো ধরনের সমঝোতা করতেও রাজি ছিল না। হামাস নেতাদের এ সংক্রান্ত প্রস্তাব তারা বারবার প্রত্যাখ্যান করে।

তবে হামাসের ওপর আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে যতই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, হামাসের ওপর জনগণের ভালোবাসা, আবেগ ও সহানুভূতি ততই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। আর যারা নির্বাচনে জয়ী হয়েও দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না, তারা এ জন্য হামাসকে কখনোই দায়ী করেননি। তারাও বুঝতে পারছিল, ফাতাহ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য গোটা ফিলিস্তিন এবং এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাঠামোকে জিম্মি করে রীতিমতো ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অন্যদিকে সে সময় ইরাক যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক রাজনীতিতেও কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইজরাইল লেবাননে হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে উলটো নিজেরাই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

যাই হোক, ইজরাইলকে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ২০০৬ সালের ১১ আগস্টে ১৭০১ নং প্রস্তাবনা পাস হয়। এর পরপরই বিশ্বের সকলের দৃষ্টি লেবানন থেকে সরে আবার ফিলিস্তিনের ওপর পড়ে।

ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও নিজ দেশে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েন। সেই সমালোচনা থেকে মুক্তি পেতেই তিনি মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু এবং ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার সফরের মাত্র এক সপ্তাহ আগেও গাজার বিভিন্ন স্থানে ইজরাইলিরা সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানে নারী ও শিশুসহ মোট ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অবরোধ জারি করেও হামাসকে কাবু করা যাচ্ছিল না। এতে বরং সাধারণ ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ ও ভোগান্তি বেড়ে যাচ্ছিল। এই ক্রমবর্ধমান কষ্টের জন্য সাধারণ ফিলিস্তিনিরা হামাসকে নয়; বরং ইজরাইল ও পশ্চিমা মিত্রদের দায়ী মনে করত।

২০০৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর টনি ব্লেয়ার মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছান। তার ধারণা ছিল, হামাস সরকারে আসার পর থেকে গোটা শান্তি প্রক্রিয়ায় যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাটাতে একটাই উপায় আছে; জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন। এ রকম সরকার হলে তারা নিশ্চয়ই একটা পথ বের করতে পারবে। ফলে ফিলিস্তিনের ওপর আরোপিত অবরোধগুলো প্রত্যাহার এবং ইজরাইলের সাথেও শান্তি প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হবে। তা ছাড়া ব্লেয়ার জিম্মি ইজরাইলি সেনা গিলাদ শালিতকেও মুক্ত করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য ব্লেয়ারের এই সফর খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি। তিনি প্রথম সাক্ষাৎ করেন ইজরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টের সাথে। সেই বৈঠকে তিনি ইজরাইলকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। এরপরই ব্লেয়ার যান রামাল্লায়। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে বৈঠক করেন। ব্লেয়ার হামাসের কোনো নেতার সাথে কথা বলতে চাননি! কারণ, হামাস তখনও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত।

তিনি আব্বাসকে মূলত তিনটি প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন– ফিলিস্তিনের সাথে আন্তর্জাতিক মহলের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তার অবসান করতে হলে হামাসকে তিনটি শর্ত মেনে ফাতাহর সাথে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনে রাজি হতে হবে। এগুলো হলো– হামাসকে অবিলম্বে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সহিংসতা পরিহার করতে হবে এবং ইজরাইলের সাথে পূর্বে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি মেনে নিতে হবে।

কিন্তু এগুলোর একটি শর্তও হামাসের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। কারণ, এই ইস্যুগুলোর বিরোধিতা থেকেই হামাসের জন্ম। শুধু তাই নয়; সর্বশেষ নির্বাচনে ফিলিস্তিনের মানুষ যে হামাসকে বেছে নিয়েছে, তার একটা বড়ো কারণ– হামাস কখনো ইজরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। দ্বিতীয় যে কারণে ফিলিস্তিনের মানুষ হামাসকে পছন্দ করেছিল তা হলো– হামাস ফাতাহর মতো কখনোই মাথা বিক্রি করে দেয়নি এবং দুর্নীতি করেনি।

ব্লেয়ারের মধ্যপ্রাচ্য সফর ব্যর্থ হলেও এখানে একটি ইতিবাচক দিক হলো, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় ব্লেয়ারের আগ্রহ। অর্থাৎ তার এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ হয়, আন্তর্জাতিক মহলে হামাসের স্বীকৃতি পাওয়ার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ফলে এরপর থেকে যে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়, তা মূলত জাতীয় ঐক্যের সরকার এবং হামাসের থেকে ইজরাইলের স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। ব্লেয়ারের সাথে আব্বাসের বৈঠকের পরপরই হামাসের মুখপাত্র সামি আবু জুহরি এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তারা ফাতাহর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠনে প্রস্তুত, কিন্তু ব্লেয়ারের দেওয়া তিন শর্ত মেনে নয়।

ব্লেয়ারের সাথে বৈঠকের পরপরই অর্থাৎ ২০০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, গাজায় প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আব্বাস জানান, ফিলিস্তিনের ভোগান্তির দিন শেষ হতে চলেছে। এখন হামাসকে শুধু জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনে রাজি হতে হবে যাতে পশ্চিমা মহল বুঝতে পারে, হামাস ওপরোক্ত তিন শর্ত মানার ব্যাপারে নমনীয় হতে শুরু করেছে। আর এ রকম একটি ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, তা আন্তর্জাতিক মহলেও গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

আব্বাস হানিয়াকে পরামর্শ দেন– আপাতত যদি তারা ২০০২ সালের আরব দেশগুলোর উদ্যোগটি প্রকাশ্যে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন, সেটাই যথেষ্ট। উল্লেখ্য, আরব দেশগুলোর প্রস্তাবে ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তবে নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে আর গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। হামাস সেই প্রস্তাবকে বরাবর প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সেদিনই কিছু সময় পরে মাহমুদ আব্বাস ঘোষণা দেন, হানিয়ার সাথে বৈঠকে একটি ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি একমত হয়েছেন। এই সমঝোতা অনুযায়ী হামাসের বর্তমান সরকার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করবে। নতুন একটি সরকার হবে, যেখানে ইসমাইল হানিয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

যে শর্তের আলোকে আব্বাস জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন এবং তাতে হামাসের রাজি হওয়ার কথা বলেছিলেন, তা ফিলিস্তিনের ভেতরে ও বাইরে থাকা হামাসের সকল নীতি-নির্ধারককেই ভীষণ বিস্মিত করেছিল। এই নেতারাও ঐক্যের সরকার গঠনে একমত ছিলেন, তবে আরব প্রস্তাব অনুযায়ী নয়। দামেস্ক থেকে খালিদ মিশাল প্রধানমন্ত্রী হানিয়াকে চাপ দেন, যাতে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, আরব লিগের প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

খালিদ মিশালের এই উদ্যোগ মাহমুদ আব্বাসকে হতাশ এবং ইসমাইল হানিয়াকে বিব্রত করে। এটা ঠিক, হানিয়ার কিছু উপদেষ্টা আব্বাসের পরামর্শ শোনার জন্য তদবির করছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আহমাদ ইউসুফ এবং ঘাজি হামাদ। এই পরিস্থিতিতে আবারও হামাসের অভ্যন্তরীণ ও প্রবাসী শাখার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। সেইসঙ্গে হামাসের সমালোচক ও বিরোধীরাও নতুন করে অপপ্রচার করার অবকাশ পায়।

এর পরপরই প্রেসিডেন্ট আব্বাস হামাস নেতা হানিয়া এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সমঝোতা নসাৎ করার অভিযোগ তোলেন। ফাতাহর নেতারাও নতুন করে কূটনৈতিক প্রয়াস চালানোর সুযোগ পান। তারা আন্তর্জাতিক মহলকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, ফিলিস্তিনের হামাস জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনে আগ্রহী, কিন্তু হামাসের প্রবাস শাখার নেতা খালিদ মিশালের কারণেই কাঙ্ক্ষিত সমঝোতা সম্ভব হচ্ছে না। ফাতাহ নেতারা আরও অভিযোগ করে– এই সেই খালিদ মিশাল, যার পরিকল্পনায় ইজরাইলি সেনা গিলাদ শালিতকে অপহরণ করা হয়েছে।

এমন প্রচারণার পরপরই মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা দামেস্কে খালিদ মিশালের সঙ্গে দেখা করে জিম্মি ইজরাইলি সেনাকে মুক্ত করে দিতে বলেন। একই সঙ্গে হানিয়া এবং আব্বাসের মধ্যকার সমঝোতায় বাধা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান। তবে এই বৈঠকগুলোর ইতিবাচক দিক হলো, কূটনীতিকরা এই প্রথম হামাস এবং হামাস নেতা খালিদ মিশাল সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেলেন। এর আগে তারা কেউ-ই মিশালকে দেখেননি। তাই তার সম্বন্ধে অনেকেরই নেতিবাচক ধারণা ছিল। একই সঙ্গে হামাসের সাথেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নতুন পথ উন্মুক্ত করল।

এরই মধ্যে ফাতাহ আরেক প্রচারণা শুরু করে। তারা বলে– ফিলিস্তিনিদের ওপরে যে অবরোধ আরোপ হয়েছে, তার জন্য হামাস দায়ী! হামাসকে তার অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তারা দাবি করেন, হামাসের জনপ্রিয়তা দিন দিন কমছে। এরপর ফাতাহ নেতারা আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠক করে অবরোধ অব্যাহত রাখাতে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রথম দিকে ফাতাহর এসব প্রচারণাকে মার্কিনিরা গুরুত্ব দিলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে, ফাতাহ আইনসভার নির্বাচনের মতোই তাদের ভুল তথ্য দিচ্ছে। অবরোধের কারণে হামাসের জনপ্রিয়তায় মোটেও ভাটা পড়েনি।

আন্তর্জাতিক দাবির কাছে হামাসকে নতি স্বীকার করাতে এবং জনগণকে হামাসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার পর ফাতাহ সর্বশেষ কৌশল হিসেবে দলীয় সশস্ত্র নেতা-কর্মীদের গাজার রাজপথে নামিয়ে দেয়! উদ্দেশ্য, বিক্ষোভ-অবরোধ করে জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করা। তবে গাজায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষিত সশস্ত্র কর্মীরা থাকায় ফাতাহর সেই প্রচেষ্টাও কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায়নি। সেই হতাশা থেকেই ফাতাহর আধা সামরিক কর্মীরা পশ্চিম তীরের বেশ কয়েকটি শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেখানে তাদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ-ই ছিল না। ফলে তারা বেশকিছু সরকারি ভবন জ্বালিয়ে দেয়! আইনসভা কাউন্সিলের অফিসে হামলা এবং হামাসের বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে অপহরণ করে।

হামাসের নেতারা বুঝতে পারে, ফাতাহ গৃহযুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায় সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে। তাই হামাসও পরিস্থিতির ভয়াবহতা রোধে সশস্ত্র সদস্যদের মাঠে নামায়।

হামাসের রাজনৈতিক নেতারা খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। কারণ, তারা আশঙ্কা করছিলেন, পরিস্থিতি যেকোনো সময় তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। হামাসের সামরিক কর্মকর্তারাও আর ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না। তারা ফাতাহর সকল অপকর্মের জবাব দেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে পড়ছিলেন। আর গাজার মতো একটি জায়গা, যেখানে প্রায় ১৪ লাখ মানুষ বছরের পর বছর বন্দি জীবনযাপন করছে, সেখানে দাঙ্গা বা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিনও নয়।

পরবর্তী মাসগুলোতে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে দূরত্ব মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে। অথচ কয়েক মাস আগেও তারা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার নিয়ে আলোচনা করছিল। জনগণও ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। পরিস্থিতি এমন দিকে যাচ্ছিল, ফাতাহ যদি বড়ো বিক্ষোভ করে, তাহলে হামাস পরের দিন আরেকটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে তার প্রতিক্রিয়া দেখায়। যেহেতু গাজায় হামাসের জনপ্রিয়তা বেশি, তাই হামাসের সমাবেশগুলোতে লোকসমাগমও বেশি হতো।

হামাস সাধারণত এই সব সমাবেশকে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং শত্রুদের সতর্ক করার কাজে লাগাত। হামাস সবচেয়ে বড়ো সমাবেশের করে ২০০৬ সালের ৬ অক্টোবর। এই সমাবেশে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ যোগ দেয়। যদিও প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ইসমাইল হানিয়া সমাবেশে পুরো বক্তব্য দিতে পারেননি, তবে যতটুকু দিয়েছেন, সেখানে তার দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ পায়।

ব্লেয়ারের মধ্যপ্রাচ্যে সফরের পর হামাসের নেতৃত্বে ফাটল ধরেছে বলে যে অপপ্রচার শুরু হয়েছিল, হানিয়ার এই বিশাল সমাবেশে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়। বিশাল এই সমাবেশের মঞ্চে খালিদ মিশাল ও ইসমাইল হানিয়া দুজনেরই ছবি টানানো হয়।

হানিয়া তার ভাষণে বলেন, হামাস ইজরাইলকে কখনোই স্বীকৃতি দেবে না। তিনি জাতীয় ঐক্যের সরকার নিয়ে লুকোচুরি খেলার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা করেন। তিনি জানান– 'যে সরকার দখলদার ইজরাইলিদের স্বীকৃতি দেবে, সেই সরকারে হামাস কখনোই যোগ দেবে না। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইজরাইল যে ভূমি দখল করেছে, হামাস তার ওপরই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে তার বিনিময়ে তারা ইজরাইলকে এক চুল জমিও ছাড় দেবে না।' হামাস নেতার এই ভাষণ যে শুধু ইজরাইলিরা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা-ই নয়; ফাতাহ এবং প্রেসিডেন্ট আব্বাসও এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

গাজা ও পশ্চিম তীরের উত্তেজনা এবং থমথমে অবস্থা বেড়ে যাওয়ার পরও হামাস ছিল নিজের অবস্থানে অবিচল। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বড়ো বড়ো কূটনীতিক ও প্রখ্যাত ব্যক্তিরা দামেস্কে খালিদ মিশালের সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন। অন্যদিকে একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া তার প্রথম আন্তর্জাতিক সফরের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি আরব দেশ সফরে বের হন।

২৮ নভেম্বর তিনি কায়রোতে পৌঁছান। এরপর যান কাতার, বাহরাইন, সিরিয়া, সুদান এবং ইরানে। তার আরও বেশ কয়েকটি দেশে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গাজার পরিস্থিতি ভয়াবহ অবনতি ঘটছে– এমন সংবাদে সফর সংক্ষেপ করে ১৪ ডিসেম্বর ফিলিস্তিনে ফিরেন। মিশরের রাফা ক্রসিং দিয়ে যখন তিনি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন ইজরাইলি সেনারা তাকে বাঁধা দেয়! কারণ, এই সফরে ফিলিস্তিনের জন্য তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, সেগুলো তার সাথে ছিল। আর ইজরাইলি সেনারা তাকে এই টাকা নিয়ে যেতে দিতে রাজি ছিল না।

হানিয়ার এই সফরের মার্কিন নেতৃত্বাধীন অবরোধের কার্যকারিতাও প্রশ্নের মুখে পড়ে। বেশ কিছু আরব ও অনারব দেশ, মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্র এই অন্যায় অবরোধের অবসানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি কাতার, ইরান, বাহরাইন ও সুদান সরকার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন পরিশোধ এবং ইজরাইলের হাতে ধ্বংস হওয়া ফিলিস্তিনের বাড়িঘর নির্মাণে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

হানিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ বড়ো অঙ্কের অর্থ নিয়েই ফিরেছিলেন, সেইসঙ্গে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই সফরের অর্জন ম্লান হয়ে যায়,

যখন আসতে না আসতেই আইন-শৃঙ্খলাজনিত সহিংসতায় তিন শিশু ও তাদের গাড়ির ড্রাইভার নিহত হয়! আরেকটি ঘটনায় হামাস সমর্থক এক বিচারপতিও নিহত হন। ফাতাহ এই তিন শিশু ও ড্রাইভার হত্যার ঘটনার জন্য হামাসকে দায়ী করে। তারা বলে, ফাতাহ নেতা বালুচিকে দুর্বল করার জন্যই এই হামলা চালানো হয়। হামাস অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলে– ফাতাহর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেই বালুচির পরিবারের ওপর এই হামলাটি চালানো হয়।

যাই হোক, হানিয়াকে আনীত সব টাকা জমা দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে হয়। গাজা তখন সহিংসতা আর সংঘাতে বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষরাও তীব্র আতঙ্কে। হানিয়া মিশর হয়ে গাজায় প্রবেশ করার সাথে সাথে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা তার ওপর গুলি চালায়। এতে তার দেহরক্ষী মারা যায় এবং সঙ্গে থাকা ছেলে ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা আহত হয়।

হামাস এই হামলার জন্য ফাতাহ নেতা মোহাম্মাদ দাহলান এবং তার গ্রুপকে দায়ী করে। ফাতাহ সেই অভিযোগ অস্বীকার করে। দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার পর আব্বাসও ঘোষণা করেন, জাতীয় ঐকমত্যের সরকার নিয়ে আলোচনা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যেই প্রেসিডেন্ট আব্বাস ১৬ ডিসেম্বর জানান, সার্বিক অচলাবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়ার জন্য তিনি দ্রুত প্রেসিডেন্ট এবং সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করবেন। অন্যদিকে, হামাস নেতারা প্রেসিডেন্ট আব্বাসের এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে। আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গাজায় হামাস ও ফাতাহর সশস্ত্র কর্মীরা গুলি বিনিময় শুরু করে।

এরপর ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভিন্ন আলোচনা শুরু হয়। তারা বলেন, আদৌ কি প্রেসিডেন্ট আব্বাস এভাবে সংসদকে বিলুপ্ত করে দিতে পারেন? হামাস সরকার ২০১০-এর শেষ অবধি মেয়াদ থাকার কথা। অথচ মাহমুদ আব্বাস কোন কারণে এক বছর যেতে না যেতেই সংসদকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছেন– এটা নিয়েও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলো।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরাশক্তি হামাসকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে নতুনভাবে ফিলিস্তিনের ওপর অবরোধ আরোপ করে। হোয়াইট হাউস, টনি ব্লেয়ার এবং ইজরাইলি সরকার নগ্নভাবে আব্বাসকে সমর্থন এবং হামাস সরকারকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

এতে পশ্চিমা মিত্ররা খুব যে সুবিধা পেলো তাও কিন্তু নয়। অবরোধ আরোপের পরেও হামাস খুব একটা সংকট ছাড়াই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারছিল।

তারা দেশটির স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের বেতন পরিশোধ করছিল, যাতে এই দুটি মৌলিক সেবা বন্ধ হয়ে না যায়। অবরোধের কারণে মানুষের ভোগান্তি হচ্ছিল, কিন্তু এর জন্য তারা হামাসকে কখনোই দায়ী করেনি। এই সময় পশ্চিম তীর ও গাজায় যে কয়টি জরিপ চালানো হয়, সেগুলোতেও হামাসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ফাতাহর ওপর জনগণের আস্থা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছিল।

এদিকে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ফাতাহ ও হামাসের সমর্থকদের সংঘর্ষ নিয়মিত ঘটছিল। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির কোনো প্রক্রিয়াই সফলতার মুখ দেখছিল না।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার দুদফা মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। আর তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইসও ২০০৬ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক দফা মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন, তবে তাদের এই সফরে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। কারণ, তারা যেভাবে আব্বাস ও ফাতাহকে নগ্নভাবে সমর্থন দিচ্ছেল, তাতে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে জনমনে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল।

অন্যদিকে আরব দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতাও তেমন কোনো ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারছিল না। ২০০৬ সালের অক্টোবরে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেইখ হামাদ বিন জসিম একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার সেই আলোচিত ৬ দফা কর্মসূচি 'কাতার ইনিশিয়েটিভ' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ছিল, হামাস ও ফাতাহর মধ্যে অচলায়তন ভেঙে দেওয়া এবং হামাসের সাথে আন্তর্জাতিক মহলগুলোর দূরত্ব ঘোচানো। কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কয়েকদিন সিরিয়া, রামাল্লা এবং গাজাতে ঘুরে হামাস ও ফাতাহ নেতৃবৃন্দের সাথে বেশ কয়েকদফা বৈঠক করেন, তবে সেগুলো থেকে কোনো ফলাফল আসেনি।

সেই বছরেই কায়রোতে মিশরের তৎকালীন গোয়েন্দাপ্রধান ওমর সুলায়মানের মধ্যস্থতায় হামাস ও ফাতাহ নেতারা বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেন।

মিশরের এই দূতিয়ালি দেখে মনে হতো, তারা ফাতাহ ও হামাসের সমঝোতায় যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ইজরাইলি জিম্মি সেনাকে মুক্ত করতে। এর আগে মিশর ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। এতে অনেকেই মনে করছিল, ফিলিস্তিনের ওপর মিশরের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল মিশরের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। সে সময় হোসনি মোবারকের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত ঘটত।

২০০৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী মারুফ আল বাখিত মাহমুদ আব্বাস ও ইসমাইল হানিয়াকে আম্মানে আমন্ত্রণ জানান। জর্ডান জানিয়েছিল, এই আলোচনা বাদশাহ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হবে। আর এই সংলাপ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য গাজার সহিংস পরিস্থিতির অবসান ঘটানো। আব্বাস ও হানিয়া দুজনই এই বৈঠকে যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করলেও কোনো এক রহস্যজনক কারণে সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

হামাস নেতারা মনে করে, জর্ডান এই বৈঠকের ব্যাপারে কখনোই আন্তরিক ছিল না। তারা মানুষকে দেখানোর জন্যই মিডিয়াতে এই ধরনের ঘোষণা দিয়েছিল।

তা ছাড়া ১৯৯৯ সালে হামাস নেতাদের জর্ডান থেকে বের করে দেওয়ার পর থেকে হামাসের সঙ্গে জর্ডানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর কখনোই ভালোর দিকে যায়নি। এ সম্পর্ক আরও খারাপ হয় ২০০৬ সালের এপ্রিলে, যখন জর্ডান সরকার ঘোষণা দেয়– তারা জর্ডান স্থাপনায় হামাসের হামলা চালানোর একটি পরিকল্পনা নসাৎ করে দিয়েছে। হামাস আজ অবধি জর্ডানের এই অভিযোগ স্বীকার করেনি। তাই হামাস নেতারা মনে করেন– জর্ডান যদি ফিলিস্তিন ইস্যুতে কখনো মধ্যস্থতা করতে চায়, তাহলে সবার আগে হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।

২০ জানুয়ারি মাহমুদ আব্বাস দামেস্কে পৌঁছান। সিরিয়ান সরকার আশা করেছিল, আব্বাস সেখানে বসবাসরত হামাস নেতা খালিদ মিশালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাতীয় সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করবেন।

অনেকেই ধারণা করেছিল, দুই নেতাই বৈঠকে বসতে আগ্রহী। সেখানে নিছক ফটোসেশনের চেয়ে বড়ো কোনো অর্জন হবে। বিশেষ করে গাজার সহিংসতা বন্ধ ও জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।

কিন্তু এই দুই নেতার পক্ষে যে প্রতিনিধিরা প্রস্তুতিমূলক কাজ করছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারা সামান্য মতবিরোধের কারণে এক হতে পারেননি। ফলে বহুল প্রত্যাশিত বৈঠকটি আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

যে কয়েকটা বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে একটি হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে? হামাস এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যাকে প্রস্তাব করেছিল, মাহমুদ আব্বাস তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের বিষয়টি নিয়েও বিরোধ ছিল। আব্বাস চাচ্ছিলেন, জাতীয় ঐকমত্যের সরকার ইতঃপূর্বে স্বাক্ষরিত পিএলও ও ইজরাইলের মধ্যে সকল চুক্তি মেনে নেবে।

খালিদ মিশাল তাতে রাজি ছিলেন না। কারণ, তিনি মনে করতেন এ সকল চুক্তির অধিকাংশতেই ফিলিস্তিনি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি।

সমঝোতা যখন হলোই না, তখন আর বৈঠক করে কী হবে– এটাই ছিল মিশালের প্রথম অভিব্যক্তি। তবে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের হস্তক্ষেপে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মিশালকে বোঝালেন, আব্বাস দামেস্কে সফরে এসেছেন, এরপরও যদি একটা বৈঠক না হয়, তাহলে তা খুবই মর্মান্তিক এবং দৃষ্টিকটু হবে। তা ছাড়া এই দুই নেতা একসঙ্গে না বসলে সব জায়গাতেই ভুল বার্তা এবং দুই দলের মধ্যে দূরত্ব আরও বেড়ে যাবে। ফলে গোটা অঞ্চলে অস্থিরতারও বৃদ্ধি পাবে। এতে উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরাও আরও সহিংস হয়ে উঠার সুযোগ পাবে।

কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেভাবে কাজ এগোচ্ছিল না। অবশেষে সৌদি আরবের উদ্যোগে সফলতা অর্জন হয়। উদ্যোগটি নিয়েছিলেন সৌদি যুবরাজ প্রিন্স বন্দর বিন সুলতান, জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি আরবের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। সকল মহলের সব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হচ্ছিল, ঠিক তখন প্রিন্স বন্দর বাদশাহ আব্দুল্লাহকে বোঝাতে সক্ষম হন, এখন জর্ডানের কিছু করার সময় এসেছে। সেই মোতাবেক বাদশাহ আব্দুল্লাহ হামাস নেতা মিশালের সঙ্গে কথা বলার জন্য দামেস্কে বার্তা পাঠান। তিনি সিরিয়ার সরকারকে অবহিত করেন, সৌদি বাদশাহ একটি সমঝোতা উদ্যোগ নিয়েছেন, যাতে ফিলিস্তিনের সহিংসতা বন্ধ এবং দেশটির ওপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের অবসান ঘটানো যায়।[১৪০]

হামাস ও ফাতাহ নেতাদের আলোচনার জন্য মক্কায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। খালিদ মিশাল, মাহমুদ আব্বাস এবং ইসমাইল হানিয়া সৌদি আরবের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। এই আলোচনা হামাসকে আরেকটি বড়ো অর্জন লাভ করার সুযোগ দিলো। মূলত এটা তাদের সৌভাগ্য ছিলই; অন্যভাবে বলতে গেলে এ প্রাপ্তিটি ছিল তাদের ধৈর্যের পুরস্কার। বিগত কয়েক মাসে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা আর অসংখ্য নেতা-কর্মীর শাহাদাতের পরও দল হিসেবে হামাস কখনোই নেতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। হামাসের এই ভূমিকার কারণেই ফিলিস্তিনে বড়ো আকারের গৃহযুদ্ধও সংঘঠিত হয়নি।

---

১৪০. www.atimes.com/atimes/Middle_East/IC06AK04.html এই ওয়েবসাইটে এলেইস্টার কুক এবং মার্ক পেরি মিলে যৌথভাবে এই কলামটি লিখেন। হামাস অবশ্য এই সমঝোতায় প্রিন্স বন্দরের অবদানকে অস্বীকার করে। হামাসের মতে– এই উদ্যোগের পুরোটাই সরাসরি সৌদি রাজার কৃতিত্ব এবং প্রিন্স বন্দর অন্য আরও অনেক সৌদি কর্মকর্তার মতোই কেবল রাজার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন।

যাহোক, বেশ কয়েকদিনের কূটনৈতিক তৎপরতার পর ২০০৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ফিলিস্তিনের দুই পক্ষ সৌদি রাজ পরিবারের মধ্যস্থতায় 'মক্কা-চুক্তি' স্বাক্ষর করতে রাজি হয়। এর ফলে হামাসকে সকল প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পরিস্থিতির অবসান হয়। পর্যবেক্ষকরা এই চুক্তিকে হামাসের বিজয় হিসেবে অভিহিত করে।[১৪১]

আসলে মক্কা-চুক্তিতে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা নতুন করে সামনে এসেছে। ইতোমধ্যে দুই পক্ষ অধিকাংশ বিষয়েই সমঝোতায় রাজি হয়েছে; এমনকী মন্ত্রণালয়ের বণ্টন নিয়েও সমঝোতা হয়েছিল।

মক্কা-চুক্তি[১৪২]

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

'সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের; যিনি তাঁর প্রিয় নবিকে (সা.) মক্কার হারাম (বায়তুল্লাহ) থেকে শুরু করে আরেক পবিত্র মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাস) মিরাজের যাত্রার মাধ্যমে নিয়ে এসেছিলেন। দুই পবিত্র মসজিদের সম্মানিত জিম্মাদার, সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের উদ্যোগ এবং সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১৪২৮ হিজরির ১৯ থেকে ২১ মুহাররাম, তথা ২০০৭ সালের ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ফিলিস্তিনের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহর রহমতে সংলাপ সফল হয়েছে। দুই দলই বেশ কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

প্রথমত, ফিলিস্তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রক্তপাত বন্ধ করা হবে। জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে দৃঢ়তার সাথে দখলদারদের মোকাবিলা করা যায় এবং ফিলিস্তিনের মানুষের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হয়। এরই প্রেক্ষাপটে আমরা মিশরে বসবাসরত ভাই ও বোনদের প্রতি এবং মিশরের নিরাপত্তা প্রতিনিধি দলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা গাজায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন।

---

[১৪১]. ইজরাইলি মিডিয়া মক্কা-চুক্তিকে হামাসের একচেটিয়া বিজয় হিসেবেই অভিহিত করে। এই ব্যাপারে ২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জেরুজালেম পোস্টে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'Why Hamas Came out Clear Winner From Mecca Summit > www.jpost.com/servlet/sattelite?cid'. একই ধরনের প্রতিবেদন জেরুজালেম পোস্টসহ অন্যান্য ইজরাইলি পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

[১৪২]. সৌদি পত্রিকা *আল শার্ক আল আওসাতে* ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এভাবেই চুক্তিটি প্রকাশিত হয়।

> দ্বিতীয়ত, আমরা সমঝোতার ভিত্তিতে ফিলিস্তিনের একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছি এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তৃতীয়ত, পিএলওকে কার্যকর এবং এর কাঙ্ক্ষিত সংস্কার সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি, আমরা ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ ও গোটা উম্মাহকে এই সমঝোতার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানাতে চাই, উভয় পক্ষ এখন থেকে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন, দখলদারিত্ব থেকে মুক্তি, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আল আকসা পুনরুদ্ধার, যুদ্ধবন্দি বিনিময় এবং নির্মাণাধীন অবৈধ বসতি ও ইজরাইলি সীমান্ত দেয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ সকল মৌলিক ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করবে। আল্লাহ আমাদের সফল করুন। আমিন।'

প্রকৃতপক্ষে একটি সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য ফাতাহ ও হামাস উভয়েই মক্কা-চুক্তির মতো একটি সমাধান তালাশ করছিল। তা ছাড়া গোটা ফিলিস্তিনে যেভাবে সহিংসতা ও উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাতে গোটা জাতিসত্তাই হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যেদিন ফাতাহর নিরাপত্তা কর্মীরা গাজায় হামাসের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালায় এবং সেখানকার লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টারসহ অন্যান্য স্থাপনা ধ্বংস করে। এরপর মক্কা-চুক্তি না হলে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।

গাজার সড়কগুলোতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সংঘর্ষ চলছিল। এক পর্যায়ে ফাতাহ অনুধাবন করে, হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব সহজ হবে না। ফাতাহ নেতাদের কেউ কেউ এটাও মানতে শুরু করেন, জোর করে হামাস সরকারকে ফেলে দেওয়াও সম্ভব না। আমেরিকা ও ইজরাইল যদিও ফাতাহকে সমর্থন দিচ্ছিল, তারপর এই দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত ও সহিংসতায় হামাসের কোনো ক্ষতিই হচ্ছে না; বরং নিরীহ ফিলিস্তিনিরা হতাহত হচ্ছিল। আর দল হিসেবে ফাতাহ অনেক লোকসান গুনছিল। তাই তারা এই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা সমীচীন মনে করছিল না।

একসময় গিয়ে ফাতাহর নীতি-নির্ধারকরা চিন্তা করেছিল, হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগ দিলেই তাদের জন্য ভালো হতো। সৌদি আরব সেই সরকারে নতুন করে অংশীদারিত্বের প্রস্তাব দেওয়ার পর আব্বাস তা পুনরায় প্রত্যাখ্যান করেন। বাস্তবিক অর্থে প্রথমদিকে ফাতাহ এমন কোনো সরকারে যেতে চাচ্ছিল না, যার প্রধানমন্ত্রী হামাসের কেউ থাকবে। মাহমুদ আব্বাস শুধু চেয়েছিলেন, হামাস অন্তত পিএলও'র পুরোনো চুক্তিগুলোকে স্বীকৃতি দিক।

যাই হোক, মক্কা-চুক্তির সবচেয়ে ভালো দিক হলো– এর কারণেই ফিলিস্তিন নিশ্চিত গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল। এই চুক্তির ফলে আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনের নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো। হামাসের ইসমাইল হানিয়া তার গঠনমূলক ভূমিকার কারণে খুবই প্রশংসিত হলেন। আরব দেশগুলো তাকেই ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিলো।

এরপর নতুন করে ২৪ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন হলো, তার মধ্যে ১১ জনই হামাস থেকে। ফাতাহ পেল একজন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ৫টি মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্ব। অন্য ছোটোখাটো ৩টি দল পেল ৩টি মন্ত্রণালয়। আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা পেলেন ৪টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। উল্লেখ্য– স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেল স্বতন্ত্র থেকে।

অবশ্য অনেক পর্যবেক্ষক মক্কা-চুক্তিকে ফাতাহর পরাজয় এবং হামাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচনা করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোহাম্মাদ ইয়াঘি। তিনি ওয়াশিংটন ইন্সটিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির জন্য লেখাতে এরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন– 'এই চুক্তির খবর পেয়ে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ দল-মত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে আসে এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করে। তাদের কাছে এটা কোনো দলের জয় বা পরাজয় নয়; তাদের উদ্‌যাপনের কারণ ছিল, এই চুক্তিকে ফিলিস্তিনের জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থে একটি বিরাট অগ্রগতি।'

হামাস ব্লেয়ারের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারায়নি। এতটুকু কৃতিত্ব তাদের দেওয়াই যায়। আর পিএলও ইতঃপূর্বে ইজরাইলের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছিল, হামাস সেগুলোর ব্যাপারে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিল। প্রধানমন্ত্রী হানিয়া জানালেন– 'তার সরকার পূর্বে স্বাক্ষরিত সব চুক্তি সম্মান করে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে, যতক্ষণ না তা ফিলিস্তিনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে। তবে চুক্তিগুলো সম্মান করলেও ইজরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দেওয়ার পুরোনো অবস্থানেই হামাস অটল থাকবে।'

অনেকে বলেন, মক্কা-চুক্তিটি মূলত আমেরিকাই তৈরি করে দিয়েছে। মূলত যারা এগুলো বলেন তারা মনে করেন, প্রিন্স বন্দরের কারণেই এই চুক্তিটি হয়েছে। আর প্রিন্স বন্দরের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভালো সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তাকে কাজে লাগিয়েছে। হামাস অবশ্য আগাগোড়াই এই মতামত অস্বীকার করেছে। তাদের মতে– এই পুরো চুক্তি সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লার ভূমিকার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সে সময় এই সব কথায় আরও প্রণোদনা দেন জর্ডানের প্রখ্যাত কলামিস্ট এবং জর্ডান ইখওয়ানের সাবেক সংসদ সদস্য ইবরাহিম ঘারায়বাহ। তিনি একটি কলামে[১৪৩] জানান, 'মক্কা-চুক্তিটি আমেরিকা ও ইজরাইল উভয় দিক থেকেই প্রত্যাশিত ছিল... যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইল বাহ্যিকভাবে হামাসের বিরুদ্ধে যতই তোড়জোড় করুক, আসলে তারা হামাস সরকারকেই টিকিয়ে রাখতে চায়... সামগ্রিক এই দূতিয়ালিতে যদি কেউ কিছু হারায়, তাহলে তা হারিয়েছে ফাতাহ...'

তবে যারা এসব অভিযোগ করছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়, যখন মক্কা-চুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে। সেইসঙ্গে মক্কা-চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐকমত্যের সরকারকেও অস্বীকার করে। বাস্তবিক অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে এই ধরনের চুক্তি করতে চাপ দিয়েছে, তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। কারণ, এর আগে ২০০৬ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠক চলাকালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাইডলাইনে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে তিনি আব্বাসকে শাসান, যেন ফাতাহ কোনোভাবেই হামাসের সাথে সরকারে যোগ না দেয়।

মূলত আমেরিকা এবং তার মিত্ররা অপেক্ষা করছিল, হামাস ব্লেয়ারের দেওয়া শর্তগুলো মেনে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয় কি না তা দেখতে।

হামাস বিশ্বাস করেছিল, সৌদি আরব ক্রমবর্ধমান সহিংসতা বন্ধ করার জন্য আন্তরিকভাবে এই কূটনৈতিক কার্যক্রমটি হাতে নিয়েছে। তা ছাড়া ফিলিস্তিনের সহিংসতা নিয়ে তৎকালীন সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ নাগরিক এবং বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরাও ফিলিস্তিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য বাদশাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন।

হামাস ও ফাতাহকে সমঝোতায় আনার জন্য বেশ কয়েকটি আরব দেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় সে সময় গোটা আরব কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করছিল। সৌদি আরব সেই সুযোগটা কাজে লাগায় এবং ইরানসহ অন্যান্য শক্তিগুলোর ওপর এক ধরনের ভৌগোলিক আধিপত্য সৃষ্টির খায়েশ থেকেই এই কাজটি করে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে সৌদি আরবের ইরানকে টেক্কা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ, সৌদি আরব মনে করে ইরানের সাথে হামাসের এক ধরনের আদর্শিক বন্ধন বিদ্যমান। তারা আশঙ্কায় করত, কখন না আবার হামাস তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে ইরান, সিরিয়া এবং হিজবুল্লাহদের গ্রুপে ঢুকে যায়।

---

[১৪৩]. *আল আসর*-এর অনলাইনে ২০০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই কলামটি প্রকাশিত হয়।

এর পাশাপাশি সৌদি আরবের আরও একটি ভয় ছিল। বুশ ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে সেভাবে মূল্যায়ন করছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রও তাকে অবহেলা করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ইরাকে হামলা এবং ইজরাইলের প্রতি বুশ প্রশাসনের নগ্ন সমর্থনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই সৌদি আরবের মতামতকে তোয়াক্কা করেনি। তাই সৌদি আরবের জন্য নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়া অপরিহার্য ছিল।

সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে ২০০৭ সালের ১৭ মার্চ ফিলিস্তিনে ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়, যেখানে ফাতাহর প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। অনেকে ভাবতেও পারেনি, ফিলিস্তিনে এমন কিছু সম্ভব হবে। কেউ এটাও ভাবতে পারেনি, সরকার গঠনের মাত্র ১০ দিনের মাথায় আরব লিগের সম্মেলনে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করবেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই সংগঠনের দুই নেতা ইসমাইল হানিয়া ও মাহমুদ আব্বাস।

মক্কা-চুক্তির আলোকে ১৫ মার্চ হামাস ও ফাতাহ আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপরই দামেস্কে থাকা খালিদ মিশাল মক্কা-চুক্তির পূর্ণ কূটনৈতিক ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা শুরু করেন। মক্কা থেকে ফিরে তিনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপরই তিনি মিশর, সুদান, রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও ইরানে দীর্ঘ সফরে বের হন।

মক্কা-চুক্তি অনেকগুলো নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। এই চুক্তির পর প্রথমবারের মতো এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে ফিলিস্তিন ও ইজরাইল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ তৈরি হয়; অথচ ইজরাইলের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই। এই প্রসঙ্গে *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় খালিদ মিশাল 'আওয়ার ইউনিটি' শিরোনামে একটি কলাম লেখেন। সেখানে তিনি বলেন– 'মক্কায় যে ফিলিস্তিন ঐক্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তা স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। ১৯৬৭ সালে ইজরাইলিরা আমাদের যে ভূমি দখল করেছিল, তা নিয়ে এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করে আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা চাই পশ্চিম তীরে ইজরাইল যতগুলো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করেছে, সেগুলো যেন ভেঙে ফেলা হয়। আর ইজরাইলের কারাগারে যত ফিলিস্তিনি বন্দি আছে, আমরা তাদের সকলের মুক্তি চাই। আর সেইসঙ্গে চাই– যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।'

খালিদ মিশালের এই কথা হামাসের ১৯৮৮ সালে প্রণীত সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আলাদা। ওই সংবিধানে হামাস ব্রিটিশের কাছ থেকে মুক্ত হওয়া পুরো ভূখণ্ডকে নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। হামাসের প্রথম সংবিধানের অবস্থান মানতে গেলে গোটা ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যায়। তাই মিশালের এই ঘোষণা হামাসের একটি উদার, বাস্তব এবং সময়োপযোগী ঘোষণা হিসেবেই পর্যবেক্ষকরা মূল্যায়ন করেন।

তবে হামাসের ভেতরে মিশালের এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। অনেকেই বলেন– হামাস ক্ষমতায় গিয়েই এখন সেই সুরে কথা বলছে, যে সুরে ফাতাহ বলত। সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আসে উগ্রবাদী সংগঠন আল কায়েদার পক্ষ থেকে। আল কায়েদার দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আয়মান আল জাওয়াহিরি এক অডিও ক্লিপে বলেন– 'হামাস বিক্রি হয়ে গেছে।'

তবে জাওয়াহিরির এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় এতদিন যারা হামাসকে আল কায়েদার সাথে মেলানোর চেষ্টা করত, তারা অনেকটাই চুপসে যায়। সবাই নতুন করে উপলব্ধি করে, হামাসের সাথে আল কায়েদা কিংবা এ ধরনের সন্ত্রাসী উগ্রবাদী সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। জাওয়াহিরির সেই অডিও বার্তাটি আল জাজিরায় ২০০৭ সালের ১১ মার্চ প্রচারিত হয়।

এ কথা ঠিক, জাতীয় ঐকমত্যের সরকারটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ, তবে এই সরকারের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল। বেশ কিছু কারণে এই সরকারের ঠিকমতো কাজ করার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। ধারণা করা হচ্ছিল, এই সরকার হবে স্বল্পস্থায়ী। সামনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর চলে আসছিল যাতে বোঝা যাচ্ছিল, যেকোনো সময় সরকার পড়েও যেতে পারে।

প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছিল– আন্তর্জাতিক অবরোধ। যদিও ফিলিস্তিনিরা একমত হয়ে সরকার গঠন করেছিল, কিন্তু পূর্বে হামাসের ক্ষমতা গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে অবরোধ শুরু হয়েছিল, তা তখনও অব্যাহত ছিল। অল্প কয়েকটি দেশ বিশেষ করে রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড বলেছিল, ফিলিস্তিনে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার তারা দেশটির ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেবে, কিন্তু অধিকাংশ দেশই অবরোধ অব্যাহত রাখায় ফিলিস্তিনের সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি ছিল– কিছু কিছু দেশের বৈষম্যমূলক ও একপেশে আচরণ। যেমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং তাদের মিত্ররা যদি ফিলিস্তিন সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইত, তাহলে তারা এমন মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, যারা হামাস থেকে মনোনীত নয়। ফলে সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। বিশেষত যেসব মন্ত্রণালয়গুলো কাজের স্বার্থে সব সময় বাহিরের দেশগুলোর সাথে কথা বলতে হতো, যোগাযোগের অভাবে সেগুলো ক্রমশ অকার্যকর হয়ে পড়ছিল। বিদেশি সরকারগুলোর এরূপ অন্যায় আচরণ ও দ্বৈত নীতির কারণে হামাস নেতারাও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছিল। খালিদ মিশাল এ ব্যাপারে পশ্চিমা কয়েকটি দেশের প্রকাশ্যে সমালোচনাও করেন।

তৃতীয়ত চ্যালেঞ্জটি ছিল, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো তখনও নামে-বেনামে ফিলিস্তিনের ভেতরে বিভিন্ন মিলিশিয়া এবং আধা-সামরিক বাহিনীগুলোকে লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে আসছিল। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মাদ দাহলানের মিলিশিয়া দল এবং প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নিজের বাহিনী বাড়তি কিছু সুবিধাও পাচ্ছিল। ধারণা করা হয়– এই ধরনের আধা-সামরিক বাহিনীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বড়ো করা হচ্ছিল, যাতে এদের ব্যবহার করে যেকোনো সময় সরকারকে ফেলে দেওয়া যায়।

এমন পরিস্থিতিতে হামাসের নেতাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো– ফাতাহ আসলে আন্তরিকতা থেকে নয়; বরং কিছুটা সময় পার করার জন্যই চুক্তি স্বাক্ষরের নাটক করেছিল। তারা হামাসের বিরুদ্ধে আবারও লড়াই শুরু করবে এবং এই সময়টা তারা সেই প্রস্তুতির কাজেই ব্যবহার করেছে। একই সঙ্গে হামাস দাহলান ও মাহমুদ আব্বাসের সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে মদদ দেওয়ার জন্য বারবার আমেরিকা, ইজরাইল, জর্ডান এবং মিশরকে অভিযুক্ত করছিল।

জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের পতন হলে গোটা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষেরই পতন ঘটার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে প্রথম যে প্রতিক্রিয়াটি হতে পারত তা হলো– তৃতীয় ইন্তিফাদা। হামাস বারাবর মনে করত, জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের মাধ্যমে তারা বলটি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর কোর্টে ঠেলে দিয়েছে। হামাস নেতারা প্রায়ই বলতেন– 'এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চাইলে ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে। তারা ইজরাইলকে চাপ দিতে পারে, যাতে ইজরাইল আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক না গলায় এবং ফিলিস্তিনের দলগুলোর মধ্যকার ঐকমত্যের চুক্তির বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। কিন্তু যদি তারা এটা না করে ফিলিস্তিনকে দুর্বল করার চেষ্টা করে, তাহলে শুধু হামাস নয়; বরং ফিলিস্তিনের সকল দল

এবং সংগঠনই বিপদে পড়ে যাবে। যদি তারা ফিলিস্তিনকে দুর্বল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাহলে এর পরিণতি হবে সকলের জন্যই ভয়াবহ। ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই অশান্ত হয়ে উঠবে, বহু বছর যার খেসারত দিতে হবে।'

২০০৭ সালের ৩০ মার্চ জুমার নামাজের খুতবায় প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়াও খালিদ মিশালের সুরেই কথা বলেন। তিনি বলেন– 'আমাদের দিক থেকে যা করার ছিল ইতোমধ্যেই আমরা তা করেছি। আমরা একটি ঐকমত্যের সরকার গঠন করেছি এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাভিত্তিক কর্মসূচিও গ্রহণ করেছি। এখন সবার আগে দরকার– ফিলিস্তিনের ওপর থেকে সব ধরনের অবরোধ প্রত্যাহার। যদি এই অবরোধ আরও দু-তিনমাস চলে, তাহলে আমাদেরও হয়তো বিকল্প চিন্তা করতে হবে। আমরা সেই সিদ্ধান্তই নেব, যা আমাদের সম্মান ও স্বার্থকে সুনিশ্চিত করবে।'

বাস্তবিক অর্থে মক্কা-চুক্তির মাধ্যমে একটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছিল। অনেকেই এই চুক্তিকে স্বীকৃতিও দিয়েছিল, কিন্তু ইজরাইল ও আমেরিকা এই চুক্তি কখনোই মানতে চায়নি।

অবশেষে ২০০৭ সালের জুন মাসের মাঝামাঝিতে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করল। জাতীয় ঐকমত্যের সরকার মোটামুটি অকার্যকর হয়ে পড়ল। এর আগে জুন মাসের শুরুতে মিশরীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে হামাস নেতারা অভিযোগ করেন– গাজাতে ফাতাহ নিরাপত্তা বাহিনীর যে কমান্ডাররা আছেন, ফাতাহর মূল নেতৃত্ব তাদের সমঝোতা চুক্তি মানতে চাপ দিচ্ছে না। তারা সরকারকে অসহযোগিতা করে যাচ্ছে, আইনও অমান্য করছে। সে কারণে হামাসের ওপর চতুর্দিক থেকে, বিশেষ করে গাজার সাধারণ মানুষরা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছিল, যাতে সংকট উত্তরণে হামাস কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ, হামাস নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা গাজায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করবে, অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। আর এর পেছনে মূল কারণ ছিল– ফাতাহর উদ্দেশ্যমূলক অসহযোগিতা আর সন্ত্রাসী আচরণ।

হামাস সামরিকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু তাতে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ছিল। হামাস সহিংসতা পরিহার করতে চাচ্ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ফাতাহ এবং আরও কিছু সংগঠন বেপরোয়া হয়ে উঠল। তারা হামাসের লোকদের যেখানে-সেখানে হত্যা করা শুরু করল। মুখে দাড়ি আছে কিংবা ফাতাহ'র সদস্য হিসেবে তেমন একটা পরিচিত নয়– এমন কাউকে পেলেই সন্ত্রাসীরা তাকে হামাস বলে হত্যা করত।

এক পর্যায়ে হামাস সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হলো। পাঁচ দিনের মধ্যে তারা গাজায় একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। ফাতাহর তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনী প্রশিক্ষিত

ও সশস্ত্র হওয়ার পরও পিছু হটল। সশস্ত্র বাহিনী পিছু হটায় সাধারণ মিলিশিয়া সদস্যরা ঘাবড়ে গিয়ে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করল। হামাস ঘোষণা দিলো– তাদের এই সামরিক কার্যক্রম ফাতাহর বিরুদ্ধে নয়; বরং যারা ফাতাহর নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে, আর জাতীয় ঐকমত্যের সরকারকে বিপদে ফেলতে চায়– তাদের বিরুদ্ধে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রেসিডেন্ট আব্বাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এরপর হামাসের বিরুদ্ধে কোন কৌশলে এগোবেন!

অবশেষে তিনি তার মুখপাত্রের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় খালিদ মিশাল এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আব্বাসের প্রতি আহ্বান জানালেন, তিনি যেন নতুন সরকার গঠনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন এবং হামাসের সাথে পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে মিশাল আরব কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান, যাতে ঐকমত্যের সরকার গাজা ও পশ্চিম তীরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ঐকমত্যের সরকারের বিলুপ্তি ঘোষণার সাথে সাথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূত পাঠিয়ে জানাল, তারা এক্ষুনি ফিলিস্তিনের ওপর অবরোধ উঠিয়ে নেবে, যদি আব্বাস হামাসমুক্ত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এভাবে ২০০৭ সালের ১৭ জুন প্রাক্তন বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা সালাম ফায়াদের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে নতুন সরকার গঠিত হয়। এর আগে সালাম ফায়াদ জাতীয় ঐকমত্যের সরকারে অর্থমন্ত্রী হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এরপর থেকেই গাজা পৃথিবীর বৃহত্তম মানব কারাগারে পরিণত হয়। ইজরাইলও কাল-বিলম্ব না করে গাজার সাথে বাইরের এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং পানি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের সংযোগ কেটে দেয়। আজ অবধি গাজার অবস্থা একই রকম আছে। সেখানকার মানুষ এখন কতটুকু নাগরিক সুবিধা পাবে, কোথাও যেতে পারবে কি না, বাজারের পণ্যের সরবরাহ বেশি নাকি কম থাকবে, মানুষ পড়াশোনার সুযোগ পাবে কি না, চাকরি পাবে কি না, সবটাই ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে গাজা উপত্যকা এখনও হামাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।

অধ্যায়-১৪
সম্প্রতি কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ভূমিকাতে বলা হয়েছে, এই বইয়ে হামাসের ২০০৭ সাল অবধি ঘটনা প্রবাহকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এরপর আজ অবধি যা ঘটছে, তা এই বইতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনিতেই বইটির আকার বেশ বড়ো হয়ে গেছে। আর বইটি যেহেতু হামাস প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সরকার গঠন পর্যন্ত ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়েছে, তাই পরবর্তী ঘটনাগুলো ধারণ করার প্রয়াস শুরু থেকে তেমন একটা ছিল না। তারপরও দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা জানাতে চাই; যাতে পাঠকরা হামাস ও ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক অবস্থা কিছুটা অবগত হতে পারেন।

২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের নির্বাচনে হামাসের জয়লাভের পর ইসমাইল হানিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। দলের দায়িত্ব হিসেব করলে ইসমাইল হানিয়া তখন হামাসের গাজা শাখার প্রধান। আর খালিদ মিশাল তখন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হানিয়া খুব বেশিদিন দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। ফাতাহ ও হামাস দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০০৭ সালের ১৪ জুন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস তাকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু ইসমাইল হানিয়া এই অন্যায্য আদেশ না মেনে গাজা উপত্যকায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন।

হানিয়াকে পদচ্যুত করার পর মাহমুদ আব্বাস সালাম ফাইয়াদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর হামাসের সামরিক শাখা ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। ইতঃপূর্বে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ মূলত ফাতাহর মিলিশিয়াদের

এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফাইয়াদের নিয়োগ বেআইনি হিসেবে ধরা হয়েছিল। কারণ, ফিলিস্তিনি মৌলিক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে চাইলে আইন পরিষদের অনুমোদন ছাড়া নতুন কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন না। আইন অনুযায়ী নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ফাইয়াদের নিয়োগ আইন পরিষদে অনুমোদিত না হওয়ায় ইসমাইল হানিয়া গাজায় প্রধানমন্ত্রিত্ব করতে থাকেন। সেইসঙ্গে বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনি তাকে বৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণ্য করে। অবশেষে ২ জুন, ২০১৪ তিনি দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।

এর আগে ২০১১ সালের নভেম্বরে কায়রোতে ফিলিস্তিনের শীর্ষ নেতা মাহমুদ আব্বাস এবং হামাস নেতা খালেদ মিশাল আবারও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ঘোষণা দেন। তারা কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কথা বলেন। মিশাল বলেন– 'আমরা আমাদের জনগণ এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বকে জানাতে চাই, ফিলিস্তিন জাতির জন্য আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' অপরদিকে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন– 'আমাদের মধ্যে আর কোনো মতপার্থক্য অবশিষ্ট নেই। আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে সম্মত হয়েছি।' তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সেই সমঝোতা শেষ পর্যন্ত আর কার্যকর হয়নি।

হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্বে গাজায় মানবিক সংকট

এক দশকের বেশি সময় ইজরাইল ও মিশরের অবরোধের কারণে ফিলিস্তিনের গাজা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত হয়েছে। তার ওপর ফিলিস্তিনের ফাতাহ ও হামাসের দ্বন্দ্বের কারণে অবস্থা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। হামাসকে চাপে রাখতে গাজার বিদ্যুৎসুবিধা বন্ধসহ সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কেটে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

ফাতাহ পরিচালিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত গাজার অনেক বাসিন্দার বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইজরাইল ও মিশর গাজায় পণ্য আমদানি-রফতানির সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেওয়ায় গাজার অর্থনীতিব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আর এতে ২০ লাখ অধিবাসীর ভূখণ্ড গাজায় দেখা দিয়েছে চরম মানবিক বিপর্যয়।

ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মূল শক্তি হলো ফাতাহ। অন্যদিকে, হামাস ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রাম করে এলেও ২০০৭ সালে নির্বাচনে অংশ নেয়। গাজায় নির্বাচনে জয়লাভের পর তারা সেখান থেকে ফাতাহর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়। সে সময় থেকেই হামাস ও ফাতাহর মধ্যে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তখন থেকে ইজরাইল ও মিশর গাজা অবরোধ করে রেখেছে। তারা গাজায় যেকোনো পণ্যসামগ্রী

আমদানি-রফতানিতে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ইজরাইল মনে করে, এতে হামাস চাপে থাকবে, আর গাজাবাসীও নিষেধাজ্ঞা শিথিলের আশায় তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করবে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে হামাস সুড়ঙ্গ ব্যবহার করে পণ্যসামগ্রী আনা-নেওয়া করত। সুড়ঙ্গ দিয়ে মিশর থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে আনা পণ্যসামগ্রীর ওপর ছিল তাদের আয়ের উৎস। তবে মিশরে আল সিসি ক্ষমতায় আসার পর চোরাচালানের ব্যবহৃত এসব সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দেয়। কারণ, হামাসের সঙ্গে মিশরের বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সিসির এমন পদক্ষেপের কারণে হামাস 'সিনাই টানেল' বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ইজরাইলও এই ধরনের সুড়ঙ্গ খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করছে। গত কয়েক মাসে তারা হামাস ও ইসলামিক জিহাদের তৈরি কয়েকটি সুড়ঙ্গ ধ্বংস করেছে। সুড়ঙ্গগুলোতে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের পাশাপাশি বাতাস প্রবাহের সুব্যবস্থা ছিল। অন্তত শ'খানেক শ্রমিক পালাক্রমে কাজ করে সুড়ঙ্গগুলো খনন করেছিল। এ ছাড়া ইজরাইল নতুন সরবরাহ সুড়ঙ্গ তৈরির পথও বন্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন সুড়ঙ্গ তৈরি ঠেকাতে তারা ৩৪ কিলোমিটার এলাকায় ভূগর্ভে বিশেষ দেয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এই স্থাপনা নির্মাণে দেশটি প্রায় ৮২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

মিশর ও ইজরাইল সরকারের পাশাপাশি, গাজাবাসী খোদ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাপের মুখে পড়েছে। এতদিন গাজা ভূখণ্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হামাস ও ইজরাইলকে অর্থ সহায়তা দিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ, তবে ২০১১ সালে হামাসের নিজস্ব কর ব্যবস্থা নিয়ে রেষারেষির কারণে মাহমুদ আব্বাস ওই অর্থ সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেন। এরপর গাজায় মানবিক বিপর্যয় ভয়াবহ রূপ নেয়। সেখানকার হাসাপাতালগুলোতে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। জেনারেটর দিয়ে কোনোরকমে চিকিৎসাসেবা চালু রাখা হচ্ছে। আর গাজাবাসীর জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে মোট চাহিদার মাত্র ৩৭ শতাংশ বিদ্যুৎ। ফলে মানবিক বিপর্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গাজায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে শুধু সরকারি কর্মচারীরাই নয়; শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ প্রায় সব পেশার মানুষই চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সেখানকার মুদি দোকানগুলোতে মধ্যবিত্তের সঙ্গে অনেক গরিব মানুষও ভিড় করেন। অর্থাভাবে তারা অপেক্ষাকৃত খারাপ খাবার সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, দোকানদারের বাকি শোধ করতে না পেরে অনেককে জেলে যেতে হয়েছে; এমনকী অভাবের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছে ব্যাপক হারে। সেখানে ডাকাতির ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। শিশুরা এখন স্কুল বাদ দিয়ে শাক তুলতে যায়। অনেকেই আবার গাড়ির কাচ পরিষ্কার করে অর্থ আয়ের চেষ্টা করছে। দোকানগুলোতে মালামাল থাকলেও ক্রেতার অভাব, তাই তাদের আয়েও ভাটা পড়েছে।

হামাসের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন

যাই হোক, হামাস আর ফাতাহের মধ্যে এই টানাপোড়েন পরবর্তী ৫-৬ বছরও একইভাবে অব্যাহত থাকে। ফিলিস্তিনের মানুষের ভোগান্তিও বাড়তে থাকে। হামাসের অনেক নেতা-কর্মীসহ অসংখ্য ফিলিস্তিনি নাগরিক এই দীর্ঘ সময়ে বর্বর ইজরাইলিদের হাতে শাহাদাত বরণ করে। ২০১৭ সালে এসে হামাসের নেতৃত্বে বড়ো ধরনের পরিবর্তন হয়।

২০১৭ সালের এপ্রিলে ইসমাইল হানিয়াকে হামাসের প্রধান নির্বাচন করা হয়। সে সময় ইসমাইল হানিয়া খালিদ মিশালের স্থলাভিষিক্ত হন। মিশাল দুই মেয়াদে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান থাকার পর সেই বছরই অবসরে যান।

দলীয় সেটাপ নির্ধারণে গাজা সিটি এবং দোহায় একযোগে হামাসের এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, রাফাহ সীমান্তের ক্রসিং বন্ধ থাকায় হানিয়া গাজার বাইরে যেতে পারেননি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে হামাস প্রথমবারের মতো এমন একজন নেতাকে প্রধান হিসেবে বেছে নেয়, যিনি ফিলিস্তিনি এলাকার ভেতরেই অবস্থান করছেন। হানিয়াকে বরাবর একজন উদার ও বাস্তববাদী নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এর আগে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে গাজায় হামাস নেতা-কর্মী তাদের পরবর্তী নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে নির্বাচিত করেন। আর একই বছরের এপ্রিলে সিনওয়ার গাজাপ্রধান হিসেবে ইসমাইল হানিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহিয়া সিনওয়ার ১৯৮৮ সাল থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর ইজরাইলের কারাগারে বন্দি ছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর কারাভোগের পর ২০১১ সালে বন্দি বিনিময় চুক্তিতে মুক্ত হন। তিনি ছিলেন হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং হামাসের সামরিক শাখার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান।

নেতৃত্ব নির্বাচনের পর জাতীয় প্রয়োজনে হামাস একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সংঘাত মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে গাজা ভূখণ্ডে নিজেদের প্রশাসন ভেঙে দেয়। একই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের বিষয়েও সম্মত হয়।

এর আগে ২০১১ সাল থেকে ফিলিস্তিনের এ দুটি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ মিটমাট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু গাজা ও পশ্চিম তীরে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগ শেষমেশ ব্যর্থ হয়। এরপর ২০১৪ সালে হামাস ও ফাতাহ ঐকমত্যের সরকার বিষয়ে একমত হয়, কিন্তু সমঝোতা সত্ত্বেও হামাসের ছায়া সরকার গাজায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ২০১৭ সালের এপ্রিলে হামাসের নয়া নেতৃত্ব দায়িত্ব নিয়েই মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় গাজায় তাদের ছায়া সরকারের অবসান ঘটায়।

২০১১ সালে ফাতাহ-হামাসের সমঝোতা উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর অবশেষে হামাস ও ফাতাহ জাতীয় সংহতিতে পৌছাতে সক্ষম হয়। এই সমঝোতার পেছনে সাবেক ফাতাহ নেতা মোহাম্মাদ দাহলান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দাহলানের সাথে হামাসের আগে থেকেই রেষারেষি ছিল। সে কারণে ২০০৭ সালের পর তিনি আর গাজায় থাকতে পারেননি। তিনি চলে যান আরব আমিরাতে। সেখান থেকেই তিনি ফিলিস্তিনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। দাহলানের ব্যাপারে হামাসের আপত্তি থাকলেও জাতীয় প্রয়োজনে তার উদ্যোগে সাড়া দেয়। দাহলানের ব্যাপারে ফাতাহ বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসেরও নেতিবাচক মানসিকতা ছিল। কারণ, দাহলান আব্বাসের স্থলে ফাতাহর নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এক পর্যায়ে মাহমুদ আব্বাসেরও দাহলানের উদ্যোগে সাড়া দেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না।

যাহোক, প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল সমঝোতায় আসার পর এক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট, সংসদ এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেয় (যদিও তা এখনও সম্ভব হয়নি)। মিশরের রাজধানী কায়রোয় তিন দিনের আলোচনা শেষে দল দুটি এই ঘোষণা দেয়। প্রায় এক দশক ধরে হামাস ও ফাতাহ আন্দোলনের মধ্যে যে মতপার্থক্য চলে আসছিল, তা নিরসনের জন্য মিশরের কায়রোয় এ বৈঠক হয়।

তৃতীয় ইন্তিফাদা কি আসন্ন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী করার ঘোষণা ফিলিস্তিনে তৃতীয় ইন্তিফাদার জন্ম দিতে পারে। এতে আরও অনেক ফিলিস্তিনির মৃত্যু হতে পারে। সেইসঙ্গে ভূমি-ঘর-সম্পদ ধ্বংস হতে পারে। হামাসের পলিটিক্যাল ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়া এরই মধ্যে হামাসের সকল ইউনিটকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ট্রাম্পের ঘোষণার বহু দিক রয়েছে। জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানীরূপে স্বীকৃতির এ ঘোষণা মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এই ঘোষণার ফলে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ক্ষমতা সংহত করা হয়েছে। অপরদিকে নিজের ঘরেও ট্রাম্পের ক্ষমতা সংহত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আরব বিশ্বের দেশগুলো এই ঘোষণায় কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাও খতিয়ে দেখার সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প এবং হিলারি উভয়ের পরিবারে বেশ কয়েকজন ইহুদি সদস্য রয়েছে এবং উভয়েই ইজরাইলকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ট্রাম্প জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় আগামী নির্বাচনে ইজরাইলি সমর্থনের জন্য বিশেষ কোনো অনুরোধ জানাতে হবে না কিংবা ইজরাইল-প্রীতির বিষয়ে রিপাবলিকানদের আর কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না।

ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে শান্তি প্রচেষ্টাকে এগিয়ে না নিয়ে বরং হত্যা করেছেন। ফলে পশ্চিম তীর ও গাজাসহ বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত, মুসলিমদের পবিত্র দিনগুলোতে এবং শুক্রবার জুমার নামাজের পর উত্তেজিত জনতা ইজরাইলি সেনাদের সঙ্গে বিক্ষোভ এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে যেকোনো সময় জনবিস্ফোরণ তথা ইন্তিফাদার ডাক আসতে পারে।

ইজরাইলের সঙ্গে পিএলও-র সম্পর্ক ছিন্ন

ইজরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা জানিয়েছে– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)। সেইসঙ্গে তারা ঘোষণা দেয়– ইজরাইলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হবে। এর আগে পিএলও জানিয়েছিল– রাষ্ট্র হিসেবে ইজরাইলকে দেওয়া স্বীকৃতি তারা প্রত্যাহার করবে।

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা *ওয়াফার* খবর অনুসারে, পিএলও'র নির্বাহী কমিটি আরেকটি উচ্চতর কমিটি গঠন করতে চাচ্ছে। এই কমিটির উদ্দেশ্য– ইজরাইলকে দেওয়া পিএলও'র স্বীকৃতি বাতিল করা।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে বিবেচনা করে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এতে ফিলিস্তিনের নেতারা ক্ষুব্ধ হন। ট্রাম্পের স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে সংঘাত চলে আসছে, তার অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকেই ধারণা করা হয়। ইজরাইলের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম একমাত্র দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই দেশ কৌশলগত মৈত্রীতে আবদ্ধ। এই দুই দেশে সরকার বদল হয়, নতুন নেতা আসে, কিন্তু তাদের কৌশলগত আঁতাতের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যুক্তরাষ্ট্র বরাবর নিজেকে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার নিরপেক্ষ 'সমঝোতাকারী' হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার অর্থ– আগে ইজরাইলের স্বার্থ, তারপর অন্য কথা। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বব সেইটস বলেছিলেন– 'বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের ভেতর যে মার্কিনবিরোধী মনোভাব, তার পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যনীতি। তা সত্ত্বেও ইজরাইল প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিবর্তিত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

ট্রাম্প মুখে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে মহান শান্তিচুক্তি করাতে চায়, অথচ কাজটা ঠিক উলটো। জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানীর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি– সেই বিপরীত মনোভাব স্পষ্ট করে। যদিও ট্রাম্পের এই সমর্থনে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রের সমর্থন নেই। ইইউ, রাশিয়া, চীন ইরান তো নয়; এমনকী সম্প্রতি ভারতও একে সমর্থন করেনি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা গাজায় গণহত্যাকে সমর্থনযোগ্য না বলে উল্লেখ করলেও ইজরাইলের এই আগ্রাসনকে তাদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বলে সাফাই গান। যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইজরাইলকে প্রতিবছর তিন বিলিয়ন ডলার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে থাকে। ইজরাইলের বিরুদ্ধে যেকোনো মুভমেন্ট ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সহায়তা করেছে– এমন অভিযোগ বহু পুরোনো। (তথ্যসূত্র : ৬ জুন, ২০১৮ *প্রতিদিনের সংবাদ*)

অন্যদিকে, অস্ত্র ব্যাবসা জমজমাট রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি যে জিইয়ে রাখা প্রয়োজন, তা আমেরিকা ভালোভাবেই বুঝেছে। বিশ্বে আমেরিকা যদি শীর্ষ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হয়, তবে শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক দেশ যে ইজরাইল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে অস্ত্র বাণিজ্যের এই গোপন আঁতাত, একে-অপরকে সন্তুষ্ট রাখতে বদ্ধপরিকর।

মধ্যপ্রাচ্যেকে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি জেরুজালেম। ১৯৬২ সাল থেকে আজ অবধি আমেরিকা অনুদান হিসেবে ইজরাইলে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ প্রেরণ করেছে। আমেরিকার জাতীয় আর্থিক ঘাটতি যেখানে প্রায় ১৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, অধিকাংশ স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকার যেখানে নিজস্ব বাজেট ঘাটতি পূরণে অপারগ, জাতীয় বেকারত্ব যেখানে প্রায় ১০ শতাংশ; সেখানে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরাইলের সামরিক খাতে প্রতিবছর ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে।

আমেরিকার এই ধরনের নগ্ন, চরম পক্ষপাতপুষ্ট ও অন্ধভাবে ইজরাইলকে সমর্থন করার এবং ইজরাইলের সামরিক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করার অর্থই হলো– আমেরিকা ইজরাইলকে নিয়ন্ত্রণ করছে! ইজরাইল আমেরিকার সাহায্যে একের পর এক ভূখণ্ড দখল করে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। আর তারই ধারাবাহিকতার ফল– আমেরিকার ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমকে স্বীকৃতি।

৭০ বছরের বর্বরতা আর অন্যায্য দখলদারিত্বের শিকার ফিলিস্তিন

২০১৮ সালের মার্চ মাসের ৩০ তারিখ থেকে শত বঞ্চনা, নিপীড়ন আর জুলুমের শিকার ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষগুলো ছয় সপ্তাহের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছে। মূলত ৭০ বছর আগে এই দিনে, ইহুদি অপশক্তি ফিলিস্তিনিদের তাদের আদিভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে। সেই অন্যায় দখলদারিত্বের দিনটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দেশটির মজলুম নারী-পুরুষ সকলেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে।

এই প্রতিরোধ কর্মসূচিতে গাজা ও পশ্চিম তীরের মানুষগুলো নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু। কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রেট মার্চ অব রিটার্ন'। এই প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা মূলত তাদের মূল ভূমিকে ফেরত চাইছে; যা আজ থেকে ৭০ বছর আগে ইজরাইলিরা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে।

আগে থেকেই ধারণা করা হয়েছিল, ইজরাইলিরা এই কর্মসূচি সহিংসতার মাধ্যমেই মোকাবিলা করবে। তবে এতটা সহিংস ও বর্বর হবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি।

ফিলিস্তিনিরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কর্মসূচি শুরু করার সাথে সাথেই ইজরাইলিরা গুলি বর্ষণ এবং ড্রোন দিয়ে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার জন্য অসংখ্য স্নাইপারও নিয়োগ করে। স্নাইপার হলো মুখোশধারী কিছু আততায়ী, যারা আড়ালে থেকে টার্গেট করা ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে।

প্রথম ১৫ দিনের বিক্ষোভে ৪২ জন ফিলিস্তিনি শাহাদাত বরণ করে, আহত হয় আরও সহস্রাধিক মানুষ। ইজরাইলিরা নিজেদের সীমানা নিরাপদ রাখার জন্য সীমান্তের বাইরে ৩৫০ মিটার এলাকা পর্যন্ত সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করেছে। অথচ তারা এই ৩৫০ মিটারের বাইরে থাকা ফিলিস্তিনিদেরও রেহাই দিচ্ছে না।

এই বিক্ষোভকারীরা কখনোই ইজরাইলি সীমানা অতিক্রম করতে চায়নি। তারা একেবারেই নিরস্ত্র। বিক্ষোভকারীরা কেবল গাড়ির টায়ার পুড়িয়ে কিংবা পাথর ছুড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর বিক্ষোভাকারীদের অবস্থান সীমান্ত বেড়া থেকে এতটাই দূরে যে, তাদের ছোড়া এইসব পাথর ইজরাইলি সীমানার ধারে-কাছেও পৌঁছায় না। এভাবে ফিলিস্তিনিরা শুধু একটি বার্তাই দিচ্ছে– তা হলো ৭০ বছরের অন্যায় আগ্রাসনের পরেও তারা ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। তারা কখনোই আগ্রাসনকারীদের কাছে মাথা নত করবে না এবং নিজেদের মাতৃভূমি কারও কাছে ছেড়েও দেবে না।

ইজরাইল যদিও দাবি করেছে, বিক্ষোভকারীদের অনেকেই সহিংস ঘটনা ঘটাচ্ছে, কিন্তু মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক বিবৃতিতে এই দাবি অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে, ইজরাইলের চলমান বর্বরতা এবং নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হত্যার ঘটনায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও ইজরাইল তাতে কর্ণপাত করছে না। ইজরাইলের এই পৈশাচিকতা তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব অবশ্য উঠেছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ায় তা আর আলোর মুখ দেখেনি। প্রকারান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন পৃষ্ঠপোষকতা ইজরাইলকে আরও বেপরোয়া হতে উৎসাহিত করেছে।

ইজরাইলের সেনা প্রশাসনের কর্মকর্তা এভিগেদর লিবারম্যান এক টুইট বার্তায় বলেছেন–

> 'সৈন্যরা যা করছে, তা বুঝে-শুনেই করছে। ইজরাইলি সেনারা খুব ভালো করেই জানে, বুলেট কোথায় খরচ করতে হবে।'

ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের খাবারের কষ্ট দেয়, আবাস কেড়ে নেয়, পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করে। এখন সেই অবস্থা বরং পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক ভয়াবহ।'

সম্প্রতি গাজা ঘুরে এসে এক পর্যবেক্ষক আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন– 'গাজার মানুষেরা যেভাবে বেঁচে আছে, হয়তো নরকেও মানুষ এর চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে। সেখানকার মানুষ খাবার পায় না, বাড়িগুলো খালি পড়ে আছে। সারা দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ পায়, কল ছাড়লে পানিও পাওয়া যায় না। পাশাপাশি বেকারত্ব তাদের এই সব কষ্টকে যেন আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে পরাশক্তিগুলোর নগ্ন সমর্থন পেয়ে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ তাদের অবৈধ বসতি স্থাপন জোরদার করেছে। গত কয়েক মাসে ইজরাইলি সরকার কেবল পশ্চিম তীরেই নতুন করে ৩ হাজার ৭ শো ৩৬টি ইহুদি বসতি স্থাপনের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। সব মিলিয়ে এই ইহুদি স্থাপনাগুলোতে বসবাসরত ইহুদিদের সংখ্যা ছয় লাখ ছাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিরা নিরাপত্তার অজুহাতে প্রতিদিন তাদের আদিভূমিগুলো হারাচ্ছে। অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা মূল সড়কের পাশে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। প্রকারান্তরে ফিলিস্তিনিদের উঠতে-বসতে চেকপয়েন্ট মোকাবিলা করতে হয়। দেয়াল টপকিয়ে গন্তব্যে যেতে হয়। কাজ করার জন্য বা কোথাও যাওয়ার জন্য ইজরাইলিদের থেকে অনুমতি নিতে হয়। অবস্থা এমন হয়েছে– একজন ফিলিস্তিনি নাগরিক হয়তো তার বাড়ি থেকে ভূমধ্যসাগর দেখতে পারে, কিন্তু সেই সাগরের পাড়ে যাওয়ার জন্য তাকে ইজরাইলিদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। অনেক ফিলিস্তিনি শিশু হয়তো সাগরের গল্পই শুনে যায়, কিন্তু এত সব নিয়মকানুন মেনে তাদের কখনো সেই সাগরের কাছে যাওয়া হয় না। তাদের অনেকের কাছেই সাগরভ্রমণ একটি স্বপ্নের মতো।

প্রায় দিনই বিভিন্ন অজুহাতে ইজরাইলি প্রশাসন ফিলিস্তিনিদের বাড়িগুলোকে ধ্বংস করছে। অনেক সময় ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ভাঙে, কারণ, বাড়িটি নাকি অনুমতি নিয়ে বানানো হয়নি। কিন্তু যখন ফিলিস্তিনিরা বাড়ি বানানোর অনুমতি আনতে যায়, তখন তাদের অনুমতিই দেওয়া হয় না কিংবা দিলেও বড়ো অঙ্কের ঘুষ চাওয়া হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, একজন মানুষের প্রতিদিন ১০০ লিটার পানি প্রয়োজন হয়। অথচ একজন ফিলিস্তিনি নাগরিকরা ৭৩ লিটারের বেশি পানি কখনোই পায় না। অন্যদিকে, ইজরাইলের একজন নাগরিক পায় ৩০০ লিটারেরও বেশি পানি। ফিলিস্তিনি শিশুরা স্কুলে পড়তে গেলে তাদের নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। ফলে বিগত কয়েক বছরে স্কুলে ফিলিস্তিনি শিশুদের ড্রপ আউটের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ছেলেমেয়েরা এত বিড়ম্বনার মধ্যে স্কুলে যাওয়া বা পড়াশোনা করার আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থা জরিপ চালিয়ে জানিয়েছে– ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যত পুরুষ মানুষ আছে, তার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ এখন নানা অভিযোগে

ইজরাইলি কারাগারে আটক আছেন। তাদের কোনো সামরিক বা বেসামরিক আইনের আওতায় বিচার করা হয় না। ফলে তারা ততদিন থাকতে বাধ্য থাকবে, যতদিন ইজরাইলি প্রশাসন চাইবে। এই বিপুলসংখ্যক বন্দি ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও নেই, নেই কোনো বিচার প্রক্রিয়া। এমনকী ইজরাইলি কারাগারে অনেক ফিলিস্তিনি শিশুও আটক আছে, যাদের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়া ছাড়া অন্য কোনো অভিযোগ নেই। এখন ইজরাইলি একটি আইন অনুমোদন করেছে, যেখানে শুধু পাথর ছোড়ার অপরাধে একটি শিশুকে ১০ থেকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিতে পারবে!

ইজরাইলিরা পরিকল্পিতভাবে গাজায় এই ভয়াবহতা সৃষ্টি করে রেখেছে, যাতে তারা নিজ ভূমি থেকে পালিয়ে যায় অথবা এখানেই ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নেওয়া ফিলিস্তিনিরা বলছেন– 'আমরা কখনোই ইজরাইলি দখলদারদের চাপে নিজেদের মাটি ছেড়ে যাব না। আমরা জয়তুন গাছের শিকড়ের মতোই শক্ত হয়ে আমাদের মাটিতে গেড়ে বসে থাকব।'

এত নিপীড়নের পরও ফিলিস্তিনি মজলুম মানুষগুলো আমাদের প্রেরণার জায়গা। যখনই ইজরাইল মনে করেছে– তারা দখলদারিত্ব, বর্বরতা, শোষণ এবং না খাইয়ে রেখে ফিলিস্তিনিদের শায়েস্তা করতে পেরেছে, ঠিক তখনই ফিলিস্তিনিরা এই 'গ্রেট রিটার্ন মার্চ' কর্মসূচিটি ঘোষণা করেছে। এতে প্রমাণ হয়েছে– ফিলিস্তিনিরা বীরের জাতি, জুলুম করে তাদের নিঃশেষ করা যাবে না। ফিলিস্তিনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিগুলোতে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইজরাইলিদের বিস্মিত করেছে। ইজরাইলিরা এখন বুঝতেই পারছে না, কীভাবে তারা এই নির্ভিক মানুষগুলোর মোকাবিলা করবে। তারা গুলি করে ফিলিস্তিনিদের উসকে দিচ্ছে, যাতে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা ভুলেও ইজরাইলের সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে না। এতে বরং ইজরাইলি আরও জুলুমবাজ ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে।

মাত্র ১৭ বছরের আহেদ তামিমি এই চলমান বিক্ষোভে ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রেরণার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এই কিশোরী যেভাবে ইজরাইলি সেনাকে চড় মেরেছে, লাথি দিয়েছে সেই ছবি ও ভিডিওগুলো ইতোমধ্যেই গোটা বিশ্বে ভাইরাল হয়েছে। ইজরাইলিরা তার বাড়ি ধ্বংস করেছে, তার ভাইকে গুলি করেছে, তথাপি সে দমে যায়নি। ইজরাইলি সেনারা তাকে আটক করে ৮ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সাহসী কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের নব্য 'জোয়ান অব আর্ক' উপাধিতে অধিষ্ঠিত করেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়– জাতিসংঘ, ওআইসি এবং মুসলিম দেশগুলো ইজরাইলের চলমান বর্বরতা নিরসনে এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। অতীতে দুই পক্ষের মধ্যে অনেক চুক্তি হলেও ইজরাইল কখনোই তা মানেনি। তাদের গণহত্যা ও নিপীড়নমূলক মানসিকতার কারণে গোটা ফিলিস্তিন এখন মধ্যপ্রাচ্যের আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে।

এর সমাধান একটাই। প্রিন্সটনের অধ্যাপক রিচার্ড ফালকও একই কথা বলছিলেন। তিনি বলেন– 'শান্তিপূর্ণ আলোচনার দিন শেষ। এখন গোটা বিশ্বের মানবতাবাদী মহলগুলো একমত হয়ে অবিলম্বে ইজরাইলকে বয়কট করতে হবে, ইজরাইলে বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে, ইজরাইলের ওপর অবরোধ আরোপ করতে হবে। ন্যায়বিচার তখনই নিশ্চিত হবে, যখন ইজরাইলকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একঘরে করে ফেলা সম্ভব হবে।'

ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর ওষুধের পরীক্ষা

কারাবন্দি ফিলিস্তিনিদের ওপর প্রতিদিন নতুন নতুন ওষুধের পরীক্ষা চালাচ্ছে ইজরাইলের বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ই ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোকে এ অনুমতি দিয়েছে বলে দাবি করেছেন ইজরাইলি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাদেরা শালহাব। মূলত তার গবেষণাতেই আরব ও ফিলিস্তিনি কারাবন্দিদের ওপর ওষুধ পরীক্ষার এ চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। খবর ফিলিস্তিন *ক্রোনিক্যাল* ও *শেহাব* নিউজের।

তিনি আরও বলেছেন, ইজরাইলের সামরিক সংস্থাগুলোও ফিলিস্তিনি শিশুদের ওপর অস্ত্র পরীক্ষা করছে। অধিকৃত জেরুজালেমে এ পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা তাদের নতুন উদ্ভাবিত পণ্য এবং অস্ত্র দীর্ঘমেয়াদে ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়নের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক নাদেরা শালহাব বলেন– হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার সময় তিনি এসব তথ্য পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে ফারেস বারুদ নামের এক ফিলিস্তিনি কারাবন্দির মরদেহ হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় ইজরাইল। তিনি কারাগারে বেশ কিছুদিন ধরে একাধিক রোগে ভুগছিলেন। ফারেসের পরিবারের শঙ্কা, তার শরীরে নতুন ওষুধের পরীক্ষা চালানো হতে পারে। ফরেনসিক পরীক্ষায় এটা বেরিয়ে আসবে, সেই ভয়ে তার মরদেহ হস্তান্তর করেনি ইজরাইল।

এর আগে কারাবন্দিদের ওপর ওষুধের পরীক্ষা চালানো নিয়ে ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে ইজরাইলি দৈনিক *ইয়েদিওথ আহরোনোথ* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়– ইজরাইলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ডালিয়া আইজিক স্বীকার করেন, কারাবন্দিদের ওপর নতুন ওষুধের পরীক্ষা চালানোর জন্য দেশটির ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোকে অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

সেই সময় তিনি বলেন– ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার বন্দির ওপর এ পরীক্ষা চালানো হয়েছে। গত বছরের আগস্টে বেলজিয়ামের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাকডের সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক রবরেচট ভ্যান্ডারবিকেন বলেন– 'গাজা উপত্যকার মানুষ না খেয়ে,

বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মরছেন।' তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন– 'উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনি শিশুরা নিখোঁজ হচ্ছে। পরে তাদের মরদেহ পাওয়া গেলেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে না।'[১৪৪]

নতুন ঘটনা

২০১৯ সালে (এপ্রিল ২০১৯) উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা ঘটেছে। ২৯ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী রামি আল-হামদাল্লাহ পদত্যাগ করেছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কাছে তিনি ও তার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সদস্যরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এ ঘটনাকে হামাসের সঙ্গে ফাতাহর ঐক্য পুনঃস্থাপনের পথে বড়ো ধাক্কা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। অবশ্য, পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হলেও নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাবে তার সরকার।

এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। তবে এর আগে ফাতাহর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন– 'যদি রামির নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে, তবে নতুন সরকার গঠন করা হবে।' ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র ইউসুফ আল-মাহমুদ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফাতাহর নতুন সরকার গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে হামাসের এক নেতা বলেন, নতুন সরকার গঠনের এই প্রক্রিয়া ফিলিস্তিনের রাজনীতি থেকে হামাসকে দূরে সরানোর প্রচেষ্টার একটি অংশ।

পরে যে ঘটনাটি হলো– ২১ মার্চ এক অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইজরাইলিদের অন্যায্যভাবে দখলে নেওয়া গোলান হাইটসকে ইজরাইলের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। গোলান হাইটস হচ্ছে সিরিয়ার উত্তর ভাগের পার্বত্য এলাকা। এলাকাটি ছোটো ছোটো পাহাড়ে ভরপুর। এটি সিরিয়ার অংশ এবং তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইজরাইল সিরিয়ার এ এলাকা দখল করে। এলাকাটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব রয়েছে, কিন্তু ইজরাইল এখনও তা কার্যকর করছে না– এটা ইজরাইলের পুরোনো স্বভাব।

এর মধ্যে ট্রাম্প নতুন এক খেলা শুরু করছেন। গোলান হাইটসকে ইজরাইলের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এ ঘোষণা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। ইতোমধ্যে আরবলিগ, ওআইসি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ এর নিন্দা জানিয়েছে। ট্রাম্পের এ বাড়াবাড়ির কোনো মানে হয় না। এর পূর্বে তিনি জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তরিত করেন। অথচ পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের রাজধানী মনে করে এবং ভবিষ্যতে যা অফিসিয়াল রাজধানী হবে। জেরুজালেম নিয়ে ট্রাম্প যা বলেছেন,

---

[১৪৪]. *দৈনিক যুগান্তর*। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

তাতে ফিলিস্তিনে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর গোলান হাইটস নিয়ে তিনি এখন যা করছেন, তা বিশ্ব রাজনীতিকে ভীষণভাবে উত্তপ্ত করবে।

সমাপনী মন্তব্য

এ রকম বইয়ের উপসংহার হয় না। যে লড়াইটাকে নিয়ে লিখছি, তা এখনও চলমান। তাই এর উপসংহার টানা লেখক হিসেবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিজের লেখনীর দিক থেকে কিছু কথা বলা যায়। আমার এত দূর লিখেও মনে হচ্ছে– আসলে অনেক কিছুই লেখা বাকি। পুরো বইটি হামাসের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস নিয়েই লিখে গেলাম, তবে সেভাবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। তাতে হয়তো বইয়ের কলেবর আরও বাড়ত। সেটা সংশ্লিষ্ট সবার জন্যই বেশ ভারীও হয়ে যেত। তাই ফিলিস্তিন ইস্যুতে সামনে আরও কাজ করার ইচ্ছা রাখি।

আমি খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেদের সমালোচনা করে বলতে চাই– ফিলিস্তিন, আল কুদস তথা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমরা অনেকেই হৃদয়ে ধারণ করতে পারিনি। মুসলমানদের এই করুণ পরিণতি ও পরাজিত মানসিকতা মেনে নেওয়া যায় না। অথচ উম্মাহর যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, তা কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না, যদি তাতে মুসলমানদের প্রথম কিবলাকে মুক্ত করার এজেন্ডা না থাকে।

সহজভাবেও যদি চিন্তা করি। আমাদের দেশের মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে মক্কায় ও মদিনায় উমরাহ করার প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ হজ আদায় করে। বায়তুল্লাহ ও সোনার মদিনা নিয়ে মানুষের আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকবেই। কিন্তু এই দুই পবিত্র মসজিদের পর, অসংখ্য নবিদের স্মৃতি বিজড়িত; এমনকী আমাদের রাসূল (সা.)-এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত বায়তুল মুকাদ্দিসকে নিজের চোখ দিয়ে দেখার কিংবা মসজিদের ভেতরে ঢুকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার আগ্রহ কয়জনের আছে? মসজিদটা দখল হয়ে আছে কিংবা ওখানে যাওয়া কঠিন, ভিসা নেই ইত্যাদি বাস্তবতা যদি আলাদা করেও রাখি, তাহলেও প্রশ্ন জাগে, আমরা কয়জন যাওয়ার স্বপ্ন দেখি? আমরা কতবার বায়তুল মুকাদ্দাসের দখলমুক্ত হওয়ার জন্য দুআ করি? আমাদের এই পবিত্রতম মসজিদটি বেদখল হয়ে পড়ে আছে আজ বছরের পর বছর ধরে। আমরা কয়জন কতবার তা নিয়ে চোখের পানি ফেলি? আমি মনে করি, ফিলিস্তিন নিয়ে নিজেদের সেই আত্মপর্যালোচনা করার সময় এসেছে।

বইটির ভূমিকায় ফিলিস্তিন নিয়ে আমাদের আবেগের কথা বলেছিলাম, সেটা মিথ্যা নয়। তবে আবেগের সাথে আমাদের দিক থেকে কার্যকর কৌশলের অভাব দারুণভাবে দেখতে পাই। আজ যখন কোনো এক শুক্রবারে এই লেখাটা লিখছি, তখনও ৪০ হাজার মুসলমান খুব কষ্ট করে ইজরাইলি পুলিশের বাধাকে উপেক্ষা করে বায়তুল মুকাদ্দাসে জুমার নামাজ আদায় করছে। সেখানে প্রতি রমজানে তারাবিহ পড়তে বাধা দেওয়া হয়, গোলাগুলি হয়। মুসল্লিরা নামাজ পড়তে এসে শহিদ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

গাজা থেকে রকেট ছোড়া হচ্ছে– এ রকম ঠুনকো অভিযোগ তুলে প্রতিদিন গড়ে দুই-তিনজন করে নিরীহ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করছে ইজরাইল। জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকতি দেওয়ার পর এবার গোলান হাইটসকেও ইজরাইলের মালিকানায় দেওয়ার চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ব্যস্ত। আমাদের প্রাণের মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসে আজ ইহুদিদের অবাধ প্রচারণা। মুসলিমরা নামাজ পড়ে মসজিদের চত্বরে। মসজিদের চত্বরে যুবক-যুবতির অশ্লীল কার্যক্রমের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। ইজরাইল দিনের পর দিন এসব অনাচার আর অসহনীয় অন্যায় অবলীলায় করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিরা এত কিছুর পরও ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ হচ্ছে। হামাসকে পশ্চিমারা সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অভিহিত করে, অথচ ইজরাইলিদের বর্বরতার তুলনায় হামাসের ভূমিকা রীতিমতো মজলুমের মতোই। হামাস এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম মজলুম সংগঠন। ভাবা যায়– হামাস একটি দল, যার প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশই এরই মধ্যে শহিদ হয়েছে! দেশের প্রতি, দ্বীনের প্রতি কতখানি মায়া, আবেগ আর ডেডিকেশন থাকলে এরপরও টিকে থাকতে পারে। হামাসের বর্তমান গাজাপ্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার, যিনি জীবনের ২৩টি বছর কাটিয়েছেন জেলে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা পঙ্গু শহিদ শেখ আহমাদ ইয়াসিনও তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়ে শহিদ হয়ে বিদায় নিয়েছেন। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সাবেক প্রধান খালিদ মিশাল দীর্ঘ ৩৬ বছর পর নিজ ভূমিতে একবার যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আরেক নেতা মুসা আবু মারজুক তার জীবনের সোনালি সময়টা কাটিয়েছেন অসহায় পর্যটকের মতো, ঠিকানাবিহীন। এই দলের প্রায় ১৫ হাজার নেতাকর্মী এখন ইজরাইলের কারাগারে বন্দি; যাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ২০ বছরের বেশি কারাদণ্ড হয়ে আছে। শহিদ হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। ফিলিস্তিনের বাড়িতে বাড়িতে কান্নার রোল, পঙ্গু যুবক আর সন্তানহারা মায়েদের আহাজারি।

হজরত নোমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

> 'রাসূল (সা.) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে থাকবে, যেন তাদের একটি একক দেহের মতোই দেখাবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথা পাবে, তখন যেন শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই ব্যথার কারণে রাত জেগে থাকবে এবং জ্বরের মাধ্যমে তার ব্যথায় সম-অংশীদার হতে পারে।' বুখারি ও মুসলিম

ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষগুলোর প্রতি মুহূর্তের দুঃখ-বেদনা যেন আমাদেরও স্পর্শ করে। পরিশেষে দুআ করি– মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে আমরা যেন সকলেই ঐকবদ্ধ হয়ে যার যার অবস্থান থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য কার্যকর কিছু করতে পারি। মহান আল্লাহ যেন সেই তাওফিক দেন। আমিন।

রেফারেন্স

১. *Sheikh Ahmad Yassin, a Wintess to the Age of Intifada*; Edited by Ahmad Mansur, Published by Arab Scientific Publishers & Dar Ibn Hazm, Beirut, 2003.

২. *Palestine Right Of Return, Sacred, Legal, and Possible*, Written by Dr. Salman Abu Sittah, Published from Palestine Return Center, London 2001.

৩. My meeting with Shaikh Yasin>.https://www.aljazeera.com/archive/2004/03/200841013442976696 2.html published on 25 March, 2004.

৪. The life and death of Shaikh Yasin> https://www.aljazeera.com/archive/2004/03/200849163312822658.html published on 24 March, 2004.

৫. http://historypalestine.blogspot.com/2012/09/musa-abu-marzuq.html

৬. http://www.passia.org/personalities/91.

৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Mousa_Mohammed_Abu_Marzook.

৮. Hamas: A History from Within; written by Azzam S. Tamimi, Published by Olive Branch Press; Massachusetts 2007.

৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Basheer_Nafi.

১০. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_University_of_Gaza.

১১. http://www.iugaza.edu.ps/en/About-IUG

১২. https://en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre

১৩. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/remeMYering-sabra-shatila-massacre-35-years-170916101333726.html

১৪. The Christian Science Monitor, a report published on 8 May, 1980.

১৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Intifada

১৬. ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইন্তিফাদা; লেখক. ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সাল। দৈনিক *নয়াদিগন্ত*, ৬ জুন, ২০১৮।

১৭. ফিলিস্তনের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইন্তিফাদা; লেখক. মুজতাহিদ ফারুকি। http://www.iranmirrorbd.com প্রকাশ ১৭ জুলাই, ২০১৮।

১৮. কেন সেই ইন্তিফাদা, কী চেয়েছিল ফিলিস্তিন, কী পেল? অনুবাদক : তারিক মাহমুদ। সাপ্তাহিক প্রশান্তি। ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭

১৯. Edward Said (1989)। *Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation*। South End Press, page 5–22।.

২০. Ruth Margolies Beitler, *The Path to Mass Rebellion: An Analysis of Two Intifadas*, Lexington Books, 2004 p.xi.

২১. http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_ip_timeline/html/1987.stm

২২. Arthur Neslen, *In Your Eyes a Sandstorm: Ways of Being Palestinian*, University of Caslifornia Press, 2011 p.122.

২৩. UN (31 July, 1991) । "THE QUESTION OF PALESTINE 1979-1990"। United Nations

২৪. Foreign Policy Research Institute (SepteMYer 9, 2008) . Yitzhak Rabin: An Appreciation By Harvey Sicherman

২৫. https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

২৬. Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) of Palestine Author(s): Muhammad Maqdsi Source: Journal of Palestine Studies, Vol. 22, No. 4 (Summer, 1993), pp. 122-134 Published by: on behalf of the University of California Press Institute for Palestine Studies

২৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Sephardi_Jews

২৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrahi_Jews

২৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta

৩০. Documentary titled Hamas behind the mask https://www.youtube.com/watch?v=2IE_RzOEU9M

৩১. Pretending Democracy: Israel, and Ethnocratic State; Edited by Nayeem Jeenah; Published by Afor-Middle East Center, South Africa, 2012.

৩২. 6 day long Arab-Israel war > https://www.history.com/topics/middle-east/six-day-war

৩৩. Suvey of Palestinians www.fafo.no/gazapoll/summary. Htm>

৩৪. Rantisi interview with al-qassam website https://www.qassam.ps/specialfile-118-Interview_with_Dr_Rantisi.html

৩৫. Graham Ushar, Hudna, Resistance and War on Islam, Al Ahram Weekly, 6-12

৩৬. About Mahmud Al Zahar > https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_al-Zahar

৩৭. Hamas & Israel: Conflicting Strategies of Group-based Politics; Sherifa Zuhur, DeceMYer 2008

৩৮. Hamas Covenant> https://en.wikipedia.org/wiki/Hamas_Covenant

৩৯. Hamas Political Bureau: Structure & Description. > http://hamas.ps/en/politicalofficemeMYers

৪০. The Jordan-Hamas Divorce> http://www.mafhoum.com/press2/60P2.htm

৪১. Kidnapping and murder of Nachshon Wachsman> https://en.wikipedia.org/wiki/Kidnapping_and_murder_of_Nachshon_Wachsman

৪২. The Muslim Brothers in Jordan: From Alliance to Divergence; written by Jamal Al Shalabi, published in Dans Confluences Méditerranée 2011/1 (N° 76), pages 117 à 136

৪৩. Difference between the Jordan Ikhwan> https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-1-page-117.htm#

৪৪. Breaking apart: Hamas and Jordan's Muslim Brotherhood> http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=21150

৪৫. Hamas and the Jordanian Muslim Brotherhood> http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=4335

৪৬. Israel Frees Ailing Hamas Founder to Jordan at Hussein's Request> https://www.nytimes.com/1997/10/01/world/israel-frees-ailing-hamas-founder-to-jordan-at-hussein-s-request.html

৪৭. bbc news, "Israel spy chief blames PM,"4 NoveMYer 1997> news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/21858.stm

৪৮. (Lucille Barnes, "Arafat Reported 'Close to Despair", Washington Report on Middle East Affairs (Jan/Feb 1998)> www.washington-report.org/backissues/0198/9801066.htm

৪৯. Profile : Khaled Meshaal of Hamas. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3563635.stm

৫০. *Kill Khalid: The Failed Mossad Assassination of Khalid Mishal and the Rise of Hamas* by Paul McGeough Quartet, May 2009

৫১. Mishal's Luck> https://www.lrb.co.uk/v31/n09/adam-shatz/mishals-luck

৫২. Khaled Meshal, Hamas leader: "It is possible to reunite the Palestinians"> https://www.newstatesman.com/middle-east/2009/09/israel-palestinian-hamas

৫৩. State Department spokesman James P. Rubin, Press statement, 20 October 1998> telaviv.useMYassy.gov/publish/peace/october98/102098a.html

৫৪. For the text of Wye River Memorandum see> www.state.gov/www.regions/nea/981023_interim_agmt.html

৫৫. For a summary of the report, visit> www.amnestyusa.org/countries/israel_and-occupied_territories/document.do?id=19024c93E884246A80256A0F005BCC96

৫৬. Camp David: The Tragedy of Errors; by Hussein Agha & Robert Malley; published by New York Review of Books, 9 August 2001. You may visit > www.nybooks.com/articles/14380?email>

৫৭. https://www.youtube.com/watch?v=4kQBL4xU-8w&feature=share&fbclid=IwAR1yFloZQHxH1k6n5pZbcyE6to6I3jN37FYzh5On3DpyfbrQ22nfoJfmXqI

৫৮. Donald Macintyre, "Fatah invokes Memory of Arafat as campaign closes", *Independent*, 24 January 2006> news.independent.co.uk/world/middle_east/article340625.

৫৯. The New Hamas: Between Resistance and Participation. Middle East Report. Graham Usher, August 21, 2005

৬০. Transnational and non-state armed groups. Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, 2008

৬১. https://web.archive.org/web/20140920163954/http://www.ampalestine.org/index.php/history/the-intifadas/200-what-is-an-qintifadaq

৬২. *Hamas lions, the war of the Seven Days*; Ghassan D. Filastin al-Muslimah Publications, 1993.

লেখক পরিচিতি

আলী আহমাদ মাবরুর।
পেশায় সাংবাদিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। মানারাত ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে কলা অনুষদের পক্ষে তিনি একমাত্র গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনেই যোগ দেন একটি জাতীয় দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ও নিউজ পোর্টালে কাজ করে যোগ দেন একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বিভাগে। পরবর্তী সময়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অনুবাদ, ভয়েজ ওভার ও চিত্রনাট্য তৈরিসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। জাতীয় ও সাপ্তাহিক দৈনিকে তার নিয়মিত কলাম প্রকাশিত হয়; যা ইতোমধ্যেই সচেতন পাঠকসমাজে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন; যা পাঠকমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। 'হামাস : ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির' লেখকের মৌলিক গ্রন্থ।

হামাস।

নামেই যার পরিচয়। বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোচিত এক বিপ্লবী কাফেলা। দখলদার জায়োনবাদীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধ আন্দোলন। আজকের দুনিয়ার প্রতাপশালী সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ইজরাইলিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তারা। কঠোর পরিশ্রম, মানবসেবা, ঈমানদারি, অনড় মনোবল, লড়াকু মনোভাব আর সর্বোপরি আরশের মালিকের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস তাদের পরিণত করেছে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে।

সারা পৃথিবীর মুসলমানদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হামাস। তাদের নেতৃত্বেই আল-কুদস মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছে মজলুম মুসলিম উম্মাহ। বিস্ময় জাগানিয়া হামাসকে বাংলাভাষায় জানার আয়োজনে আপনাকে স্বাগতম।